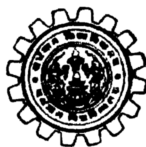
আধুনিক বাংলা কবিতা : বিচার ও বিশ্লেষণ

আধুনিক বাংলা কবিতা : বিচার ও বিশ্লেষণ

জীবেন্দ্র সিংহ রায়
সম্পাদিত



বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা ১৩৬৭

সম্পাদক

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

সম্পাদনা-সমিতির সদস্যবর্গ

মনোরঞ্জন জানা	বিজিতকুমার দত্ত	সুমিতা চক্রবর্তী
রবীন্দ্রনাথ মাইতি	সত্যব্রত দে	রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	শক্তিব্রত ঘোষ	গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

প্রকাশক : রথীন্দ্রকুমার পালিত, প্রকাশন-আধিকারিক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

একটা দেশ যদি বন্ধ্যা না হয় এবং মানুষ যদি না হয় মৃতকল্প, তবে ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মেই তাদের বার বার পেরুতে হয় পরিবর্তন এবং উত্তরণের নানা স্তর। এবং তাতেই সেই দেশ, সেই দেশের মানুষ অস্তিত্বের ঘনায়মান সংকট কাটিয়ে নতুন করে জীবিত হয়ে ওঠে সদ্যোজাত আত্মস্থতায়। যুগান্তরের লগ্ন অবশ্য পঞ্জিকা মেনে আসে না—কোনো ক্ষেত্রে তার আগমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, কোনো ক্ষেত্রে ঢাক ঢোল পিটিয়ে। কখনও তা আসে দ্রুত গতির আকস্মিক চমক নিয়ে, কখনও বা বিলম্বিত চলনের প্রত্যাশিত মন্থরতা নিয়ে। যে-ভাবেই এবং যে-কালেই আসুক না কেন, পালাবদলের সব পালার একমাত্র নিয়ামক কার্যকারণের জটিল সূত্রাবলী।

দেশ ও মানুষের ইতিহাসগত অস্তিত্বে যে অবস্থান্তর তর্কাতীত সত্য, সাহিত্যের প্রবহমান সত্তায়ও তা সমাক্রান্ত সত্য। সাহিত্য একই সঙ্গে অতিভব্য সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম ও ব্যক্তিগত পুরুষার্থের শ্রেয়সী কল্পপ্রতিমা। তাই সাহিত্যের নাটমঞ্চে শুধু সমষ্টিগত সাজবদল নয়, ব্যক্তিগত সাজবদলেরও আমরা মুখোমুখি হই। সাজবদল কেবল বাইরের নয়, ভেতরেরও বটে। এ হচ্ছে মনের বদল, মননের বদল, বাচনভঙ্গির বদল।

ঈশ্বর গুপ্তের আমলের কবিকর্মে জনরুচির দায় সামলানোর প্রথাসিদ্ধ অথচ ক্ষয়িষ্ণু আভ্যাসিকতায় ছিলো বিনাশের বীজ—অভিপ্রায় ও অভিব্যক্তি দু'দিক থেকেই ঘুণ-পোকার আক্রমণ প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু বাংলা কবিতার সেই রঙ-রেখাহীন নির্বিশেষ মানচিত্রে প্রথম ধস নামালেন মধুসূদন—যে দেশি-বিদেশি মিশ্র অভিজ্ঞতার নতুন আয়তন তিনি তৈরি করলেন, বাঙালি তার বাসিন্দা ছিলো না কোনো কালেই। তাঁর ক্লাসিক্যালিটি আসলে পূর্বজদের ক্লান্তিকর প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে অনুজের সোচ্চার প্রতিবাদ। শ্রমসাধ্য শব্দসন্ধান, চেষ্টিত বাক্যসমবায়, প্রবাহিত অমিত্র-ছন্দ—সব মিলিয়ে তাঁর কাব্য-উচ্চারণ আকাশের সুদূরতার মতোই এক দৈবাৎ বিস্ময়করতা। ফলে বাংলা কাব্যে দেখা গেলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাজবদল,—মধুসূদনের অক্ষম অনুকারকবৃন্দের কথা মনে রেখেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

এই ব্যক্তিগত পালাবদলের আরেক চেহারা দেখি রবীন্দ্রনাথে। আপন কবিসত্তা নির্মাণের দায়ে রবীন্দ্রনাথ কৈশোরেই এগিয়ে গিয়েছিলেন মধুসূদনের ধ্রুবকল্প নতুন সাম্রাজ্য এবং বিষয়গৌরবী কবিত্বের উৎসমুখ উৎখাত করার দিকে। কিন্তু সেই ঋণাত্মক কর্মিষ্ঠতায় নিজেকে অন্য রকম দেখালেও তাঁর নিজস্ব পৃথিবীর সন্ধান ছিলো না। তাই তিনি বিহারীলালের কাব্য থেকে স্বপ্নচারিতা ও সৌন্দর্যসংকেত গ্রহণ করে নতুন পথে যাত্রা শুরু করলেন এবং অনতিবিলম্বে আত্মগৌরবী সাহিত্যাচল রচনা করলেন। নব্য রোমান্টিক দুর্গে সৌন্দর্যকল্পনার অন্তর্বাসের ওপর আস্তিক্যবুদ্ধি, অধ্যাত্মবিবেক ও অতীন্দ্রিয় রহস্যের সোনালি সাজে তিনি রাজসিকভাবে স্বয়ংবৃত

হলেন। কিন্তু স্বয়ংরচিত শিল্পমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ আজীবন বন্দী হয়ে রইলেন না, নিরন্তর জিজ্ঞাসা ও সংকটানুভবে তার রদবদল ঘটিয়ে চললেন। তাঁর কবিস্বভাবের এই পরীক্ষামূলক ক্রমিকতা একদিকে আত্মাবিষ্কারের তৃপ্তিহীন আকুলতা থেকে উৎসারিত, অন্যদিকে কালের যাত্রা ও মাত্রার সঙ্গে সম্বদ্ধ। তাই তাঁর দীর্ঘায়ত কবি-জীবন বর্তমানের ভেতর থেকেই ভবিষ্যৎ ভাবনায় নিয়ত উজ্জীবিত, ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় আভ্যাসিক পৌনঃপুনিকতায় কখনও ক্লান্তিকর নয়। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের কাল-জ্ঞান ও ইতিহাসের সত্যবোধ ছিলো রক্তমাংসের মতোই অব্যবচ্ছেদী। পরিবর্তমান ইতিহাসের তাগিদে নিজেকে নানান খানা করে দেখাবার কর্মিষ্ঠতা তিনি কখনও হারান নি। ফলে ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর উপকরণে রচিত হয়েছে নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা।

মধুসূদনের মহাসংগীতের স্থাপত্যশিল্প ব্যক্তিক কারুকৃতি হিসেবে যতই পূর্বচ্ছেদী ও দ্রোহাত্মক হোক, বাংলা কাব্যের বাঁক ফেরার ইতিবৃত্তে তার কোনো ভূমিকা নেই। হেমচন্দ্রের জনপ্রিয় বক্তৃতা, নবীনচন্দ্রের উদ্দীপনাময় চিৎকার এবং অন্য সব অক্ষম অনুকারকের ছন্দোবদ্ধ কথার উতরোল মধুসূদনের সৃষ্টিসত্তার পুরুষকার ও প্রতিধ্বনিময় স্বরভঙ্গিকে বাংলা কাব্যের নতুন প্রমূল্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। কিন্তু বিহারীলালে যে গীতিপরবশ কবিতার শুরু, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়ালের মতো কিছু কবিকর্মীর পরিমিত সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ তাকেই অতঃপর বাঙালি কবির স্বগত উচ্চারণ ও কবিতার সর্বতোব্যাপ্ত নতুন প্রমূল্যে পরিণত করলেন। ফলে ঘটলো বাংলা কবিতার সত্যিকারের সমষ্টিগত (এবং সেই অর্থে সামগ্রিক) পালাবদল। এই মন্ময়, গীতল ও রোমাণ্টিক নবত্ব যে কতখানি গভীরতলশায়ী ও সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠেছিলো তা যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের কম্পবিহীন সৃজন ও রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের শিল্পিত উপচ্ছায়ার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সুতরাং প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথ পর্বে এবং রবীন্দ্র-প্রদক্ষিণের উপপর্বে বাংলা কবিতা আর ঈশ্বর গুপ্তের আমলের নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ খণ্ডকবিতার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করে নি, বরং ভাবে ও রূপে গৃহীত নবীনতায় এবং সদ্বিবেকী আত্মস্থ সন্ধিৎসায় আরেক ভুবনে দৃষ্টিপাত করেছে।

২.

কিন্তু কোনো কবিই, রবীন্দ্রনাথের মতো বড়ো কবিও, নশ্বরতার অর্থে যেমন তেমনি সৃজনশীলতার অর্থেও, চিরজীবী হতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ যতই নিজেকে ভেঙে ভেঙে কালের সহযাত্রী করুন না কেন—অকাল জরার হাত থেকে আত্মরক্ষা করে চলুন না কেন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের দায়ভাগ তাঁর ওপরও বর্তেছিলো। প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভেই তাঁর বিশ্বাসের প্রাকারে ও প্রাকরণিক দুর্গে আক্রমণ এলো চতুর্দিক থেকে, তাঁর আত্মস্থতার বিশ্বস্ত বলয়ে ভাঙনের কামড় প্রকট হয়ে উঠলো। অবশ্য এই ভাঙনমুখিতার জন্যে অংশত দায়ী রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজকৃত 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল'। তাই তিনি নতুন করে খুঁজলেন নতুন করে বাঁচবার প্রাণমন্ত্র। যে যৌবনকে ছেড়ে এসেছেন সেই যৌবনকে পুনরুদ্ধার করার জরুরি সূত্রটি ধরা পড়লো তাঁর কাছে—'পর্যাপ্ত

তারুণ্যের পরিপূর্ণ মূর্তি / দেখা দিল আমার চোখের সম্মুখে।' কিন্তু তিনি আবার নতুন হলেন বটে যৌবনায়মান সত্তাকে পুনরাবিষ্কার করে, তবু প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগযন্ত্রণা ও জটিল মানসিকতা তাঁর সম্যক্ মনঃসংযোগ ঘটাতে পারে নি। তা সম্ভবও ছিলো না। তিনি অবশ্য সাধ্যমতো আধুনিক হয়ে নিজেকে নতুন কালের একজন বলে প্রমাণ করতে চাইলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে-চেষ্টা তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, 'আকাশ-প্রদীপ'-এর উৎসর্গ পত্রে (১৯৩৯) লিখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে— '…তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি! তাই, আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্রমাভিব্যক্তি ও কালানুগামিতার এই নিত্যজাগ্রত পুরুষার্থ সত্ত্বেও, ইতিহাসের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বেঁচে থাকার সদ্বিবেকী প্রয়াস সত্ত্বেও বিশ শতকের বিশের দশকেই বিদ্রোহী নব্যপন্থীদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে গিয়েছিলো যে, রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে বসা বা তাঁকে পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সময়টাও ছিলো অনুকূল—প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাংলা দেশের পক্ষে মোড় ফেরার কাল—সমাজব্যবহারে, জীবনচর্যায় ও মানসিকতায়। অবশ্য এর আগে থেকেই ব্যক্তিগত মনোধর্মের তাড়নায় রবীন্দ্র-তটে আঘাত হেনে চলেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী (রবীন্দ্র-কবিতার খেলো নকলের প্রতিবাদে স্থাপত্যধর্মী সনেট রচনা করে—রবীন্দ্রাদর্শে ভাঙন ধরানো তাঁর সজ্ঞান অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিলো না, যদিও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার স্পর্ধা ছিলো), মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম ইত্যাদি। তাই বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে চতুর্ধাব্যাপী অনুকূল পরিস্থিতিতে নতুন বিশ্বাস ও বিভঙ্গের ধ্বজা উড়িয়ে কল্লোল (১৯২৩), কালি-কলম (১৯২৬) ও প্রগতির (১৯২৭) আসরে এসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন একদল তরুণ কবি। এঁদের কবিকর্মেই বাংলা কবিতার নতুন অধ্যায় শুরু হয়। বিশের দশকে 'হাওয়া বদল', 'সৃষ্টিবদল' ত্রিশের দশকে। বাংলা কবিতার এই পালাবদলেরই অপর নাম আধুনিক বাংলা কবিতা।

৩.

প্রথম আবির্ভাবের পরেই আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে সোরগোল উঠেছিলো—বিরূপ সমালোচনার ধুলো উড়েছিলো অনেক। শনিবারের চিঠি ও সজনীকান্ত দাস প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন যৌনচেতনা ও অশ্লীলতা, দুর্নীতি ও পারিবারিক সম্পর্কের অসম্মান, ফর্ম ও স্টাইলের বিশৃংখলা নিয়ে। লক্ষ্য ছিলো শুধু আধুনিক কবিতা নয়, আধুনিক কথাসাহিত্যও। কেউ কেউ তুলেছিলেন কবিতার দুর্বোধ্যতার প্রসঙ্গও—যেমন সেই অভিযোগ একদিন উঠেছিলো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রসঙ্গেও এবং যার উত্তরে তাঁকে লিখতে হয়েছিলো 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' (১২৯৩) প্রবন্ধে—'প্রকৃতির নিয়ম-অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক ও সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত ও আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার জো নাই।' এমন কি

বিচিত্রা ভবনে অনুষ্ঠিত সভার (১৩৩৪) সালিস রবীন্দ্রনাথও আধুনিক কবিতাকে জানিয়েছিলেন ব্যর্থ নমস্কার মাত্র, এই অভিমতও শোনা গেছে। কিন্তু জন্মলগ্নে যে বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিলো কল্লোলের কালের কবিদের নিয়ে, কবিপরম্পরায় আশির দশকে পৌঁছেও বাংলা কবিতা সেই বিতণ্ডার ঝড়ো হাওয়া থেকে মুক্ত হয় নি। বোধহয় একথা সত্য যে, পঞ্চাশের দশক থেকে পালাবদলের নতুন পালা শুরু হয়েছে বলে তর্ক-বিতর্কেরও অবসান হয় নি। কিন্তু তার আগের আমলের কবিদের নিয়েও কি বাঙালি পাঠক আজও নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন ?

অবশ্য কবিতার আনন্দসম্ভোগের জন্য, সৃষ্টিশীল কবিদের শোণিতচাঞ্চল্য ও সুগভীর প্রশান্তি অনুভবের জন্য ব্যক্তিগত প্রস্তুতি ও আত্মীয়তাবোধই যথেষ্ট। কবির দুর্গ নির্জিত হোক্ বা না হোক্ তাতে কিছু যায় আসে না, কবির অন্তর্দাহের উষ্ণতা, পরিণামী শমপ্রাপ্তি এবং বাক্‌বন্ধের ধ্বন্যাঘাত কিছু অন্তরঙ্গ সুখ দিলেই হলো। কিন্তু যেখানে সমষ্টিগত আনন্দভোজ সেখানে অনেকটা সমতলস্তরের প্রস্তুতি ও সম্ভ্রম নিশ্চিন্ততার শর্ত স্বাভাবিকভাবেই ওঠে। কেননা তা না হলে কবিতাপাঠে অল্পবিস্তর সমান বুদ্ধিমুক্তি ও হৃদয়মোচন ঘটে না, আস্বাদনও সকলের পক্ষে একই ভাবে তৃপ্তিকর হয় না। বিশেষ করে সাহিত্যশিক্ষা একটা সমস্যা—কবিতার ক্ষেত্রে সে-সমস্যা কঠিনতর, কারণ কবিতার আত্মা ও শরীর সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ধরিয়ে দেওয়া সহজসাধ্য নয়। একে কবিতামাত্রই 'কী-জানি-কী', স্পষ্ট করে কিছু বলে না ; তার ওপর আধুনিক বাংলা কবিতা আরও দূরভাষী—ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গিতে। তার এক একটি চিত্রকল্প নিয়েই কত বিতর্ক ! তাই আধুনিক কবিতার সমষ্টিগত শিক্ষায় বুদ্ধির অহেতুক কারসাজি এড়িয়ে কবিতার মধুস্বাদ ও সৌরভ বিতরণ করা এক দুরূহ কর্ম।

আধুনিক কবিতার পাঠক সহৃদয় সামাজিক বা জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থী যেই হোক্ না কেন, তাকে নানা ধরনের দুর্বোধ্যতার সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। শিক্ষা ও রুচিভেদে উৎসাহী পাঠকদেরও কবিতার রসাস্বাদনে যে তারতম্য ঘটে সেই সাধারণ সত্যের কথা বলছি না। আধুনিক কবিতায় যত বেশি করে জনগণের কথা এসেছে ততই শুধু জনগণের সঙ্গে নয়, সাধারণ শিক্ষিত মানুষের সঙ্গেও তার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। ফলে শিক্ষার্থী ও উৎসাহী পাঠক আর নিজের বিবেকের সাড়া নিজের ভাষায় শুনতে পায় না আধুনিক কবিতার মধ্যে। আধুনিক কবিতা এখন মুষ্টিমেয়ের উপভোগ্য এক বিশেষী-কৃত সৃষ্টি—তা পাঠকের কাছে বিদ্যামনস্কতা, অধ্যয়নশীলতা ও অনুশীলনযোগ্যতা দাবি করে। দেখে শুনে মনে হয়, অনুভবনির্ভর কাব্য-উপভোগের দিন প্রায় অবসিত। এতে মননের যে অভিজ্ঞতা রূপায়িত তার জন্য চাই 'সচেতনতায় অভ্যস্ত জাগ্রত মনন'। আধুনিক জগতের সব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি আধুনিক বাংলা কবিতার সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনার সঞ্চরণ, সমকালীন রাজনীতির আক্রমণ, তত্ত্ব ও তথ্যের ভিড়, চিত্রকলার সহমর্মী অধিকার, বোধ ও বুদ্ধির বিচিত্র জটিলতার জট দুর্লক্ষ্য নয়। তার সঙ্গে এসে মিলেছে কবিদের মননকর্ম ও মনোধর্মে ব্যক্তিগত প্রতীকারোপ, তির্যক ও অপ্রচলিত শব্দসন্ধান, অভাবনীয় প্রতিমানের প্রয়োগ, উচ্চাবচ স্বরলিপি, বিশৃংখল অন্বয়রীতি ইত্যাদি। সর্বত্রই যে ইত্যাকার বোধিচর্যা ও বাক্‌চর্চা ঘটেছে এমন কথা বলবো না। এমন বেশ কিছু সরল কবিতাও আছে যাদের কাছ

থেকে একটা সুশীল ভালোবাসা সহজেই আদায় করে নেওয়া যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে আধুনিক বাংলা কবিতাকে আগের চেয়ে স্পৃহণীয় ও গ্রহণীয় বলে মনে হলেও এখনও তাকে নিয়ে যুক্তিনিষ্ঠ তর্ক ও বিতর্ক, ন্যায়সঙ্গত বিচার ও বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি সহৃদয় সহচারিতার অবকাশ আছে। সেই সর্বাঙ্গীণ অনুশীলনের পর দেখা যাবে, আধুনিক বাংলা কবিতা নিতান্তই স্বৈরচর্যা বলে গণ্য হচ্ছে না—তা রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতোই অসম্মাননার পর্ব পার হয়ে আপন সামর্থ্যেই সুবোধ্য হয়ে উঠেছে।

৪.

আধুনিক বাংলা কবিতা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্য-তালিকাভুক্ত। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ মঞ্জুরি কমিশনের অর্থ সাহায্যে দুটি আলোচনাচক্রের পরিকল্পনা করেছিলো। প্রথমটির আয়োজন করা হয়েছিলো অনুমোদিত মহাবিদ্যালয়গুলির অধ্যাপকদের জন্য, দ্বিতীয়টি স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য। প্রথমটির বিষয় ছিলো আধুনিক বাংলা কবিতার বিভিন্ন কালপর্ব এবং কিছু সন্নিহিত প্রসঙ্গ ; দ্বিতীয়টির বিষয় ছিলো আধুনিক কবিতার তিনটি তত্ত্বগত নিহিতার্থ এবং পাঁচজন কবির কাব্যকৃতি। বর্তমান গ্রন্থ দ্বিতীয় আলোচনাচক্রে পঠিত প্রপত্রগুলি ও মৌখিকভাবে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুলিপিগুলির সংকলন।

উল্লিখিত দুটি আলোচনাচক্রে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কবি ও কবি-অধ্যাপক ছিলেন—হরপ্রসাদ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, সুনীল গঙ্গো-পাধ্যায়, কেতকী কুশারী ডাইসন, অবন্তীকুমার সান্যাল, বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় ও শঙ্খব্রত ঘোষ। এঁদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য ছিলো কবিদের মুখে কবিতার কথা শোনার আগ্রহ। কবিতা যেহেতু এক প্রাণময় সজীব সৃষ্টি, সেই হেতু বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ সৃজনশীল কবিদের নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞার সঙ্গে সাহিত্য-শিক্ষার সংযোগ সব সময়েই রক্ষা করে চলেছে। সেই একই আগ্রহে অন্য একটি সভায় একদা প্রেমেন্দ্র মিত্রকেও অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিলো। এই সব কবির সঙ্গে দুটি আলোচনাচক্রে মিলিত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ সমালোচক—অজিতকুমার ঘোষ, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী, ভবতোষ দত্ত, মৃণালকান্তি ভদ্র, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্রুকুমার সিকদার, শিবচন্দ্র লাহিড়ী, জ্যোতির্ময় ঘোষ, ক্ষেত্র গুপ্ত, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, অরুণ সেন, গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কমলেশ চট্টোপাধ্যায় ও সুমিতা চক্রবর্তী। কবিদের অন্তরঙ্গ সংবেদনা ও আলোচনা, অধ্যাপক-সমালোচকদের সবিচার বিশ্লেষণ, শ্রোতাদের তর্কবিতর্ক ও ছাত্রদের তীক্ষ্ণ প্রশ্নাবলী—সব মিলিয়ে আধুনিক কবিতার দুটি আসরই বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিলো। তার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় আলোচনাচক্রে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের সকলের লেখা সময় মতো হস্তগত করা যায় নি। আলোচনার যে ধারাবাহিক বিবরণ রাখা হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত

বলে ছাপা হলো না। জীবনানন্দ সম্পর্কে বড়ো লেখাটি যে আলোচকের দেওয়ার কথা ছিলো, তা পাওয়া যায় নি বলে ওই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য বিজিত-কুমার দত্তকে অনুরোধ করা হয়। তাঁর সেই লেখাটি 'সম্পূরণ' চিহ্নিত করে গ্রন্থশেষে ছাপা হলো।

মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির ভালোমন্দ ও তাতে প্রকাশিত মতামতের দায়িত্ব লেখকদের। সম্পাদক প্রস্তাবগুলির মধ্যে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেন নি। সংশ্লিষ্ট দুটি আলোচনাচক্র উদ্বোধন করার জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গ্রন্থটির মুদ্রণব্যয় মঞ্জুর করার জন্য য়ুনিভার্সিটি কাউন্সিলের সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রকাশন-আধিকারিক রথীন্দ্রকুমার পালিত এবং তাঁর অন্যান্য বিভাগীয় সহকর্মীকে। অরুণ মজুমদার লেখক-পরিচিতি রচনার কাজে সাহায্য করেছেন বলে তাঁকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

সূচীপত্র

ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ও বাংলা কবিতা

মৃণালকান্তি ভদ্র

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে সমগ্র পৃথিবীতে তখনও প্রথম মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটেনি। সনাতন মূল্যবোধ, সৌন্দর্য ও কল্যাণে মানুষের মনে জেগেছে সন্দেহ। মনে হয়েছে, মানবিক বিশ্বে একমাত্র নৃশংসতাই সত্য। যদিও রবীন্দ্রনাথ তখনও সত্যের জ্যোতির্ময় টিকার ভাস্বরতায় মুগ্ধ, মানুষের অকৃত্রিম আত্মোৎসর্গের সাধনায় তিনি অটল বিশ্বাসী, তবুও মানুষের বিশ্বাসের বাঁধনে সেই অটুট নিশ্চয়তা নেই। মানুষের মধ্যে একটি হিংস্রতার বীজ রয়েছে, যে হিংস্রতা বিশ্ব-ধ্বংসের তাণ্ডবে মাঝে মাঝে মেতে ওঠে। এই হিংস্রতা দ্বি-মুখী, একদিকে তা আত্মহননের, অন্যদিকে তা বিশ্বহননের। বরং মানুষের এই প্রবৃত্তির দ্বিধা-বিভক্তি বোধ হয় পরস্পরের পরিপূরক। মানুষের এই বিশ্বাস অবসানের পিছনে যেমন রয়েছে যুদ্ধোন্মাদ ধনতন্ত্রের বাণিজ্য-লাভের তীব্র মোহ, তেমনি রয়েছে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই কতকগুলি সংকট। এই সংকট একদিকে ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্য বিস্তারের অর্ন্তদ্বন্দ্ব, অন্যদিকে জড়বিজ্ঞানে নিশ্চয়তার তত্ত্বে ফাটল। অণু-পরমাণুর নিশ্চিত গতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের মনে দেখা দিল সন্দেহ, আবার মন সম্বন্ধে মানুষের বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত যে ধারণা ছিল, তাতে লাগ্‌ল এসে আমূল পরিবর্তনের ঢেউ। এই সমস্ত পরিবর্তন ও মানসিক অনিশ্চয়তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আধুনিক বাংলা কবিতা তার যাত্রা সুরু করল। যে সমস্ত কবিদের রচনা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়, যেমন বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ, তাঁদের কাব্য জীবনের মানসিক প্রস্তুতি এই যুগে—যখন প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে, বিশ্ব জুড়ে একটি সংকট চলেছে, যে সংকট সর্বব্যাপী, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক, যার ফলে আধুনিক যুগের যে লক্ষণ, ব্যক্তি-বিচ্ছিন্নতা, হতাশা, ক্লান্তি, সন্দেহ, পার্থিব ও ইন্দ্রিয়গতসুখে জীবনের চরম অনিষ্ট, এ'দের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে, হয়ত সর্বত্র সমানভাবে নয়. তবু রবীন্দ্রানুসরণ থেকে আলাদা ভাবে এ'দের কাব্যে আধুনিকতার সেই সমস্ত লক্ষণ হয়ত খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়, যার মূলে রয়েছে নীট্‌শের সেই আর্তনাদ, "ঈশ্বর যখন মৃত, তখন সব কিছুই সম্ভব।" বলা বাহুল্য, ঈশ্বর এখানে সেই অপরিবর্তনীয়, ধ্রুব বিশ্বাসের প্রতীক, যা হয়ত শেষ পর্যন্ত সকল সন্দেহের, দুরূহ কষ্টের অবসান ঘটায়। মানুষের এই সনাতন মূল্যবোধে প্রচণ্ড আঘাত দিলেন সিগমুণ্ড্ ফ্রয়েড তাঁর যুগান্তকারী মানসিক জীবনের নতুন দিগন্ত আবিষ্কারে, যার ফলে এই ধারণা জন্মাল, মানুষের চেতনা সংহত কোন পদার্থ নয়, তার বিস্তার চেতনার আলো থেকে দূর বিস্তৃত এক অতল অন্ধকারে. যে অন্ধকারই নিয়ন্ত্রিত করে চেতনার ক্রিয়া-কলাপ। আধুনিক বাংলা কাব্যের আলোচ্য রচয়িতারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তি। এই আশা করা সম্ভব যে, ফ্রয়েড তত্ত্ব প্রথম যুদ্ধের অবসানেই যখন ভারতবর্ষের তটভূমিতে

এসে পৌঁছাল, তখনই তা তাঁদের মানসিক জগতে আলোড়ন তুলেছিল। যে কোন নব-আবিষ্কৃত তত্ত্ব চিন্তার গঠনলোকে আঘাত করে, তারপরে তা চিন্তা ও অভিজ্ঞতার রসে সঞ্জীবিত হয়ে মানস-স্তরের উপাদান হিসাবে গ্রথিত হওয়া স্বাভাবিক। তবে কতখানি তা মানুষের রচনায় ও কর্মে নিজেকে প্রকাশিত করে, তা বলা খুবই কঠিন। তবু এইটুকু অনুমান করা যায়, যে, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব আধুনিক কবিদের অপরিচিত ছিল না এবং তাঁদের রচনায় তার প্রকাশও অসম্ভব নয়। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ নীতি অনুযায়ী ব্যক্তির কর্ম ও ব্যবহারের পিছনে থাকে তার মানসিক প্রবৃত্তি এবং কর্ম ও ব্যবহারের মধ্যে হয়ত থাকে এমন কিছু চিহ্ন থাকে, যা থেকে সঠিক প্রবৃত্তি বিষয়ে অনুমান করা সম্ভব। তবু অনুমান ভ্রান্ত হতে পারে এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানী যে প্রবৃত্তিকে মানসিক ক্রিয়া-কলাপের কারণ বলে অভিহিত করেন, ইয়ুং ও অ্যাড্‌লারপন্থী মনোবিজ্ঞানী তার বিপরীত কারণ নির্দেশ করতে পারেন। এই দ্বিধা মনে রেখেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। এরকম দাবী এ প্রবন্ধের কোথাও করা হবে না যে, ফ্রয়েড জানতেন বলে আধুনিক কবিরা এরকম কাব্য রচনা করেছিলেন, বরং একথা বলার চেষ্টাই করা হবে যে, সমসাময়িক সমস্যা জর্জরিত পৃথিবীতে কবি-চিত্তে যে আন্দোলন জেগেছিল, ক্রান্তদর্শী বলেই হয়ত কবিদের চিত্তের আকাশে তার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছিল, তবে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব-পরিচয় হয়ত সে প্রতিবিম্বকে আরও গভীরভাবে পরিস্ফুট করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

আধুনিক কবিদের রবীন্দ্রনাথ থেকে পার্থক্য কোথায়, সে সম্বন্ধে বহু গবেষণা আজ পর্যন্ত হয়েছে। তাই সে সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলবার দরকার নেই। রবীন্দ্রনাথের কালেই যখন ফ্রয়েডীয় গবেষণা মানুষের মনকে আলোড়িত করেছে, তখন তিনিও সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, একথা বলা যায়। কিন্তু প্রায় ষাট বৎসরের রবীন্দ্রনাথের মানসিক ধারা একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সহসা আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাবে, একথা বলা যায় না। তবু শেষ দিকের জীবনে আনন্দরূপের জয়গান করতে করতে মনের আদিমতম রূপকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর ছবিগুলিতে মনের সেই কুশ্রীতা, ছিন্ন-ভিন্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছে, অন্ধকারের তমোরূপকেই তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, যদিও তাঁর বিশ্বাস অটুট ছিল, এই অন্ধকার সাময়িক; যাকে ভেদ করে চিরস্থায়ী সূর্যালোক উঠ্‌বেই উঠবে। 'রোগশয্যা'য় একটি কবিতায় কবি বলছেন, 'অচেতন তোমার অঙ্গুলি / অস্পষ্ট শিল্পের মায়া বুনিয়া চলিছে ; / আদি মহার্ণব গর্ভ হতে / অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে / প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড / বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ ;' কিন্তু তারপরেই আছে, 'বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর / নব সূর্যালোকে'। এ কবিতা কবি যখন লিখছেন, তখন পৃথিবীতে আর একটি প্রলয়-ধ্বংসী মহাযুদ্ধ চলেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতা, আনন্দ ও কল্যাণের মৌল বিশ্বাসে এতটুকু ফাটল ধরেনি। অথচ আধুনিক কবিরা যখন লেখেন, 'তুমি মোরে দিয়েছ কামনা, অন্ধকার অমারাত্রি সম' কিংবা 'রক্ত মাঝে মদ্য ফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন' অথবা 'শত শত শূকরের চীৎকার সেখানে / শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর' তখন স্বভাবতঃই কোথাও একটা প্রভেদ দেখা দেয় দৃষ্টিভঙ্গীতে। আধুনিক কবিরও অমৃতের বা আনন্দের পিপাসা আছে, কিন্তু তা পিপাসা মাত্র। তিনি জানেন মানুষের মানস-লোকে কোথাও একটা বাধা আছে, যা তাঁকে চিরদিন কামনা-বিধুর মনের কারাগারে বন্দী করে রাখবে, তাই তাঁকে

হয়ত শান্তি খুঁজতে হবে নিবিড় ঘাস-মাতার অন্ধকার গর্ভে। আমার এ বক্তব্যে এই কথাটাই বলতে চাই, মানুষের মনের গতি-প্রকৃতির বিস্তৃত অন্বেষণ যখন জানিয়ে দিয়েছে, মানুষ আসলে কতকগুলি জান্তব প্রবৃত্তির সমষ্টি মাত্র, 'এবং যাকে সভ্য করাই ও শৃঙ্খলিত করাই মানুষের ধর্ম, তখন মানুষ আর এ বিশ্বাস রাখতে পারেনা যে, সে দেবতারই অংশ বিশেষ। এই ইন্দ্রিয়-কামনার চেতনা, দেহকে কেন্দ্র করে মানুষের যে আবর্তন, নিঃসন্দেহে আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র পদক্ষেপ। হয়ত এর জন্য ইয়োরোপীয় সাহিত্যে, যে সমস্ত লেখক-কবির আবির্ভাব হয়েছে ইতিমধ্যে, যেমন লরেন্স, এলিয়ট, কিংবা তারও আগে বোদ্‌লেয়ার, র‍্যাবোঁ, ন্যুট হ্যামসন ইত্যাদি, অনেকাংশে তাঁরা দায়ী। আধুনিক বাংলা কাব্যেও দেহ-চেতনার একটি ধারা মোহিতলালের কাব্য থেকে উৎসারিত হতে পারে। আলোচ্য কবিরা লরেন্স সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, এবং লরেন্সের উপন্যাসে যে দেহ-ধর্মী, প্রবৃত্তি-প্রধান প্রেমের ছবি পাওয়া যায়, তা এ'দের প্রভাবিত করে থাকতে পারে এবং লরেন্সের কিছু বিখ্যাত রচনা 'Sons and Lovers' 'Women in love' ফ্রয়েডের ইংরাজী অনুবাদের সমসাময়িক। আধুনিক কবিদের সকলের মধ্যে দেহ-ধর্মিতা প্রবলভাবে উপস্থিত না থাকলেও দেহকে অঙ্গীকার না করে এ'দের কাব্য রচিত হয় নি। মানুষের কামনা-বাসনাকে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা, হয়ত ফ্রয়েডের বিপ্লবী আবিষ্কারের আগে সম্ভব ছিল না।

কবিত্বের উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, তিনি প্রেরণায় বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে, অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধিই কবিতার উপকরণ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, অভিজ্ঞতার উপকরণ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল নয়, শিক্ষা ও গ্রন্থপাঠ সেই অভিজ্ঞতার উপাদান আহরণে সমর্থ। বুদ্ধদেব বসুও এক জায়গায় বলেছেন, 'আমার দুর্ভাগ্য এই, সকলই জেনেছি'। আগেই একথা বলা হয়েছে, কবি তাঁর অভিজ্ঞতায় যা কুড়িয়ে পান, তা তাঁর জীবনের রসে অঙ্গীভূত হয়ে একটি নতুন সুর তৈরী করে। আমরা কবিদের আলাদা আলোচনায় দেখতে পাব, কোন কোন ছত্র সম্বন্ধে, কবি কোন একটি দৃশ্য দেখে, তার প্রতিক্রিয়াকে ছন্দে রূপ দিলেন, আবার হয়ত কোথাও খুবই তুচ্ছ একটি ঘটনা কবির চেতনার গভীরে আঘাত তুলল। ফলে সুসংহত, সুসম্বদ্ধ কোন চিত্র-কল্প সেখানে দানা বাঁধতে পাচ্ছে না, অবাধ জলস্রোতের মত এলোমেলো অর্থহীন কতকগুলি ছবি কবির মানসলোকে উঁকি দেয় এবং কবিতা যেহেতু ব্যক্তি-বিশেষের অভিজ্ঞতায় জাত হয়ে নির্বিশেষের রূপ ধারণ করে, তাই তাকে এমন কতকগুলি সজ্জা পরিধান করতে হয়, যেগুলি দিয়ে অভিধান-গত নিয়মে কবিতা বলে চিহ্নিত করা যায়। আমি দেখাতে চেষ্টা করব, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এমন অনেক পংক্তি আছে, যেগুলি মনের উপর স্তর থেকে আসছে না, আসছে অনেক গভীরতর লোক থেকে। কবিতা লেখার নিয়মে অনেক সময় কথাগুলিকে সাজান একটা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে কবিরা যে চিত্রকল্প কিংবা যে ভাবনা তাঁর মনে উঁকি দেয়, তাকে অবদমন করেন। কিন্তু ফ্রয়েডীয় আবিষ্কার এইটাই শিখিয়েছে যে, মনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। সমস্ত নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে হবে এবং তাহলেই, মনের গভীরতম বেদনা বা উপলব্ধি চেতনার

উপরিভাগে উঠে আসবে। আর তখনই মনের দ্বন্দ্ব কোথায়, তা বোঝা যাবে। হয়ত ফ্রয়েড এসব কথা বলেছিলেন মানসিক ব্যাধি প্রসঙ্গে, মনের অকৃত্রিম প্রকাশকে সম্ভব করতে, কিন্তু কবিতা সম্বন্ধেও বোধ হয় একথা বলা যায়, কারণ কবির বুকে যে বেদনার ভার রয়েছে, তাকে প্রকাশ করতেও চেতনার সেই গভীরতম স্তরে নামতে হবে। আমার মনে হয়, ফ্রয়েড জানার ফলেই হয়ত চেতনার অন্তর্লোকে অবতরণ করা আধুনিক কবিদের পক্ষে সহজ হয়েছিল।

আধুনিক ইংরাজ কবিদের মধ্যে দেখা যায়, তাঁরা কোন তত্ত্বকে প্রচার করেছেন। যেমন অডেন প্রথম দিকে ফ্রয়েডের তত্ত্বকে, কিংবা স্টিফেন স্পেণ্ডার মার্কসের তত্ত্বকে। আবার, ডিলান টমাস ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাবে সরাসরি অনেক রূপকল্প ব্যবহার করেছেন। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বেলায় এরকম যদিও ঘটেনি, মার্কসবাদের বেলায় হয়ত তা ঘটেছে। ইংরাজী কবিতায় অডেনের লেখায় দেখা যায়, 'Our hunting fathers told the story / of the sadness of the creatures, / Pitied the limits and the lack / Set in their finished features / ' কিংবা 'That human ligament could so, / His southern gestures modify, / And make it his mature ambition / To think no thought but ours, / To hunger, work illegally / And be anonymous / ' এই কবিতায় অডেন প্রেমকে একটি সহজাত প্রবৃত্তিশক্তি বলতে চেয়েছেন, যা ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব থেকে আহরিত। ডিলান টমাসের কবিতায় দেখা যায়, পরিণত মনের জগৎ-সংগ্রাম থেকে পলায়ন, যাকে ফ্রয়েড বলেছেন 'শৈশবে প্রত্যাবর্তন'। টমাস যৌবনের পূর্ণ প্রেমকে ভয় পান, তাঁর কাছে প্রেম-প্রক্রিয়া একটি বীভৎস হিংসা, যার ফলে তার মধ্যে নেই সেই হার্দিক অনুভূতি, যার দ্বারা অন্যের হৃদয়ের কাছে উপনীত হওয়া যায়। টমাসের কবিতায় রয়েছে অসংখ্য বিকৃতির উদাহরণ, যা সৃষ্ট হয়েছে সংঘাতময় জগৎ থেকে পলায়নের ফলে, অথচ যে স্বপ্নময় শৈশবে তিনি ফিরতে চান, সেখানেও ফেরা যায় না। তাই তাঁর কবিতায় অর্থহীন, সংগতিহীন বহু চিত্রের সমাবেশ, যার মধ্যেই পাওয়া যায়, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের কোন অনুসরণ। টমাস চেতনার সেই বিক্ষুব্ধ স্তরে নামতে চাইছেন, যেখানে জন্ম নেয় কামনার কুশ্রী রূপবিশেষ এবং যাকে তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন। টমাস সম্বন্ধে ডেভিড্ হলব্রুক লিখছেন "Disgust with humanity is often expressed in images of sick, saliva, urine, spittoons, 'lovers messing about in the park' and other uses of 'shocking language', which have the air of a child's repelled fear of adult sexuality: 'they would be tittering together now, with their horrid bodies close'." (David Holbrook—"Metaphor and Maturity" in the Modern Age, a Pelican book, edited by Boris Ford, 1961, p. 417.) অডেন বা ডিলান টমাসের মত ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রচার বা অনুসরণ, আধুনিক বাংলা কবিতায় হয়ত নেই, তবু অভিজ্ঞতার স্বাঙ্গীকরণে হয়ত কিছুটা আভাস মিলতে পারে।

যে সব কবিদের কাব্য আমরা আলোচনা করব, এঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়েছিল যে পত্রিকা, "কল্লোল", তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। "কল্লোলের" বিদ্রোহে এবং তার প্রভাবে যে সমস্ত উপন্যাস ও গল্প রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে ফ্রয়েডের সজীব উপস্থিতি অনেক সহজে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসাবে নাম করা যায়, জগদীশ গুপ্তের রচনা, যার উপজীব্য ছিল বিকৃত-মন, কিংবা বুদ্ধদেব বসুর প্রথম দিককার উপন্যাসগুলিতে সেই কামনা-মত্ততা, যা তাঁকে তখনকার দিনের অশ্লীলতম সাহিত্যিক হিসাবে অভিহিত করেছিল। উদাহরণ আরও দেওয়া যায়, যেমন, অচিন্ত্য সেনগুপ্তর 'বেদে' যার মধ্যে ন্যুট হ্যামসন্ ও ফ্রয়েডের বোধ হয় পরিকল্পিত সংমিশ্রণ কিংবা, আরও পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত উপন্যাস 'চতুষ্কোণ' যেখানে নারীর নগ্নদেহের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্ব স্থাপনের একটা বিজ্ঞানসম্মত প্রয়াস, যা আপাতঃদৃষ্টিতে ফ্রয়েডীয় মনে হলেও হয়ত ক্রেট্‌শ্‌মার প্রবর্তিত ব্যক্তিত্ব-কাঠামোর সঙ্গে শারীরিক গঠনের সম্বন্ধ স্থাপনের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপন্যাসে ও গল্পে চরিত্রের বিবর্তনে বা ঘটনার সন্নিবেশে যা অনেক সহজ, কবিতায় চিত্রকল্পের ভীড়ে তা আবিষ্কার করা দুরূহ। তবু যে সব কবিরা গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন, তাঁরাই যখন কবিতা লিখেছেন, তখন একই মানসিক-চেতনার প্রকাশ থাকা অসম্ভব নয়। এই সমস্ত কারণ মনে রেখেই আধুনিক বাংলা কবিতায় ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ও তার প্রভাবের অন্বেষণ। ভূমিকা হিসাবে এই কথাগুলি বলে আমি ফ্রয়েডীয় মানস-তত্ত্বের আলোচনা করব এবং কোন্ কোন্ দিক থেকে আধুনিক বাংলা কবিতায় তার প্রভাব থাকতে পারে. তার সূত্রগুলি নির্দেশ করতে চেষ্টা করব। শেষে যে কয়েকজন কবিকে আমি বেছে নিয়েছি. তাঁদের পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েডীয় প্রভাব কিভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে, তার খসড়া প্রস্তুত করব।

২

ফ্রয়েডের পূর্বে মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল. মানুষের মনের সবটাই চেতন। কিন্তু মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে ফ্রয়েড আবিষ্কার করলেন, রোগী এমন বহু কাজ করছে, যার কারণ সম্বন্ধে সে মোটেই সচেতন নয় এবং কেন সে কাজগুলি করছে তাও সে জানে না। হয়ত দেখা গেল, রোগী নিজেকে পক্ষাঘাতদ্বারা আক্রান্ত মনে করছে, যদিও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোথাও কোন আঘাত বা ত্রুটি নেই। এইসব মানসিক ব্যাধির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফ্রয়েড দেখলেন, রোগের উৎস রোগীর মনেই অবস্থিত, যদিও তা তার চেতনায় নেই। ফ্রয়েড যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তা হোল এই যে, মানুষের মন ভাসমান বরফশৈলের মত, যার আটভাগের একভাগ জলের উপরে ভাসে, বাকী সাতভাগ জলের নীচে। শুধু মানসিক ব্যাধি নয়, স্বপ্ন, স্মৃতিভ্রংশ, দৈনন্দিন জীবনের ভুলত্রুটি ইত্যাদি থেকে ফ্রয়েড প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে, মনের অধিকাংশই অচেতন বা অবচেতন। এই অবচেতন মন আমাদের বিভিন্ন সহজাত

প্রবৃত্তির সমষ্টি নিয়ে গঠিত। এই প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য হোল তৃপ্তির অন্বেষণ এবং এই জন্য শারীরিক অন্যান্য প্রবৃত্তি যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি থেকে ফ্রয়েড একে আলাদা ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। ফ্রয়েডের বক্তব্য হোল, এই প্রবৃত্তি মানুষের সমস্ত কর্মশক্তির মূলে এবং মানুষ নিজেকে বাঁচানর তাগিদে সৃষ্টিশীল যে সমস্ত কাজ করে, তার মূলেও এই কাম-শক্তি। ফ্রয়েড একে 'লিবিডো' আখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর মতানুযায়ী এই শক্তি মানুষের প্রাণশক্তির উৎস। কিন্তু এর প্রকৃতি আদিম ও বন্য, এবং নিজের তৃপ্তির জন্য সামাজিক কোন বাধা নিষেধ মানতে রাজী নয়। কিন্তু মানুষকে সামাজিক নিয়মে বাস করতে হয়, তাই এই বন্য পশুকে নিয়ন্ত্রিত করেই তাকে জীবন যাপন করতে হবে। মানুষের কাছে যখন এই শক্তির প্রকাশ হয়, হয়ত তখন তা সভ্য পোষাকেই দেখা দেয়। কিন্তু এর বর্বর রূপ সব সময় অবচেতনে সুপ্ত থাকে এবং যখনই সুযোগ পায় তখনই তা সমস্ত অর্গল মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। সমাজে বহু ব্যক্তির সঙ্গে কাম সম্বন্ধ নিষিদ্ধ এবং ফ্রয়েড তাঁর Totem and Taboo গ্রন্থে দেখিয়েছেন, এই সমস্ত নিষেধ অবহেলা করলে আদিম সমাজে কি ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা হোত। কিন্তু সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ হলেও কামনার বস্তু হিসাবে মানুষ তা চাইবে না এমন হয় না। তাই যখন সে নিষিদ্ধ ব্যক্তিকে কামনা করে এবং সমাজের ভয়াবহ শাস্তির কথা মনে আসে, তখনই তার কামনা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সেই অচরিতার্থ কামনা অচেতনে থাকে। অচেতনের অবস্থান তাই এমন প্রদেশে যেখানে মানুষ সামাজিক ন্যায়-নিয়মের আলো ফেলে যেতে পারে না, অচেতনকে উদ্ঘাটন করতে সাহায্য লাগে মনঃসমীক্ষকের যিনি মানসিক পীড়া কিংবা স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে বলতে পারেন, অচেতনে এমন একটি অপূর্ণ কামনা রয়েছে, যার অপূর্ণতাই মানসিক বিকৃতি ঘটাচ্ছে। এইভাবে, যে সমস্ত কামনা মানুষ পূরণ করতে চায় এবং যা সে পূরণ করতে পারে না এবং যেগুলি তার কাম-প্রবৃত্তির অংশবিশেষ, সেইগুলিকে নিয়ে অচেতন বা অবচেতন গঠিত। এই অবচেতনের প্রকৃতি কিরকম জানা মুস্কিল, কারণ বিভিন্ন মানসিক সংঘাত ও অচরিতার্থ কামনা থেকেই তাকে অনুমান করা হয়। অবচেতনের এই বন্য প্রকৃতির জন্য ফ্রয়েড এর নাম দিয়েছেন Id বা অদস্, যদিও Id এবং অবচেতন সমার্থক নয়, কারণ Id হোল সহজাত কাম-প্রবৃত্তি এবং তজ্জনিত শক্তি এবং যে অংশে Id এর অবস্থান কল্পনা করা হচ্ছে তা অবচেতন।

ফ্রয়েড চেতন ও অবচেতনের মাঝামাঝি আর একটি স্তরের কল্পনা করেছেন যাকে বলা যেতে পারে প্রান্ত-চৈতন্য বা প্রাক্-চেতনা। এতে রয়েছে সেই সব অভিজ্ঞতা যা আমরা এককালে উপভোগ করেছি, দুঃখের বা সুখের, কিন্তু যা আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইনি এবং ইচ্ছা করলে আমরা চেতনের স্তরে আনতে পারি সেই সমস্ত প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতাকে। কিংবা এও হতে পারে অবচেতনের কামনা একটু ভদ্রবেশে সজ্জিত হলে তা প্রাক্-চৈতন্যের স্তরে উন্নীত হয়, যেমন কোন বর্বর, হিংস্র মানুষকে আমরা তার ছদ্মবেশে বিভ্রান্ত হয়ে অনেক সময় আমাদের গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে থাকি। প্রাক্-চৈতনা ও অবচেতনের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে থাকে মনের প্রহরী, ফ্রয়েড যাকে বলেন Super-ego বা অধিশাস্তা। এমন অনেক কামনা আছে যা সাংঘাতিকভাবে আদিম এবং সেগুলি কিছুতেই Super-egoর কাছে ছাড়পত্র পায় না। আমাদের স্বপ্নে

অবচেতনের রুদ্ধ কামনা চরিতার্থ হবার বা তৃপ্ত হবার চেষ্টা করে। তারা এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে, যাতে অবরুদ্ধ কামনাগুলি প্রতীক-বস্তুর মাধ্যমে নিজেদের তৃপ্ত করে, কারণ এদের স্বরূপ এমনই ভীতিপ্রদ যে কিছুতেই তারা Super-egoর সতর্ক পাহারা এড়িয়ে স্বপ্ন-চৈতন্যে প্রবেশ করতে পারে না। মনের যে অংশ বর্তমান বাস্তব জগৎ নিয়ে সম্পর্কিত তাই হোল চেতন মন এবং ফ্রয়েডের ভাষায় এই অংশের অধিকর্তার নাম Ego বা অহম্।

ফ্রয়েড মনে করেন, এই অহম্ও অনেকাংশে অবচেতন বা অদস্ এবং অধিশাস্তার সংঘাতের ফলে সৃষ্ট, ফলে অহম্ বা চেতনার স্তরে আমরা যা চিন্তা করি, যে ভাবে আমাদের প্রতিক্রিয়া হয়, যে দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের গড়ে ওঠে, সবই অবচেতন কামনা কতখানি তৃপ্ত হয়, বা অতৃপ্ত থাকে তার উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে, মানুষ অবচেতনের তাড়নায়ই জীবন-যাপন করে এবং যেহেতু তার কামনা বাসনা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয় না, তাই অধিশাস্তা সেগুলিকে অবদমন করে অর্থাৎ প্রাক্-চৈতন্যে তাদের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অসামাজিক প্রকৃতির জন্য আবার ঠেলে পাঠিয়ে দেয় অবচেতনের নির্বাসনে। এর ফলে যে মানসিক ব্যর্থতা ও বিপর্যয় দেখা দেয়, অনেক মানুষ তার ফলে মানসিক পীড়ার শিকার হয়ে পড়ে। ফ্রয়েড এই সব ব্যর্থতাকে মানুষ কিভাবে দূর করবার চেষ্টা করে, তারও বিবরণ দিয়েছেন। তিনি সেগুলিকে প্রতিরক্ষা-বিধি বলেন। এই বিধিগুলির বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে আমরা শুধু একটিকে বেছে নিচ্ছি, যা শিল্প-সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। ফ্রয়েড মনে করেন, অনেক মানুষ তার অচরিতার্থ কামনার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে উন্নততর কোন বস্তুতে কামনাকে নিয়োজিত করে। যেমন ঈপ্সিত কামনার জনকে না পেলে কেউ হয়ত তাকে নিয়ে কাব্য রচনা করতে পারে, কিংবা কোন মহান শিল্পের সৃষ্টি করতে পারে ব্যর্থ প্রেমের উপাদানকে নিয়ে। ফ্রয়েডের মত তাই, প্রত্যেক সাহিত্য ও শিল্পের পিছনে কোন একটি ব্যর্থ-কামনা থাকে, যা কামনাকে তার জান্তব প্রকৃতি থেকে বহু ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে। ফ্রয়েড এই পদ্ধতিকে বলেছেন ঊর্ধ্বায়ন বা sublimation।

ফ্রয়েডের তত্ত্বের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল স্বপ্ন। তাঁর মতে, প্রত্যেক স্বপ্নের পিছনে রয়েছে অবদমিত বাসনা, এবং তা দু'একটি স্পষ্ট বিষয় যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণার স্বপ্ন ছাড়া, সর্বত্রই কাম-প্রবৃত্তির অচরিতার্থ রূপ। তাই, ফ্রয়েড স্বপ্নকে মনে করেন ইচ্ছা-পূরণ এবং যেহেতু সরাসরি অবদমিত কামনার তৃপ্তি অধিশাস্তার সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে হওয়া সম্ভব নয়, তাই স্বপ্নে অজস্র চিত্র রূপের সমাবেশ হয়, যাতে আসল ইচ্ছাটা অধিশাস্তার নজরে পড়ে না। স্বপ্নে তাই স্থান কাল সবই পরিবর্তিত হয়ে যায়, বাস্তব জীবনে যে দুটি জিনিস কাছাকাছি ছিল স্বপ্নে হয়ত তারা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এই যে স্বপ্ন-নির্মাণ বিধি একে ফ্রয়েড বলেছেন, স্থানচ্যুতি বা displacement, এছাড়া থাকে, অনেক ভিন্ন বস্তুর একত্র সমাবেশ, যাকে ফ্রয়েড বলেন, একীকরণ বা condensation, তারও একটি বিধি হোল, একটি নাট্যকাহিনী নির্মাণ। যাতে আসল ঘটনাটি স্পষ্ট না হয়, ফ্রয়েড একে বলেন, dramatization। এই নাটকনির্মাণেই দরকার হয় বহু প্রতীকের যার সাহায্যে অবদমিত ইচ্ছা ছদ্মবেশ

ধরে। এই সমস্ত কারণেই স্বপ্নের দুটি বিষয়রূপ—একটি যেটি প্রকাশিত, যা চিত্র-রূপেরও স্বপ্ন-কাহিনীর মধ্যে সোজাসুজি উপস্থিতি, যাকে বলা যায় প্রকাশ্য বিষয় বা manifest content এবং অন্যটি হোল স্বপ্নের যথার্থ রূপ, যা লুকানো থাকে, যাকে ফ্রয়েডের ভাষায় বলা যায় প্রচ্ছন্ন বিষয় বা latent content। ফ্রয়েড মনে করেন, এই প্রচ্ছন্ন বিষয়কে আবিষ্কার করা সম্ভব স্বপ্নের প্রতীকগুলির অর্থ অনুধাবন করে এবং তা করা সম্ভব, যিনি স্বপ্ন দেখছেন তাঁর মনের ভাবনাগুলি যদি মনঃসমীক্ষকের কাছে অনিয়ন্ত্রিত-ভাবে তুলে ধরা হয়। এই অনিয়ন্ত্রিত অবাধ ভাবানুষঙ্গকে ফ্রয়েড বলেছেন free association। স্বপ্নে অচরিতার্থ বাসনার তৃপ্তি হওয়া সম্ভব, কারণ প্রতীক, নাট্য-কাহিনী সব কিছুর মাধ্যমে অবদমিত কামনা নিজেকে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। ফ্রয়েডপন্থীরা মনে করেন, কবিতায়ও অবদমিত বাসনা একইভাবে প্রতীক, চিত্ররূপ এবং অবাধ ভাবানুষঙ্গের মধ্যে নিজেকে তৃপ্ত করে। তবে দেখতে হবে, কবি যেন অবচেতনের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেন। আসলে কবিতার ও স্বপ্নের গঠন-বিধি একই রকম। একথা ফ্রয়েডের আগে কেউ বলেননি। ইউরোপে এবং এদেশে বহু কবি, কবিতার এই যথার্থরূপ উপলব্ধি করেছিলেন, যার ফলে আধুনিক বাংলা কবিতায় আমরা অনেকের মধ্যেই পাই সেই অবাধ ভাবানুষঙ্গ ও অবচেতনের স্তরে অবতরণ, যা কবিতাকে দিয়েছে একটি নতুন গঠন ও শৈলী। বোধহয়, আধুনিক বাংলা কবিতায় ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের এটি একটি দান। কবিতা ও স্বপ্নের নির্মাণ কায়ার সাদৃশ্য সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার আগে ফ্রয়েডীয়তত্ত্বের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি করলাম, সেই প্রসঙ্গে দু'একটি বিষয় বলা দরকার।

আমরা যাকে কল্পনা বলি, তা বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে চিন্তা নয়। মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং মনে করেন; স্বপ্নের বেলায় যেমন মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ স্তর কাজ করে না এবং নিম্ন স্তরে, উদ্দীপকগুলি আঘাত করে বলে নানা ধরনের চিত্ররূপের সৃষ্টি হয়, সেই রকম বলা যায়, কল্পনা বুদ্ধি ও যুক্তির নিয়ম-ব্যতিরেকে কোন একটা কিছু গড়ে তোলা। দিবা-স্বপ্নের সঙ্গে একটা যুক্তির যোগ থাকে, কারণ তখনও চেতন মন সম্পূর্ণভাবে বাস্তব বোধশূন্য হয়নি। এইজন্য মনে করা হয়, দিবা-স্বপ্নের সঙ্গে উপন্যাস বা গল্পের গঠনের সাদৃশ্য আছে, কারণ কথাসাহিত্যের এ দুটি বিভাগে যুক্তিগ্রাহ্য বা গল্পের যুক্তি অনুযায়ী কতকগুলি ঘটনাই সেখানে আসতে পারে। কিন্তু কবিতায় এই নিয়ম মানার প্রয়োজন নেই, অন্ততঃ কোন্ চিত্রের পর কোন্ চিত্র আসবে, তার কোন যুক্তিসিদ্ধ নিয়ম না মানলেও চলে। বরং সেখানে কবির আবেগ ও প্রবৃত্তি যে চিত্রকে তার কামনা-পূরণের উপযোগী বলে মনে করে, তাকেই গ্রহণ করবে। তাই, ফ্রয়েড বলবেন, কবিতাও স্বপ্নের মত অবদমিত কামনার তৃপ্তিসাধনের উপায়, অবশ্যই তা ঊর্ধ্বায়িত উপায়।

ফ্রয়েডের চিন্তায় দুটি পর্ব দেখা যায়—একটি পর্বে তিনি বলেছেন, কাম-প্রবৃত্তি সকল ইচ্ছা ও শক্তির উৎস। যদিও সে কামনার মধ্যে, যা কিছু মানুষকে জীবনমুখী করে তোলে. তাকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পর্বে তিনি এও বলেছেন, কামনার তৃপ্তিতে ব্যর্থতাই তাকে জীবনের পর্ব থেকে পর্বে নিয়ে যায়। তাই মানুষের জীবন গড়ে ওঠে অসংখ্য ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে, যে ব্যর্থতার প্রথম সুরু, জন্মের মধ্য দিয়ে,

কারণ জন্মেই শিশু জগতের বাধার সম্মুখীন হয় এবং মাতৃগর্ভে যে নিশ্চিত আরামের উত্তাপে সে সুরক্ষিত ছিল, তা ছিন্ন হোল। এই ব্যর্থতা হয়ত তাকে হিংস্র করতে পারে, ভীষণ করতে পারে এবং তাই প্রথম পর্বে, ফ্রয়েড তৃপ্তি ও ব্যর্থতা এই দুই-এর টানা-পোড়েনে জীবনের দ্বন্দ্ব ও অগ্রগতি দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় পর্বে ফ্রয়েড জীবন-প্রবৃত্তি ও মৃত্যু-প্রবৃত্তির কথা বলেছেন, যে জীবন-প্রবৃত্তির মধ্যে আগের পর্বের কাম প্রবৃত্তিও রয়েছে। জীবন-প্রবৃত্তি সর্বকিছু ভোগ করতে চায়। কিন্তু পরিবেশ, সমাজ তাকে বাধা দেয়। তাই সে পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে ধ্বংস করতে চায়। তাই, জীবন-প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু-প্রবৃত্তিও কাজ করে যায়। যখন পরিবেশকে বা সমাজকে ধ্বংস করতে মানুষ অক্ষম, তখনই সে আত্মহননে প্রবৃত্ত হয় কিংবা, পৃথিবী থেকে নির্বাসন চায়। দ্বিতীয় পর্বে তাই ফ্রয়েড জীবন-প্রবৃত্তি ও মৃত্যু-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে মানুষের জীবন গড়ে উঠেছে মনে করেন। দুই পর্বের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বোধহয় খুব একটা পার্থক্য নেই, কারণ জীবন ও কামনা, ব্যর্থতা ও ধ্বংস একে অপরের বিকৃতি বা সঙ্কোচ।

কবিতা ও স্বপ্নের গঠন কায়ার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বলা যায়, কবিতা স্বপ্নের অপর দিক, স্বপ্নে চিত্ররূপগুলি সামনে হাজির থাকে এবং আসল আবেগসূত্রটি লুকানো থাকে, অন্যদিকে কবিতায় চিত্ররূপগুলি বহু সময় অন্তরালে থাকে, তবু একটা আবেগের প্রকাশের দ্বারা সমস্ত ছবিলিকে ধরবার চেষ্টা করা হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, কবিতা কেন কতকগুলি চিত্ররূপ বা ধ্বনির সমষ্টি হয় না। তার কারণ, কবিতাকে ভাষায় প্রকাশিত হতে হয়, এবং ভাষার নিয়মগুলি মেনেই তাকে একটি কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করতে হয়, যে জগৎ বাস্তব জগতের প্রতীক। ভাষার আবরণই কবিতার প্রকাশ্য রূপ, আব যে আবেগ কবিতায় প্রকাশিত হয়, তাই প্রচ্ছন্ন রূপ। কবি কতকগুলি শব্দ গ্রথিত করে একটি আবেগকে প্রকাশিত করেন, এবং শব্দগুলিকে এমনভাবে সাজান হয়, যাতে যে আবেগ জাগরিত হওয়ার দরকার, তাই প্রকাশ পায় এবং অন্য আবেগ অবদমিত হয়। ভাষার আবরণ শব্দের সঙ্গে আবেগের যে যোগসূত্র তাকে নাড়া দেয় এবং সমস্ত মিলিয়ে তখন একটি অর্থ গড়ে ওঠে। কবিতার বিষয়বস্তু শুধু আবেগ নয়, বরং আবেগের সংবদ্ধতা, যা ভাষার নিপুণ ব্যবহারে সম্ভব হয়।

কবিতা ও স্বপ্নের মধ্যে আবেগের প্রকাশের দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও কয়েকটি প্রধান পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, কবিতা সৃষ্টিমূলক ; স্বপ্ন তা নয়। কবিতাতে তাই আবেগকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী করে গড়ে তুলতে হয়, কবিতাকে সামাজিক প্রকাশের আওতায় আসতে হয়, যাতে কবির আবেগ সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, স্বপ্নের উৎস সহজাত প্রবৃত্তি এবং সেই প্রবৃত্তিই চিত্ররূপগুলিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই প্রবৃত্তিগুলি অন্ধ এবং তাদের কোন সৃষ্টি ক্ষমতা নেই। কিন্তু কবিতায় কবি অবচেতনের স্তরে অবতরণ করেন। তাই তিনি জানেন, তিনি কি করছেন, এবং কি সৃষ্টি করতে চান। যদিও সেই জানাকে অনিয়ন্ত্রিত অবাধ অনুষঙ্গের সঙ্গে মিলিত হতে হয়। তৃতীয়তঃ, স্বপ্নের উদ্দেশ্য ইচ্ছাপূরণ, তাই সেই সব অবদমিত বাসনাকে স্বপ্ন-চেতনা এড়িয়ে চলে, যার আলোড়ন নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দেবে এবং বাসনার পূরণ হবে না। কবিতা আবেগের গভীরে নাড়া দেয়, কারণ

কবিতা মানুষের মনে পরিবর্তন ঘটাতে চায়। চতুর্থতঃ, কবিতা বাস্তব থেকে প্রবৃত্তির উদ্দেশে যাত্রা করে এবং একেবারে প্রবৃত্তির সঙ্গে সাক্ষাতের আগের স্তরে থামে, স্বপ্ন প্রবৃত্তি থেকে বাস্তবের দিকে যাত্রা করে এবং বাস্তবের সুরুর আগেই তার যাত্রা শেষ হয়। এই পার্থক্যগুলির কথা মনে রেখেই কবিতাকে স্বপ্নের নির্মাণ-কায়ার সঙ্গে তুলনা করা চলে।

আগেই বলেছি, স্বপ্নের সঙ্গে কবিতার প্রধান মিল অবাধ ভাষানুষঙ্গ বিষয়ে। এর ফলে কবিতায় এক ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যাতে কবিতা সমস্ত অভিজ্ঞতাটাকে কতকগুলি টুকরো টুকরো ছবিতে সন্নিবিষ্ট করে। আপাতঃ বিচ্ছিন্ন এই সমস্ত যাদের একটার সঙ্গে আর একটার কোন মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, হয়ত তারা কোন এক আবেগের সুদৃঢ় মূলে আবদ্ধ। এই বিচ্ছিন্ন বাস্তবতা বা সুররিয়ালিজম ফরাসী কাব্যে বোধহয় র‍্যাবোঁ, নারভ্যাল এবং লএে-মঁর কাব্যে পাওয়া যায়, যাঁরা কাব্যের ভাষা এবং ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করেন। কিন্তু সুররিয়ালিজমের প্রধান প্রেরণাদাতা যে ফ্রয়েড সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। Cazamian তাঁর A history of French Literature এ লিখেছেন, 'The gospel now proclaimed, coolly and defiant, was largely one of obedience to the sub-conscious. By all methods—automatic writing, trances, dreams, chance meetings and accidents—our hidden impulses were to be consulted and the unknown made to speak. The new faith was sceptical and pessimistic, a kind of mysticism, as it were of negation, except in so far as it strengthened that one traditionally mistrusted element of our deeper selves, desire. Its over-simplified, almost puerile denial of all the rules of reasonable composition might have seemed to offer little promise." (Cazamian—A History of French Literature, 1963, p. 437.) অন্যান্য ভাষার কাব্যে দেখা যায়, ফ্রয়েডের চেতনার বিভিন্ন স্তরের আবিষ্কারকে কবিরা এই সুররিয়ালিজম পদ্ধতির ব্যাপারে কাজে লাগিয়েছেন। বিচ্ছিন্ন ছবির মধ্য দিয়ে একটি গোটা চিত্রকে তুলে ধরে কবি অবচেতন থেকে চেতনায় আসতে পারেন এবং তার মধ্য দিয়ে স্বপ্ন-চৈতন্যের মতই তাঁর বাসনাকে রূপ দিতে পারেন।

ফ্রয়েডীয়-তত্ত্বের আলোচনা এবং প্রসঙ্গতঃ কবিতার সঙ্গে স্বপ্নের সাদৃশ্য বিষয়ে বিশ্লেষণ থেকে এ প্রশ্ন হতে পারে, আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায় কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা যেতে পারে। আমি মোটামুটি চারটি সূত্রে আলোচনাটি করতে-চাই এবং তা হবে নিম্নরূপ।

(১) ইন্দ্রিয়-কামনার প্রাধান্য স্বীকার

আধুনিক কবিরা ফ্রয়েড পড়ে দেহ-চেতনা বা ইন্দ্রিয়-কামনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তা নয়; বরং বাংলা কাব্যের অতীত যুগে এ প্রাধান্য ছিল। বৈষ্ণব কবিদের রচনায়, বিশেষ করে বিদ্যাপতির রচনায় ইন্দ্রিয়-কামনার ও দেহ-চেতনার আধিক্য দেখা যায়,

যদিও দেহ সেখানে দেবতার অঙ্গন। আমি দেখাতে চেষ্টা করব, আধুনিক কবিদের কাব্যে এই দেহ-বাদ বেশ জোরালোভাবে উপস্থিত যদিও সকলের মধ্যে সমানভাবে নয়। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে দেহ-চেতনার সোচ্চার প্রকাশ, সুধীন্দ্রনাথে তা আত্মরতির পর্যায়ে এবং স্মৃতি-সুখের উপাদান হিসাবে বর্তমান, বিষ্ণু দে দেহ-চেতনাকে স্বীকার করে নিয়েছেন রোমাণ্টিক সৌন্দর্য ধ্যানকে ব্যঙ্গের বিদ্রূপে বিদ্ধ করে, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় দেহ-প্রেম বিষণ্ণ ধূসরতায় একটি হতাশার সৃষ্টি করেছে এবং অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে দেহ থেকে আরও বড় কিছু পাবার চেষ্টা, যাকে বলা যায় প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বায়ন পদ্ধতি।

(২) মৃত্যু-চেতনা বা ধ্বংস-চেতনা

ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে ব্যর্থতা ও ধ্বংস চেতনা মানুষের জীবন-চেতনাকে আবৃত করে আছে, মানুষের তাই আত্ম-হননের চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের কাছে, মৃত্যু নতুন জন্মের সিংহদ্বার; কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগে মৃত্যুর রূপ পাল্‌টে গেছে, মৃত্যু সেখানে কঠিন, শীতল, অন্ধকার। আধুনিক কবিদের চিন্তায় মৃত্যুর এই বিষণ্ণ রূপ আমার মনে হয় ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সঙ্গে কিছুটা পরিচয়ের ইঙ্গিত বহন করে। শুধু মৃত্যু নয়, মৃত্যুর মত হতাশা, উদ্বেগ, ক্লান্তি, ব্যর্থতা, অবসাদ, এই ধরনের সমস্ত মানসিকতার পিছনে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

(৩) বাক্য-গঠনে ও শব্দ-চিত্র গঠনে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের ছায়া

আধুনিক কবিরা এমন কিছু প্রতীক ব্যবহার করেছেন, যা পূর্বতন কবিরা করেন নি; কিংবা এমনভাবে, কবিতার ছত্রকে সাজিয়েছেন বা চিত্রকে গ্রথিত করেছেন, যার সঙ্গে হয়ত স্বপ্নের নির্মাণ-কায়ার সাদৃশ্য আছে কিংবা আছে সুররিয়ালিজমের। কবিতার এই নতুন রীতির পিছনে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

(৪) চেতনার বিভিন্ন স্তরের প্রকাশ

আধুনিক কবিরা অনুভব করেছেন চেতনার বিভিন্ন রঙ আছে এবং নানা রঙা চৈতন্যকে তাঁরা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। সব কবিই চেতনার নানাবিধ স্তরকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি, চেতনার নানা রঙের প্রকাশের ছবি পাওয়া যায় কিছুটা সুধীন্দ্রনাথে, বেশির ভাগ জীবনানন্দে ও অমিয় চক্রবর্তীতে।

আমি বিভিন্ন কবিদের পৃথক পৃথক আলোচনায় এই চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।



(ক) বুদ্ধদেব বসু

বিশের দশক থেকে সুরু করে বুদ্ধদেব বসু সাহিত্য-চর্চায় অবিরত থেকেছেন। তাঁর বিভিন্ন পর্বের কাব্য-জীবনে বিশেষ কোন পালা-বদল হয়নি, বরং যে দেহ-ভোগবাদ ও ইন্দ্রিয়বাদে তাঁর কাব্য-পরিক্রমা সুরু, পরবর্তী কালে তাতে ঘনত্ব এসেছে। "বন্দীর

বন্দনা" থেকে "শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর" পর্যন্ত মোটামুটি একই জীবন-দর্শন অব্যাহত থেকেছে, এবং সে দর্শন দেহ-সুখবাদের দর্শন। কবি "শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর" কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতায় "মৃত্যুর পরে ঃ জন্মের আগে" তাঁর জীবন দর্শনের দলিলটিকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কবিতায় তিনি বলেছেন, তাঁর যখন যৌবন ছিল, তখন তিনি যৌবনের বন্দনা করেছেন, যৌবন-অন্তে তিনি আবার যৌবনের জয়গান গাইছেন, "কেননা জীবন / যৌবনেরে ভালবাসে—প্রকৃতির রীতি এই।" ফ্রয়েডীয় তত্ত্বেও এই কথা, মানুষ তার সারা জীবন ধরে যৌবনের কামনাকে ভোগ করতে চায়। বার্ধক্যেও তার ব্যতিক্রম নেই; বুদ্ধদেব বসু শুধু বলেননি, শিশুরাও অন্ধ আবেগে বাসনার তৃপ্তি খোঁজে, যা ফ্রয়েড বলেছেন। আর যখন যৌবন-ভোগে মানুষ অসমর্থ, তখনই সে একা। কবির ভাষায়, "পরস্পর-বিদ্বেষী বুড়োরা / পরস্পরের মুখে আঁকা / নিজের জরার ভয়ে হাত পাতে যৌবনের দম্ভের কাছেও— / আর তাই বুড়োরা এমন একা, আর তাই বার্ধক্য এমন / নিষ্ঠুর, ভীষণ"। কিন্তু কবির বক্তব্য, দেহ-প্রেমেই তাঁর কাব্য সীমাবদ্ধ থাকেনি, তিনি ভালবাসাকে অমর করে তুলতে চেয়েছেন, এবং ভালবাসার স্তব-গানেই কখন তাঁর কাছে নারী ও কবিতা একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু এখানেই দেখা যায়, এ ভালবাসা একেবারে আত্মহারা ভালবাসা, যার রূপ সর্বগ্রাসী, ফ্রয়েডীয় মতবাদেও ভালবাসা বল্‌তে এমনই স্বার্থপর ভোগের কথা বলা হয়েছে, সেখানে ভালবাসার সঙ্গে অন্য কোন প্রবৃত্তি যুক্ত নেই, যা মানুষকে স্বার্থ-শূন্য কোন আনন্দময় জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বুদ্ধদেব বসুর কথায় আমরা পাই "আমি মনে করি, / যৌবনের বিদ্রোহের, জীবনের অন্ধ আনন্দের— / কিংবা তার অস্থির স্মৃতির—যদিও করেছি স্তব / তৃপ্তিহীন, স্তাবকতা কখনো করেনি। আমার পূজায় / পৌত্তলিক কামনা ছিলো না। রূপে রঙে বানায়েছি প্রতিমারে / ··· কিন্তু সেই রচনার আশ্চর্য সুখেও / একথা ভুলিনি, যার প্রতিমারে বার-বার / বানাই, আবার ভাঙি, আবার বানাই ; / সে তো নয় ; কিছু নয়, আমারই আত্মার / ভালবাসা ছাড়া, / আত্মহারা ভালবাসা ছাড়া"।

প্রশ্ন হতে পারে বুদ্ধদেব বসু কি ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব জানতেন বলেই একথা বলেছেন, না দেহ-বাদের দৃষ্টি তাঁর কাব্যে এসেছে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া, সংস্কার ও অভিজ্ঞতা থেকে ? বলা শক্ত, তবে তিনি এ কবিতায় যা বলেছেন তাঁর কাব্য-ইতিহাস সম্বন্ধে, ফ্রয়েড পন্থীরাও মানুষের কামনা-মত্ত জীবন সম্বন্ধে এই একই কথা বল্‌বেন। যে ধরনের দলিলের কথা বুদ্ধদেব বসু ব্যক্ত করেছেন, যে দলিলে তিনি তাঁর দেহ-সম্ভোগের আদর্শকে বিবৃত করেছেন, সে ধরনের বক্তব্য লরেন্সের কবিতাতেও পাওয়া যায়। আমার ধারণা, মানসিক জীবনের গবেষণায় ফ্রয়েড যে তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং জীবনের বিচিত্র সমারোহে লরেন্স সেই তত্ত্বের মূর্ত উপলব্ধি লাভ করেছিলেন। লরেন্সের Manifesto কবিতায় তাই পাওয়া যায়, "But then came another hunger / very deep, and ravening ; / the very body's body crying out / with a hunger more frightening, more profound / than stomach or throat or even the mind ; / redder than death, more clamorous : / the hunger for the woman... ,

'ts like the unutterable name of the dread Lord, / not to be spoken aloud. / Yet there it is, the hunger which comes upon us,/which we must learn to satisfy with pure, real satisfaction ;/ or perish, there is no alternative.''

এই কবিতায় বুদ্ধদেব মৃত্যুকে কল্পনা করেছেন অন্ধকারের মত, এবং ফিরে যেতে চাইছেন, সেই "তামসী মাতার গর্ভে, তারপর অজ্ঞাত আত্মার / নিশ্চিন্ত নির্বাণে।" তিনি বার্ধক্যের একাকীত্বকে ভুলতে চাইছেন, ঘুমের উষ্ণ আরামে, যদিও এই ঘুম আর মৃত্যুর রূপকল্প একই রকম। কবি বল্‌ছেন. "মনে হয় ঘুম যেন জীর্ণ কোনো / জন্তুর গোপন গুহা, ছোট তার অন্ধকার রেখেছে ঠেকিয়ে / আরো বড় অন্ধকার এখনো—এখনো। / আর ঘুম যখন গরম করে, মনে হয় ঘুম যেন মাতার মমতা ; / তামসী মাতার নির্বাণ করুণ যোনি, / পরিমিত অন্ধকারে, মগ্নতার নরম উষ্ণতা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে / অন্তহীন অন্ধকারে, কঠিন ঠাণ্ডারে— / আরো একদিন—আরো একদিন।"

মৃত্যুর কঠিন শীতল রূপের বর্ণনা বুদ্ধদেব বসুর অন্য কবিতা "শীত রাত্রির প্রার্থনায়"ও আছে। আমি বলেছি, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার পরে মৃত্যু সম্বন্ধে একটি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হয়েছে এবং সেই মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই ঘুমের উষ্ণ আরাম, যা তামসী মাতার নির্বাণ করুণ যোনি।

এই কবিতাটি "মৃত্যুর পরে ঃ জন্মের আগে" দীর্ঘ আলোচনা করলাম, কারণ আমার মনে হয়েছে, এই কবিতাতেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর জীবনতত্ত্বের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। কবিতার গঠন আলোচনায় আমার পারদর্শিতা নেই, তবু যেখানে যৌবন-কামনার কথা এসেছে, সেখানে পংক্তিগুলি আবেগে কম্পমান, তাই বোধহয় তাদের দৈর্ঘ্য কম। কিন্তু মৃত্যুর শীতলতা যেখানে কবিকে আচ্ছন্ন করেছে, সেখানে পংক্তিগুলি শীত রাত্রির মতই দীর্ঘ। কবিতাটিতে যে অবাধ ভাবানুষঙ্গ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে স্বপ্ন ও কবিতার মধ্যে সাদৃশ্যকে খুঁজে বার করে, সে রকম বিশেষ কিছু নেই, কারণ এই কবিতায় একটি বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়েছে। বরং বলা যায়, এ কবিতা চেতনার উপর স্তরের বিশ্বাস নিয়ে লিখিত, এবং অবচেতনের গভীরে তাকে নামতে হয়নি. যা হলে, হয়ত কবিতাটিতে আর একটি বিস্ময়কর মাত্রা যোগ হতে পারত।

"বন্দীর বন্দনা" "কঙ্কাবতী" "দময়ন্তী" ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু যৌবন মত্ততারই জয় ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি শুষ্ক, নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন, / আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।" (শাপভ্রষ্ট), ইন্দ্রিয়কে তিনি দেহের বাতায়ন বলে বর্ণনা করেছেন। নিজেকে মনে করেছেন "প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী" এবং তাঁর "বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন, / দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।" "বন্দীর বন্দনা" কবিতায় কবির বক্তব্য "তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমারাত্রি-সম।" যদিও সেই কামনাকে তিনি প্রেমে পরিণত করতে চান। যদিও এ প্রয়াসে অনেক বাধা, কারণ "শিরায় শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ, / লোলুপ লালসা করে অন্য মনে রসনা লেহন।" "মানুষ" কবিতায় কামনাকে ঊর্ধ্বায়িন করার একটি চেষ্টা আছে, কারণ কবি যদিও "প্রলুব্ধ, অস্থির, / আসঙ্গ বাসনা-পঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক," / কবিতার শেষ দিকে কবির নতুন উপলব্ধি হয়েছে,

"এ জীর্ণ পাতার স্পর্শ নারীমাংস চেয়ে সুখকর, / মলাটে ধূলির গন্ধ—মুখমদ্য তার তুল্য নয়, / গ্রন্থের অক্ষয় গ্রন্থি—পরিপূর্ণ, প্রবল প্রণয়, / এই প্রেমে সমাসীন স্বপ্নলব্ধ পরম সুন্দর।"

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সম্পূর্ণভাবে দেহাশ্রিত, একথা বলা বোধহয় ভুল হবে। বরং বলা উচিত, দেহ-কামনাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে তিনি দেহাতীতের সন্ধান করতে চান। এই মতের সঙ্গে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের কোন বিরোধ নেই, যদিও ফ্রয়েড বল্‌বেন, অনন্ত, অমৃত এসবের জন্য আকাঙ্ক্ষা দেহমিলনের বাসনার ব্যর্থতা থেকেই আসে। তবু ফ্রয়েড কামনার যে ঊর্ধ্বায়ন হয় একথা বলবেন। "পৃথিবীর পথে" কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেব বসুর উপলব্ধি এই ধরনের। "কঙ্কাবতী"-র বিভিন্ন কবিতায় দেহকে ঘিরে যে সৌন্দর্য গড়ে উঠেছে তার তীব্রতা কবি প্রকাশ করেছেন ধ্বনি, চিত্র ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমন্বয়ে। বহু জায়গায় বুদ্ধদেব বসু প্রেমের বিচিত্র লীলাকে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্য দিয়ে প্রেমের প্রদীপ্ত কামনাকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। "নতুন পাতা"র "জন্ম" কবিতায় দেখি, কবি বলছেন, "তোমাকে বুকে রেখে তোমার মুখের মধ্যে ঢেকে আমার মুখের আহত / বিক্ষত ক্লান্তি / প্রতি নিশ্বাসে আমি নিঃশেষে শোষণ করি তোমার রাত্রির শক্তির উৎস।" কিংবা "কঙ্কাবতী"র "বিবাহ" কবিতায় "বক্ষ তব ঢাকিয়া দিনু চুম্বনের চাপে— / যুগ্ম সেই অগ্নিগিরি স্পর্শ ভয়ঙ্কর / যেখানে প্রেম মৃত্যুহীন রাত্রিদিন কাঁপে"। অথবা "নতুন পাতা"য় "যে কোন মেয়ের প্রতি" কবিতায় "তোমার উত্তাপ সঞ্চারিত হোক আমার রক্তে / তোমার অন্ধকারের নির্মম নিষ্পেষণে / আমি যেন উষ্ণ সুরার মত ঝরে ঝরে পড়ি / তোমার প্রাণের নিভৃত পাত্রে / বিন্দু বিন্দু ঝরে / নিঃশেষে।" এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায় যে, বুদ্ধদেব বসু দেহ-সম্ভোগকেই তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য করে তুলেছেন, যা রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে আধুনিক বাংলা কবিতায় একটি নতুন দিক পরিবর্তন, এবং যা করা সম্ভব হয়েছে, হয়ত ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের দ্বারা মানুষের মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের ফলে।

আমি বুদ্ধদেব বসুর প্রতীক ব্যবহার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বল্‌ব। ফ্রয়েডীয়রা বলেন, স্বপ্নে যে প্রতীক ব্যবহার করা হয় তা অবচেতন থেকে কাম-প্রবৃত্তির তৃপ্তির জন্য ফুটে ওঠে। কবি যখন কোন প্রতীকের দ্বারা কোন আবেগকে প্রকাশ করতে চান, তার পিছনে অবচেতনের কামনার ভূমিকা থাকা অসম্ভব নয়। বুদ্ধদেব বসু বহু কবিতায় "চুল"কে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং 'চুল' অনেক কিছু হতে পারে, কবি যে প্রশান্তি খুঁজছেন তাও হতে পারে, আবার, অন্ধকার রাত্রি, মৃত্যুকেও বোঝাতে পারে। হয়ত কবি দেহ-মিলনের নিবিড়তাকেও বোঝাতে চাইছেন, ফ্রয়েডীয় প্রতীক-বাদে নারীদেহের একটি অংশ সমগ্র প্রতীকও হতে পারে। যাই হোক, বুদ্ধদেব বসু "চুলের" প্রতীকের মধ্য দিয়ে দেহ-কামনার বাস্তব রূপকে ফোটাতে চাইছেন। এই প্রসঙ্গে "একখানা হাত" কবিতার উল্লেখ করতে পারি, যেখানে কবি জানালায় চোখের পলকে একখানি হাতকে দেখেছেন, যে হাত সাদা, আংটিতে হীরার ঝলক, কিন্তু জানালা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কার হাত কবি জান্‌তে পারলেন না। তাই কবি বল্‌ছেন, "আবার দু-চোখ ভ'রে ঘুম জ'মে এলো / সকল পৃথিবী অন্ধকার, / —এই কথা না-জেনেই মৃত্যু হবে মোর / হাতখানা কার। /"

ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাব আলোচনায় বুদ্ধদেব বসুর সমস্ত কাব্যগ্রন্থগুলি আরো বিস্তৃত-ভাবে হয়ত আলোচনা করা যায়, কিন্তু আমাকে যেহেতু আরও অন্যান্য কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে, তাই এই কবির প্রসঙ্গ এইখানে শেষ করছি। শুধু আর একটি কথা বলা যায়, বুদ্ধদেব বসু দেহ-কামনার প্রকাশে বড় বেশি সোচ্চার, এবং কবিতায় যে ব্যঞ্জনা থাকলে একই আবেগের অংশীদার হওয়া যায়, সেরকম কিছু না থাকায়, তাঁর কবিতাগুলি নেহাৎই শরীরী কামনার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, যদিও ধ্বনি-মাধুর্য ও বর্ণনা-বৈচিত্র্যে তাঁর কবিতা অনেক সময় আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু আগেই যে কথা বলেছি, তারই পুনরাবৃত্তি করছি, বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় অবচেতনের গভীরতার সেই স্বাক্ষর নেই, যার রহস্যময়তার চাবি আমাদের হাতে ফ্রয়েড তুলে দিয়েছেন, যা হয়ত জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আমরা আবিষ্কার করতে পারব।

(খ) জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দ দাশকে অনেকে সম্পূর্ণভাবে অবচেতনার কবি বলেছেন এবং জীবনানন্দ নিজেও এই আখ্যাকে আংশিকভাবে তাঁর কাব্য সম্বন্ধে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। ফলে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব কবিতা ও স্বপ্নের কাঠামোয় যে সাদৃশ্যের কথা ঘোষণা করে, সেই দিক দিয়ে বিচার করলে, হয়ত কবিতার গঠন-রীতিতে ফ্রয়েডীয় মতবাদ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল ; একথা বলা যায়, যেমন বলা যায় যে ফরাসী সুর্‌রিয়ালিস্ট কবি ও চিত্রকরেরা ফ্রয়েডীয় অবচেতন-তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে এ প্রভাব সব সময়েই পরোক্ষ। জীবনানন্দ দাশের কাব্য আলোচনায় কাব্যের নির্মাণ-কায়া সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিকে বিশেষ করে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। যদিও বলা বাহুল্য সেই আলোচনায় আমার যোগ্যতা খুবই সীমাবদ্ধ। জীবনানন্দ দাশের জীবনকালে যে সমস্ত মতবাদ ও ঘটনাপ্রবাহ দেখা দিয়েছে, কবির নজরে সবই এসেছে, এই ধরনের একটা স্বীকারোক্তি কবির লেখায় পাওয়া যায়। কবি বলেছেন, "মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময় চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো ; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোন মানে নেই আমার কাছে।" এখন এই সময়-চেতনা অনেক কিছুই হতে পারে ; বিংশশতাব্দীর বিশের ও ত্রিশের দশকে সমস্ত বিশ্বে একটি ক্ষয়িষ্ণু চেতনা বিরাজ করছিল। যুদ্ধের ধ্বংস-লীলায় ও নানাবিধ সংকটে মানুষ ম্রিয়মাণ। সমস্ত পৃথিবীতে হতাশা ও ব্যর্থতার ছায়া বিস্তৃত হচ্ছে। এরকম একটি যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যে কোন অনুভূতি সচেতন কবি দূর অতীতের স্বপ্ন-রাজ্যে কিংবা মৃত্যুর বিবর্ণতায় মুক্তি খুঁজতে চাইতে পারেন। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে তাকে বলা যেতে পারে জীবনের জটিল সংগ্রামের মুখোমুখি না হয়ে তা থেকে পলায়ন ; হয়ত সকল রোম্যাণ্টিক কবিদের তাই-ই সাধনা। কিন্তু প্রাক্-বিংশশতাব্দীর রোম্যাণ্টিক কবির যে শুদ্ধ সৌন্দর্য-স্বপ্ন ছিল, তা ভেঙে গেছে ; তার সঙ্গে মিশেছে রিক্ততা, গ্লানিমার আর্তনাদ। জীবনানন্দ সেই ব্যর্থতাকে রূপ দিতে চেয়েছেন কাব্যের ভাষায়। তাই প্রেম তাঁর কাছে শরীরী-মিলনের সার্থকতা নয়, বরং তা অপ্রাপ্তির ধূসরতা। যদিও কিছু কিছু কবিতায় কবি ব্যর্থতা হতাশাকে কাটিয়ে উঠে মানবের ক্রম-মুক্তির পথ অন্বেষণ

করেছেন এবং মানবিক কল্যাণের আদর্শকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। কবির মৃত্যু-চেতনায় এক ধরনের শান্তিকে খোঁজার চেষ্টা আছে, যে শান্তি জীবনের জ্বর থেকে অনেক ভালো, যদিও কোন কোন কবিতায় মৃত্যু জীবনের পরিপূরক, এরকম একটি আভাস আছে। তবু সমস্ত মিলিয়ে, আমার ধারণা, জীবনানন্দ সেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি যাতে জীবনের তীব্র আলো কখনও জ্বলেনি। আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমি কবির ব্যর্থতা-অনুভব, প্রেমের ধূসরতা, মৃত্যু-চেতনাকে প্রথমে দেখাবার চেষ্টা করব এবং যা আমার মনে হয়, ফ্রয়েডীয় অবচেতনার যে নিত্য সংঘাত, তার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হতে পারে, কিংবা না হলেও মানুষের হৃদয়লোকের ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয়। জীবনানন্দ সম্পর্কিত আলোচনার শেষ অংশে তাঁর কবিতার গঠন-রীতিতে অবচেতন মানস উদ্ঘাটনের যে পরিচিতি পাওয়া যায়, তার কিছুটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা করব।

আমি সেই প্রসিদ্ধ স্মরণীয় কবিতাটি দিয়ে সুরু করছি, যার নাম "বনলতা সেন"। এখানে কবির চিত্তে সেই সনাতন যাযাবরীয় প্রেমিকের পরিচয়, যে পৃথিবীর বিভিন্ন যুগে যুগে প্রেমিকাকে অন্বেষণ করেছে, কিন্তু যার কাছে মিলনের আপাতঃ তীব্রতার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, দুদণ্ডের শান্তি এবং সন্ধ্যার অন্ধকার যেখানে থাকে শুধু "মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন"। প্রেমের শুদ্ধায়িত এই রূপ, যার মধ্যে আবেগের দাহ নেই, অথচ একটা বিরহ-অবসাদের ধ্বনি আছে, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে কামনার রঙ পুড়ে প্রেমের প্রশান্তির মত, তবে এই কবিতার পিছনে যে অপ্রাপ্তির ধ্বনি আছে, হয়ত তাই সেই বিশ্ব-মানবের ব্যর্থতা, যা ফ্রয়েডীয় মতবাদ অনুযায়ী সমস্ত মানুষের ইতিহাস। অতীত-ইতিহাসচারিতা জীবনানন্দের অন্য কবিতায়ও আছে। যেমন "হাওয়ার রাত", যদিও সেখানে জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততার কথা এবং বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণের কথা আছে। আবার জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে বনহংসীর জীবন-কামনাও আছে। "শঙ্খমালা" কবিতায় প্রেমিকার চোখে 'যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার'। "অন্ধকার" কবিতায় নীল কস্তুরী আভার চাঁদকে ডেকে কবি বলছেন 'তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,......তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও' এবং পৃথিবীর সংগ্রামে তিনি ভীত, তাই 'আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি / অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে / থাকতে চেয়েছি।' এবং 'কোনদিন জাগব না আমি—কোনদিন আর।' ফ্রয়েডীয়রা বলবেন, এই কবিতার রূপকল্প অবচেতনার সেই কামনা যা জীবনের যুদ্ধে হেরে গিয়ে মাতৃ-জঠরের প্রশান্তিতে ঘুমের কথা বলতে চায়। 'দুজন' কবিতায় প্রেমের অপূর্ণতার হতাশ্বাস, যদিও নক্ষত্রের তীরে হয়ত বাসনার মত ভালবাসা খুঁজে পাওয়া যাবে। আবার 'মরণের পরপারে বড় অন্ধকার / এইসব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো' "আমাকে তুমি" কবিতায়। অবশ্য 'মিতভাষণ', 'সবিতা' ও 'সুচেতনা' কবিতায় ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে একটা কিছু গড়ার সংকল্প আছে, তাই 'তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো, এখনো নারীর মানে তুমি', 'মানুষকে মানুষের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা হবে' এবং 'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।'

"ধূসর পাণ্ডুলিপি"তে 'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতায় অগাধ জীবনের কথা আছে, 'মাঠের

গল্প' কবিতায় বন্ধ্যা যুগের রূপকল্প 'পোড়ো জমি-খড় নাড়া-মাঠের ফাটল' তবু সেখানে 'শিশিরের জল' আছে। 'কয়েকটি লাইন' কবিতায় যদিও কবি প্রথমে বলছেন, 'উৎসবের কথা আমি কহিনাকো, / পড়ি নাকো ব্যর্থতার গান ; / শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান—' তবু শেষ দিকে ব্যর্থতার সুর। 'পরস্পর' কবিতায় হতাশার প্রতিধ্বনি, 'শরীরের ঘুণ রাখে ঢেকে, / দিন যায় যাহাদের অসাধে, —অসুখে !— / দেখিতেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ, / চোখে ঠোঁটে অসুবিধা,—ভিতরে অসুখ।' 'বোধ' কবিতায় নির্জনতম একাকিত্বের প্রতিধ্বনি, যা ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যায় প্রত্যেক মানুষের নিষ্ঠুর নিয়তি, যা থেকে মুক্তির আশায় মানুষ ভালবাসা কামনা করে, অথচ কবি অনুভব করছেন 'আমারে সে ভালবাসিয়াছে, / আসিয়াছে কাছে, / উপেক্ষা সে করেছে আমারে, / ঘৃণা করে চলে গেছে—যখন ডেকেছি বারে বারে / ভালবেসে তারে।' 'অবসরের গান' কবিতায় 'উদ্যমের ব্যথা নাই—এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয় ! / এইখানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,······জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর /'। আমার প্রশ্ন, এই কৃমিগুলি কি কামনার প্রতীক ? 'ক্যাম্পে' কবিতায় কবি মানুষ আর হরিণ-হরিণীর প্রেম, কামনা, মিলনাকাঙ্ক্ষাকে এক সুরে এনেছেন, এবং সেই 'লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন' সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে মানুষের মধ্যেও। তাই মানুষের হিংসায় যখন এই প্রেমের অবসান ঘটে, তখন কবি ব্যথিত হন এবং অনুভব করেন, ঐ লালসা-আকাঙ্ক্ষার জীবন নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকতে চায়, 'মৃত পশুদের মত আমাদের মাংস লয়ে আমরাও পড়ে থাকি,' 'বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা মৃত্যু পাই।' যে প্রেম সব দিকে রয়েছে, অথচ যার পরিপূর্ণতা নেই, যার জন্য কবি উপলব্ধি করলেন, 'এই ব্যথা, —এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে,— / কোথাও ফড়িঙে-কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে / আমাদের সবের জীবনে / বসন্তের জ্যোৎস্নায় অই মৃত মৃগদের মত / আমরা সবাই।' 'জীবন' কবিতায় কবি অনুভব করলেন, জীবন ধোঁয়ার মত, যে অঙ্গার জ্বলে জ্বলে নিভে যায়, জীবন তার মত এবং আমরাও জীবনের মত ঝরে পুড়ে যাই। তবু আমরা চাই 'নক্ষত্র হয়ে জ্বলিবার মত শক্তি।' জীবনের পথে মানুষের পরিচয় হয় ব্যর্থতার সঙ্গে, তাই কবির মনে হয়েছে, 'জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ' এবং কবি এই মৃত্যুকে ভালবাসতে চান, কারণ 'সব ভালবাসা যার বোঝা হল—দেখুক সে মৃত্যু ভালবেসে।' জীবনকেও কবি ভালবাসতে চান, তবে তা পৃথিবীর পথে নয়। বরং 'পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাস গেছে ভ'রে' যেখানে, সেখানেই আছে এক নিশ্চয়তা, কারণ 'রোগীর জ্বরের মত পৃথিবীর পথের জীবন।' তাই কবি মৃত্যুকে বন্ধুর মত, প্রিয়ার মত ডেকেছেন, এবং 'সেখানে পৃথিবীর ভিতরের গহ্বরের মতন নিঃসাড় / রব আমি' / কিন্তু এই গহ্বরেও কবি থাকতে পারেন না, কারণ 'কবরের ভূতের মতন / পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা হতাশা,— / বাতাসে ভাসিতেছিল ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন !— / মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন।' এই কবিতাটির একটু দীর্ঘ আলোচনা করতে হোল, কারণ জীবনানন্দের জীবন-চেতনা ও মৃত্যু-চেতনায় এক সখ্যতা রয়েছে, কারণ তাঁর কাছে জীবন মৃত্যুর মত। শরীর চেতনা জীবনানন্দ দাশের কাব্যে একেবারে নেই, তা নয়, কারণ '১৩৩৩' কবিতায় কবি বলছেন, 'তোমার শরীর ছানি / মিটায় পিপাসা / কে সে আজ !' 'কিন্তু তীব্র দেহ-

চেতনায় তাঁর সুখ নেই। কারণ 'কত দেহ এল, —গেল, —হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে / দিয়েছি ফিরায়ে সব' এবং তিনি চাইছেন, 'সমুদ্রের জলে / দেহ ধুয়ে নিয়া / তুমি কি আসিবে প্রিয়া।' 'প্রেম' কবিতায় কবি স্বীকার করেছেন, 'সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে / প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি' ; কিন্তু প্রেমের স্থায়িত্ব একদিন—একবার, 'সব শেষ হয়,— / সময়ের আগে তাই কেটে গেল প্রেমের সময়' এবং প্রেম মানুষকে ব্যথা-বিহ্বলতা দেয়, যা ভুলে কে আর ঘুমাতে পারে। 'পিপাসার গান' কবিতায় দেহ-চেতনার তীব্রতা কিছুটা বর্তমান, কারণ 'আজ শুধু দেহ—আর দেহের পীড়নে / সাধ মোর,' দেহ ব্যথা পেলেও 'তবু চাই সবুজ শরীরে / ব্যথার সুখ।' কিন্তু এ দেহ-চেতনার সঙ্গে প্রকৃতি-চেতনা মেশায় দেহ-কামনা এক ধরনের অতীন্দ্রিয়তায় উত্তীর্ণ। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় মৃত্যু-চেতনা প্রকাশ পেয়েছে অন্ধকার দীর্ঘ শীত রাত্রে পুরানো পেঁচার ঘ্রাণে, সবুজ পাতার অন্ধকারে হলুদ হয়ে যাওয়ায় এবং ধূসর মৃত্যুর মুখে। তবু কবির স্বপ্ন দেখার বিরতি নেই, 'স্বপনের হাতে / আমি তাই / আমারে তুলিয়া দিতে চাই।' এবং উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়, / 'মানুষেরো আয়ু শেষ হয়। / পৃথিবীর পুরানো সে-পথ / মুছে ফেলে রেখা তার,— / কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ / চিরদিন রয়।'

"মহাপৃথিবী" কাব্যগ্রন্থে কবি একটি রহস্যময় জগতের কথা বল্ছেন, যে জগতের কবাট একবার খুলছে, আবার বন্ধ হচ্ছে। এই জগৎ কি অবচেতনার জগৎ? কারণ 'যে-সব ধূসর হাসি, গল্প, প্রেম, মুখ রেখা / পৃথিবীর পাথরে কঙ্কালে অন্ধকারে মিশেছিলো / ধীরে ধীরে জেগে ওঠে তারা, / পৃথিবীর অবিচলিত পঞ্জর থেকে খসিয়ে আমাকে খুঁজে বার করে।' কবি কি এখানে সেই বিস্মৃত-চেতনার কথা বল্তে চাইছেন, যেখানে অভিজ্ঞতার হাসি-আনন্দ, ব্যথা-বেদনা জমা হয় মানুষের মনকে মাঝে মাঝে আলোড়িত করবার জন্য? চেতনার কি একের বেশি স্তরের কথা এখানে বলা হচ্ছে, যার কথা ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে বলা হয়, প্রাক্-চেতনা ও অবচেতন, এবং তাই কি কবি বল্ছেন 'দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো প্রবেশ করলাম' ঃ 'সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম' যে মুখ অবচেতনের প্রবেশ-দ্বার। 'আট বছর আগের একদিন' জীবনানন্দ দাশের একটি বিখ্যাত কবিতা, যেখানে রূপ পেয়েছে মানুষের আত্ম-হনন প্রবৃত্তি, যে প্রবৃত্তি জন্ম নেয় জীবনের সমস্ত কামনার পরম প্রাপ্তির ব্যর্থতা থেকে। যদিও কবি বলেছেন, 'নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ; / বিবাহিত জীবনের সাধ / কোথাও রাখেনি কোনো খাদ।' কিন্তু 'নারীর হৃদয়—প্রেম-শিশু-গৃহ নয় সবখানি', কারণ 'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—। আরো এক বিপন্ন বিস্ময় / আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে ;' এই বিপন্ন বিস্ময় হয়ত জীবন-মৃত্যুর ক্রমাগত সংঘাতে মৃত্যু-প্রবৃত্তির অদম্য শক্তি, যা জীবনের সব আয়োজনকে ধ্বংস করে।

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যে প্রেমিকার হৃদয়কে কবি ঘাসে পরিণত ভাবছেন, 'সুরঞ্জনা / তোমার হৃদয়ে আজ ঘাস।' 'ঘোড়া' কবিতায় সেই অবিনাশী যৌবনশক্তির প্রকাশ, যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত যার অব্যাহত গতি, 'মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে / প্রস্তর যুগের ঘোড়া যেন।' 'সাতটি তারার তিমিরে' অন্যান্য কবিতায় কবির সমাজ-চেতনা, ইতিহাস-চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। 'নিরঙ্কুশ' কবিতায় তিনি দেখাচ্ছেন মালয়-সমুদ্র-পারের দেশ কি করে বাণিজ্যের শোষণে মরুভূমিতে

পরিণত হয়েছে। 'খেতে-প্রান্তরে' কবিতায় হয়ত কবি মনে করছেন 'কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে / করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়। / আর কোন প্রতিশ্রুতি নেই।' "তিমির হননের গানে" তাই কবি বলতে চেয়েছেন, 'তিমির হননে তবু অগ্রসর হয়ে / আমরা কি তিমির বিলাসী / আমরা তো তিমিরবিনাশী হতে চাই, আমরা তো তিমির-বিনাশী /" আরো যে সব কবিতা আছে যেমন 'সৌর করোজ্জ্বল', 'সূর্য-তামসী', 'সময়ের কাছে' 'মকর সংক্রান্তির রাতে' 'দীপ্তি' প্রভৃতি সেগুলিতে আশার আলো উজ্জ্বলতর এবং 'উত্তর প্রবেশ' কবিতায় তা সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে, এবং কবি বলেছেন 'অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে / বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস, / এ ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয় ; / এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব ; আগুনে আলোর জ্যোতির্ময়।'

জীবনানন্দের শেষতম কাব্যগ্রন্থ "বেলা অবেলা কালবেলায়" জীবনের জয়গান কবি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, পৃথিবীর ক্লান্তি, মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে নারীর ভালবাসা। এই কাব্যে কবি বার বার সেই নারীর কথা বলতে চেয়েছেন 'সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুকদের রক্তে / মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন / আমি যাকে আবহমান কাল ভালবেসে এসেছি সেই নারীর।' একমাত্র নারীকেই ভালবেসে কবি বলেছেন, 'বুঝেছি নিখিল বিষ কি রকম মধুর হতে পারে।' কবি অনুভব করেছেন, 'কল্যাণ কল্যাণ ; এই রাত্রির গভীরতর মানে শান্তি / এই আজ এইখানে স্মৃতি এখানে বিস্মৃতি / তবু প্রেম ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।' কবি আরও ভাবছেন, 'কেমন আশার মতো মনে হয় রোদের পৃথিবী / যতদূর মানুষের ছায়া গিয়ে পড়ে / মৃত্যু আর নিরুৎসাহের থেকে ভয় আর নেই ভোরের ভিতরে।' "বেলা অবেলা কালবেলায়" জীবনানন্দ একটি আশাবাদের কথা শুনিয়েছেন, যার প্রতিধ্বনি পাই আমরা এই পংক্তিতে, 'ভাবা যাক—ভাবা যাক—/ ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি / ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত / শত জল-ঝর্ণার ধ্বনি।' প্রশ্ন হতে পারে, এই জীবনবাদের ইশারা কি ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে পাওয়া যাবে ? এর উত্তর হবে স্পষ্টতঃ না, কারণ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে মানুষ আত্ম-সুখে ব্যস্ত, গোষ্ঠী কল্যাণ তার কাছে আত্ম-সুখের সোপান হিসাবে আসতে পারে, লক্ষ্য হিসাবে নয়, উপায় হিসাবে, কারণ মানুষ, ফ্রয়েডের মতে, আত্ম-সুখ-মগ্ন কামনা-নিমজ্জিত একটি জান্তব অস্তিত্ব। তাই ফ্রয়েডীয় মতবাদে শেষ পর্যন্ত মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব এবং নিরাশাই একমাত্র সত্য। জীবনানন্দ এই তত্ত্ব গ্রহণ করেননি ; বরং আশাবাদের দিকেই তিনি অগ্রসর হয়েছেন, এই অগ্রগতির মধ্যেও মনোবিজ্ঞানের আত্মসুখবাদকে জেনে তাকে অস্বীকার করার পরিচয় আছে। অন্ততঃ কবির কথায় তার ইঙ্গিত আছে : তিনি নিজে বলেছেন, "আশা করা যাক, আধুনিক বিজ্ঞানের (ফলিত বিজ্ঞানের কথা বলছি না আমি) ফলাফল কেবলই নিরাশাবাদকে আশ্রয় দেবে না ; জাগতিক বিষয়ে ক্রমাগত যে আলোর অনুসন্ধান চলেছে, সেটা সামাজিক ব্যাপারের অতিরিক্ত সম্পূর্ণ এক শূন্য সন্ধান নয়—সামাজিক স্তরে মানুষের খুব সম্ভব ভবিষ্যত রয়েছে—অনুভব করতে পারা যাবে হয়তো "

জীবনানন্দ দাশের কাব্য আলোচনার শেষে অবচেতনের অনুভূতি তাঁর কাব্য-গঠনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, তার কিছুটা আলোচনা এখানে করা যেতে পারে। জীবনানন্দকে কতখানি সুররিয়ালিস্ট বলা যায় সে সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন,

কিন্তু তা না করে বলা যায়, অবচেতনের যে গোপন গহ্বরে আলো-অন্ধকারের মেশামেশি, কবির সেখানে দ্বার ছিল অবারিত। এই স্তরে মানুষ ফেনোমেনোলজিস্টদের স্বীকৃত সেই Lebenswelt কিংবা life-world এ অবতীর্ণ হয়, যেখানে অনুভূতির ভেদ-রেখাগুলি সুস্পষ্ট হয়নি, আবেগ যেখানে চিত্র-পরম্পরার মিছিল মনের বাতায়নে নিয়ে আসে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির একে অপরকে জড়াজড়ি সৃষ্টি। তবে তার সঙ্গে থাকে কবির সৃষ্টিশীল সুদক্ষ নিপুণতা, যা চিত্রগুলিকে মিলিয়ে একটি অনবদ্য ছবি গড়ে তোলে। বর্তমান কালের একজন ইংরাজ কবি ডিলান টমাস, যাঁর কাব্যে ফ্রয়েডের প্রভাব পড়েছে বলে অনেকে মনে করেন এবং যাঁর সুররিয়ালিস্ট প্রকাশভঙ্গী অনেকটা স্বীকৃত, বলেন, '...a poem by itself needs a host of images, because its centre is a host of images. I make one image—though 'make' is not the word, I let, perhaps, an image be 'made' emotionally in me and then apply to it what intellectual and critical force I possess'. ডিলান টমাসের রচনা-রীতি সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি কাব্য-রীতিকে লঙ্ঘন করে, একটি চিত্রের বিপরীত চিত্রকে সন্নিবিষ্ট করে আবেগকে এমন ঘনীভূত করেছেন, যে তাঁর কবিতা, সেই আবেগকে সঞ্চারিত করবার চেষ্টায় পাঠক বা শ্রোতার মনে একটি সজোর ধাক্কা দেয়। জীবনানন্দের কবিতায় হয়ত এই প্রবল ঝাঁকুনি নেই; কিন্তু অবচেতনের যে লীলা এবং অন্ধকারকে কবি অনুভব করেছেন তাকে ফুটিয়ে তুলবার প্রচেষ্টা আছে। ডিলান টমাসের দু'একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই যে নিজেকে চৈতন্যের মগ্নতায় সমর্পণ করা এবং তারপরে ডুবুরির মত চিত্রমুক্তা তুলে আনা, বোঝা যেতে পারে। এবং ফ্রয়েডের প্রভাব স্বীকার করে টমাস বলেছেন, কবিতা হচ্ছে, '...the record of my individual struggle from darkness towards some measure of light...To be stripped of darkness is to be clear, to strip of darkness is to make clear .My poetry is, or should be useful to others for its individual recording of the same struggle with which they are necessarily acquainted. ডিলান টমাসের একটি কবিতায় পাই, 'I see you boys of summer in your ruin / Man in his maggot's barren... / We are the sons of flint and pitch / O see the poles are kissing as they cross,' ভ্রূণ অবস্থায় যিশু খৃষ্টের অনুভূতিকে বর্ণনা করেছেন কবি একটি কবিতায়। তার কয়েকটি পংক্তি, 'Before I knocked and flesh let enter, .../ I who was shapeless as the water / That shaped the Jordan near my home /' আবার 'My heart knew love, my belly hunger ; / I smelt the maggot in my stool.' আর একটি কবিতায়, যে ধ্বংস চেতনা সমস্ত বিশ্বে, মানুষে ও প্রকৃতিতে টমাস তাকে রূপায়িত করেছেন, 'The force that through the green fuse drives the flower / Drives my green age ; that blasts the roots of trees / Is my destroyer. / And I am dumb to tell the crooked rose / My youth is bent by the same wintry fever !' যৌন-প্রতীক, মৃত্যু-চেতনা

সমস্ত কিছু একত্রিত হয়ে একটি সুররিয়ালিস্ট দ্যোতনা ফুটে উঠেছে অন্য একটি কবিতায়, 'Light breaks where no sun shines ; / where no sun runs, the waters of the heart / Push in their tides ; / And broken ghosts with glow—worms in their heads / The things of light / File through the flesh where no flesh decks the bones. / A candle in the thighs / Warns youth and seed and burns the seeds of age ; / where no seed stirs. / The fruit of man unwrinkles in the stars, / Bright as a fig ; / where no wax is, the candle shows its hair.' জীবনানন্দের কাব্যেও এই ধরনের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিভিন্ন চিত্র-সমন্বয়, আবেগের কেন্দ্র থেকে উত্থিত একটি ছবিকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয় আরও নানা ধরনের একজাতীয় কিংবা বিজাতীয় চিত্র : এবং সেখানেও মেলে বিশ্ব-প্রকৃতি-মানুষকে গাঁথা একটি সূত্র, যা মনের অন্ধকারকে আলোতে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামে টমাসের মানস-চেতনার সমগোত্রীয়। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের দরুনই জীবনানন্দের কবিতা-গঠনে ফ্রয়েডীয় প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যায় না, যদিও টমাসের মত সে প্রভাবকে কোথাও ঘোষণা করেছেন কিনা আমার জানা নেই। জীবনানন্দের কাব্য থেকে কিছু উদাহরণ নিয়ে এ বক্তব্যকে পরিষ্কার করা যেতে পারে।

'বনলতা সেন' কবিতায় ভিন্ন অনুভূতির অপরূপ সমন্বয়, ভিন্নধর্মী চিত্রের একত্র-সন্নিবেশ। যেমন, 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল,' 'পাখির নীড়ের মত চোখ,' 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য,' 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,' 'পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন।' 'হাওয়ার রাতে' 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মত অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব/রোমশ উচ্ছ্বাসে/জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়।' প্রকৃতি-চেতনায় অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যাওয়ার অনুভূতি 'ঘাস' কবিতায় 'ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোন এক নিবিড় ঘাস-মাতার/শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।' 'যে আমাকে চিরদিন ভালবেসেছে/অথচ যার মুখ আমি কোনদিন দেখিনি. / সেই নারীর মতো / ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে।' এরকম পংক্তি 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায়। 'বেড়াল' কবিতা সম্বন্ধে আমার নিজের মনে হয়েছে, এ কবিতায় যে চেতনাকে অবিরত অবচেতনের অন্ধকার আঘাত করছে, কবি তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বেড়াল একেবারে আদিমতার প্রতীক নয় ; কারণ সে গৃহপালিত, তবু তার পশু-স্বভাবের মধ্যে সেই নখ আঁচড়ানো প্রবৃত্তি রয়েছে। কয়েকটি পংক্তিতে অবচেতনের দিকে যাবার গতি প্রকাশ পেয়েছে, 'কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর/তারপর সাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর/নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে, দেখি,/ কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে, / সারাদিন সূর্যের পিছনে চলেছে সে' এর তারপর 'হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফ্‌রাণ-রঙের সূর্যের নরম শরীরে/শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে/তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মত থাবা দিয়ে লুফে আনল সে/সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।' 'নিরালোক' কবিতায় 'প্রান্তরের মত নীরবে/বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার।' 'আদিম দেবতারা' কবিতায়

'ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয়ে শুয়ারের মাংস হয়ে যায়।' 'আজকের এক মুহূর্ত'তে 'আমার হৃদয়ের ভিতর/সেই সুপক্ক রাত্রির গন্ধ পাই।' 'বিভিন্ন কোরাসে' 'সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ।' 'মৃত্যু' কবিতায় 'তবুও তাদের মুখ/চকিত 'আলোর পূর্ণ ফটোগ্রাফ থেকে/উঠে এসে ভীত হয়/নিজেদের গ্লানিহীন পরিণতি দেখে'। "মহাপৃথিবীর" 'ঘাস' কবিতায় সুররিয়ালিস্টিক আমেজ, 'মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেলো নদীটির পারে/সফেন আলোক তাকে চেটে গেল দুপুর বেলায়' এবং 'সেই থেকে হাসায় এ পৃথিবীর ঘাস/দু-মাস গাধাকে, আর মনীষীকে মিহি ছয়মাস।' এই রকম আরও উদাহরণ জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন,' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যেতে পারে যেখানে কবিতার ছত্র অবচেতনের স্তর থেকে উঠে এসেছে, অবশ্য তার সঙ্গে রয়েছে সেই সৃজনীক্ষমতা যা অনেক উচ্ছৃঙ্খল চিত্র-রূপের সমষ্টিকে কবিতা করে তোলে।

'সাতটি তারার তিমির' কাব্য সম্বন্ধে অনেকেরই অভিমত যে জীবনানন্দ এখানে সুররিয়ালিস্ট প্রকাশ-ভঙ্গীতে উপনীত হয়েছেন। অন্ততঃ কাব্য-গ্রন্থের নামে সেই অনুভূতির বৈপরীত্য আছে, যা সুররিয়ালিজমে দেখা যায়। 'আকাশলীনা' কবিতায় 'সুরঞ্জনা, তোমার হৃদয় আজ ঘাস/'ঘোড়া' কবিতায় 'চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো ঘুমে-ঘেয়ো/কুকুরের অস্পষ্ট কবলে/হিম হয়ে নড়ে গেল ও পাশের পাইস্‌-রেস্তরাঁতে।' 'গোধূলি সন্ধ্যার নৃত্যে' 'বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,/পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক-কর্কট-তুলা-মীন।' 'সপ্তক' কবিতায় 'লুপ্ত বেড়ালের মতো,' শূন্য-চাতুরীর মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে,' এখনে কি Lewis Carroll এর সেই বিখ্যাত বেড়ালের উদাহরণ যার grin without the cat পাওয়া যেত? 'রাত্রি' কবিতায় 'ফিরিঙ্গি যুবক-কটি চলে যায় ছিমছাম। /থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে; /হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে/বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।' আবার 'লঘু মুহূর্তে' 'এ-সব সফেন কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁস/লাফায়ে লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায়; /নদীর জলের পারে বসে যেন, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিটে/তাহারা গণনা করে গেল এই পৃথিবীর ন্যায়-অন্যায়।' জীবনানন্দের কবিতার আরও অনুসন্ধানে এই রকম তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায়। যদিও মূল বক্তব্য, অবচেতনের অন্ধকার থেকে চিত্র-সংগ্রহ করে আলোর দিকে অগ্রগতি, যা তাঁর কাব্যে মেলে, তা মোটামুটি অভ্রান্ত থাকে।

(গ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বিশের দশকের শেষ ও তিরিশের দশকের প্রথম দিকে কাব্যজগতে সুধীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ। প্রথম কাব্য 'তন্বী'তে তাঁর স্বীকৃতি মত রবীন্দ্রছায়া অনুসৃত হলেও রোম্যাণ্টিকতার অনুধ্যানে স্বাতন্ত্র্য আছে, কারণ প্রিয়ার করপদ্মে একই সঙ্গে রয়েছে সুধা আর বিষ, এবং সমস্ত জগৎ অন্বেষণ করে অরূপ অমূর্ত দেবতার সন্ধানের পর যার কাছে আত্মনিবেদন করছেন, তার কাছে পরিপূর্ণ দেহ-মিলনের মিনতি, যা হয়ত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দেহ-সম্ভোগের এই তত্ত্ব, তার ব্যথা, ক্লান্তি, বিরহ, হাহাকার এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষণিকতায় তৃপ্তির পরম অন্বেষণ, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, দেহ-কেন্দ্রিক এই রূপ-সাধনা এবং কামনার বহ্নিতে নিজেকে সমর্পন

ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে মানবচরিত্রের একটি মূলকথা। সুধীন্দ্রনাথ কৃতবিদ্য ছিলেন, দৈবীপ্রেরণা অপেক্ষা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান-অর্জনের উপর তাঁর আস্থা ছিল। জড়বাদে তাঁর সুগভীর প্রত্যয় ছিল, যদিও তিনি নিজেকে অনেকান্ত জড়বাদী বলেছেন এবং সে হিসাবে অন্য বহু বিশ্বাসের মধ্যে জড়বাদ একটি দৃষ্টিকোণ হওয়া উচিত, অন্যগুলিও মর্যাদা পাওয়া উচিত। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের জীবন-তত্ত্বে জড়বাদ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, যার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মিশেছে নিখিল নাস্তি এবং ক্ষণবাদী-দৃষ্টিভঙ্গী। সুধীন্দ্রনাথের সমগ্রকাব্য ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাব নিরূপণ স্বল্প পরিসরে করা সম্ভব নয়; তাই তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির কিছু কিছু কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করে জীবন ও মন সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার প্রয়াস পাব।

"অর্কেস্ট্রা" কাব্যে 'হৈমন্তী' কবিতায় কবি জীবনের জয়গান গাইতে চাইছেন, যদিও সে গান নিমেষের দুঃস্থ হাসি, সুখের ক্রন্দনকে ফুটিয়ে তোলে, কিন্তু রমণীর তড়িৎ চুম্বনেই রয়েছে অখণ্ড নির্বাণ, এবং 'বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার' কবি আর শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে ঘুরে বেড়াবেন না। কিন্তু 'অপচয়' ও 'কস্মৈ দেবায়' কবিতায় প্রেমের অপূর্ণতার হাহাকার, তাই কবির বক্তব্য, 'যৌবন যজ্ঞাগ্নি মোর যে—অনাম দেবতার আশে,/জানি সে অচেনা/কোনদিন আমার হবে না।' কবির বিশ্বাস ক্ষণিক প্রেমের উন্মাদনায়, তাই তাঁর কাছে চিরপ্রেম অসংগত, প্রেমের চপল খেলাকে তাঁর মনে হয়েছে উষর, যদিও তা তাঁর শোণিতে বিহ্বলতা জাগিয়েছিল। কবির অনুভূতি প্রেম ক্ষণিক, কিন্তু 'অসংখ্য অলি' যৌবনের অমৃতসঞ্চয়কে হরণ করবে, যদিও 'সর্বস্বান্ত মর্মে শুধু পড়ে রবে অবেদ্য অভাব' (ভবিতব্য)। ক্ষণিক প্রেমই কবিকে দেয় অস্তিমের অব্যয় পারানি। (অনুষঙ্গ)। কবির মনে ক্ষণিক প্রেমের স্মৃতি একটি স্বর্গ রচনা করছে এবং কবি সেই স্মৃতিতে নিজেকে ভুলতে চান। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে এই দৃষ্টিভংগীর নাম পশ্চাদগতি বা regression এবং সুধীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় বিশেষ করে "অর্কেস্ট্রা"র নামধেয় কবিতায় এবং আরও অনেক রচনায় সেই অতীত-স্মৃতি রোমন্থন। 'মহাশ্বেতা' কবিতায় কবি তাই ভাবছেন 'ক্ষণিকা পরমা'র দানই তাঁকে দিয়েছে ইন্দ্রত্বের ধ্রুব অধিকার এবং বিধাতা 'নির্দয়/কোনও দিন পারিবে না—অর্গলিতে সে-স্বর্গের দ্বার।' পুরুষ-প্রেমের মত্ততা ও দস্যুতা প্রকাশ পেয়েছে 'সঞ্চয়' কবিতায়, যার মধ্যে কবি প্রবৃত্তির অবাধ বিচরণের কথা বলেছেন। মালার্মের কাব্যাদর্শকে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর অম্বিষ্ট বলেছেন, তা কতখানি সত্য বলতে পারি না, কিন্তু তাঁর L'Apres-midid'un Faune কবিতায় যে যৌবন-লুণ্ঠনের কাহিনী আছে এবং তার স্বপ্নে বিভোরভাব আছে, তার ছায়া কবির অনেক কবিতায় আছে। সুধীন্দ্রনাথ অনন্ত ও অমৃতের পরিবর্তে চপল চুম্বনের অখণ্ড নির্বাণকেই কামনা করেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। মৃত্যুর ধ্বংস অতীব সত্য, কিন্তু তাঁর অন্তরতমাকে সৃষ্টির সুষমা হিসাবে মনে করে মৃত্যু-ভয়কে জয় করতে চান। 'নাম' কবিতায় সেই প্রিয়তমার নামই উচ্চারিত হয়েছে, যিনি কবির কাছে একমাত্র সত্তা, যদিও 'তোমার স্মৃতিও জানি, সেই মতো হারাবে ধূলায়।' ক্ষণিকতার তীব্র কামনা-উদ্বেল ক্ষণ কবির সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত করেছে, যার প্রমাণ পাই 'শাশ্বতী' কবিতার এই কয়েকটি পংক্তিতে, 'একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে/ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ; /

একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,/থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।' 'অর্কেস্ট্রা' কবিতায় একদিকে সংগীতের বর্ণনা ; অন্যদিকে সেই সংগীত যে সমস্ত স্মৃতির ঢেউ তুলেছে, তার প্রকাশ চলেছে খণ্ড খণ্ড কবিতা-সোপানে এবং সেগুলি যেন শব্দের মধ্য দিয়ে একটি অশ্রুত সঙ্গীতকে মূর্ত করতে চাইছে। এই কবিতায় কবি সেই প্রেমেরই জয়গান গাইছেন, যার সন্ধানে তিনি নিত্য যাযাবর, যা ক্ষণিক, অথচ যা মৃত্যুঞ্জয়ী কিন্তু যা এখন স্মৃতিমাত্র। তাই কবি বলছেন 'মরণের সুধা সঞ্চিত তব আলিঙ্গনে ; /জন্মান্তর নিমেষে ফুরায় ও চুম্বনে ; তোমার নিবিড় নিঃশ্বাসবায়ু/করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু ; / সন্নিধি তব সৃজন-আকুতি পরাণে ভণে। /আসে তথাগতি তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে / 'কিন্তু এ সমস্তই স্বপ্ন, তাই স্বপ্ন ভেঙে গেলে কবি দেখলেন, 'শান্তি-শান্তি-শান্তি চারি ধারে / কেবল অন্তর মোর উত্তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হাহাকারে'। ক্ষণিক তৃপ্তিতে আনন্দের অন্বেষণ, যা হয়ত সুধীন্দ্রনাথে ক্ষণবাদী দর্শনের ভিত্তি, তার সঙ্গে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সম্পর্ক আছে। জার্মান দর্শনে শোপেনাওয়ার ও নীট্‌শে বৌদ্ধদর্শনের তৃষ্ণাই সমস্ত জীবন-যন্ত্রণার কারণ, এ বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফ্রয়েড তৃষ্ণার অবচেতন ও অন্ধ শক্তিকে তাঁর পূর্বসূরীদের কাছ থেকে আহরণ করেছেন বলা যায়। এবং এই তৃষ্ণাই তৃপ্তি খোঁজে, যদিও তা সব সময়ই ক্ষণিক এবং তাই মানুষ জীবনে চির অতৃপ্ত, একথা ফ্রয়েডীয়রা মানবেন। সুধীন্দ্রনাথ বৌদ্ধবাদী হলে তৃষ্ণাকে ধ্বংস করার কথা বলতেন, তৃষ্ণার শান্তি খু'জতেন না।

'অর্কেস্ট্রা' কাব্য-গ্রন্থে প্রেমের অস্থিরতা এবং ক্ষণিক আনন্দের বিহ্বলতা কবিকে উদ্বেল করে রাখলেও মাঝে মাঝে জগতের ক্ষণস্থায়ী মৃত্যু-কীর্ণ রূপ তাঁকে বিপর্যস্ত করেছে। কিন্তু পরবর্তী কাব্যগুলিতে যথা 'ক্রন্দসী' 'উত্তরফাল্গুনী' 'সংবর্ত' এবং 'দশমী'তে জাগতিক চেতনার হতাশা, ঈশ্বরে অবিশ্বাস, মৃত্যু-চেতনা আরও তীব্রভাবে উপস্থিত, যদিও একই সঙ্গে প্রেমের স্মৃতির আত্মনিমজ্জনে শান্তির প্রচেষ্টাও দেখা যায়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে পশ্চাদ্‌গতিতে নিমগ্ন মানুষ হতাশা, ব্যর্থতার হাহাকারের নিত্য শিকার এবং নৈঃসঙ্গ্যের বেদনায় তার জীবন দীর্ণ, তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে একমাত্র পশ্চাতের স্মৃতি। 'ক্রন্দসী' কবিতার 'উটপাখী'তে সেই জীবন থেকে পলায়নবৃত্তির আর্তনাদ, তবে সঙ্গে সঙ্গে কণ্টকাবৃত বনে নব-সংসার পাতার-বাসনাও রয়েছে। ধ্বংসের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কবি এও বুঝছেন, 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে।' 'সৃষ্টি রহস্য' কবিতায় নিখিল নাস্তির অন্ধকার থেকে আত্ম-পরিক্রমায় সত্যকে খোঁজা, কারণ সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন। ঈশ্বরকে রুদ্ররোষে পৃথিবীর ধ্বংসে কবির আহ্বান 'প্রত্যাখ্যান' কবিতায়, এবং তার সঙ্গে একাকিত্বের তীব্র জ্বালা। এখানে কি ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে আত্ম-সুখবাদের সর্বনাশা অন্ধতার ইঙ্গিত আছে ? কারণ কবি চাইছেন, 'হানো তীক্ষ্ণ সর্বনাশ, তীব্র ক্ষতি, বৈরিতা নির্মম।' ধ্বংসের প্রবৃত্তি ফ্রয়েডীয় মতবাদে মানুষের কামনা-প্রবৃত্তির সঙ্গে মিতালীবদ্ধ। শূন্যতা ও ফল্গুনাশা বালি আত্মগ্লানিতে কবিকে বিক্ষুব্ধ করলেও কবির 'মনে হল পত্রবিরল গাছের অন্তরালে/ কোন্ চরণের সোনার নূপুর বেজে আরেক নাম-না-জানা তালে/লুকিয়ে গেল ধরা পড়ার আগে' (বর্ষশেষ)। 'প্রতর্ক', কবিতায় স্পিনোজা ও হেগেলীয় দর্শনের অনন্ত সত্তাকে কবি মানতে পারেন নি, তাই তিনি বলেছেন 'অনন্ত, অমৃত তব মায়া, মিথ্যা মায়া,/

সম্ভবত তার চেয়ে সত্য এই অতীতের ছায়া।' 'কালের' হাতে কিছুরই রক্ষা নেই। এমন কি 'মোর ফণিমনসায় ধরিল যে অপুষ্পক শীষ/এ বিস্মৃত মরুভূর অনামিক কোণে।' তাও কালের সংহারে নিঃশেষিত হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে কবির সন্দেহ জেগেছে 'ভগবান' কবিতায় যে ভগবান কেবল কল্যাণের কথা বলে অথচ যারা বঞ্চিত তাদের জীবনে সঞ্চারিত করতে পারে না অমৃতের স্রোতধারা, তাই কবির প্রশ্ন, 'অজস্র-মঙ্গল তব পারিবে কি করিতে সুন্দর/অবরুদ্ধ যৌবনের জীবন্ত মৃত্যুরে?' সুধীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গতায় আবৃত থাকতে চান বলে 'জনসংঘ বিভীষিকা মোর।' তবু তিনি বিশ্ব-মানবেরে একমাত্র সত্য বলে জানেন, এবং মানুষের দিকে বারংবার হাত মেলে দিতে চান (প্রতীক)। 'নরক' কবিতায় পৃথিবীকে নরকের বীভৎস রূপে এঁকেছেন কবি এবং তাঁর অন্তরে উঠে এসেছে অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা, নিরাকার লজ্জা অসন্তোষ, আসন্ধ দুরাশা দম্ভ, নিষ্ফল আক্রোশ, এই জীবনে 'মানসীর দিব্য আবির্ভাব, সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে,/ জাগরণে আমরা একাকী।' তিনি অনুভব করেছেন, 'ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত অমার পটভূমি ; /সবই সেথা বিভীষিকা, এমন কি বিভীষিকা তুমি'। ঈশ্বরের বিধান-বিহিত রাজ্যে কবির সন্দেহ, তাকে অলীক বলে মনে হয়, তাই তিনি চান না, সেই স্বর্গরাজ্য 'নিরালম্ব নিরালোকে যেথা/দেবদ্বিজ প্রবঞ্চিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়/মৌনের মন্ত্রণা শোনে মৃত্যু-বিপ্রলব্ধ নচিকেতা ; /সেখানে আমার তরে বিছায়ো না অনন্ত শয়ান, হে ঈশান।' বর্তমান শতাব্দীতে ফ্রয়েডই বলেছেন, ঈশ্বর কোন বাস্তব সত্তা নয়, মানসিক ভাবের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। তাই ঈশ্বরে সন্দেহ আসা স্বাভাবিক।

"উত্তরফাল্গুনী" কাব্যগ্রন্থে 'হৈমন্তী'তে জীবনের হেমন্ত সন্ধ্যায় ক্ষয়িষ্ণুতাকে ঢাকার প্রচেষ্টা. কালের বিনাশ-যাত্রায় অতিক্রান্ত উৎসবের দুঃস্বপ্ন জেগে যাবে। 'প্রতিদান' কবিতায় অবচেতনের অন্ধকারের কথা স্পষ্টতঃ ব্যক্ত। কবির ভাষায় 'আমার মনের আদিম আঁধারে / বাস করে প্রেত কাতারে কাতারে। / প্রাকপুরাণিক বিকট পশুর / দায়ভাগ মোর শোণিতে নাচে।' / যাযাবর কালের লুণ্ঠনে যখন সমস্তই ধ্বংস হয় তখন 'তার চেয়ে তোমার আননে / এমনই অবাক চোখে চেয়ে থাকা শতবার শ্রেয়।' দেহকে গৌরবময় স্থান দেওয়া কবির বাসনা. তাই বলেন, 'আত্মা সদা স্বগত, একা বটে, তাই কি হেয় দেহের পরিচিতি' এবং আরও উপলব্ধি 'মিলনে ক্ষুধা মেটেনি কোনও কালে ; / কামনা শেষে মিশেছে এসে কামে।' 'বিলয়' কবিতায় কবির প্রেম সম্বন্ধে দৈহিক ভিত্তির তটে দাঁড়িয়ে যে ধারণা হোল, তা এই 'প্রণয়ের জয়স্তম্ভ ঠেকে গিয়ে যদিও ত্রিদিবে, / বদ্ধমূল ভিত্তি তার তবু কাম-কারণ-কর্দমে ; / নিরাকৃত মানবাত্মা অঙ্গারিত সৌর তেজসম / নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় মগ্ন ইন্দ্রিয়ের প্রাক্তন খনিতে।'

"সংবর্ত" কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথের নিজের মত 'অথচ উক্ত যুদ্ধ যে ব্যাপক মাৎস্যন্যায়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তার সঙ্গে পরবর্তী কবিতা সমূহের সম্পর্ক অকাট।' ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে যুদ্ধ মানুষের ধ্বংসপ্রবৃত্তির প্রকাশ, কিন্তু এই ধ্বংসপ্রবৃত্তি যে বিভীষিকার জন্ম দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে কবি-চিত্ত বিভ্রান্ত, হতাশা-মগ্ন। 'নান্দীমুখ' কবিতায় তারই ইঙ্গিত। কবি বলেছেন, 'তাই আমাদের সমাহিত অভিসারে / ঘটে দুর্গতি, মৌন আরতি / সংকেত প্রতিহারে ; / বিপ্রলব্ধ বিশ্বমানব বিষাদে / অঙ্গুলি তুলি দেখায় অলখ নিষাদে।' 'উজ্জীবনে' কবির বিশ্বাস নেই, যে পশুবলের কাছে জগৎ

হার মেনেছে, যে উন্মত্ততা ধ্বংসের বীজ, তাই আজ পৃথিবীতে ভ্রমণরত, তাই কবির জিজ্ঞাসা, 'আসে কি সে অর্ধপশু, অর্ধেক মানব, সঙ্গে করে দিগ্বিজয়ী মরু ?' কবির মনে ধ্বনিত হচ্ছে দূরান্তের আর্তনাদ, তাই তিনি বলেন, 'প্রিয় সম্ভাষের ফাঁকে শোনা যায় দূর আর্তনাদ ;' এবং 'আবহে বিষাক্ত বাষ্প।' এ যুগের অবসন্ন অন্ধকার ছবি ফুটে উঠেছে 'কাস্তে' কবিতায়। কবির অননুপম ভাষায় যার বর্ণনা হোল 'আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ / এ যুগের চাঁদ কাস্তে। / বিপ্রলব্ধ প্রেতের আর্তনাদ / মানা করে ভালবাসতে, / সংগমে মিছে খুঁজে মরি নিরাপত্তা ; / ক্রমায়ত ঋণে ন্যস্ত আমার সত্তা ;' দেহমিলনের মধ্যেও সেই নিরাপত্তা নেই যা কবি খুঁজছেন যুদ্ধের বিভীষিকাকে ভুলতে। 'আসে সে বেতাল তুমি যার বাগদত্তা, / দন্তিল হাসি হাসতে, / চৈতী ফসলে শটিত শবের স্বাদ ; / এ যুগের চাঁদ কাস্তে।' 'জাতক' কবিতায়ও অনুরূপ চিত্র, বরং এখানে মানুষের আত্মহননের ও যুদ্ধের প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত। কবি বলছেন 'অতিদৈব বিবর্তনে মানুষই যেহেতু অতুল, / তাই সে আত্মহারা আজ, তার ধর্ম আত্মীয় সংহার।' যুদ্ধক্লিষ্ট, মুহ্যমান সভ্যতার আশাহীন রূপ ফুটেছে 'সংবর্ত' কবিতায়, যদিও সেখানে কবির আশা এমন একটি রাজ্য গড়ে তোলার, যে রাষ্ট্রের মুখ্য অবলম্ব ন্যায়, ক্ষমা, মিতালী, মনীষা, কিন্তু হয়ত সবই 'বৃথা স্বপ্ন ; সংকল্প অক্ষম ; / মতিভ্রম / বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে অসংলগ্ন স্মৃতির সংগ্রহে / কিংবা শুধু মৌখিক বিদ্রোহে / নিঃসঙ্গ জরার আর্তি ভোলার প্রয়াস'। যুদ্ধে নাৎসী শক্তির পরাজয়েও কোন উৎসাহ সঞ্চার করে না কবির কাছে, কারণ কবির মনে হয় 'শূন্যে ঠেকেছে লাভে লোকসানে মিলে, / ক্রান্তির মত, শান্তিও অনিকাম। / এরই আয়োজন অর্ধশতক ধরে, / দু-দুটো যুদ্ধে, একাধিক বিপ্লবে ;' 'যযাতি' কবিতায় নিজের আত্মোপলব্ধি 'আমি বিংশ শতাব্দীর / সমান বয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর / নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে / বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্য-ধর্মের স্তরে / নিরুত্তর ; অভিব্যক্তবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে / যতনা পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে,'। 'প্রত্যাবর্তন' কবিতায় কবি আণবিক বোমার বিস্ফোরণে সভ্যতা-ধ্বংসের আশঙ্কায় শঙ্কিত, এবং জগতে যে শান্তির প্রচেষ্টা চলেছে, তার মধ্যে যে ফাঁকি আছে, তা কবির চোখে ধরা পড়েছে। কবি বল্‌ছেন, 'অণুবিদারণে শত সহস্র মানুষ হত, / ব্যক্ত অভিব্যক্তিবাদের ফাঁকি ; / বেতালগ্রস্ত বিকলাঙ্গের দুষ্ট ক্ষত, / পরি-ত্যাজ্য হিরোশিমা, নাগাসিকি।' যদিও 'জিত ও বিজেতা অবশ্য প্রত্যক্ষে / সুপ্রতিষ্ঠ অনুকরণীয় সখ্যে : /' পশ্চিমের ধ্বংসলীলায় পৃথিবীর শান্তি অপগত, এবং কবি তাই বল্‌ছেন, 'দ্বৈপ সাগরে স্বতন্ত্র মানদণ্ড ; / পশ্চিমে সাম্রাজ্যের মার্তণ্ড ;/ মাৎস্যন্যায় প্রাচীর স্বস্তি কাড়ে।'

"দশমী" কাব্যগ্রন্থ সুধীন্দ্রনাথের শেষ রচনাসমষ্টি। এ কাব্যের সুর আশাভঙ্গের, সংশয়ের, প্রশ্নের, সন্দেহের এবং ক্ষণিকতার তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠায়। সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতায় কবি উপলব্ধি করেছেন, পার্থিব জীবনে মানুষ একাকী এবং বর্তমান সভ্যতায় সে আশা-হীন। এই হতাশা-তাড়িত নির্জন মানুষের সঙ্গে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের মানুষের ছবি মিল্‌তে পারে, এবং সে মানুষও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে, যে স্বপ্নের মেঘ সুধীন্দ্রনাথের এই কাব্যেও পাওয়া যায়। 'প্রতীক্ষায়' কবি বলছেন, 'অন্তত এতে সন্দেহ নেই আর / অলাতচক্রে ঘুরে ঘুরে, সংসার / অনাদি অমাকে আনে আমাদের গোচরে,' এবং 'পৃথিবী অনাথ

যথেচ্ছ পরমাণু ; / প্রগতিক শুধু কালভৈরব সদলে।' কবির মনে হয়েছে 'অনুমানে শুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে, / জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে ;' তবু তিনি প্রশ্ন তুলছেন, 'তথাচ পাবনা আমি আপনার দেখা কি ?' 'নৌকাডুবি' কবিতায় একই ভাবনার প্রতিধ্বনি কারণ 'অনুত্তার্য নাস্তির কিনারা ; / বৈকল্যের ষড়যন্ত্রে তুল্যমূল্য তুঙ্গী ধ্রুবতারা / ও মগ্ন চুম্বক'। হতাশার আর্তি ফুটেছে 'ভ্রষ্টতরী' কবিতায় যেখানে কবি বলছেন, 'একা সে এখন, বাঁধা অধুনার তালে, / ত্রিসীমায় নেই, আদ্যন্তের দিশা ; ঢলঢল জল সচল চক্রবালে ; / সান্ধিলগ্নে সংগত দিবা-নিশা।' বিশ্বাসের ঝলক 'তীর্থপরিক্রমায়' '... আমাদের নিয়তি অগস্ত্যযাত্রা, অনুগামী / হত বা বিস্মৃত ফণিমণসার বনে। তবু বলি — / এখনও গেলনা ভোলা ; তীর্থরজে রক্তের অঞ্জলি'। 'উপস্থাপন' কবিতায় ক্ষণবাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা আশাবাদের আলোও আছে। কবি বল্ছেন, 'আমি ক্ষণবাদী ; অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায় / নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, তথা / তাতে যার জের, সে সংসারও', তবু শেষে তাঁর উক্তি, 'ওঠে / ভেসে স্বচ্ছ মায়া-মুকুরে বিভূতি—তারা / পরিনির্বাণে, সেঁজুতি জ্বালায় একাদিক্রমে যাতে / না হারায় সাহারায় প্রবাসীর প্রতিগামী পথ।' 'অসংগতি' কবিতায়ও আশার হাতছানি—'হঠাৎ শুনি মৌনে কানাকানি : / কোথায় যেন কিসের উপক্রম / আরব্ধ কি আবার দৈববাণী, / এ-বারে আর ঘটবে না দিকভ্রম ?' 'নষ্টনীড়' কবিতায়ও কি তারই রেশ ? কারণ কবি বলছেন, 'জ্যোতির্গামী কিন্তু সেই তমসও, / তারার ফেনা উৎসারিত ক্রমশ ;' ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের মতে, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন গড়ে ওঠে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রায় সমগ্র কাব্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে আমি চেষ্টা করেছি এই আশায় যে কবির আশাহীনতা, ব্যর্থতা এবং তার সঙ্গে প্রথম দিকের কাব্যে তাঁর যে তীব্র দেহচেতনা প্রকাশ পেয়েছে, যা অতীত স্মৃতির জীর্ণ রোমন্থন এবং যার মধ্যে কবি কাম স্বপ্নকে তৃপ্ত করতে চাইছেন, সব মিলিয়ে একটি ফ্রয়েডীয় মানস তত্ত্বের আংশিক সাক্ষাৎ মিললেও মিলতে পারে। কবি যদি তাঁর অভিজ্ঞতার উপলব্ধিতেই এই জীবনতত্ত্বে উপনীত হয়ে থাকেন এবং কেউ যদি বলেন, তার সঙ্গে ফ্রয়েডীয় মতবাদের সঙ্গে পরিচয় অনিবার্য মনে হয় না, তাহলেও আমি যে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি, তাতে অসুবিধা নেই, কারণ ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে সমগ্র জগতে একটি বাতাবরণ তৈরী করেছিল এবং তার অল্প জ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান থেকে অব্যাহতি তখনকার দিনের কোন শিক্ষিত মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পক্ষে একথা আরও বেশি করে খাটে, কারণ তিনি একটি বুদ্ধি-চর্চার পত্রিকা 'পরিচয়'কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যে পত্রিকায় বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। আমার স্মরণমত ফ্রয়েডীয় পণ্ডিত ডঃ গিরীন্দ্র-শেখর বসু একসময় এ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের "উত্তর ফাল্গুনী" কাব্যে 'প্রতিদান' কবিতায় অবচেতনের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা একেবারে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান থেকে উদ্ধৃত মনে হয়, বিশেষ করে, এই পংক্তিটি, 'আমার মনের আদিম আঁধারে / বাস করে প্রেত কাতারে কাতারে।' তবুও সুধীন্দ্রনাথ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বদ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা হয়ত সম্ভব নয়।

(ঘ) বিষ্ণু দে

কাব্য-জীবনের প্রথমে রবীন্দ্রনাথের রোম্যাণ্টিক সৌন্দর্য-তত্ত্বকে ত্যাগ করে, বিষ্ণু দে একটি মানবীয় সৌন্দর্য-বোধকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ সৌন্দর্যের মূল দেহ-চেতনা, কোথাও কোথাও সে চেতনা তীব্রতায় উদ্বেল হলেও সাধারণ জীবনের শুভ্রতায় তাকে পাবার কথাই কবির মনে হয়েছে। বিষ্ণু দের প্রেম-চেতনায় তাই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সরব উপস্থিতি আছে বলে মনে হয় না, বরং যে জীবন, খণ্ডিত ও ক্লান্ত, তাকে সুস্থ জীবনে উত্তীর্ণ করবার প্রয়াস তাঁর কাব্যে সমধিক উপস্থিত। সে দিক থেকে শোষণহীন যে সমাজের কল্পনা তিনি করেন, হয়ত তার প্রতিষ্ঠায় প্রেমের পূর্ণতা প্রাপ্তি। তবুও বর্তমান অবসন্ন জীবনে মাঝে মাঝে দেহ-কামনার আবেগ তাঁর কবিতায় ভাষা পেয়েছে। যে যুগে বাঁধন-মুক্তির প্রথম ঘোষণা স্বীকৃতি পায়, সে যুগে শুদ্ধ সৌন্দর্য থেকে মুক্তি লাভে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনেকটা সাহায্য করেছিল। যে বিদ্রোহের দ্বারা সমাজকে পরিবর্তন করা যায়, ফ্রয়েডীয় মতবাদে তার পথ-প্রদর্শন না থাকলেও পুরাতন বাধা-নিষেধের, সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার দেহ-বাদও এক ধরণের বিদ্রোহ। বিষ্ণু দের কিছু কিছু কবিতায় সে বিদ্রোহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যদিও প্রেমের সুস্থ আদর্শকে রূপায়িত করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটিতে দেহ-রূপের আরাধনা, তাতে মুগ্ধতাই বেশি এবং হৃদয়ের প্রেম শুভ্রতাই প্রতীয়মান। 'ঘ্রাণ' টানি মৃদু শীতল আঁধারে সুরভি চুলের। / স্বল্প পরিধি রক্ত সূত্র সরস অধর / মুখে রেখেছি ও শুনেছি বক্ষে গ্রহদের বেগ। / দেখি মুহূর্তবিশ্বে চিরন্তনেই ছবি / উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে' এবং তারপরেই, 'ফোটালে যে ফুল সে-ফুল শেফালি।' (পলায়ন—উর্বশী ও আর্টেমিস)। 'উর্বশী' কবিতায় অকুণ্ঠ প্রকাশ ইন্দ্রিয়-ভোগের। 'হে উর্বশী, / ক্ষণিকের মর অলকায় / ইন্দ্রিয়ের হর্ষে, জানো, গড়ে তুলি আমার ভুবন ?…শুধু তুমি থাকো ক্ষণকাল, / ক্ষণিকের আনন্দ আলোয় / অন্ধকার আকাশ-সভায় / নগ্নতায় দীপ্ত তনু জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে যাও / নৃত্যময় দীপ্ত দেওয়ালীতে।' কবি হয়ত আমরণ আসঙ্গ-লোলুপ, তবু তিনি বলেন, 'আমি জানি আকাশ-পৃথিবী / আমি জানি ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের।' আমার মনে হয়, দেহ-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েও বিষ্ণু দের কাব্যাদর্শে প্রেম দেহোত্তর এক শুদ্ধায়িত রূপে ফুটে উঠেছে। তবে যেখানে কবি নিজেকে পৃথিবীর পথে পরবাসী মনে করেন, সেখানে প্রেম অপূর্ণতার ব্যথা তার হৃদয়কে অস্থির করে তোলে এবং ব্যর্থতা ও অতৃপ্তিতে তিনি বলে ওঠেন, 'দিন কাটে নিত্য তৃপ্তিহীন/রাত্রিও প্রশান্তিহীন—ত্রিশঙ্কু এ আমার হৃদয়।'

বিখ্যাত কবিতা 'ঘোড়-সওয়ারের' অনেক ব্যাখ্যা আছে হয়ত, কিন্তু ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুযায়ী 'ঘোড়-সওয়ার' সেই রাজপুত্র যে স্নো-হোয়াইটকে অবচেতন নিদ্রা থেকে জাগিয়ে কামনা-বিদ্ধ করেছিল। যদি এই প্রতীক অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে 'ঘোড়-সওয়ার'কে কামনার রাজ্যে বিপ্লব-সৃষ্টিকারী বলা যায়, যে কামনা 'চোরা বালি'তে অবলুপ্ত। অন্ততঃ বিপ্লবের উদ্দীপনায় সমস্ত দেহে-মনে যে সাড়া জাগবে, তাতে কামনা জীবনকে প্রেরণা দেবে, এমন কথাও ভাবা যায়। এরকম ধারণা, এই পংক্তি ক'টি

থেকে করা যায়, 'আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে / পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে / কাঁপে তনু বায়ু কামনায় থরো থরো'। এবং 'হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর, / আযোজন কামনার ঘোর।' প্রেমকে প্রবৃত্তির অভ্যাস বলে অভিহিত করেছেন 'কন্‌ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স' কবিতাংশে। কবি বলছেন, 'অভ্যাস শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাসি, / সহজের পেশা, আরামের নেশা, তাই তো আসি : তোমার শাড়ীর ছটায়, কথায় কথায় হাসি—' ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ও প্যাভ্‌লভের কন্‌ডিশনড্‌ রিফ্লেকস্‌ বা সাপেক্ষ পরাবর্ত তত্ত্বে আপাতঃ দৃষ্টিতে পার্থক্য থাকলেও দুই-এর ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে পশুর শরীর প্রবৃত্তির একাত্মতা স্বীকারে। 'আত্মজ্ঞান' কবিতাংশে কবি স্বীকার করেছেন, 'আমাদের ভালবাসা প্রাকৃতিক লিলি।' শরীরী চেতনার কথা পাওয়া যায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়—'সভ্য তো বটে, শরীর ধর্ম লোপাট আজ। / আদিম স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ায় মুক্তি নেই।' 'মহাশ্বেতা' কবিতায় এ চেতনা মিলেছে, যেমন, 'হে বীর অতনু, নাচিকেত ধনু টানো, / দেহ-দুর্গের রক্ষায় মোরে আনো,— / তোমার প্রাকৃত বাহুতে, মহাশ্বেতা।' 'যযাতি'তে অচরিতার্থ বাসনার বিশৃঙ্খল রূপ, যথা, 'ব্যাধ-ভয়াহত, তাই তো পাহাড়ে আড়াল খোঁজা, / প্রসার্পিনার মুঠিতেও। তাই প্রণয়-রতি / পিতৃ-সারস যযাতি-শিরার প্রবল গানে' কিংবা 'অশনায়োগ্র ধমনীশিরার পরম তৃষ্ণা / নিদ্রাহীনের রজনীতে চায় চরম ভোলা / স্নায়ু দাবদাহে যযাতি-শিরার প্রবলগানে।'

তিরিশের শেষ দিক থেকে বিষ্ণুদের কাব্যে প্রথম যুগের নিরাশা, দ্বন্দ্ব ও ক্লান্তির অবসান ঘটে এবং যে এলিয়টীয় ভাবধারা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তার মধ্যে জীবন-সমস্যার সমাধান তিনি খুঁজে পাননি। তিনি খুঁজেছেন বিপ্লবের আদর্শ, তাই 'মৃত্যুহীন চিদম্বরে সে তো জানে আদিগন্ত / জীবনের অনির্বাণ গতি / সে কিশোর বীর! / ভঙ্গুর দুঃখের স্তূপে / নূতন চেতনা চৈত্যে রচনা করে কি দুই হাতে, বিপ্লবী পাখাতে, সোনালী ইগল তার, / চোখে সূর্য, পায়ে তার কর্ণফুলি মৌন, ইরাবতী / প্রতীক্ষায় স্থির।' (ভারতীয় বিমান বাহিনী)। তিনি 'পদধ্বনি' শুনতে পাচ্ছেন, তাই বল্‌ছেন, 'কার পদধ্বনি আসে? কার / একি এল যুগান্তর। নব-অবতার', কিন্তু, বিলাস-মগ্ন ধনী-সমাজের কাছে এ পদধ্বনি ক্লান্তির নয়, দস্যুদলের, তাদের মনে হচ্ছে, '…নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে, / দ্বারকার অঙ্গনে-অঙ্গনে / চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী / প্রাণৈশ্বর্যে ধনী / চায় তারা ফসলের খেত, দীঘি খামার, / চায় সোনাজ্বলা খনি।' কবি এক কঠিন যাত্রার সংকল্প নিয়েছেন 'জন্মাষ্টমী'র অমারাত্রিতে 'অমাকৃষ্ণ তমিস্রাকে দুই হাতে ঠেলে ঠেলে কোথা / ভারাক্রান্ত লবনাক্ত বাতাসের ব্যূহ ভেদ করে / চলেছ দুর্জয় একা, পদক্ষেপে ছড়িয়ে রিক্ততা / কি উদ্দেশে, কঠিন যাত্রায়।' এরকম উদাহরণ আরও দেওয়া যায় যে বিপ্লব-চেতনার সার্থক পরিণতি বোধহয় 'অন্বিষ্ট' কাব্যে। কবি বলেছেন 'স্বপ্নে নয়, নরকের পরে এ রচনা।' তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে প্রেম ও বন্ধুতার বাণী, 'এসেছি যাত্রার শেষে ধনধান্যে পুষ্পেভরা / আমাদের এ বসুন্ধরায় তোমাদের দেশে শান্তির ঝঞ্ঝায় নিঃসঙ্গ উধাও/ মানুষের পরম্পরায় প্রেমে, বন্ধুতায়, কর্মে, রচনায়। / এ দেশ আমারও দেশ, দু-হাত মিলাও।' এবং তাই তিনি মানুষকে খুঁজছেন, কারণ 'অন্তিমের অমর পাথরে / খোদাই আমারও সেই ভবিষ্যৎ, মৃত্যুকে যে হৃদয়ের মৃত্যুকে যে রোখে।' আর 'তোমাকে তাই চাই খুঁজি

চলো পাহাড়, / মানুষ।' 'সেই অন্ধকার চাই' কাব্যের নাম-ধেয় কবিতাটিতে কবি যে অন্ধকার কামনা করছেন তাকে বলছেন দিব্য অন্ধকার, কারণ এই অন্ধকার হয়তো আলোর অধিক, কারণ এ অন্ধকার গুপ্ত হত্যার আড়ত নয় কিংবা ভয়াল জন্তুতে ভরা হিংস্রতায় পরিপূর্ণ নয়। আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে, কবি কি অন্ধকারের দুটি স্তর ভাগ করছেন, প্রথম স্তরে রয়েছে মানুষের আদিম বাসনার হিংসাপ্রবৃত্তি, এবং দ্বিতীয় স্তরে জীবন-মৃত্যুর স্বাভাবিক হর্ষ বিষাদ, যা চেতনার কাছাকাছি যার মধ্য থেকে আলোর জন্মকে লক্ষ্য করা যায়, কারণ রাত্রির স্বচ্ছ অন্ধকার থেকেই তো ভোরের সূর্য জন্ম নেয়। কবির ভাষায় এই অন্ধকারের রূপ এই রকম, 'অন্য অন্ধকার আছে ? তাও চেনা, থেকেছি নিবিড় / ঘন নীল অন্ধকারে, স্পন্দমান ছন্দে অতল স্মৃতির হর্ষে ভয়ে। / কাব্যের আদিম গর্ভে যেখানে করেছে মহা ভীড় / লক্ষ-লক্ষ জীবন-মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার। / থেকেছি সে-অন্ধকারে, সেই অন্ধকার চাই শরীরে, হৃদয়ে, / সেই বনে হিংস্রতাও স্বাভাবিক, সৃষ্টিময়, মধুর দয়াল ; / মৃত্যু নয় দীনহীন, আপতিক, নয় সামাজিক ভয়ে / অথবা হাজার জন্তুর দন্তর নখী মানবিক শোষণে ভয়াল।' এরকম একটি ব্যাখ্যা যদি সম্ভব হয়, তাহলে বলতে হয়, বিষ্ণু দে ফ্রয়েডীয় চেতনা স্তরের গভীরতম এবং অগভীর প্রদেশকে স্বীকার করে আলোক-চৈতন্যের দিকেই এগুতে চান।

বিষ্ণু দের কাব্যে সুররিয়ালিজমের কিছু প্রভাব দেখা যায়। সুররিয়ালিজমের পেছনে রয়েছে ফ্রয়েডীয় অবচেতনার দান এবং যদিও বিষ্ণু দের মার্কসবাদে বিশ্বাস ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বিপরীত কোটীতে, তবুও অবচেতনকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ যুক্তি-শৃঙ্খলা ও সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ। তাই সুররিয়ালিজমে মুক্তির অন্বেষণ একেবারে অস্বাভাবিক নয়। কবি মনে করেন, যা আমি পূর্বেই বলেছি, গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল জীবনে সুস্থ প্রেম-জীবন অসম্ভব এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে শোষণের চক্রান্ত, যা জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। প্রেমজীবনে ও সামাজিক জীবনকে বিশৃঙ্খল চিত্র-রূপের মধ্যে ব্যক্ত করে চেতনার বিসর্জনেই কবি মুক্তিকে খুঁজছেন। তাই তিনি বলছেন, 'আত্মবাহী খুঁজি আত্মদানে অপস্মার' ('সন্ধ্যা,' "পূর্বলেখ")। 'চোরাবালি' 'সন্ধ্যায়' 'যযাতি' 'অপস্মার' ইত্যাদি কবিতায় সুররিয়ালিজমের চিহ্ন পাওয়া যায়। যেমন 'কবে ভেসে যাবে সম্বিৎ / স্মরণের নীল পরপার ! / হতোর্ম্মি হবে জয়গান / ডুব্‌বে অহম্‌ কশ্চিৎ। / ...তাই কি ঘুমের নীলিমা / বৈতরণীতে চেয়েছ ? / পলে পলে প্রাণ পরাভব ! / মরীচিকা-ফাঁকা ত্রিসীমা ! / তাই কি রক্তে চেয়েছ / রসাতল ব্যাপী নীল হিম / অপস্মারেরই বিপ্লব ?' /'যযাতি' কবিতায় অতৃপ্ত কামনার বিশৃঙ্খল রূপ পাওয়া যায়, এবং উলুপীর কাহিনীতে মিলেছে অবচেতন বাসনার ছিন্ন-ভিন্ন পরিচয়।

বারট্র্যাণ্ড রাসেল তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তিতে বলেছেন, এ যুগের সমস্ত সমস্যা, জীবনের ও সমাজের, মেটাতে হলে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ও মার্কসবাদের মধ্যেই খুঁজতে হবে তার সমাধান।' সমাজ পরিবর্তনের বাণী দুই তত্ত্বেই আছে, যদিও তাদের মধ্যে বৈপরীত্যই বেশি। তবু এ দুয়ের প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করতে পেরেছেন এ যুগের জ্ঞানী, দার্শনিক, কবিরা এরকম মনে হয় না, তবে কেউ হয়ত নেতির দিক

থেকে এই প্রভাবগুলিকে পরিহার করে নতুন কোন জীবন-দর্শনের খসড়া রচনা করেছেন। বিষ্ণু দে মার্কসবাদকে সমাজ-পরিবর্তনের মন্ত্র বলে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে সামাজিক বন্ধনকে চুরমার করে বাসনার জীবনকে মুক্ত করার যে আহ্বান রয়েছে, তাকে তিনি একেবারে অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন, এ আমার মনে হয় না।

৪

অমিয় চক্রবর্তী

ফ্রয়েডীয় চেতনা-তত্ত্বের সাক্ষাৎ স্বাক্ষর যেমন অবদমিত কামনার সংঘাত, তীব্র দেহ-চেতনা, কিংবা, সম্পূর্ণভাবে সুররিয়ালিস্টিক প্রকাশভঙ্গী হয়ত অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে নেই। তবে চেতনার যে বিচিত্র সঞ্চারকে কবি স্বীকার করেছেন, কখনও অতল গভীরতায়, কখনও অস্ফুট চেতনায়, আবার কখনও মায়াময় দৃষ্টি-চেতনায়, তা তাঁর কাব্যে ভাস্বর। চেতনার বিচিত্র প্রবাহে এক বিশ্ব-চেতনাও তিনি আবিষ্কার করেছেন এবং এই চেতনায় তিনি মগ্ন। বরং বলা যায়, চেতনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি সমন্বয়ই তাঁব মূল লক্ষ্য। স্বভাবতঃই মনে হয়, চেতনা সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গী হযত ভারতীয উপনিষদ-অনুসারী, যা রবীন্দ্রসাধনার ধারায় পুষ্ট হয়ে কবি অমিয চক্রবর্তীর মানস-লোককে সঞ্জীবিত করেছে। চেতনার একটি বিশ্বব্যাপ্ত রূপ এবং চেতনার তুচ্ছ বস্তু থেকে ও দৈনন্দিন কামনা থেকে ঊর্ধ্বায়ন (Sublimation) অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে মিশেছে। প্রথমটিকে যদি রবীন্দ্রসাধনা ও ভারতীয দর্শনের প্রত্যক্ষ ফল বলি, দ্বিতীয়টিকে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুযায়ী চিন্তার ঊর্ধ্বায়ন বা sublimation বলা যায়। হয়ত এমন বলা কষ্ট কল্পনা, তবু দুদিকে চোখ রেখে কিছু কবিতা পাঠ করলে বোধহয় কবিব উপলব্ধির তীরে পৌছান যায়। কবির কয়েকটি কবিতায় চেতনার নানাবিধ স্তরের কথা আছে, চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশ ও কেন্দ্রের কথা আছে। মনের আবর্জনাকে শুদ্ধ চেতনার আগুনে পুড়িয়ে সোনার অলঙ্কার গড়ার কথা আছে। কোথাও কোথাও প্রতীকের ব্যবহার আছে, যা হয়ত ফ্রয়েডীয় প্রতীকবাদের সঙ্গে স্বল্প সাদৃশ্যে উজ্জ্বল; কিন্তু সেগুলি নেহাৎ প্রক্ষিপ্ত মনে হতে পারে। আলোচ্য অংশে আমি কবির যে কয়েকটি কাব্য গ্রন্থের প্রতি মনোযোগ দিয়েছি, তা হোল, 'খসড়া', 'এক মুঠো', 'অভিজ্ঞান বসন্ত', 'পারাপার'। 'পালা বদলে' আমার মনে হয়েছে রহস্যময় অতীন্দ্রিয় চেতনার স্পষ্টপ্রকাশ, যা হয়ত দৈনন্দিন চেতনার একেবারে উপরের স্তরের রূপ, তবু তা আমি আলোচনা করিনি, কারণ আমাব মনে হয়েছে, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হলে এটা করার দরকার। অমিয় চক্রবর্তী এখনও লিখছেন, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া মুস্কিল, যা কোন জীবিত কবির পক্ষেই প্রযোজ্য। আর, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে বলা যায় যে, এই মতবাদ বঙ্গোপসাগরের তীর পেরিয়ে কোলকাতার বুদ্ধিজীবীমহলে সাড়া তোলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর। সুতরাং এ তত্ত্ব কবির অজ্ঞাত ছিল না, এরকম মনে করা যেতে পারে।

"খসড়া" কাব্যগ্রন্থে 'বাড়ি' কবিতায় নীচের তলা, দোতালা ও ছাতের কথা আছে। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে জীবনের বিচিত্র সংঘাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় কবি তারা-ভরা ছাতে শান্তির অন্বেষণ করেছেন। সিঁড়ি নিঃসন্দেহে একটি প্রতীক, যা উপরে ওঠার উপায়। কবি বাড়ির নীচের তলাকে তালাবন্ধ রেখে সিঁড়ির আবর্ত পেরিয়ে ছাতে যেতে চাইছেন। বাড়িও একটি প্রতীক হতে পারে এবং হয়ত, তা জীবনের বহুতল বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা বহন করছে। তালাবন্ধ নীচতলা কি মনের সেই প্রকোষ্ঠ, সেখানে সমস্ত কামনা-সংশয়, জটিল-প্রবৃত্তিকে অবদমিত রাখা হয় ? দোতালা কি মনের উপরিভাগ, যেখানে অভিজ্ঞতার আলো জ্বলে, দৃষ্টি সমস্ত কিছুকে একে একে গ্রথিত করে ? কিন্তু কবি চেতনার এই উপরস্তরেও থাকতে চান না, কারণ সেখানে আলো জ্বললেও যা তিনি চান, সেই শান্তি নেই। তাই সিঁড়ি বেয়ে আরও উপরে যেতে হবে, যেখানে তারা-ভরা রাতের আকাশের নীচে শান্তি মিল্‌বে। বোধহয়, সেইজন্য, ছাতে যাবার সিঁড়ি কবিকে আকর্ষণ করে। কবির কথায়, 'তাই— / ছায়াভরা সিঁড়ি, মধ্য রাতে / ধীরে ধীরে উঠে আসি ছাতে / বেয়ে চলি সিঁড়ির ইসারা / নীচের তলায় বন্ধ তালা / দোতালায় আলো আছে জ্বালা / ছাতে বহু তারা'। 'নামা-ওঠা' কবিতায় কবি নেমেছেন মগ্নতার স্তরে, যে মগ্নতায় স্মৃতির আলোও স্বচ্ছতা আন্‌তে পারছে না, কারণ স্মৃতি-রশ্মি হারা সেই মগ্ন-চৈতন্য অতল, গভীর ! তবু সেই গভীরতা থেকে দিনের কিনারে অভিজ্ঞতার স্পষ্টতায় কবি চোখ মেল্‌ছেন। আমাদের অভিজ্ঞতার বহু অংশ নিমজ্জিত থাকে স্মৃতির আলো পেরিয়ে অগম্য অচেতন অন্ধকারে। সেখান থেকে ঢেউএর দোলায় মনের উপর তলে অনেক কিছু ভেসে আসে। কবি কি এই ধরনের কিছু বল্‌তে চাইছেন ? 'কালান্তর' কবিতায় চেতনা-বিদ্যুতের কথা। সময়ের স্রোতের মতই চেতনার প্রবাহ, এবং সেই প্রবাহ কাল থেকে কালান্তরে। নক্ষত্রের ছায়াপথ জ্যোতির অতীত হলেও স্বচ্ছতায় জ্বলে। সময়ের সঙ্গে চেতনার সাদৃশ্য এই কবিতায় ধরা পড়েছে। কবির ভাষায়, 'তবু দেখো স্রোতোবেগ / চেতনা-বিদ্যুৎ নামে :/ মর্ম ঘরে জ্বালি অন্যকাল।' 'বহুকালের ঘড়ি'তে আকাশে পৃথিবীর সময় ঘড়ি, তাকে পড়বার প্রয়াস কবির। ঘড়ির কালের রহস্য ধরা পড়ে রাত্রির অস্পষ্ট আলোয় এবং তাকে ধরবার জন্য কবির সমস্ত চেতনা উন্মুখ। তাই বলেন, 'চৈতন্য জমিয়ে, পড়তে চাই, এক হয়ে, পৌঁছতে পারিনে, শুধু চোখে / বৈশাখী রাত্রির ডালা খোলা / ভিতরে কলের কি কাণ্ড চলে / আলোর প্রলয়ে / মুহূর্তের সঙ্কেত লাগে বুকে'। / 'বক-যন্ত্র' কবিতায় জীবনের ঊর্ধ্ব-বিবর্তনের কথা আছে। জীবন মনের স্পর্শে নিজেকে গড়ে তোলে। জীবনের সঙ্গে মনের এই সংযোগ ঠিক ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের কথা মনে পড়ায় না, বরং জীবন, দেহ ও প্রাণ যে একই চেতনায় উদ্দ্বুদ্ধ, এই ধরনের কোনও ভারতীয় তত্ত্বের কথা মনে করায়। কবি বলতে চান, 'জীবন যেখানে হয় মন / সেই খোলো আবরণ / ভাবনা, / স্বপ্নে, জাগায়, কাজে / প্রাণ হল মননায়িত'। 'অতি-আধুনিক' কবিতায় অনুভূতির স্বরূপ নির্ণয়ে একই ধরনের কথা, যা চেতনার 'চিন্ময় দিয়াশালাই' জ্বালিয়ে সুন্দরকে গড়ে তুল্‌বে। তাই 'জড় ও জঙ্গম / প্রাণের সঙ্গম / মনের বশে / নতুন রাজ্য পশে।' এখানেও সমস্ত বস্তুতে একই চেতনাকে খোঁজার চেষ্টা। 'স্মারক' কবিতায়ও অনুরূপ বক্তব্য। সেখানে কবি বল্‌ছেন, 'খুঁজেছি জড়কে, প্রাণকে, মনকে / সব মিলে

আপনকে, / জেনো, সত্তার স্বামী / মানুষ ; বহু যুগের আসামী'। "এক মুঠো" কাব্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'চেতন স্যাকরা।' জীবনের আবর্জনা, পরিবেশের কদর্যতা, কুশ্রীতা, সব কিছুকে গলিয়ে সোনার গহনা গড়তে ব্যস্ত জীবনের কারিগর চেতন স্যাকরা। বৈশিষ্ট্য এইটাই, চেতনা সব কিছুকে সুন্দর করে তোলে, কদর্যতা ধুয়ে মুছে আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি করে তোলে। গ্লানিময় জীবনের অন্ধকার থেকে চেতনার মঙ্গলরূপকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব চেতনার আগুন দিয়ে, যে জন্য কবি বলেন, 'শুধু জানি আগুন, আগুনের কাজ, সৃষ্টির আগুন লাগলো প্রাণে, / তীব্র হানে বেদনা জাগবার, আর্টের আগুন, মরীয়াকে টানে।'

"অভিজ্ঞান বসন্ত" কাব্য গ্রন্থে 'অনির্বচনীয়' কবিতায় যে কথা মনের কোণে দেখা দেয়, তাকে অনুসরণ করতে কবি গভীরে ডুব দেন। সেই গভীরে চৈতন্যের অস্ফুট আলো। সে কথা মনের দিগন্তে কৌতুকে সরে আসে, প্রহরে প্রহরে আলো ছায়ার সঞ্চরণে। হঠাৎ একটি বাক্য গভীর থেকে উঠে আসে, আবার গভীরে চলে যায়। প্রত্যহের তটে আঘাত করে অস্ফুট কথার সারি—যেগুলি মনের প্রান্তদেশের কথা, সেগুলিকে সাধারণতঃ ধরা যায় না। কবি বলছেন, 'অতলে তলিয়ে নিয়ে চলে অন্তর্হিত। / বাক্যের নীল জল, অগাধ উজ্জ্বল, উজ্জ্বল ; / কথায়-কথা-গাঁথা অস্ফুট, স্ফুটনোন্মুখ, / প্রত্যহের তটে দোলায় অকথিত অন্যতা— / প্রত্যন্ত মনের কথা।" এই কবিতায় মনের প্রত্যন্ত প্রদেশ কি margin of consciousness, আর যে অতল গভীরতার কথা বলা হয়েছে, তা কি নির্জ্ঞান ফ্রয়েডীয় রূপকল্প—হয়ত সম্ভব। 'ঘুম' কবিতায় মনোবিকলনের উল্লেখ আছে এবং বিভিন্ন ঘুম, যা মনকে অচৈতন্য আচ্ছন্ন করে, তা থেকে মুক্ত করার উপায় মনোবিকলন। তাই, কবি বলছেন, 'যে ঘুম আমাদের আচ্ছন্ন করে, ভুলের ঘুম, অভ্যাসের ঘুম, উষ্ণতার ঘুম, সব কিছুকে মনোবিকলনের শোধনে মুক্ত করে জাগরণের স্রোতস্বিনী আলোর তলে আনা যায়। ঘুমের যে মিশ্রণ জাগরণের বেগ ক্রিয়ায়, তাকে দেখতে কবি বলেছেন, 'চলো ঘুমের স্বপ্নাভ পথে / মহা-মনোরাজ্যে— / সেখানে ম্লানতায় স্তিমিত তারা / নীহারিকা। /' 'পরিচয় দেখতে নামবো মগ্ন—চৈতন্যে। / মিলিয়ে দেখবো ভাস্বর চৈতন্যের সঙ্গে / প্রথম সূর্য করোজ্জ্বল।' এই কবিতায় স্পষ্টতঃ ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের ইঙ্গিত। 'বীজমন্ত্র' কবিতায় চৈতন্যের একাগ্র সংহতির অন্বেষণ। সারাদিনে প্রহরে প্রহরে, যে মালা গাঁথা চলেছে, চৈতন্যের মগ্নস্তরে যা বিকীর্ণ, তাই দিয়ে কবি যাকে উপাসনা করছেন, তার পায়ে দিতে চাইছেন। এই বীজমন্ত্রকে ধ্যানে ধারণ করছেন তিনি, তাই তিনি বলেন, 'দিবালোকে, তারার আলোক-পাতে, তমিস্রায় / ধরি বীজমন্ত্র ধ্যানে বিশ্বধারা প্রাণের বিন্দুতে।'

"পারাপার" কাব্যগ্রন্থের 'মাটী' কবিতায় অপার বিস্ময়ে কবি দেখছেন অজস্র সৃষ্টির খেলা। এই খেলায় 'বৃষ্টি ঝরে, চৈতন্যের বোধে / আবার আকাশ ভরে রোদে। / তারি জন্য শিশু আঙিনায় / দৌড়ে খেলে, হাট বসে, গৌরীপুর জমে ব্যবসায়।' এ চেতনা সমস্ত বিশ্বময় একটি চেতনা, যার প্রকাশ ঘটেছে সর্বত্র। স্বভাবতঃই এ চেতনা-বোধ উপনিষদীয়, তথা রাবীন্দ্রিক। 'রাত্রির প্লেন' কবিতায় প্লেনের চলার বর্ণনা থেকে অতিপ্রাকৃতে উত্তরণ, প্লেনের সঙ্গে কি ব্যক্তির একাত্মবোধ? প্লেন জীবনের গতির প্রতীক। কবি বলছেন, 'চেতনার অস্পর্শ শরীর / ছায়া ফেলে ওড়ে, / মগ্ন ধরিত্রীর

ব. বি./বাংলা কবিতা : বিশ্লেষণ/৪৩-৩

বুকে স্পন্দিত একাকী'। এরই পরে কবির নির্বাণযাত্রীর কথা মনে পড়ে যায়—'নির্বাণ-যাত্রীর চলা উঠে আসে আরো মেঘে মেঘে ; / শুধু ধূ ধূ শূন্য ; শুধু অবলীন, সত্তার স্বরূপ বর্ণ নেই।'

. এরকম বিভিন্ন কবিতায় কবির চেতনার বিচিত্রতা আস্বাদের প্রচেষ্টা মেলে। কিন্তু তা যতনা ফ্রয়েডীয় অবচেতন-চেতনা সংঘাত, তার থেকে বেশি কোন চৈতন্য-ময় আনন্দ সত্তার উদ্দেশে কবির যাত্রা, যে চেতনা সমস্ত বিশ্বে একটি সমন্বয়ের সুর গড়ে তুলেছে। আসলে, আমার মনে হয়, কবির জীবন-দর্শন 'সংগতি' কবিতায় ফুটে উঠেছে, যেখানে কবি বলেছেন, 'মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর / পোড়ো বাড়িটার / ঐ ভাঙা দরজাটা, / মেলাবেন।' / এবং সেই তাকে খোঁজবার জন্য কবির আকুলতা, যদিও কবি বলছেন, 'কেঁদেও পাবেনা তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।' এবং 'আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর। / মত্তদিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম ঝঙ্কার / অবিরহ / সেই সৃষ্টিক্ষণ। স্রোতঃস্বনা / মৃত্তিকার সত্তা স্মৃতিহীনা / প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায় / এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে।' কবি কি তাঁকে খুঁজে পাবেন চৈতন্যের আদিম স্তর থেকে সুরু করে আবেগের আকুল জল ধারায় ? সে প্রশ্ন রয়েই যায়।

সমস্ত কিছু মিলিয়ে বহু রঙের ছবিকে একই চৈতন্যের দৃষ্টিতে দেখতে চান কবি। তাই তিনি বলেন, 'আজকের চোখেই আগামীর দৃষ্টিময় চোখে / বর্ণানেকান-এর রঙ মিলিয়ে দোয়াতে / কবিতার এই লাইন লিখতে চাই- / দৈবে যদি একটি শাদা কথা বেরোতো যাতে সমস্তই আছে।'

অমিয় চক্রবর্তী সেই একের, সমগ্র চেতনার কবি, ফ্র্য়েডীয় তত্ত্ব তাতে ছায়া ফেললে ফেলতে পারে, কিন্তু তা বোধ হয় তার আসল পরিচয় নয়।

প্রবন্ধ শেষ করার আগে যে কথাটা বলতে চাই, আধুনিক কবিদের কে কতটা ফ্র্য়েড দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বা একেবারেই হয়েছিলেন কিনা, তা নির্দিষ্টভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কোন কবির ক্ষেত্রেই কোন মতবাদের প্রভাবটা বড় কথা নয়, কিন্তু একটি যুগের বুদ্ধি-পরিমণ্ডল, ভাব-জগৎ নিশ্চয়ই সমসাময়িক কবি-চিত্তে ছায়াপাত করে এবং সেই দিক থেকে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব বিশের দশক থেকে সুরু করে বেশ কিছুদিন তার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে, যতদিন না মানুষের সমাজ-চেতনা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে এই কথাটাই বুঝিয়েছে যে, মানসিক রোগের উৎস, ব্যক্তির মনের অবচেতনের গভীরতায় যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি সামাজিক বঞ্চনায় এবং তাই মনঃসমীক্ষণ প্রয়োগ করে মানুষের মনকে সুস্থ করা হয়ত দরকার। তবে আরও বেশি দরকার সমাজের আমূল পরিবর্তন। শেষ পর্যন্ত বলা যায় কবিতা সব সময়েই জন্ম নেয়, 'apparently from a strong personal need, rather than from any thorough understanding of any ideology' এবং তাই করতে গিয়ে কোন মতবাদের পার্শ্বিক প্রভাব রচনায় থাকা অসম্ভব নাও হতে পারে।

মার্কসীয় তত্ত্ব ও বাংলা কবিতা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক কবিতার জন্ম আধুনিক জটিলতাকে সাড়া দিতে গিয়ে। সুতরাং এই আহ্বানের জটিলতাকে না-বুঝলে আমরা এই সাড়ার জটিলতাকেও মূলে স্থূলে অনুভব করতে পারি না। আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যখন দ্রুতবেগে এক ক্রমবর্ধমান আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মচেতনা এবং আত্মাভিজ্ঞানের সন্ধানী পালা শুরু হল, আধুনিক কবিতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে থেকেছে আধুনিক রূপে ও স্বরূপে। ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রাতেও মধ্যবিত্ত মানসে তখন নেমে আসছে নিজ ভূমিকার ম্লান সমাপ্তি সম্বন্ধে গাঢ় অনুভূতির ধূসরিমা। দু-দুটো গণআন্দোলনের অকাল অবসানে বহু খণ্ডিত আবেগের, দমিত বাসনার, নির্বাপিত উত্তেজনার ঘোলাজলে ভেসে গেল পূর্বজদের প্রতিষ্ঠিত বহু বিশ্বাস।[১] অথরিটির পতন শুরু হল বিশ্বজোড়া মন্দা-র মধ্যে—মধ্যবিত্তের ক্ষণস্থায়ী স্বর্ণযুগের স্মৃতি তখন ধূসর হয়ে মিলিয়ে গেছে দিগন্তে। রুশ বিপ্লবের পর থেকে সারা জগতে এসেছে পুরনো কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা। ইংলণ্ডে ১৯৩৩-এ অক্সফোর্ড ছাত্রসংসদ তাঁদের সুবিখ্যাত 'King and country'[২] প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই বৃদ্ধদের সম্বন্ধে একটা বিমুখতা ও একটা অশ্রদ্ধার ভাব প্রকট হতে থাকে। অরওয়েলের 'The Road to Wigan Pier' (1937) গ্রন্থে যেকোনো দূষিত অবস্থার জন্য বৃদ্ধদের প্রাধান্যকে দায়ী করা হল—স্কটের নভেল এবং হাউস্ অব লর্ডস্ যেহেতু বৃদ্ধদের পক্ষপাত-ধন্য ছিল, তাই তা হল নিন্দার যোগ্য। আধুনিকতম ভাষায় এ্যাংরি ইয়ংমেন বলতে যা বোঝায়, তারই সূত্রপাত লক্ষ করি দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে দিশাহারা যুবকের আচরণে। এর কারণটি বিশ্লেষণযোগ্য। য়ুরোপের পশ্চিমদিকের দেশগুলিতে—বিশেষ ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াটি এই সূত্রে অনুধাবনযোগ্য। একটা ভয়ানক রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে গেল—তার জন্য কর্তৃপক্ষ শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে একটা কৃত্রিম বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। সে-সব আবেগ এবং দোহাইগুলি যে কতটা অন্তঃসারশূন্য ছিল মহাযুদ্ধের বারুদের ধোঁয়াশা সরে যেতেই তা যুবক শ্রেণীর কাছে স্পষ্ট হতে থাকল। ১৯৩০-এ ইংলণ্ডে কাফ্‌কার ম্যাইর ট্রানস্লেশন্ প্রকাশিত হয়—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের উঠতি বুদ্ধিজীবীরা কেউ কেউ তখন কাফ্‌কার নব মীথের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখেছেন নিজের জটিল অষ্টাবক্র পরিস্থিতিকে। তখন তাঁরা

---

১ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯২৮) এই স্বপ্নভঙ্গকে আরো নিষ্ঠুর করে তুলল।

২ চার্চিলের যুদ্ধস্মৃতিতে এই ঘটনার তীক্ষ্ণ সমালোচনায় বৃদ্ধ ও তরুণের বোঝাবুঝির দুস্তর ব্যবধান চোখে পড়ে।

নিজেদের বেঘোর সময়ের একটা তিক্ত সংজ্ঞার্থ খুঁজেছেন। এই মনোভাবগুলির প্রাথমিক ফসল হল পুরনো নেতা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে অস্বীকার। ইংরেজ কবিদের মধ্যে বামপন্থী প্রবণতা এ সময়ের সংজ্ঞার্থ সন্ধানের ফল। মার্কসীয় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও বিশ্ববীক্ষা তখনই জরুরী হয়ে উঠল।

প্রায় একইকালে, শতাব্দীর একই দশকে, দু এক বছরের আগে-পিছে বাংলা সাহিত্যে বিশেষতঃ তার কবিকুলের একাংশে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে—এটা আমরা লক্ষ করি।[৩] এখানেও মধ্যবিত্তের সামাজিক নৈরাশ্য, নিজ শ্রেণীর নেতৃত্ব-বিনাশের চেতনা, রাজনৈতিক হতাশা একটা নতুন জীবনভাষ্যের জন্য চঞ্চলতার জন্ম দিল। সুতরাং পুরনো জমানা বা old order-এর বিরুদ্ধে অনাস্থা—বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের চিন্তায় শুধু নয়, কাজে কর্মেও উচ্চারিত স্পষ্টতা পেতে শুরু করেছে। কংগ্রেসের মধ্যে ও বাইরে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বামপন্থা মহাত্মাজির অথরিটির বিরুদ্ধে শুধু নয়, যেকোনো প্রকার হাইকমাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে পরিগণিত হয়েছে—অন্তত বাংলাদেশে। মার্কসবাদ যে এমন অবস্থায় তরুণ কবিদের বিশ্ববীক্ষাকে প্রভাবিত করবে তাতে আকস্মিকতা কিছু নেই। অবশ্য প্রতিবাদের কবিতা এর আগেই লেখা হয়েছে। নজরুল এবং যতীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই পুরনো ব্যবস্থার ও ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সামাজিক সাম্যের জন্য কবিদের সজাগ হতে হবে এমন কথা নজরুল এর আগেই লিখেছেন। ইংলণ্ডেও উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে কবেট, রবার্ট ওয়েন, ডিকেন্স, উইলিয়ম মরিস, রাস্কিন সামাজিক ভাবে অসন্তোষকর অবস্থার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটা হয়তো বা রোমাণ্টিকদের পুরনো জমানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরই শিল্প-বিপ্লব-পরবর্তী পরিণাম। কিন্তু Anti Duhring-এ এঙ্গেলস যা ভেবেছেন এ প্রসঙ্গে সে কথা না-ভেবে আমরা পারি না—

> All former moral theories are the product in the last analysis of the economic stage which society had reached at that particular epoch. And as society has hitherto moved in class antagonisms, morality was also a class morality.

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঈশ্বর এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রয়ানার বিরুদ্ধে সমালোচনার মনোভাব, নজরুলের রাজনৈতিক সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে জনতাকে অভ্যুত্থানের জন্য আহ্বান, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের মুটে মজুরের' প্রভৃতি ঘোষণা একটা নতুন বাস্তব পরিস্থিতিকে অঙ্গীকার, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ

৩ ১৯৩৫-৩৬-এ লেনিন পড়া কেতা হয়ে উঠেছে। উল্লেখ করি বিষ্ণু দের 'জন্মাষ্টমী' কবিতার বাঁকা কটাক্ষ—লেনিনের চিঠি পড়েছ, রিমার্ক-

এব্‌ল ইন্‌-
টারেস্টিং।
বলো ভাববে না পাগল সং?

নেই—কিন্তু এসব কবিতার পিছনে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রণোদনা রয়েছে এমনটা নিশ্চিত হয়ে বলা যাবে না। তবে একথা বলা যাবে, এ সব কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থভূমিকার ছক বাঁধা পরিসর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য একটা আকুলতা লক্ষ করা যায়। ইংলণ্ডে যেমন চ্যানেলের ওপারে ফ্যাসিজম এর বিপদটা হয়ে উঠেছিল প্রত্যক্ষ, কলকাতায় কলোনির বাবুরক্তের গ্লানিও তেমনি গঞ্জনা ছড়াচ্ছিল প্রতিপদে—রোমাণ্টিক বিদ্রোহ কল্পনার জের ধরেই নজরুল উচ্চারণ করছিলেন 'ফরিয়াদ' বা 'কুলি' কবিতার চকচকে ধারালো পংক্তিগুলি। যতীন্দ্রনাথ লিখছিলেন ফেমিন রিলিফের কবিতা। ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এখানে যে ব্যাপারটি এখানে রোমাণ্টিকতার মার্কসীয় কোরিলেটিভ সংগ্রহ নয়, মার্কসবাদেরও রোমাণ্টিকীকরণ নয়—এটা এদেশে এসেছে আরো সুস্পষ্ট কার্যকারণ থেকে। সেটা হল ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ।[৪] নজরুল যতীন্দ্রনাথের অবস্থা থেকেই ব্যাপারটি বোঝা যায়। তাঁদের কবিতার ক্রোধ এবং সংশয় অনেকটাই যেন একথা বলে যে সমাজের স্ট্রাক্চার এবং সুপারস্ট্রাক্চারের প্রতীয়মান বাস্তবতার সঙ্গে তাঁরা মিলতে পারছেন না। এখানে স্ট্রাকচার এবং সুপারস্ট্রাকচারের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশের কালে মার্কস যে জটিলতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সে দিকে নজর রেখেই বলতে পারি যে এই দুইজন কবির কিছু কিছু রচনায় সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার আহ্বানে সাড়া দেবার চেষ্টা ছিল। এটাই বড়ো কথা, এটাকে মার্কসীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতনতার একটা ধারা বলার জন্য কেউ ব্যস্ত নন।

কিন্তু নজরুল কম্যুনিস্ট-আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন—ভারতীয় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজঃফর আহমেদের বন্ধু ছিলেন--আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন।[৫] এসব মেনে নিয়েও বলতে পারি নজরুল প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। ১৯২৮-এর বিশাল শ্রমিক ধর্মঘট নজরুলকে প্রভাবিত করেছে শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ে। কিন্তু নজরুল তারাশঙ্করের 'চৈতালীঘূর্ণি' উপন্যাসের মতোই শ্রমজীবী সচেতন মাত্র। তার কারণ শ্রেণী-সহানুভূতি। এর সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদের প্রাথমিক সংযোগটাই বড়ো কথা।

চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত নিজ অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে এবং বিচ্ছিন্নতার বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে তো বটেই তাত্ত্বিকভাবেও সচেতন হয়ে উঠল। মধ্যবিত্ত সজাগ যুবক তখন দুটো আধিতে পীড়িত—এক, অস্বাধীনতায়—সেটা আবার

৪ এর সঙ্গে এলিয়ট কথিত Sweeney Agonistes এর নায়কদের কোনো মিল নেই, যারা ওরেস্তিসের মতো নিজেদের ভেবেছিল—জীবনের মাঝখানে থেকেই জীবন থেকে নির্বাসিত। ১৯২৫-এ Hollow Man এও এলিয়ট এক আধুনিক boredom এর কথা বলেন—বাংলা কবিতায় তার প্রভাব পড়েছে আরো পরে।

৫ কিন্তু মনে রাখি যেন, নজরুলের বিদ্রোহী আখ্যার মূলে তার প্রতিবাদী জীবন যাত্রা। তাঁর সাম্যবাদও খানিকটা 'বিদ্রোহী নৈরাজ্যবাদ'—পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যবিত্ত বাংলা কবিতা / অভিযান ২।১।১৯৭৩

রাষ্ট্রীয় পরাধীনতায় আর একটা ফোড়ার মুখ পেয়েছে, দুই, নিজে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ভয়। ১৮৪২-এ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক বিতর্কে মার্কস বলেছিলেন—

> The mortal danger of each person consists in the danger of losing himself. Hence unfreedom is the true mortal danger for man.

রাস্কিনের সমসাময়িক মার্কস। কিন্তু মার্কস-এর তত্ত্ব ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে কার্যকর হয়ে উঠল রাস্কিনের অনেক পরে। নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয় থেকে এল সেই ভয়ের কারণকে অপসারিত করার ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা আবার অন্যার্থে সন্ধান করেছে পূর্ণ মানুষকে—মার্কস যাকে বলেছেন whole man.[৬]

বিচ্ছিন্নতার বেদনা সে সময়ের বাংলা কবিতায় কতটা উচ্চারিত হয়েছে তার একটু পরিচয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তখনই তো এ প্রশ্ন দুর্মর হয়ে উঠল শরীরে মাটির গন্ধ মেখে, শরীরে জলের গন্ধ মেখে উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে চাষার মতন প্রাণ পেয়ে কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর পরে ?

(ক) সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?

বোধ / জীবনানন্দ দাশ

তখনই তো কেউ বলেছেন ঃ

(খ) মানুষের মাঝে আমি বিদেশী পথিক,
মুখোমুখি কথা বলি—চোখে লাগে অটল প্রাচীর
বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি বিধাতার ভুলে
পৃথিবীর সভাগৃহে ? বুঝি নাকো ভাষা যে এদের

সোহবিভেওস্মাদেকাকী বিভেতী / বিষ্ণু দে

অথবা ঃ

(গ) বুদ্ধিজীবী রুদ্ধঘরে সঙ্গীহীন
আত্মরতির সম্মোহনে কাটায় দিন।
পাষাণ কালো আকাশে আলো কখন কাঁপে ?

পূর্বরাগ / বুদ্ধদেব বসু

তখনই তো মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানির করুণ এবং একার্থে প্যাথেটিক স্বগতোক্তি ধ্বনিত

৬ The alienated worker, Says Marx, "does not fulfil himself in his work but denies himself, has a feeling of misery rather than well-being does not freely develd his physical and mental energies, but is physically exhausted and mentally debased...

Early Writings / Karl Marx P. 125

হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর 'চলচ্চিত্র' কবিতায় নিদারুণ বেকার জীবনের অকর্মক যন্ত্রণার অবিস্মরণীয় এই আত্মবিলাপ ভুলবার নয় :[৭]

এই নিয়ে আটবার
চাকরীর চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ভদ্র বংশজাত বি.এ,
সচ্চরিত্র (বাধ্য হয়ে), পরিশ্রমী (হায় পণ্ডশ্রম !)—
আর কত আনাগোনা ঘামে ছেঁড়া সুপারিশ নিয়ে
মুরুব্বিবিহীন হতাশায় গোলক ধাঁধায়।
আর কতদিন
দুর্ভিক্ষ লুকিয়ে রাখা মলিন পাতলুনে।

শেষটা এক করুণ আত্মসমর্পণ নিজ শ্রেণীর ভবিতব্যের কাছে :

মনে মনে—শুধু মনে মনে—
অফুরন্ত অবাধ ভ্রমণ !
এই বাস্-এ একজন কলেজের দিকে যায় রোজ
মোটা,
কুৎসিত সন্দেহ নেই,
তবু অন্তত হতাম যদি কেরানি কি ইস্কুল মাস্টার।

খণ্ডিত ভগ্নাংশীভূত পুরুষকারের এই যন্ত্রণা বাঙালি মধ্যবিত্তের শ্রেণী হিসাবে পঙ্গুত্বের যন্ত্রণাও বটে। কখনো গান্ধীর কখনো অরবিন্দের শরণ নিয়ে সে অচরিতার্থতার অবসান ঘটে না, আবার এদিকে ওদিকে কানাঘুসো যাও শোনা যাচ্ছিল তাতে পুরোপুরি বিশ্বাস করলেও বিপদ আছে :

সার সত্য শোনো, মাথা ঠাণ্ডা করো : হৈ চৈ ছেড়ে
ভাবো তো মুখে যা বলো, সত্যি তাই হয় যদি—তবে
সব যাবে, সব যাবে, একেবারে সর্বনাশ হবে।

১৯৪০-এর বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে লেখা বুদ্ধদেব বসুর এই কবিতা থেকে একটা কথা আমরা বুঝতে পারি কলকাতার কবিরা তিনের দশক শেষ হবার অনেক আগেই মার্কসীয় শ্রেণীবিপ্লবের তত্ত্বে মনোযোগ দিতে শুরু করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এর প্রায় দশবছর আগে, যখন প্রত্যক্ষভাবে কেউ মার্কসীয় তত্ত্বে দীক্ষিত হন নি তখন থেকেই কিন্তু সভ্যতাভিমানী এবং সংস্কৃতি অভিমানী কোনো কোনো চরিত্র উপনিবেশের অকৃতার্থ বিবর্ণ অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বজ্রনাদ করেছে এই ভাষায় :

সহেনা সহেনা আর জনতার জঘন্য মিতালি।
প্রণয়ের মমত্ব বন্ধনে,
পতঙ্গের সাম্যবাদে, কৃপাজীবী ক্লীবের ক্রন্দনে,
হে ভৈরব জীবন দুঃসহ।

প্রত্যাখ্যান / সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'His work is not voluntary but forced labour' মার্কস কথিত alienated worker-এর স্বরূপ বর্ণনা ধরেই আমরা বলতে পারি—তার কর্মহীনতাও imposed এবং forced উদ্ধৃতিটিতে তিরিশের ভয়াল মন্দার তথ্যনিষ্ঠ ছবি পাই।

'জনতার জঘন্য মিতালি' বা 'পতঙ্গের সাম্যবাদ'[৮] মধ্যবিত্তের আত্মম্ভর চিন্তাকে একটা আভিজাত্যের রোহভূমি দিতে চেয়েছে। এটা ছিল না মার্কসীয় অর্থে শ্রেণীজ্ঞান। সেটা বরঞ্চ পাওয়া গেল সমর সেনের কবিতায়। মধ্যবিত্ত রক্তের ক্লান্তি, দুর্বহ অস্তিত্বের ধূসরতার বোধ, এই জীবনের সীমাবদ্ধতার সকল দায় সম্বন্ধে পরিষ্কার চেতনা—শ্রেণীগত বন্ধ্যাত্বের যন্ত্রণা সমর সেনের কবিতাতে এমনভাবে প্রতিফলিত হল, যার পিছনকার মার্কসীয় প্রেক্ষণ-পটকে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই। সমর সেনের প্রথমদিকের প্রধান কবিতাগুলি এক হিসাবে তিনের দশকের বাঙালি মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত আত্মবিলাপ। আমাদের মনে পড়ে এই বিখ্যাত পংক্তিগুলি :

হে প্রেমের দেবতা ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি ;
আর শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।
কলতলার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙ্গে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

স্ববিরোধে পূর্ণ, ভাঙ্গনের শেষধারে এসে দাঁড়ানো এই যুবক চরিত্রটির অস্তিত্বের জটিল পাঠ সত্তার গভীর বাণীতে নিয়ে আসে তার ভবিষ্যতের ভূমিকার ইঙ্গিত কবিতাটির শেষ দুটি পংক্তিতে।

শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্তের ভূমিকাবসান ট্র্যাজিক রূপ নেবে, না প্যাথেটিক হয়ে উঠবে, তা অবশ্যই নির্ভর করে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে কবির মনোযোগের উপর। 'উজ্জীবন' কবিতায় ১৯৩৮-এর ২৬শে অক্টোবর সুধীন্দ্রনাথের কবিতার চরিত্র শুনতে পান এক পদধ্বনি। 'পদধ্বনি—কার পদধ্বনি হানে মৌন অনুনাদ?' 'আসে কি সে-অর্ধপশু, অর্ধেক মানব সঙ্গে করে দিগ্বিজয়ী মরু? পুরাণ-পুরুষ হত : বাজে বক্ষে আর্তির ডমরু'। এখানে চরিত্রটি বস্তুত উজ্জীবনের কথা ভাবেনি—ভয় পেয়েছে আত্যন্তিক বিনাশের মুখোমুখি হয়ে। একই মিথ্ আরো স্পষ্টভাবে ব্যবহার করলেন বিষ্ণু দে তাঁর 'পদধ্বনি' কবিতায়। কিন্তু ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় অগ্রগতির বিষয়ে মার্কসীয় চেতনার আলোক ব্যবহারের ফলে—'পদধ্বনি'-র নাটকীয় একোক্তির নায়ক-চরিত্র অনেক বেশি তাৎপর্য পেল—কবিতার বিচারেও বটে। তাই দেখি শক্তির অবক্ষয় নয়, শক্তির রূপান্তর, সে রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবিতা 'পদধ্বনি' কবিতার বিষয়। সেদিন

৮ 'পতঙ্গের সাম্যবাদ' কথাটির মধ্যে অথরিটেরিয়ান রাষ্ট্রের রেজিমেণ্টেশনের দিকে ইঙ্গিত তীক্ষ্ণ হয়েছে এমন কথা ভাবি না। বরঞ্চ পরাধীন স্বদেশের ব্যক্তিত্বচর্চা বিহীন জীবনের কথাটাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে করি।

সেই ১৯৩৯-এ যখন নতুন সামাজিক শক্তির অভ্যুদয়কে মার্কসীয় ইতিহাস জ্ঞানে অনিবার্য বলে মনে হয়েছে, 'পদধ্বনি'-র অর্জুন সেই সময়ের নায়ক। তার খেদোক্তির পরিমণ্ডলে ছিন্নস্মৃতির বিলীয়মান স্বর্ণাভা—তার সম্মুখে স্পন্দিত ছিল আগামীকাল।[৯] কবিতাটির পরিসমাপ্তিতে দেখি—মোহ এবং মনীষা, অহমিকা এবং ভবিষ্যৎবোধ ইত্যাদির মিশ্রণে কবির সৃষ্ট নায়ক যেমন তাকিয়ে আছে তার ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তির দিকে, তেমনি তার দৃষ্টি তাকিয়ে রয়েছে ভাবীকালে। সেই মনীষা ইঙ্গিত তুলেছে—'একি নব অবতার ? একি যুগান্তর ?' আবার পরক্ষণে সেই মোহ সংশয়ের আবছায়া সৃষ্টি করে—'দস্যুদল উদ্ধত বর্বর'। এ অর্জুনের, তথা, এই মধ্যবিত্তের সচেতন সত্তা দস্যুদলের প্রাণৈশ্বর্যের প্রতি প্রশংসমান। সে ইতিহাসের এই নবপর্যায়ে 'আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর' দস্যুদলের আবির্ভাব মুহূর্তে আসলে ক্রান্তিলগ্নের চ্যালেঞ্জকেই স্বীকৃতি জানায়।[১০]

এইভাবে বিষ্ণু দে-সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ব্যাঙ্গাত্মক মধ্যবিত্ত চরিত্র মার্কসীয় ইতিহাস-বীক্ষার দৌলতে রূপান্তরিত হল এক সকর্মক ভবিষ্যউন্মুখ চরিত্রে। কবিতার ভাবগত মেরুদণ্ড ও রূপগত প্রকরণ অবশ্যই প্রভাবিত হয়েছে এই বীক্ষণের বিভায়। এশিয়া ভূখণ্ডে সামরিক স্বৈরাচারী সাম্রাজ্য পিপাসা চীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আবিসিনিয়া নির্জিত হয়েছে ফ্যাসিস্ত ইতালির হাতে, অস্ট্রিয়া ধর্ষিত হয়েছে নাৎজি জার্মানীর কাছে—স্বদেশ ও বিদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জায়মান সেই চেতনা এবার কমিটমেণ্ট এবং এলাইনমেণ্ট-এর প্রশ্নের মুখোমুখি হল। এই বেপরোয়া সময়কে স্মরণে রেখে একবার আমাদের হিসাব নিকাশ করতে হয় আধুনিক কবিতার তাত্ত্বিক পটভূমিরূপে মার্কসবাদের অবদান কতটা। আমরা দেখি :

এক : কবিতার ভাষা এক নতুন তির্যকতা পেল। ঋজুতাও হল অভিনব। অর্থাৎ ঋজু ও তির্যক দুধরনের প্রকাশভঙ্গিই জন্মান্তর পেয়েছে।

দুই : সকল কবিতাই হল এক অর্থে নাট্যকবিতা। সুতরাং কবিতার তৃতীয় স্বরে এক নতুন ডাইমেন্‌শন্ এল।

৯ তখন ওদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামায় ঘা পড়েছে। দেশে দেশে নতুন শক্তির আগমন-ধ্বনি বেজে উঠছে—এক সবাত্যয়ের মধ্য দিয়ে। এই অবস্থায় কীর্তিমান মধ্যবিত্তের চরিত্র-প্রতীক হয়ে উঠল অর্জুন—'পদধ্বনি' কবিতায়।

১০ এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকেও একবার আকৃষ্ট করেছিল। সেই অলিখিত কাব্যনাটকের পরিকল্পনাটি তিনি জানিয়েছিলেন প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশকে। পুরাণ ব্যাখ্যাটি অবশ্য ছিল কবির নিজস্ব কল্পনার দান। খবরটি পাই Samvadadham-এর P. C. Mahalanobis memorial Volume-এ Rabindranath Tagore / Prasanta Chandra Mahalanobis রচনায়।

২

আধুনিক কবিতার ভাষায় এই নতুন বাস্তব অবধানতার পরিচয় পাওয়া যায় দুভাবে। আমরা জানি যে কোনো সাহিত্যই—লিখিত অথবা মৌখিক, গদ্য অথবা কাব্য একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহারের ভাষা। 'বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহারের ভাষা'—বলতে এখানে এ আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা তৎকালীন সামাজিক, ব্যক্তিক, রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিকেই বুঝি। পরিস্থিতি তখন দাবি করছিল বৈপ্লবিক রূপান্তর, পরিস্থিতি তখন প্রতি অংশে বিশ্বগত-পরিস্থিতি, প্রতি মুহূর্তই তখন বিস্ফোরক। অতএব যে কাব্যপ্রকরণ প্রেমবিরহ ব্যক্তিগত বাসনার itemization[১১]-এ ব্যস্ত, তার জায়গায় নতুন প্রকরণের প্রয়োজন হল। প্রথম প্রয়োজন হল গতিবেগের। মার্ক্সীয় তত্ত্ব সাম্যবাদী বাঙালী কবিদের বাক্যশৈলীতে এনে দিয়েছে গতিবেগ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এবং অরুণ মিত্রের এই সময়ের কবিতাগুলি এ কথার সাক্ষ্য। দ্রুত পরিবর্তনশীল পটভূমিকে ধরার জন্য এই গতিবেগের দরকার হয়েছিল এমন বললে কম বলা হবে। বরঞ্চ পরিস্থিতির দ্বান্দ্বিক মূল্যায়ন থেকে বাক্যের এই সচল তীক্ষ্ণতার জন্ম—একথাটাই এখানে জরুরী। 'জাপপুষ্পকে জ্বলে ক্যাণ্টন জ্বলে সাংহাই' এই বাক্যে ক্রিয়াপদ বর্ণনাত্মক সাধারণ বর্তমান কাল। একটি পংক্তিতে বাক্য সম্পূর্ণ হতে না হতেই পরের চরণে ধ্বনিত হল গুরুগম্ভীর সিদ্ধান্ত 'দস্যুর দলে রোখবার আগে সংহতি চাই'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই সময়ের যে কোনো কবিতার মাত্রাবৃত্তবদ্ধ বাক্যশৈলীর দ্রুত মুভমেণ্ট দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিকে প্রতিফলিত করার প্রয়াস। অনুরূপ প্রয়াস ভিন্ন তাৎপর্যে বিশিষ্ট হল সমর সেনের গদ্যচ্ছন্দে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যচ্ছন্দ তাঁর 'শ্যামলী' মাটির বাড়ির মতো সুন্দর কিন্তু ব্যবহারোপযোগী হল না—সমর সেনের গদ্যচ্ছন্দের মাটির বাড়িতে চেনা জীবনের ধুলো বালির সঙ্গে সহাবস্থান। 'প্রাণপণে দেখি ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক'—এখানে 'প্রাণপণে' এই ক্রিয়ার বিশেষণটিতে মধ্যবিত্ত নায়কটির মানসিক অস্থিরতা স্পন্দিত হয়ে ওঠে। এই দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে মূর্ত করতে চেয়ে কবিরা রচনা করেছেন সংহত বাক্যাংশ—কখনো কখনো তা প্রবচন তুল্য সিদ্ধ উক্তি—অরুণ মিত্রের 'জনসাধারণ অসাধারণ' অথবা সরোজ দত্তের 'দুঃসাহসী বিন্দু আমি বুকে বহি সিন্ধুর চেতনা' এমনই এক একটি উক্তি। ভাষার নতুন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাকে বুঝে নেবার জন্য আগ্রহ কবিদের—আত্মসচেতন কবিদের একটা বড় লক্ষণ। ১৯১৫ সালে যে-সভায় রোমান জ্যাকবসন তাঁর বিখ্যাত পেপারটি পড়েছিলেন—Khlebnikov's (খ্লেবনিকভ্'স্) Poetic Language. সেই সভায় মায়াকোভস্কি উপস্থিত ছিলেন। এটা থেকে মায়াকোভস্কির মাধ্যম সম্বন্ধে উৎকণ্ঠার যে-পরিচয় মেলে তা আসলে তাঁর অভিজ্ঞতারই যন্ত্রণা। ১৯৩৫ থেকে ৪৫ এর মধ্যে বাংলা কবিতার বাণীবিন্যাসে দুটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। একটি হল 'ইমেজ' এবং এপি-

১১ মায়াকোভস্কির আত্মহত্যাকালীন ভাষা থেকে এই শব্দটি গ্রহণ করেছি। পুরাতন কাব্য-রীতি নয়, পুরাতন জীবন-ধারাকে কটাক্ষ করা হয়েছে ঐ বিদায়ী বিবৃতিতে।

থেটগুলির ভিতর দিয়ে যথাসম্ভব এন্টিথিসিসকে পরিবেষণ করা। বিষ্ণু দে-সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তো বটেই জীবনানন্দ এবং বুদ্ধদেব বসুর কবিতাতেও এই প্রকরণ লক্ষ করা যায়। সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব বসুর দীর্ঘ কবিতায় যে অর্কেস্ট্রা বা ঐকতান-রীতি প্রয়োগ সেটাও শুধু মিউজিক্যাল ইমপোর্ট নয়। বিশেষ করে বিষ্ণু দে দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে ধরতে গিয়ে পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট এর আশ্রয়ী হয়েছেন। এন্টিথিসিসগুলি সম্বন্ধে বিষ্ণু দের চেতনা ক্রমশ প্রকাশ করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতি তাঁর কৌতূহল। এতো গেল একদিক। আরেকদিকে দেখি মার্কসীয় বাস্তববীক্ষা থেকে কাব্যের ভাষাজ্ঞানও নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে যে অর্থে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন—Language anticipates and enacts the altering pulse of material life—সেই অর্থেই এ যুগের কাব্যভাষা ফ্রয়েড-য়ুং-এর মনঃসমীক্ষা এবং মার্কসের ইতিহাস জ্ঞানকে আয়ত্ত করতে চেয়েছে—এ যুগের নাড়ীর স্পন্দনকে প্রতিধ্বনিত করার জন্য। কথ্যভাষার মধ্যেই অকৃত্রিম কাব্য-ভাষার বনিয়াদ।[১২] যে কোনো জোরালো মৌখিক উক্তির মধ্যে আছে কাব্যের উপাদান (has in it energies which are political)। কবির ভাষা নির্বাচন ঘটে আত্মসচেতনতার এক বিশেষ স্তরে। সেই আত্মসচেতনতা একটা সমগ্র পরিস্থিতির অংশ—গভীরতর তাৎপর্যে অন্বিত। সেই বোধকে আত্মস্থ করেই এযুগের কবিতায় আমরা বাগ্‌ভঙ্গির বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ করি।

All literature—oral or written, lyric or prosaic archaic or modern—is language in a condition of special use—

যদি একথা মেনে নিই তাহলে বলতে হয় এ যুগের কবিতায় কথ্যস্রোতের লোকায়ত চালের জন্য আকুলতা এক অনন্য পারিস্থিতির স্বীকৃতি। সমর সেনের কবিতার 'আর' সংযোগাত্মক অব্যয়ের ব্যবহার আপাত অসম্পৃক্ত বিবদমান বাস্তবতার জন্যই অর্থপূর্ণ। 'আর' সেখানে 'এবং'-এর বিকল্প নয়। 'আর' এখানে 'তদুপরি'। 'ধূসর' শব্দটি বিবর্ণ অস্তিত্বের বিশেষণ-প্রতীক। 'হলুদ ঘোলাটে চোখে মোটর এগোয়'—সমর সেনের এই বর্ণনা আর জীবনানন্দের সেই যে মোটরগাড়ি গাড়োলের মতো কেসেছিল--প্রায় এক কথাই জানাতে চায়—যন্ত্র-যুগ যত আমাদের ছকে বেঁধে ফেলছে, তত মনের দিক থেকে আমরা হয়ে যাচ্ছি মন্থর। একজন দৃশ্য দিয়ে আর একজন শব্দ দিয়ে সেই দুঃসহ পুনরাবৃত্তিকে রূপ দিতে চেয়েছেন। ভাষার ঋজুতা ও ভাবনার তির্যকভঙ্গি আধুনিক কবিতায় পরস্পরের সঙ্গে কতটা বোঝাপড়া করে সমর সেনের কবিতায় তার পরিচয় পাই:

আর হাওয়ায়
নামহীন ফুলের অদ্ভুত চাপাগন্ধ
মুহূর্তগুলির নিঃশব্দ কান্নার মতো ;

শুধু দুর্জ্ঞেয়তা ও দুর্বোধ্যতার সূত্রে দুটি সুদূর সম্পর্ক—'অদ্ভুত চাপাগন্ধ' ও 'নিঃশব্দ কান্না'

১২ 'Neither thoughts nor language in themselves form a realm of their own...they are only manifestations of actual life.'—K. Marx and F. Engels, The German Ideology 'words are action too'.—Lenin

একত্র হল। দুটো মিলিয়ে শুধু দুর্মর নয়, এক দুর্বহ অন্ধকারের অনুভূতি সঞ্চারিত হল। আমরা লক্ষ না করে পারি না জীবনানন্দের কবিতায় 'স্তব্ধতা' নিয়ে আসে নির্জনতার অনুষঙ্গ, সমর সেনের কবিতায় 'স্তব্ধতায়' আসে কর্মহীনতার অনুষঙ্গ। সমর সেনের কাছে অনন্বয় বোধের মার্কসীয় ভাষ্যই মান্য।

বিষ্ণু দের 'ঘোড়া' 'পাখি' 'হরিণ' 'নদী' প্রভৃতি প্রতীক জীবনমান্য হয়ে ওঠে মার্কসীয় বিশ্বভাষ্যকে অবলম্বন করে। গতিশীলতার এই প্রতীকগুলিতে তৎকালীন রিয়ালিটির দ্রুত পটপরিবর্তন প্রতিবিম্বিত হয়েছে—শুধু তাই নয় এর ফলে নির্মিত হয়েছে বিষ্ণু দের সেই প্রসিদ্ধ কাব্যশৈলী—বিস্তৃতি যেখানে সংহতিতে নিবিষ্ট। 'ক্রেসিডা' 'ওফেলিয়া' 'ঘোড়সওয়ার' 'এলসিনোরে' ইত্যাদি কবিতার স্তবক পরিকল্পনা রীতি স্মরণীয়—সেখানে আপাত বিচ্ছিন্ন স্তবকগুলি গ্রথিত হয়ে আছে নায়ক-চরিত্রের টেন্‌শনের সূত্রে। এবং সে টেন্‌শনের মূলে রয়েছে বিষ্ণু দের ছন্দ জ্ঞান—সময়ের ছন্দ-জ্ঞানের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। বিষ্ণু দের ছয় মাত্রার ছন্দের প্রসিদ্ধি তর্কাতীত। তারপরেই বোধ হয় আমরা উল্লেখ করতে পারি তাঁর সাত মাত্রার বিলম্বিত লয়ে সংকল্পকে এবং প্রতীতিকে গাঢ় করে তোলার গূঢ় রহস্য। একজন মার্কসবাদী কবি—পূর্ণ মানুষ যাঁর অন্বিষ্ট—সাতমাত্রা দীর্ঘতরঙ্গাভিঘাত তাঁর স্বগতোক্তির ভাষা হয়ে ওঠে।

কমিট্‌মেণ্ট এবং এলাইনমেণ্টের প্রশ্নটি চারের দশকের স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক কার্যকারণে আরো জরুরী হয়ে ওঠার ফলে কাব্যের ভাষা কমিটেড কবিদের কাছে আরো ঋজুতার দিকে এগিয়েছে। এ যুগে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে সময়ের অব্যবহিত চাপে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার ভাষা কমিটেড এই কারণে যে একটা সামাজিক দায়িত্ব তাঁরা নির্বাচন করে নিয়েছিলেন—একথা ফর্মালিস্টদের মতো ভাবেন নি যে,

> literature is a language freed from paramount responsibility to inform.

লক্ষণীয় এ'দের ভাষায়—বিশেষ করে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার ভাষায় ভবিষ্যৎ ক্রিয়া-পদের ব্যবহার।

Man's capacity to articulate a future tense—his ability and need to 'dream forward' to hope-make him unique.—

একথা ভাষার ইতিবৃত্তে গুরুত্বপূর্ণ, কাব্য ভাষায় এ গুরুত্বটা প্রতিভাত হয় অন্যভাবে। সুকান্ত ভট্টাচার্য যখন বলেছিলেন :—

(ক) অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ
তারপরে হব ইতিহাস

অথবা

(খ) তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে,
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।

অথবা

(গ) কিন্তু জানি একদিন সে সকাল আসবেই
যেদিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখে মুখে
সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায়।

অথবা

(ঘ) সব চুপচাপ : জাগবে হয়তো বোশেখি ঝড়ে

অথবা

(ঙ) তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা
জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব।

(চ) কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই শেষবারের মতো !

বা (ছ) আমরা বেরিয়ে পড়ব
সবাই একজোটে, একত্রে
তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে
জ্বলন্ত আমরা ছিটকে পড়ব তোমাদের হাত থেকে
বিছানায় অথবা কাপড়ে ;

এই ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ ব্যবহারের পিছনে শুধু সুকান্তের ভূমিকা নির্বাচনটিই মুখ্য ব্যাপার নয়, দুর্বিসহ বর্তমানের কাছে অসমর্পিত থাকার সংকল্পটিও এখানে প্রধান। তিনি বাক্যে ক্রিয়ার অতীতকাল বেশি ব্যবহার করবেন যিনি জেনেছেন তাঁর বর্তমান তাঁকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে না। তিনি বাক্যের ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ বেশি ব্যবহার করবেন, যিনি জেনেছেন বর্তমানের দ্বন্দ্বময় অগ্রগমনের ছন্দকে।



কবিতা ব্যক্তির ক্রমবর্ধমান আত্মচেতনার সাক্ষ্য—সেই ক্রমবর্ধমান আত্মচেতনাকে একটি প্রেক্ষণ বিন্দুতে সংহত করে তোলার ব্যাপারে মার্কসবাদ সাহায্য করে। আগের পরিচ্ছেদে আমরা আধুনিক কবিতার চরিত্র-ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি। 'চরিত্র ভাষা' কথাটি এখানে ইচ্ছা করেই ব্যবহার করা গেল—কেননা কম বেশি সব কবিতা এক হিসাবে নাট্যকবিতার লক্ষণাক্রান্ত—অন্তত বেশির ভাগ কবিতাতেই একটা চরিত্রের আত্মগত বা বহির্গত উক্তি প্রধান কথা। কাজেই সে ভাষারহস্যের মূল খুঁজতে গেলে বক্তাপাত্রটিকে চিনে নেওয়াটা আরো আবশ্যিক। এইবার আমি বাধ্য হচ্ছি চারের দশকের বাংলা কবিতার একাংশের একটা প্রবণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। চারের

দশকেই সেই জাতীয় কবিতা প্রচুর লেখা হল যার মূল প্রেরণা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যাহিক আন্দোলন। মার্কসীয় তত্ত্ব যত কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংহত হয়েছে কবিতাও তত আত্মানুসন্ধান পরিহার করে বক্তব্যপ্রধান উদ্দেশ্যবাদী হয়ে গিয়েছে—মার্কস এঙ্গেলস নিজে কিন্তু এ ধরনের উদ্দেশ্যবাদকে প্রশ্রয় দিতে চান নি। এবং লেনিন স্পষ্টই বলেছিলেন—

> Every artist...has a right to create freely according to his ideals independent of everything.

লেনিন শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি। মার্কস-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গতি সৃষ্টি করে লেনিন আরেকটি কথাও বলেছিলেন—

> The history of all countries shows that the working class exclusively by its own effort, is able to develop only trade union consciousness.

অর্থাৎ সে নিজে নিজে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ রচনা করতে পারবে না—তার জন্য বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ডাক পড়বে। লেনিন যদি সত্যই একথা বিশ্বাস করে থাকেন যে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিক আইডিয়লজি সৃষ্টি করতে অক্ষম—তাহলে মার্কসকথিত অস্তিত্ব ও চেতনার সম্পর্ক, শ্রেণী এবং ভাবাদর্শের সম্পর্ক মান্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। হয়তো এই সমস্ত এবং আরো নানাবিধকারণে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা প্রশ্ন তীব্রতা পেতে শুরু করেছিল—সত্যই মার্কসীয় ঈসথেটিকস্ বলে কিছু আছে কি না। ১৯৪৭ সালে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সভ্য রজের গারোদি এ প্রশ্ন তুললে তা নিয়ে সর্বত্র তুমুল বিতর্ক-বাত্যা বয়ে যায়। এদেশে তা নিয়ে আলোচনা দানা পাকাতে না পাকাতেই ভারতীয় কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক রণনৈতিক লাইন বদলে যায়—শুরু হয় পার্টির বহু আলোচিত 'বামযুগ'। বর্তমান আলোচকের মতে এই যুগে কবিতার কাছে আমরা অনেক ভুল দাবি পেশ কোরেছি। তার ফল হল ঃ

ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই
রক্তের ধার রক্তে শুধব কসম ভাই।

লেখা হল পার্টি শ্লোগান ধরে ঃ

আমরা সব বাগনানের বৈনানের চাষিরাই
সকলে মিলে জোট বেঁধেছি এবার তুমি শোন ভাই
জমিদারের জোতদারের জুলুম নয়, জমি চাই।

অতি সরলীকৃত কবিতার পাশাপাশি এল অতিসরলীকৃত কাব্যসমালোচনা এই লোক-সঙ্গীত উদ্ধৃত করে ঃ

"নির্বিচারে নরনারী ছাত্রছাত্রী হত্যা।
এই যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা
তবে আমি সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি
পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী—লেখা হল "বিষ্ণুদের মতো তথাকথিত 'ভদ্র' কবিরা রচনা করুন তো দেখি এমন কবিতা, তাঁদের মুরোদ বুঝি!

কিন্তু বিষ্ণুবাবুদের তা সাধ্যাতীত—কোথায় পাবে বুর্জোয়াদের বশংবদ সংস্কৃতিবিদরা এই প্রাণশক্তি ?"[১৩]

সুখের বিষয় এই পিরিয়ড ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত অর্থে যাঁরা মার্কসবাদী, তাঁরা সকলেই তাঁদের কবিতার চরিত্রে সে-পূর্ণ মানুষকে খুঁজেছেন—যে পূর্ণ মানুষ ছিল মার্কস-এর অনুসন্ধেয়। এ'দের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা বলতে পারি। বোধকরি পূর্বোক্ত হঠকারী আতিশয্যের প্রতি বিরূপতার স্মৃতি বহন করে অরুণ মিত্র ১৩৮৪-র 'গাঙ্গেয়' পত্রিকার শ্রাবণ সংকলনে পুষ্কর দাশগুপ্তকে এক সাক্ষাৎকারে জানান—"কমিউনিস্ট ঘোষণার সঙ্গে হয়তো সম্পর্কিত করা যায়, এমন কবিতা প্রথম জীবনে গোটা তিনেক লিখেছি, তারপর আর লিখিনি। তাছাড়া কোনো বিশেষ মতবাদের ভিত্তিতে কবিতা লেখায় আমি বিশ্বাসী নই।" কিন্তু তাই বলে অরুণ মিত্র নিজ চরিত্র বিসর্জন দেন নি। মার্কস যে সমগ্র মানুষের কথা বলেন অরুণ মিত্রের কথায় ও কবিতায় তারই ঠিকানা। তিনি বলেন—"যদি বামপন্থা মানে হয় মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে ভাবনা, জীবনের সঙ্কট সম্বন্ধে অনুভূতি, নৈরাশ্য যন্ত্রণা ও অবক্ষয়ের চেতনা এবং তা উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা, তাহলে আমায় কবুল করতেই হবে আমি বামপন্থী কবি।" অরুণ মিত্রের কবিতায় লাল ইস্তাহারের টগবগানি আজ আর খুঁজে পাবো না ঠিকই—কিন্তু অডেনের মতো তিনি একদা কবিতা লিখে পরে ভাঁটির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন,—এমনটা নয়। বরঞ্চ মানুষের বহতা-জীবননদীর ঘোরা ফেরা, আবর্ত, জোয়ার, চরপড়া—সবটাই তাঁর কবিতায় ফুল ফুটিয়েছে দীপ জ্বালিয়েছে। অন্যদিকে, মার্কসবাদ বিষ্ণু দে-কে তত্ত্ববিশ্ব নির্মাণে সাহায্য করেছে বিচিত্রভাবে। তিনি কলাকৌশল বা টেকনিকের প্রগতিকে বিশ্বাস করেন—তাই জানেন টেকনিকের উৎস শেষ পর্যন্ত জীবন। মার্কসবাদ কিভাবে কবিতা লিখতে হয় তা শেখায় না। সে বিষয়ে টেকনোলজির অগ্রগতির ক্ষেত্রেও যেমন কবিতার ক্ষেত্রেও তেমন উত্তরাধিকারকে বাদ দেওয়া চলে না! তাঁর মার্কসবাদ তাঁকে জীবনের জল মাটি শিকড়ের সন্ধানে অক্লান্ত করে তোলে। কলোনির বাবুজীবনের জের-ধরা আমাদের এই ভাঙ্গাচোরা, বহুদিক থেকে প্রতিহত জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিষ্ণু দে প্রত্যক্ষ করেন রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক শুদ্ধতার একক প্রয়াসকে। মার্কসবাদই তাঁকে প্রেরণা দেয় এই প্রয়াসকে এক মহারূপক বলে পরিগণনা করতে। বিষ্ণুদে-র কবিতার চরিত্রপাত্র ট্র্যাজিক অপরাজেয়তায় বর্তমানের সমস্ত নৈরাশ্য, আঘাত, মনোভঙ্গের মাঝখানে পূর্ণতার আদর্শ খুঁজে পায় একদিকে ধ্রুপদী ও লোকায়ত সংস্কৃতির বহমানতায় এবং

---

১৩ অথচ তখনই এই সমস্ত কুৎসারটনাকে উপেক্ষা করে বিষ্ণু দে-র সাধনা এবং বোধি, প্রেম এবং প্রতীক্ষা একীভূত হয় একটি 'তুমি'-তে :

পরমাগতি! তোমার হাসি চোখে
হৃদয়ে নীল ঢেউ বলো কে রোখে
কুৎসা শুধু কুয়াসা হবে ভোর
ঊষায় যাবে অসহিষ্ণু ঘোর।...
তোমাকে আজ জানাতে দ্বিধা লাগে
বিজ্ঞ বলে কত কী মূঢ় রাগে।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের মতোই—প্রকৃতিতে : নিজের মুক্তি এবং কবিতার মুক্তি তখন তাঁর কাছে এক হয়ে যায়—

কবিতা কি শুধু ছাপার হরফে মেলে ?
কবিতার আদি রূপ কবিতার বাহিরে—
বাঁচাই কবিতা, রুদ্র সে অবহেলে
মৃত্যুকে মারে জঙ্গলে গ্রাম শহরে।

বিষ্ণু দে—মল্লারে ভেজা সবিতা ঈশাবাস্য দিবানিশা

বিশ্বরাজনীতি ও আধুনিক বাংলা কবিতায় তার প্রভাব

গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কবিতার ভাবগত পটভূমিতে বিশ্বরাজনীতি কতখানি ভূমিকা গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভেই রাজনীতি সম্পর্কে আমার অনুসৃত ধারণাটিকে স্পষ্ট ক'রে দেওয়া প্রয়োজন ; কারণ, 'বিশ্বরাজনীতি' অভিধাটি রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ প্রত্যয়েরই বিশেষিত প্রয়োগমাত্র।

প্রথমেই ব'লে নেওয়া দরকার যে, বর্তমান প্রবন্ধে 'রাজনীতি' এবং 'দেশাত্মবোধ' বা 'দেশপ্রেম'-কে সমীকৃতভাবে গ্রহণ করা হয় নি। জনৈক আধুনিক বিশেষজ্ঞের মতে, রাজনীতি হচ্ছে 'participation in the affairs of the state, its guidance, determination of the forms, aims, and the content of the activity of the state.' এক্ষেত্রে 'participation' ব্যাপারটিকে অবশ্যই তাত্ত্বিকভাবনা-মাত্রের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ক'রে না দেখাই বাঞ্ছনীয়। 'দেশপ্রেম' হচ্ছে, রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের জন্য, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনশক্তিকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া-শ্রেণীর তৈরি-করা একটা concept বা প্রত্যয়—যা পরিণামে দেশবিশেষের বাজারে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর একচ্ছত্র আধিপত্য রক্ষা করার পক্ষে একটা মস্তবড়ো রক্ষাকবচ। সুতরাং, কাব্য-সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব এবং দেশপ্রেমের প্রভাব অবশ্যই সমার্থবাচী নয়।

ধর্মীয় প্রভাবাচ্ছন্ন কৃষি-অর্থনীতি-সর্বস্ব মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রকে নিয়ে বিশেষভাবে ভাবনার এবং সেই ভাবনাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার কোন অবকাশ ছিল না। এবং সেই সময়ে সামাজিক অর্থনৈতিক কারণেই হয়তো তার কোনও প্রয়োজনই অনুভূত হয় নি। মুকুন্দরামের পর্যবেক্ষণশক্তি যতোই বস্তুনিষ্ঠ হোক না কেন, মোগল-রাজ-শক্তির আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের শোষণকারী অত্যাচারী রূপ শোষিত ও অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের দৃষ্টি নিয়ে যতোই নিবিড়ভাবে মুকুন্দরাম লক্ষ্য ক'রে থাকুন না কেন, সেদিন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না সর্বপ্রকার শোষণ ও অত্যাচারের পিছনে কারণ হিসেবে রাষ্ট্রশক্তির অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করার এবং তা থেকে মুক্তির অনিবার্য কারণ হিসেবে শোষিত ও অত্যাচারিত জনসাধারণ কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের প্রশ্নটিকে অনুভব করার।

মধ্যযুগে সামন্ত-প্রভুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আঞ্চলিকভাবে যে সমস্ত অভ্যুত্থান ঘটেছিল, সেগুলির সামনে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের কোন লক্ষ্য ছিল না। অর্থাৎ, সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ অত্যাচার ও শোষণ থেকে স্থায়ী ভাবে মুক্তিলাভের উপায় হিসেবে তখনও পর্যন্ত নিজের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিগ্রহণের তত্ত্বটিকে গ'ড়ে তুলতে পারে নি। এই তত্ত্বকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেন তাঁরাই যাঁরা

ব. বি. / বাংলা কবিতা : বিশ্লেষণ/৪৩-৪

ইউরোপে 'মার্কেণ্টাইল ক্যাপিটালিস্ট্' নামে অভিহিত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শেষ পর্যায়ে যখন উৎপাদন-ব্যবস্থার আপেক্ষিক উন্নতি এবং তারই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটলো, তখন উদ্বৃত্ত সামাজিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ যাঁদের হাতে ছিল তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা দাঁড়ালো, কি ক'রে সেই সামাজিক সম্পদকে দেশে বা বিদেশে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী নিয়োগ করা যায়। এরই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল সামাজিক মানবীয় শ্রমকে তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে ক্রয় করার স্বাধীনতা। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর নিয়ন্তা যাঁরা ছিলেন সেই সব রাজা ও সামন্তপ্রভু এবং তাঁদের সহায়ক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এই নবোদ্ভূত বাণিজ্যিক পুঁজিপতিদের ইচ্ছার বিরোধী শক্তি হিসেবে কাজ করছিল ব'লে নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই তাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের হাতে গ্রহণ করার কথা ভাবলেন। আর, সেই ভাবনাকে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে রূপায়িত করার তাগিদে, তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার ব্যাপারে জনগণের গুরুত্বকে তাঁদের মেনে নিতে হ'লো। ফলে, উদ্ভূত হ'লো সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শ। পরিণামস্বরূপ, কিছুটা আগে বা পরে, ইউরোপের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে সংঘটিত হ'লো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

রাষ্ট্রক্ষমতায় নবপ্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া শ্রেণী পুঁজির বিকাশের সমস্ত বন্ধনগুলিকে মোচন করতে গিয়ে, যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রয়োজনে, সামাজিক মানবীয় শ্রম ক্রয় করার জন্য ব্যক্তির শ্রম-বিক্রয়ের স্বাধীন পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্যক্তিমানসে এর প্রতিক্রিয়া হ'লো অভাবনীয়—যার সর্বাত্মক প্রকাশ ঘটলো রেনেসাঁসে। কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেলো ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা। কবিতার নূতন সংজ্ঞা দাঁড়ালো—কবিতা হচ্ছে কবির নিজের কথা। আবার, রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ন্ত্রণের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বুর্জোয়া শ্রেণী জনগণের সামনে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রাদর্শ তুলে ধরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করলো জাতীয়তা-বোধ এবং -বাদের আদর্শ। ফলে, কাব্য-সাহিত্যে দেশাত্মবোধের অনুপ্রবেশ ঘটলো। কিন্তু, সেই সঙ্গে আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটলো।

জাতীয়ক্ষেত্রে, বুর্জোয়া শ্রেণী পণ্যকেন্দ্রিক উৎপাদনের প্রয়োজনে উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতির দিকে উত্তরোত্তর অধিকতর মনোনিবেশ করায়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপারে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটতে থাকলো। পরিণামস্বরূপ, উৎপাদন-ব্যবস্থা আপেক্ষিকভাবে এতখানি উন্নতিলাভ করলো যে, উৎপাদিত পণ্য জাতীয়-বাজারের বুর্জোয়া-অর্থনীতি-সম্মত চাহিদা মিটিয়েও উদ্বৃত্ত হ'তে শুরু করলো। ফলে, নূতন বাজার অনুসন্ধানের তাগিদে বুর্জোয়া অর্থনীতি জাতীয় রাষ্ট্রের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত হ'লো। জাতীয় ক্ষেত্রে যা ছিল পুঁজিবাদ, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঔপনিবেশিক বাজার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা পরিণত হ'তে চললো সাম্রাজ্যবাদে। যান্ত্রিক উন্নতির ফলে সংঘটিত শিল্পবিপ্লব এই প্রবণতাকে অধিকতর ত্বরান্বিত করলো। বাজার দখলের জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর এই প্রয়াস জাতীয় রাষ্ট্রপরিচালনা তথা রাজনীতির ক্ষেত্রকে বিশ্বরাজনীতির স্তরে উন্নীত করলো। ফলতঃই, একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার তত্ত্ব অন্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে লাগলো। সেই সঙ্গে বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও ভাবধারার ক্ষেত্রে একটা স্ববিরোধিতাও ধরা পড়লো। শাসন

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রেণীস্বার্থের প্রয়োজনে স্বদেশে যেখানে সর্বজনীন মানবতার আদর্শভিত্তিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে রক্ষা করতে লাগলো, সেখানে তদধিকৃত উপনিবেশগুলিতে সেই মূল্যবোধকে ধূলিসাৎ করতে দ্বিধাবোধ করলো না।

আবার, বিশ্বরাজনীতির পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাজারের স্বার্থে বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ প্রকট হয়ে উঠছে। জার্মানী, ইতালী, জাপান প্রভৃতি যে-সমস্ত রাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত বিলম্বে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছে, তারা যখন আন্তর্জাতিক বাজারের সন্ধানে বেরুলো তখন পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের উপনিবেশগুলি মোটামুটিভাবে ভাগাভাগি হয়ে গেছে বৃটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। কিন্তু, এই বাজার দখলের দৌড়ে যারা পিছনে প'ড়ে গেল, বুর্জোয়া অর্থনীতির নিয়মে,-বাজার তো তাদেরও দরকার। না হ'লে, স্বদেশে তাদেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই বাজার দখলের জন্য প্রতিযোগিতা বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ সঙ্কট ঘনিয়ে তুললো। ক্ষমতার লড়াই দুই যুযুধান রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টির সম্ভাবনাকে প্রসারিত করলো। এর পরিণামস্বরূপ, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী স্বদেশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যে-জাতীয়তাবোধের তত্ত্বকে তুলে ধরলো তা আন্তর্জাতিক বাজার দখলের স্বার্থে সর্বভূমিক মানবতার তত্ত্বকে কার্যতঃ অস্বীকার ক'রে উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দিল।

ইতিমধ্যে, বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে ১৯ শতকের মাঝামাঝি। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক্স মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক শোষিত শ্রেণীর প্রকৃত মুক্তির পথ নির্দেশ করলেন। বললেন, বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার ব্যাপারে গণতন্ত্রের কথা আদর্শগতভাবে বললেও, তাদের গণতন্ত্রে শোষিতশ্রেণীর শোষণ থেকে মুক্তি কোনদিনও সম্ভব হবে না। একমাত্র শোষণ-মুক্ত শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে তোলার মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হ'তে পারে। আর তা করতে হ'লে শ্রমজীবী মানুষদের নিজের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে। ফলে, বিশ্বরাজনীতির গতি কোন্ দিকে সে-সম্পর্কে মার্ক্সবাদ এইভাবে একটা নূতন পথ-নির্দেশ করলো। মার্ক্স সেই সঙ্গে এ-ও দেখালেন যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণী তত্ত্বগতভাবে সর্বজনীন মানবতার কথা বললেও পরিণামে ঐ ব্যবস্থা মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদকেই প্রকট ক'রে তোলে। ফলে, বুর্জোয়া সাংস্কৃতির মানসিকতায় দেখা দেয় বিচ্ছিন্নতাবোধ বা alienation। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে লেনিন দেখালেন যে, পুঁজিবাদ তার বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদে উন্নীত হয়েছে। ফলতঃই পুঁজিবাদ তার বিকাশের প্রথম স্তরে যে-মানসিক পরিমণ্ডল রচনা করেছিল সেক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন দেখা দিল। ব্যক্তির আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ পরিণত হ'লো আত্মকেন্দ্রিকতায়। বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের যুগে ব্যক্তিমানসের এই আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতাবোধকে সযত্নে লালিত করতে লাগলো তাত্ত্বিক রক্ষাকবচ দিয়ে এই কারণে যে, এই মানসিকতা সার্বিক ঐক্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ভাবজগতের এক সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র। István Mészáros তাঁর "Marx's Theory of Alienation" গ্রন্থে এই ব্যাপারটাকেই পরিস্ফুট করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন ; "The idealization of individual autonomy, carried

to its extreme, leads inevitably not only to the acceptance of inactivity but also to conferring on it the highest moral praise." [p. 262]

অতঃপর, এই পটভূমিকাটি সামনে রেখে আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আসা যাক। বর্তমান আলোচনাচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা কবিদের মধ্যে যাঁরা আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, জন্মকালের বিচারে তাঁরা প্রায় সকলেই মোটামুটি-ভাবে বর্তমান শতকের প্রথম দশকেই আবির্ভূত হয়েছেন। এবং কবি হিসেবে তাঁদের আবির্ভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে। সুতরাং স্বভাবতঃই বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কিত আলোচনাটি একটি বিশেষ কালসীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। বর্তমান আলোচনার কালপরিধি দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়।

ব্যাপক অর্থে 'আধুনিক' অভিধাটি বাংলা কবিতা প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি থেকে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। কিন্তু, আধুনিকতার যে সমস্ত লক্ষণ ঐ যুগের কবিতায় দেখা যায় তা থেকে আলোচ্য পর্বের লক্ষণ পৃথক্। ঐ যুগের কবিতার ভাবলোক সৃষ্ট হয়েছিল এদেশের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার ওপর বুর্জোয়া রাষ্ট্র ইংলণ্ডের উপনিবেশে নবাগত বুর্জোয়া ভাবধারার আঘাতের ফলে। স্বভাবতঃই ঐ যুগের কবিতায় আমরা দেখতে পাই নবলব্ধ স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ এবং ব্যক্তিসত্তার আত্মস্বাতন্ত্র্য-উপলব্ধিজনিত আনন্দের অভিব্যক্তি। তাই স্বদেশের ঐতিহ্য, স্বদেশের প্রকৃতি ইত্যাদির গৌরবায়ন অনিবার্যভাবেই ঐ সময়ের কবিতার ভাবলোকে স্থান পেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, বাংলা কবিতায় কমবেশি তারও প্রতিফলন দেখা গেছে। কিন্তু, সুস্পষ্টভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার রাজনৈতিক প্রকাশ আধুনিক বাংলা কবিতায় দেখা গেল প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই। আলোচ্য পর্বে লেখা রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতায় তাঁর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বাদ দিলে বর্তমান আলোচনাচক্রের অন্তর্ভুক্ত কবিদের সকলেই পাঠ-সূত্রে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইংরেজির মাধ্যমে তাঁরা যেহেতু আন্তর্জাতিক ভাবজীবনের সান্নিধ্যে এসেছেন, সেইহেতু, প্রত্যাশা করা অনুচিত বা অযৌক্তিক হবে না যে, ভাবজীবনের অঙ্গ রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন তাঁদের কাব্যে থাকবে এবং তার চরিত্রটিও হবে আন্তর্জাতিক। কিন্তু, সেই সঙ্গে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে একথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তিমনের গঠনে তারতম্য থাকায় একই ঘটনার প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন-ভাবে দেখা দেয়। আধুনিক যুগের শিল্প-সাহিত্য-বিচারকালে শিল্পী মনের এই ব্যক্তিধর্ম যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সে-সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে Herbert Read তাঁর 'The Philosophy of Modern Art' গ্রন্থে বলেছেন, 'psychological characteristics are stronger than period characteristics'. [p. 84]। যেহেতু, আলোচ্য পর্বের কবি-ষষ্ঠকের কাব্যজীবনের অব্যবহিত পূর্বে সংঘটিত হয়েছে বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা প্রথম

বিশ্বযুদ্ধ, সেইহেতু, ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখেই তাঁদের কাব্যে বিশ্ব-রাজনীতির প্রভাব কিভাবে এবং কতখানি পড়েছে তা বিচার করা হচ্ছে।

দুই

কবি-ষষ্ঠকের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হচ্ছেন জীবনানন্দ—তাঁর জন্ম ১৮৯৯ সালে। এবং বয়োকনিষ্ঠ হচ্ছেন বিষ্ণু দে—তাঁর জন্ম ১৯০৯ সালে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অমিয় চক্রবর্তী দুজনেই জন্মেছেন ১৯০১-এ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯০৪-এ এবং বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮-এ। জীবনানন্দের সঙ্গে একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করেছেন নজরুল এবং তাঁরও কবিজীবনের সূত্রপাত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই। কিন্তু, যেহেতু, তাঁকে আধুনিক কবি-পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি বা হয় না, সেইহেতু বর্তমান আলোচনায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করাই হয়তো বাঞ্ছনীয় ছিল। তবে, বিশ্বরাজনীতি ও আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নজরুল সম্পর্কে একেবারেই কিছু উল্লেখ না করা অনৈতি-হাসিক হবে ব'লে মনে করি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয়েছে তখন জীবনানন্দ ও নজরুল দুজনেই ১৯ বছরের তরুণ যুবক। যে-যুদ্ধে এক কোটির মত মানুষ প্রাণ হারালো এবং দু-কোটির ওপর মানুষ পঙ্গু হয়ে গেল, তার ভয়াবহ স্বরূপ লক্ষ্য ও উপলব্ধি করার বয়স যে দুজনেরই হয়েছিল তা ধরে নেওয়া যায়। সেই ভয়াবহ স্মৃতি জীবনানন্দের মধ্যে কাজ করেছিল ব'লেই তাঁর সমসাময়িক কালচেতনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বিশ্বরাজনীতির এক ভয়ঙ্কর অস্থিরতা :

মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবে না সময় :
সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী। (শ্যামলী : বনলতা সেন)

কিন্তু, এই রক্তপিপাসু সময়ের ঠিক কোন্ আকাঙ্ক্ষার ফলে যে 'এত রক্ত নদী' প্রবহমান তা সঠিকভাবে কবি ধরতে পারেন নি। কারণ, যে-বস্তুনিষ্ঠ রাজনৈতিক সচেতনতা থাকলে তা ধরা সম্ভবপর হতো তা ছিল জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতির বহির্ভূত। মানুষকে—জীবনকে—নিজের ধারণামতো ভালবাসতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, এটুকু উপলব্ধি করেছিলেন যে, সর্বভূমিক মানবসমাজে আত্মীয় হননের ইচ্ছাতাড়িত আধুনিক যুগের কুরুক্ষেত্রের শ্মশানে বোধ করি তা আজ সম্ভব নয় :

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মত
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে ;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন··· (সুচেতনা : বনলতা সেন)

জীবনানন্দ মহাযুদ্ধের মহামারীতে আক্রান্ত 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ'-কে মানব-প্রেমিকতার প্রগাঢ় সহানুভূতি দিয়ে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি ক'রে বেদনাহত হয়েছেন। কিন্তু, তাই বলে একথা মনে করা কখনোই সমীচীন হবে না যে, তিনি পৃথিবীর এই

'গভীরতর অসুখ'-কেই চরম পরিণামরূপে স্বীকার ক'রে নিয়ে নৈরাশ্যবাদী হয়েছেন। যুদ্ধবাজদের যে বীভৎস কার্যকলাপ পৃথিবীকে অসুস্থ করেছে—পৃথিবীর মানুষের জীবনে স্থিরতা আসতে দিচ্ছে না, তার পিছনে সাম্রাজ্যবাদীর অর্থনৈতিক স্বার্থকে রাজনীতি-সচেতন মানসিকতা দিয়ে ধরতে না পারলেও, তাঁর অন্তর্নিহিত বিশ্বমানবপ্রেমিকতার জন্য তিনি এটুকু অন্ততঃ ধরতে পেরেছিলেন যে, এক ভয়ঙ্কর অশুভ শক্তি 'এশিয়ার আকাশে আকাশে' শাকুনিক বীভৎসতা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, এতৎসত্ত্বেও তিনি অনুভব করতে ভোলেননি যে, 'তবু জীবন অগাধ' এবং সেই কারণেই বোধ হয় নূতন যুগের পদধ্বনিও শুনতে পেয়েছেন :

নতুন আকাঙ্ক্ষা আসে—চ'লে আসে নতুন সময়,—
পুরানো সে নক্ষত্রের দিন শেষ হয়,
নতুনেরা আসিতেছে ব'লে ! (নির্জন স্বাক্ষর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ অস্তিত্ব-সংকটের মধ্যে মার্ক্সবাদকে কেন্দ্র ক'রে যে-রাজনৈতিক চেতনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করলো এবং সাধারণ মানুষের জীবনচেতনায় নূতন আশার সঞ্চার করলো, তা যে ১৯।২০ বছরের তরুণের শিক্ষিত মন উপলব্ধি করেনি একথা বোধ হয় জোর ক'রে বলা যায় না। সম্ভবত: উপলব্ধি করেছিলেন ব'লেই মাঝে মধ্যে যে-আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন সে-আকাশে চকিতেব মতো দেখেছেন

কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
জেগে ওঠে— (সহজ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

স্পষ্টই বোঝা যায়, কবি যে-স্মৃতিলোক মন্থন ক'রে বিশেষ উপমানটি আহরণ করেছেন সেখানে শ্রমজীবী মানুষের জীবন-সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ারটি প্রতীকোচিত মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু, এতখানি এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, 'নতুনেরা আসিতেছে ব'লে' 'নতুন সময়ে'-এর আকাশে 'কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ-কে' জেগে উঠতে দেখলেও, জীবনানন্দ এই অসুস্থ পৃথিবীতে সুস্থতা ফিরে আসার অথবা তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো প্রত্যয়-বলিষ্ঠ সম্ভাবনা যেন দেখেও দেখতে পেলেন না। নূতন সময়ে নূতন আকাঙ্ক্ষা সারা বিশ্বে যে-এক নূতন পৃথিবীকে গ'ড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে, তাতে যেন তিনি ঠিকমতো আস্থা রাখতে পারলেন না। অবশ্য বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার সৃষ্ট নাগরিক বিচ্ছিন্নতাবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন যে-কবি, তাঁর পক্ষে, এই অবস্থায়—পৃথিবীর গভীরতর অসুখের সময়—আর কি-ই বা থাকতে পারে এই ঘোষণা ছাড়া—

পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নাই,—
রোধ-অবরোধ-ক্লেশ-কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময়,—
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে,—
কোথায় নতুন ক'রে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয় !
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের রং
দামামা থামিয়ে ফেল,—পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক রাজ্য
আর সাম্রাজ্যের সং।
(অবসরের গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

বুঝতে পারা যায়, বিশ্বরাজনীতির গতিপ্রকৃতি কবিকে নৈরাজ্যবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর, তা ঘটেছে এই কারণেই যে, জীবনানন্দ নাগরিক ব্যক্তি-জীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধকে মেনে নিয়েই সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজেছেন এবং সামাজিক জীবনপ্রবাহের অগাধ সম্ভাবনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত ক'রে বিচ্ছিন্নতাবোধকে কাটিয়ে ওঠার মানসিকতাও তাঁর ছিল না। তাই, 'পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে' রাজ্য আর সাম্রাজ্যের অন্তহীন বিলুপ্তির পর আর কিছুই থাকে না—থাকে শুধু অন্ধকার—নিবিড় নীরন্ধ্র অন্ধকার—যে-অন্ধকারে আমাদের দৃষ্টি হয় অবরুদ্ধ, কিন্তু কবির মগ্নচৈতন্যে নেমে আসে এক মৃত্যুর শান্তি। এই প্রসঙ্গে ইলিয়টের কথা মনে না প'ড়ে উপায় নেই। জীবনানন্দের মতোই ইলিয়টও সমসাময়িক কালের পৃথিবীকে অসুস্থ ব'লে মনে করেছিলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল 'a patient etherised upon a table'-এর কথা। পৃথিবীর এই অসুস্থতার আক্রমণ থেকে অব্যাহতির জন্য তিনি প্রাচীন গীর্জার স্নিগ্ধ ছায়ায় ব'সে উপনিষদের পাতা উল্টেছেন। কিন্তু, জীবনানন্দ অনুরূপ কোনো অধ্যাত্মলোকের ছায়া-স্নিগ্ধ আশ্রয়ের ওপরেও আস্থা রাখতে পারেন নি। নাটোরের বনলতা সেনের দুচোখে নিবিড় শান্তির স্থায়ী আশ্রয় খুঁজতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। স্থায়ী শান্তি সেখানে তিনি পান নি—পেয়েছিলেন মাত্র দুদণ্ডের সাময়িকতা। এই অসুস্থ পৃথিবীতে একক জীবনে একটু সুখ, একটু শান্তির আশায় হাজার বছর ধ'রে ক্লান্ত পথ-পরিক্রমার শেষে এসে পৌঁছলেন তিনি এক বাংলায়—তাঁর 'রূপসী বাংলা'-য়, যার পল্লী-সৌন্দর্যের মধ্যেই হয়তো তাঁর সেই না-পাওয়া শান্তির স্নিগ্ধতা বিরাজ করছে ব'লে তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু, শেষে সেই মোহেরও অবসান ঘটলো—বুঝলেন, এই অসুস্থ পৃথিবীতে মৃত্যুতেই বোধহয় শান্তি আছে :

> পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে
> ধানসিঁড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব ব'য়ে···
>
> (রূপসী বাংলা)।

শ্মশানের দিকে প্রবহমান এই কবি-আত্মার মৃত্যু চেতনায় আত্মহনন-জনিত নিহতের মৃত্যুর সেই ভয়াবহতা নেই, যে-ভয়াবহতার অনুভূতি কবিচিত্তে প্রতিভাত করেছিল 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ'-টিকে। এই মৃত্যু কবির মগ্নচৈতন্যে আত্মদর্শন-সঞ্জাত এক নিগূঢ় দার্শনিকতার মহিমায় সমাবৃত 'জননান্তরসৌহৃদানি'-সৌন্দর্যলোকের ভিত্তি-স্বরূপ :

> যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে র'ব—অন্ধকারে নক্ষত্রের নিচে
> কাঁঠাল গাছের তলে হয়তো বা ধলেশ্বরী চিলাইয়ের পাশে—
> দিনমানে কোনো মুখ হয়তো সে শ্মশানের কাছে নাহি আসে—
> তবুও কাঁঠাল জাম বাংলার—তাহাদের ছায়া যে পড়িছে
> আমার বুকের 'পরে—আমার মুখের 'পরে নীরবে ঝরিছে
> খয়েরী অশথপাতা—বঁইচি শেয়ালকাঁটা আমার এ দেহ ভালোবাসে,
> নিবিড় হয়েছে তাই আমার চিতার ছাইয়ে—বাংলার ঘাসে
> গভীর ঘাসের গুচ্ছে র'য়েছি ঘুমায়ে আমি,— (রূপসী বাংলা)।

পৃথিবীর গভীর অসুখ থেকে মুক্তির তাড়নায় জীবনানন্দ গভীর ঘাসের গুচ্ছে এইভাবে

ঘুমিয়ে থাকার শক্তি অর্জন করেছিলেন ব'লেই, বিশ্বরাজনীতির আর কোনো ঘটনাই তাঁকে নাড়া দিতে পারে নি।

পক্ষান্তরে, নজরুল সম্ভবতঃ বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি আধুনিক নাগরিক জীবন-পরিবেশের বাইরে থাকার জন্যই নাগরিক ব্যক্তিজীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার হন নি। ফলে, তাঁর ব্যক্তিসত্তা নিজেকে সামূহিক মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখারও কোন প্রয়োজন বোধ করে নি। উপরন্তু, বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে তিনি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-সঞ্জাত ধ্বংসের রূপটিকেই একমাত্র চরম সত্য ব'লে মনে করেন নি। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ধ্বংসের মধ্যেও যে-আশার আলো জ্বেলে দিয়েছিল নজরুল তা লক্ষ্য করেছিলেন। বুঝেছিলেন, বুর্জোয়া সভ্যতার সৃষ্ট সামাজিক অসুস্থতার মূলটা কোথায় এবং তা থেকে মুক্তির উপায়ই বা কি। তাই, তাঁর কাব্যে একদিকে যেমন শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সোচ্চার ঘোষণা শোনা যায়, তেমনি অন্যদিকে, শোষণ-মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শোষিত মানুষের সামূহিক সংঘশক্তির বলিষ্ঠ স্বীকৃতিও সুস্পষ্ট। তাছাড়াও, যেহেতু এই যুগটি হচ্ছে বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের যুগ, সেইহেতু ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ঘটনাবলী থেকেও তিনি চোখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন নি। এই জন্যই, তুরস্কে কামালপাশার নেতৃত্বে নূতন তুর্কি গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য যে সংগ্রাম শুরু করলো তা নজরুলকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং তাঁরই কবিতায় সর্বপ্রথম এই আন্তর্জাতিক ঘটনার এক আবেগ-সমুত্থ প্রতিফলনও ঘটলো।

তিন

জীবনানন্দ ও নজরুলের চেয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তী দু-বছরের ছোট হ'লেও, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন তাঁরা দু-জনেই সতেরো বছরের তরুণ। সুতরাং, এই যুদ্ধের ভয়াবহতাকে উপলব্ধি করার বয়স তাঁদেরও হয়েছিল ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে! এই যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতির পটভূমিকায় তাঁদের পক্ষেও সম-সাময়িক যুগ-জীবনকে লক্ষ্য করা স্বাভাবিক। তাই, বিশ্বরাজনীতির যে-প্রবণতা বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি করলো তারই স্মৃতি থেকে সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন :

অমরত্ব মিথ্যা কথা, মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ঞের লড়াই
অক্ষয় শ্রুতির মধ্যে রবে না সঞ্চিত।
আসে মৃত্যু ব্রহ্মাণ্ডবাঞ্ছিত,
আসে মৃত্যু নীলকণ্ঠ, আসে মৃত্যু রুদ্র মহাকাল,
নিষ্পেষিত মানুষের শোণিতে গুলাল
চরণে অলক্তরেখা আঁকি। (প্রলাপ : অর্কেস্ট্রা)

বুর্জোয়া শোষণে নিষ্পেষিত মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের

পর মার্ক্স-নির্দেশিত পথেই যে মানবাত্মার সুনিশ্চিত মুক্তির নিশানা খুঁজে পেয়েছিল এই সত্যটা সুধীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, শুনেছিলেন আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ তাদের মিলিত পদধ্বনির রণদামামা :

অমৃতের উদাত্ত মাভৈ
নির্বিদ আহ্বানে যার প্রতিধ্বনি তোলে অবিরত,
সে আসে না, নব অনুরাগিণীর মতো,
নম্র নেত্রে, রক্ত মুখে, সন্তর্পণে সংবরি কিঙ্কিণী ;
নিঃশঙ্কিণী,
জনারণ্য উন্মথি, সে চলে,
আস্ফালি উদ্ধত অসি, নির্জিতের মুণ্ডমালা গলে,
নির্মল নগ্নতাখানি বর্মসম পরি।
... ...
সে আসে না, ভিক্ষুকের প্রায়,
উচ্ছিষ্ট প্রেমের কণা আহরিতে অধম ক্ষুধায় ,
সে আসে না স্তব্ধ অন্ধকারে,
সামান্য চোরের মতো, অজানার গুপ্ত অভিসারে।
বিজয়ীর বেশে
সশস্ত্র ভাণ্ডারে পশি, আপনার দক্ষিণা কাড়ে সে ॥

তারই তরে
উৎসুক প্রত্যাশা মোর দিকে দিগন্তরে— (কস্মৈ দেবায় : অর্কেস্ট্রা)

সেই সময়ে ক্ষণিকের জন্য কবির ইচ্ছা হয়েছিল ঐ মিলিত পদধ্বনির দৃপ্ততার সঙ্গে ; নিজেরও পদধ্বনি মেলাবার। তাই প্রেয়সীর কাছে কবির সুস্পষ্ট ঘোষণা :

তবুও নিশ্চয়
আমার উদ্যত অর্ঘ্য, প্রেয়সী, তোমার তরে নয় ॥
(কস্মৈ দেবায় : অর্কেস্ট্রা)

কিন্তু তথাপি, যেহেতু নিজের অজ্ঞাতসারেই বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার তিনিও হয়েছিলেন, সেইহেতু, আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও, সেই বিপ্লবে নিজের ভূমিকার ব্যাপারে আত্মক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন :

আমার অক্ষম বুদ্ধি দিবস-রজনী
শুনেছে অন্তরপথে বিপ্লবের নিত্য পদধ্বনি ;
জানে আপনার দৈন্য। (দৈন্য : অর্কেস্ট্রা)

তবে, সুধীন্দ্রনাথের কবিভাবনার আন্তরিকতা এইখানেই যে, নিজের এই দৈন্যবোধকে দার্শনিকতার আবরণ দিয়ে মহিমান্বিত ক'রে তুলতে চান নি—অকপটেই তাকে বস্তু-নিষ্ঠভাবে গ্রহণ করেছেন এবং ক্লান্তি অনুভব করেছেন। এই ক্লান্তি থেকে অব্যাহতির পথও তিনি খুঁজেছেন, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক চেতনার সীমাবদ্ধতার জন্য সেই পথ তিনি খুঁজে পান নি। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সুস্থ সমাজ যে গ'ড়েই উঠবে এমন কোন

সম্ভাবনার ওপর তিনি আস্থা রাখতে পারলেন না। ফলে, সুধীন্দ্রনাথ জীবনে সুস্থ-সুন্দর ভবিষ্যতের ওপর যেমন একদিকে আস্থা হারিয়ে ফেললেন, তেমনি আবার অন্যদিকে তাঁর বস্তুনিষ্ঠতার জন্য অতীতের স্বপ্ন-স্বর্গেও আস্থা রাখতে পারলেন না :

ক্লান্ত আমি ; অব্যাহতি দাও।
আলেয়ার ডাকে
দুর্লভ যৌবন মোর বুদ্ধ আজ পঙ্কের বিপাকে ;
মুছেছে আমার ভবিষ্যৎ.
অতীতের পথ
অবলুপ্ত বিনষ্ট স্বর্গের ধ্বংসস্তূপে ;
চুপে চুপে
ছেড়ে গেছে অন্তর্যামী অরাজক অন্তর আমার ;
আশা নাই, ভাষা নাই, কেবল ধিক্কার
রিক্ত মর্মে মাথা কুটে মরে। (বিস্মরণী : অর্কেস্ট্রা)

এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা দরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালের ভয়াবহ বেকারত্ব এবং ১৯২৯-৩৩-এর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের কথা। আন্তর্জাতিক এই পরিস্থিতি তৎকালে বিশ্বের তরুণ-মনে যে-ভয়াবহ শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল এখানে যেন তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, এই অবস্থা থেকে অব্যাহতির উপায় কি ? যাঁরা মানসিক গঠনের দিক থেকে একান্তভাবেই introvert, তাঁরা শম্বুকবৃত্তি অনুসরণ ক'রে নিজেদের চারপাশে আত্মকেন্দ্রিক ভাবলোকের একটা কঠিন আবরণ-সৃষ্টির মাধ্যমে যে-ভাবে অব্যাহতি পেতে চেয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ সেটাকেও মেনে নিতে পারেন নি :

অসহ্য লাগে ও আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ? (উটপাখী : ক্রন্দসী)

সুধীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির এই বস্তুনিষ্ঠ বহির্মুখীনতার জন্যই বিচ্ছিন্নতাবোধপ্রসূত একান্ত অন্তর্মুখীন আত্মকেন্দ্রিকতা তাঁর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এবং এই কারণেই বিশ্বরাজনীতির অনেক ঘটনাই তিনি সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের চেয়ে অনেক বেশি লক্ষ্য করেছিলেন। তাই, ১৯২৯-এ বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে এবং তার উপনিবেশগুলিতেও যে-অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল তার রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে তাঁর দেরি হয় নি :

সে-পাড়া-জুড়নো বুলবুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে ঊনতিরিশে॥ (উটপাখী : ক্রন্দসী)

বিশ্বরাজনীতির একটা গভীর প্রভাব সুধীন্দ্রনাথের ওপর পড়েছিল ব'লেই তিনিও যখন আকাশের চাঁদের দিকে তাকান তখন জীবনানন্দের মতোই তাঁরও মনে হয়— 'আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ'। কিন্তু, উভয় কবির মানসিক গঠনের মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল ব'লেই জীবনানন্দ যেখানে এসে থেমে গিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ সেইখানেই থেমে থাকতে পারেন নি। এ যুগের কাস্তেটাই তাঁর কাছে চাঁদ হয়ে গেছে। এ-যুগ আকাশের চাঁদের মধ্যে আর রোমান্টিক কল্পলোকের সৌন্দর্যকে অনুভব করার প্রয়োজন বোধ করে না, শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রামের হাতিয়ারের মধ্যেই সে নূতন এক

সৌন্দর্যকে খুঁজে পেয়েছে। মার্ক্সবাদী দর্শন ও রাজনীতি বুর্জোয়াদের দ্বারা বিনষ্ট-স্বপ্ন এই জগতে যে সর্বায়ত সুন্দর জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার মূল অবলম্বন শ্রমজীবী মানুষ—প্রোলেতারিয়েত। কাস্তে আর হাতুড়ি তারই প্রতীক। সম্ভবতঃ এই প্রত্যয়ই সুধীন্দ্রনাথের কবি-ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে। একটা বিশ্বযুদ্ধের পরে আর একটা বিশ্বযুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয়েছে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সূর্য বোধ হয় এবার অস্তমিত হ'তে চলেছে, আর সেই সঙ্গে আকাশে ঘটছে এক নূতন চাঁদের আবির্ভাব :

ছাই হয়ে গেছে প্রতীকী স্বর্ণলঙ্কা
নির্বাণ সূর্যাস্তে।
হঠাৎ হাওয়ায় হাতুড়ির প্রতিবাদ :
এ যুগের চাঁদ কাস্তে।...
শুষ্ক ক্ষীরোদ সাগরে মগ্ন বিষ্ণু ;
নরপিশাচেরা পৃথিবীতে আজ জিষ্ণু ;
চিনেও চেনে না স্বালম্বী অসহিষ্ণু
সমবায়ী অপরান্তে!
খণ্ডাবে কবে অমৃতের অপরাধ
কালপুরুষের কাস্তে? (কাস্তে : সংবর্ত)

তথাপি, বস্তুনিষ্ঠতার দিকে একটা দার্শনিক ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও, যেহেতু সুধীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, সেইহেতু তাঁর একক ব্যক্তিসত্তার 'নিষ্প্রতিকার ধৈর্যের পাকা বাঁধ বাধা দেয়' তাঁকে 'বানে ভাসতে'—বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের নূতন জীবন-গড়ার আন্দোলনের বানে। এর আর একটা কারণ, সম্ভবতঃ ভারতের তৎকালীন জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিল। আলোচ্য পর্বে ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগসূত্রে মার্ক্সবাদী আন্দোলনও যুক্ত হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ সে-আন্দোলনকে যে-দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করেছিলেন তা, বোধ হয়, তাঁর সামনে কোন আশার আলো তুলে ধরতে পারে নি। ফলে জীবনটা তাঁর কাছে যেন অধিকতর দুর্বিষহ ব'লে মনে হয়েছে :

সহে না সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালি।
প্রণয়ের মমত্ব বন্ধনে,
পতঙ্গের সাম্যবাদে, কৃপাজীবী ক্লীবের ক্রন্দনে,
হে ভৈরব, জীবন দুঃসহ। (প্রত্যাখ্যান : ক্রন্দসী)

ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর এইরকম মানসিকতাই সম্ভবতঃ তাঁকে কমিনটার্ণ থেকে বহিষ্কৃত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কাছাকাছি এনে দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু, তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, সুধীন্দ্রনাথের মানসিক গঠন এমনই ছিল, যার ফলে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতো না। অবশ্য, সেই ঘটনাগুলিকে তিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিচার করতেন। আলোচ্যপর্বে, বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হ'লো এই যে, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর একদিকে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বামপন্থী আন্দোলন নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে শক্তিশালী হ'য়ে উঠলো,

তেমনি অন্যদিকে, পারস্পরিক বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী নিজস্ব শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার তাগিদে সেই সমস্ত আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার জন্যও সচেষ্ট হ'লো। ১৯৩৬-এ ফ্রান্সের পার্লামেন্টারি নির্বাচনে বামপন্থী প্রভাবিত পপুলার ফ্রণ্ট জয়যুক্ত হ'লো। ঐ একই বছরে স্পেনেও পপুলার ফ্রণ্ট নির্বাচনে জিতলো। চীনেও সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে প্রতিহত করবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে একটা বিপ্লবী জাতীয় মোর্চা গ'ড়ে উঠলো। বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও, তাদের শ্রেণীস্বার্থ-বিরোধী বামপন্থী আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার ব্যাপারে স্পেনের ক্ষেত্রে তারা অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধতার নিদর্শন দেখালো: 'During the summer of 1936 the Spanish reactionaries under General Franco staged an armed revolt against the lawful Popular Front Government. The revolt developed into a civil war in which the German and Italian fascists lost no time in intervening on the side of the rebels, whom they supplied with tanks, planes and warships, in addition to sending sizable expeditionary forces...the Governments of the Western powers, and the League of Nations which was to all intents and purposes under their control, did not lift a finger to aid the Spanish people in the desperate battle they were waging against their foes, domestic and external. A Non-Intervention Committee was set up under Anglo-French sponsorship, but the Committee soon became virtually a screen behind which Germany and Italy continued, unimpeded, their intervention against the Spanish Republic.

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এই সব আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনার সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষণীয়:

প্রচ্ছদে ওই ছায়াপাত করে কারা?
.. ..
বুঝি তারা শুধু কুজ্ঝটিকার চাতুরী:
তবু তুলনার ধন্ধ জাগায় মাথুরই;
প্রতীক-প্রতিম তাদের কাস্তে, হাতুড়ি
ফসল মুড়ায়, মানমন্দির পেষে।
... ...
কখনও কখনও মনে হয় যেন চিনি—
বিদ্যুতে লেখা হেন রূপরেখা
চীনে পটে বন্দিনী।
স্পেনেও হয়তো অমনই অঙ্গভঙ্গি
চিত্রাপিত অসংহতির সঙ্গী;

সেখানেও আজ নিভৃত বিলাস লক্ষ্মী,
পণে উপবনে পরদেশী অনীকিনী।
স্পেন থেকে চীন প্রদোষে বিলীন ;
অথচ তাদের চিনি॥ (নান্দীমুখ : সংবর্ত)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদী ও ফ্যাসিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি :

অন্তর্হিত আজ অন্তর্যামী :
বুষের রহসে লুপ্ত লেনিনের মামি,
হাতুড়ি-নিষ্পিষ্ট ট্রট্স্কি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন্,
মৃত স্পেন, ম্রিয়মাণ চীন,
কবন্ধ ফরাসী দেশ। সে এখনও বেঁচে আছে কিনা,
তা সুদ্ধ জানি না। (সংবর্ত)

চার

অমিয় চক্রবর্তী সুধীন্দ্রনাথের সমবয়সী হ'লেও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৮-এ। সময়টা তখন এমনই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনির কাছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি প্রায় ম্লান হ'য়ে গেছে বলা চলে। তাই, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় প্রথম-বিশ্বযুদ্ধকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আবর্তের প্রতিফলন সুলক্ষ্য নয়। এবং জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব, আংশিকভাবে সুধীন্দ্রনাথেরও, কবিতায় কবি-মানসের যে-বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রতিফলন দেখা যায় তাও এখানে দুর্লক্ষ্য। তাঁর কবিতায় ব্যক্তিভাবনার নিজস্বতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির অবজেক্টিভিটি বা তদ্গতি। ফলে, সেখানে বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাগুলি জাতীয় জীবন-নিরপেক্ষভাবে কোনও দূরবর্তী কোটিতে অবস্থান করে নি। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় বিশ্বরাজনীতির সঙ্গে স্বদেশী রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ওতঃপ্রোতঃভাবে যুক্ত হ'য়ে কবিভাবনাকে পরিচালিত করেছে। বিশ্বরাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত মানসিকতারই প্রতিফলন তাঁর কাব্যে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। বিশ্বরাজনীতিতে মার্ক্সবাদ যে-শ্রেণীবিভক্ত সামাজিক বিন্যাসের তত্ত্বটি তুলে ধরেছিল অমিয় চক্রবর্তী তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ভারতীয় সমাজ-বিন্যাসে তিনটি স্তরকে লক্ষ্য করেছেন। তিনি দেখেছেন, নিচের তলায় যাঁরা আছেন তাঁদের অন্ধকার জীবন স্বাধীনতাহীন, মধ্যবর্তী শ্রেণীর জীবনে কিছুটা আলো ও স্বাধীনতা থাকলেও পূর্ণ আলোক-প্রাপ্তির মুক্ত স্বাধীনতা সেখানে অনুপস্থিত। এই সমাজব্যবস্থায় পরিপূর্ণ মুক্তির মধ্যে বাস করছেন শুধু ওপরতলার মানুষেরাই—

নীচের তলায় বন্ধ তালা,
দোতলায় আলো আছে জ্বালা,
ছাতে বহু তারা। (বাড়ি : খসড়া)

এইসব মধ্যবর্তী-শ্রেণীর মানুষ, রাজনৈতিক পরিভাষায় যাঁরা পেটিবুর্জোয়া হিসেবে চিহ্নিত, তাঁরা আদর্শ বা তত্ত্বের দিক থেকে অনেকখানি এগিয়ে যেতে রাজি, কিন্তু সেই তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার দায়িত্ব থেকে তাঁরা নিজেদের দূরে রাখতে চান। বিশেষতঃ, আদর্শ বা তত্ত্বের জন্য বিপদের ঝুঁকি যেখানে রয়েছে সেখানে সেটাকেও বিসর্জন দিতে তাঁদের বাধে না। তাঁরা চান শুধু নিজেদের নিরাপত্তা। সেই নিরাপত্তাটিকে সর্বাগ্রে সুরক্ষিত ক'রে তারপর যতখানি প্রগতির পথে চলা যায় ঠিক ততখানিই তাঁরা চলবেন। মধ্যবর্তী-শ্রেণী থেকে আসা বুদ্ধিজীবী ও কবি-মানসের এই রূপটাই লক্ষ্য ক'রে অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন :

সাহিত্যিক সেজো মল্ল দল বেঁধে কবিতা লেখার,
ফেনানো উক্তির মঞ্চে বিশ্ববাক্য থাকে না বেকার ;
... ...
বিপদ যেখানে নেই, স্বাদেশিক : বদলে ফেলে কথা
গোরা দারোগাকে দেখে ব্যাখ্যা করে আন্তর্জাতিকতা।
... ...
মুগ্ধ আপন স্বার্থে, তৃপ্ত, তবু বুকে শূন্য জমে,
অশান্তি বিলোয়, খোঁজে অগভীর মনের উদ্যমে
নোঙর,
যে-কোনো নোঙর। (প্রাগতিক : একমুঠো)

বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি এই মধ্যবর্তী-শ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিকতা তাকে অন্যের জীবন তথা জাতীয় ভবিষ্যৎ-ভাবনা সম্পর্কে যে কতখানি নির্লিপ্ত ক'রে তুলেছে তাও কবি লক্ষ্য করতে ভোলেন নি :

অন্যে বাঁচুক মরুক, দেশটা জ্বলুক পুড়ুক যা হোক
যুগটা কেন হ'লো না তাঁর বাবুয়ানির বাহক—
(কচুরিপানা : মাটির দেয়াল)

কিন্তু, কবি হিসাবে অমিয় চক্রবর্তীর সততা এইখানে যে, তিনি নিজেকে মধ্যবর্তী শ্রেণী সম্পর্কে এই সমালোচনার ঊর্ধ্বে রেখে তথাকথিত নিরপেক্ষ সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। তাই দেখি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন দেশে দেশে বোমার বিধ্বংসী তাণ্ডব চলছে এবং বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছে, তখন তিনি তাঁর মধ্যবর্তী-শ্রেণী-সুলভ বুদ্ধিজীবী-মানসের অকপট স্বীকৃতির স্বাক্ষর তাঁর কবিতায় রেখেছেন :

ডুবে আছি বন্ধু ভাবনায়
পা মেলে ইজি চেয়ারে,
খবর-কাগজ দিয়ে যায়—
চোখ তুলে দেখি না।
হয়তো বোমায় কোন দেশ
দারুণ আঘাতে হ'লো শেষ,
বাংলারও ঘরে হাহাকার—
মন তবু বুর্জোচ। (নানা মনে : মাটির দেয়াল)

দৃষ্টিভঙ্গির এই তদ্‌গতির জন্যই অমিয় চক্রবর্তী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেই, সম্ভবতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকাকে স্মৃতির মধ্যে রেখেই, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবলম্বন বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ির পাশবিকতাকেও লক্ষ্য করতে ভোলেন নি :

কাড়াকাড়ি কলের কবলে। 'মেরিকায়, চীনে, পূর্ব 'হতে
হানাহানি য়ুরোপ ঘিরে। (সমুদ্র : খসড়া)

কিন্তু, অমিয় চক্রবর্তীর দুঃখ এইখানেই যে, সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী লুব্ধ-লালসা-সঞ্জাত রাজনৈতিক আবর্ত যখন বিশ্বমানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে সংকটকে ঘনীভূত ক'রে তুলেছে, তখন আমরা—মধ্যবর্তী-শ্রেণী থেকে আসা বুদ্ধিজীবীরা—মুদিত-চক্ষু নিদ্রামগ্নতার নিরাপদ আশ্রয়ে নিরাপত্তার সন্ধান করছি। শুধু তাই নয়, সেই আবর্ত আমাদের নিদ্রার আত্মমগ্ন শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে বলে বরং বিরক্তই হয়েছি :

দিকে দিকে সৈন্য, রাজা, নিদ্রামত্ত। রাষ্ট্রের চীৎকার।
বাজায় ভীষণ ঘুমে। (ঘুম : একমুঠো)

তথাপি, এই অমিয় বাবুই যখন অক্সফোর্ড থেকে পড়া শেষ ক'রে ভারতে ফেরবার সময় পোর্ট সুদানে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর কবিদৃষ্টিকে সমগ্র আফ্রিকার ওপর প্রসারিত ক'রে দিয়ে কি দেখলেন ? দেখলেন :

পোর্ট্‌ সুদান।
জাহাজ-ডেকের রেলিঙ-বাঁধা
আফ্রিকা, এই আফ্রিকা। (নামা-ওঠা : খসড়া)

আফ্রিকা শব্দের একক ব্যবহারের পরমুহূর্তেই 'এই আফ্রিকা'-র উল্লেখে 'এই' শব্দ অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনাময় হ'য়ে উঠেছে। এর তাৎপর্য বুঝতে হ'লে আমাদের সাম্রাজ্যবাদীর জঘন্যতম পরিণতি ফ্যাসিবাদী ইতালীর ১৯৩৫-৩৬-এ ইথিওপিয়া-আক্রমণের ঘটনাটি স্মরণ করতে হবে। উপনিবেশ গড়ার আন্তর্জাতিক দৌড়-প্রতিযোগিতায় প্রায় সকলের শেষে যাত্রা শুরু ক'রে ইতালী দেখলো, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অঞ্চলই কোন-না-কোন বড়ো রাষ্ট্রের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। শুধুমাত্র একটু আশার আলো দেখা গেল আফ্রিকায়। ইথিওপিয়াই ছিল তখনও পর্যন্ত আফ্রিকার একমাত্র অঞ্চল যা স্বাধীন। ছোট্ট এই রাজ্যটাকে নিজের উপনিবেশে পরিণত করার জন্য ইতালী তার সমর-সম্ভার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইথিওপিয়ার ওপর। ১৯৩৭-এর জানুয়ারীতে রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকার ওপর সাম্রাজ্যবাদী এই আক্রমণের বিরুদ্ধে লিখলেন তাঁর 'আফ্রিকা' কবিতা। তাই অমিয় চক্রবর্তী ইংলণ্ড থেকে ফেরার পথে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পণ্য ও সমর-সম্ভারের বাহক 'জাহাজ-ডেকের রেলিঙ-বাঁধা' সুদানকেই শুধু দেখেন নি—সুদানের মধ্য দিয়ে দেখেছেন সমগ্র আফ্রিকাকেই, যার সর্বশেষ স্বাধীন রাজ্যটুকু পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বগ্রাসী লালসার হাত থেকে রক্ষা পায় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খবর যখন এলো তখন অমিয় চক্রবর্তীর কবিসত্তা আত্মমগ্ন স্বপ্নলোকের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে তার রাজনৈতিক চেতনাকে নিষ্ক্রিয় রাখে নি। যুদ্ধের বাস্তব তাৎপর্যের ভয়াবহতা কবিকে অস্থির ক'রে তুলেছে জার্মানীর পোলাণ্ড আক্রমণকে কেন্দ্র ক'রে :

সংহার
সিন্ধুতীরে দাঁড়াই আজ, উন্মাদ সংসার

রুধির তরঙ্গে ভাসলো, দীর্ঘ মৃত্যুর হাহাকার
সভ্যতার অন্ধকারে।…ব্যথায় কণ্ঠ ক্ষীণ
ডাক পাঠাই—মানুষের এলো দুর্দিন।
… … …
খোঁড়া পাঁচু বেচে তাজা খবর : বাসের বাবুরা দুহাতে
কেনে মরন্ত পোলাণ্ড্… (যুদ্ধের খবর : একমুঠো)

এই অবস্থায়, যখন

মারচে অমুক দেশকে অমুক,
মানুষ মানুষকে—, তখন কবির কামনা :
ভাষা কমুক, এবং
মেনে অন্তরের উদ্দেশ
বদলাও, বদলাও. বদলাও পরিবেশ। (যুদ্ধের খবর : একমুঠো)

নির্বীর্য গতানুগতিকতার সরণি বেয়ে অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, আত্মক্ষমতায় দেদীপ্যমান মানবাত্মার পরিবেশ-রূপান্তরীকরণের ভূমিকাটাই বর্তমানের ধূলি-সমাকীর্ণ রাজনৈতিক আবহাওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে বলে অমিয় চক্রবর্তী মনে করেন :

কোথায় সেনানী ?
পূর্বদেশে
ইরাক আরব চীন অর্ঘ আনি'
ধুলো,
স্তূপ করে সত্তা তব পায়ে, সাথে মেশে
শ্লথ ভারতের ভাঙা কুলো
কলিযুগ-মানা গুরু বাণী।
স্বদেশী শিবিরে আছে শত্রু তব, ধুলো :—
দরজা, মলিন পর্দা, কুলি-টানা পাখা,
ভিস্তি-বওয়া জল, ঝাঁটা, বহুর বেদনারক্তমাখা
জমিদারী মঞ্চে রাখা
দুর্লভ আরাম। আর, বৃষ্টির প্রার্থনা,
কৃপালোভী ভিড়ের সান্ত্বনা।

ওপারে নবীন দেশে, প্রাণলোকে
শান-বাঁধা ধ্যান,
কল্যাণী ইঁটের ফ্ল্যাট ঘাসে ঘেরা ;
বিজুলি-জ্বলন্ত জ্ঞান,
সাধকেরা
জীবনসাধনা সংঘে ধূলিজয়ী।
শাপগ্রস্ত !—ফুকারেন পূর্বমুণি ঊর্ধ্বচোখে,
শহরের ড্রেন ধর্মহারা ! ("আধ্যাত্মিক ধূলি মেখে রই")

"শাপগ্রস্ত, ধর্মহারা !"—বলে ত্রিশকোটি অনাহারী
দৈবপদধূলির পূজারী।

ঐ শাপ কবে, ধুলো,
মর্ম তব দীর্ণ করি' পরিচ্ছন্ন প্রাণের নগরে
নির্মল নিশ্বাসবায়ু পশ্চিমে পূরবে দেবে ভ'রে ?
মানুষ সেনানী এসে
সূর্যতলে সমাজের শুভ্র ভিত্তি বেঁধে দেবে শেষে ?
ততক্ষণ
লাঞ্ছিত, ধূলির ভৃত্য, মোর ধূলি-ভরা দেহ মন
ধূলির পরমতত্ত্বে মাতোয়ারা
লাহোরের পথে-পথে অন্ধপারা
অদৃষ্টের গান গাও ॥ (মর্মান্তিক : খসড়া)

বস্তুতঃপক্ষে, বিশ্বরাজনীতির পটভূমিকায় ভারতবর্ষীয় রাজনীতির ক্লীবতাকে কেন্দ্র ক'রে কবিচিত্তের আবেগসমুথ এমন ভাবরূপময় কাব্যিক প্রকাশ আধুনিক বাংলা কবিতায় দুর্লভ ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না।

পাঁচ

প্রেমেন্দ্র মিত্র অমিয় চক্রবর্তীর চেয়ে বয়সে ছোট হ'লেও তাঁর প্রথম কবিতার বই 'প্রথমা' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩২-এ এবং কবিতাগুলি লেখা হয়েছে আরও বছর আষ্টেক আগে থেকে। কুড়ি বছরের তরুণ কবি তাঁর কাব্য-সাধনার যাত্রাপথে বিচ্ছিন্নতাবোধকে পাথেয় করেন নি—বরং সাধারণ মানুষকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে তাঁদেরই ভাবনাকে ভাষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে তাঁর আবির্ভাবের সোচ্চার ঘোষণা করেছেন :

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের !
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই ! (কবি : প্রথমা)

কবি-ভাবনায় ভাবালুতার আতিশয্যকে বাদ দিলে দেখা যাবে, এবংবিধ মানসিকতার জন্যই অন্ততঃ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন নি। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সাধারণ মানুষের যে-জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল তা তাঁর কবিসত্তাকে নাড়া না দিয়ে পারে

নি। প্রথম মহাযুদ্ধ যে 'বিশ্বজোড়া হাহাকার'-এর সৃষ্টি করেছিল তা তিনি অনুভব করেছিলেন ব'লেই তাঁর জীবন-বিধাতাকে নমস্কার করতে গিয়ে নতুন যুগভাবনার যুগোপযোগী মন্ত্র উচ্চারণ করলেন :

ক্রীতদাস মানবের মৃত্যু-পুর হ'তে,
আজি কমণ্ডলু ভরি'
আনিয়াছি স্বেদ ও শোণিত,
—পূত পূজা-বারি।
আনিয়াছি পুঞ্জিত কালিমা
লেপিতে ললাটে তব চন্দন-বিহনে,
পূজা তব আজি বিপরীত!
বিশ্বজোড়া হাহাকারে বাজে আজ নব-স্তোত্র তব,
অভিনব স্তুতি ;
চিতাগ্নিতে অপরূপ আরতি তোমার,
ভস্মশেষে নৈবেদ্য নূতন। (নমস্কার : প্রথমা)

কবি বিশ্বজোড়া এই হাহাকারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেই থেমে থাকেন নি, আন্তরিকভাবে বোঝবার চেষ্টা করেছেন এই হাহাকারের মূল কোথায় :

দিকে দিকে কোটি গৃহ ভেঙে পড়ে আজ,
প্রচণ্ড লোলুপ এই মানবের বাসনার ঝড়ে। (প্রার্থনা : প্রথমা)

এবং 'দেবতার জন্ম হল' কবিতায় কবি উপলব্ধি করেছেন যে, যারা 'দেবতার আলো চুরি' করে, অন্যের মুখের অন্ন কেড়ে রেখে 'মানবের যাত্রাপথে সুবিপুল বাধা আবর্জনা' জমিয়ে তোলে, তারাই পৃথিবীতে বিশ্বজোড়া হাহাকারের সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থা দূর করবার জন্য বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চে যে-সাধারণ মানুষের দল শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন, কবি নিজে যেমন তাঁদের পদধ্বনি শুনেছেন, তেমনি অন্যদেরও তা শুনিয়েছেন :

পায়ের শব্দ শুনতে পাও?
নিযুত নগ্ন পায়ের মহাসঙ্গীত!
মলিন কোর্তাপরা কারখানার কুলি আসছে আজ অসঙ্কোচে
আর রাস্তার মূর্খ মজুর,
জাহাজের খালাসী আর পথের মুটে।
বিশ্বমানবের মিছিলে আজ মিলল এসে
এ কোন্ অপ্রত্যাশিত পূত বন্যা!
... ...
জরাজর্জর দেহে তাজা রক্তের স্রোত বইল ;
বদ্ধজলে মৃত্যুর জীবাণু বংশ বিস্তার ক'রছিল,
আজ প্রাণের বিপুল বেগে সাফ হয়ে গেল
বনেদি জঞ্জাল, সনাতন ধাপ্পাবাজি!
... ...

আজ পাঁওদল, চলে নবজাগ্রত ভয়মুক্ত মানবের দল,
তার সাথে পাঁওদল, চলেছেন মানবের দেবতা।
(পাঁওদল : প্রথমা)

বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদ স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দিয়েছে যে, সমাজব্যবস্থাকে শ্রেণীবিভক্ত ক'রে সেই শ্রেণীবিন্যাসকে অটুট রাখায় যে-শোষকশ্রেণী লাভবান্ তাঁরা সমাজের ওপরে ওঠার পথটা শোষিত সাধারণ মানুষের কাছে বন্ধ রেখেছেন এবং সেই পথটা বন্ধ রাখার জন্য তাঁরা আবার শোষিত শ্রেণীর মানুষকেই কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু, এই ব্যবস্থা যে আর বেশিদিন চলবে না তা বিশ্বরাজনীতির গতি-প্রকৃতি থেকে প্রেমেনবাবু বুঝতে পেরেছেন :

যে বিশাল সিঁড়ি আকাশের দিকে
চেয়েছে উঠতে,
তার তলায় তারা বসে থাকে ;—
…আর কাঠের টুলে
সশস্ত্র প্রহরী।
তবু হতাশ আমি হই না।
জানি…
কাঠের টুলে নিঃসঙ্গ জনতা আছে থেমে
স্তব্ধ হয়ে ;
একদিন তার স্থাণুত্ব যাবে ঘুচে।
শুধু কাঠের সিঁড়ি
কোনদিন পৌঁছোবে না আকাশে।
(কাঠের সিঁড়ি : সম্রাট)

'নীলদিন' কবিতায় দেখা যায়, রাশিয়ায় নূতন জীবন গ'ড়ে তোলার প্রয়াস প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিকল্পনাকে অনুপ্রাণিত করেছে :

'স্টেপি'-র দিগন্তে দেখি
আগুপিছু তুষারের
মাঝখানে ফুলের প্লাবন। (সম্রাট)

পলিনেসিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কার্যকলাপও তাঁকে বিচলিত করেছিল। কিন্তু তিনি সমগ্র ঘটনার মধ্যে শুধু সাম্রাজ্যবাদীর অত্যাচারটাকেই দেখেন নি। ইতালীর ইথিওপিয়া-আক্রমণের পর বিশেষভাবে সমগ্র আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামগুলিতে যে উদ্দামতা দেখা গিয়েছিল তাও তাঁর নজর এড়িয়ে যায় নি এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ভিতরে যে ক্লীবতা ছিল তাকে ধিক্কার জানিয়েছেন :

মোহিনী পলিনেসিয়া !
মহাসাগরে ছড়ান
ভেঙে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া কোন্ সুদূর সভ্যতার নাকি ভগ্নাংশ !

আমি জানি,
সমুদ্রের ঔরসে
প্রবালদ্বীপের গর্ভে তার জন্ম !
সূর্যের ঔরসে
মহারণ্যের গর্ভে যার জন্ম,
আঁধার বরণ সেই আফ্রিকাকেও জানি ;
—সৌখীন শিকারী আর পণ্ডিত পর্যটকের চোখে নয়।
অরণ্য-চোয়ানো ঝাপসা আলোয়,
কি, দিগন্ত-ছোঁয়া 'ফেল্ট'-র চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বলতায়
উদ্দাম আঁধার-বরণ আফ্রিকা !
কণ্ঠে তার দুরন্ত আরণ্য-উল্লাস
—হে-ঈডি, হাইডি, হাই !···
আমাদের গলায় কই সেই উদ্দাম উল্লাস,
ঘাসের ঘাঘরায় দুরন্ত সমুদ্র-দোলা ?
কেমন ক'রে থাকবে ?
আমাদের জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু,
সমুদ্রনীল মৃত্যু পলিনেসিয়ার !
আফ্রিকার সিংহ-হিংস্র মৃত্যু !
আছে শুধু স্তিমিত হয়ে নিভে যাওয়া,
—ফ্যাকাসে বুগ্ন তাই সভ্যতা ! (নীলকণ্ঠ : সম্রাট)

ছয়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন বুদ্ধদেব বসুর বয়স মাত্র দশ। অতএব, একথা ধ'রে নিতে অসুবিধা নেই যে বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক তাৎপর্য বোঝার বয়স তখনো তাঁর হয় নি। কিন্তু, যুদ্ধোত্তর আর্থিক সংকটের প্রভাব যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যতম শক্তি ইংলণ্ডের এই উপনিবেশের ওপরেও যে প'ড়েছিল তা ঐতিহাসিক সত্য। সেই পরিবেশেই তাঁর তরুণ যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু, সেই পরিবেশকে বস্তুনিষ্ঠভাবে গ্রহণ ক'রে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করার মতো মানসিক গঠন তাঁর ছিল না। মানসিক গঠনের বিচারে বুদ্ধদেব ছিলেন একটু বেশিমাত্রায় introvert। তাই, সমসাময়িক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতা তাঁর সৌন্দর্যের ভাবলোকে বার বার হানা দিয়েছে বলে তিনি বিরক্ত হয়েছেন :

সৌন্দর্যের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়···
(বন্দীর বন্দনা)

কবি হিসেবে প্রাচীন ভারতবর্ষের আত্মিক সাধনাই যেন তাঁর সাধনা :

অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি,
ভালোবাসি—আর কিছু নয়। (বন্দীর বন্দনা)

এই 'আর কিছু'—যা-ই তাঁর 'অমৃতের অন্বেষণে' বাধা দিয়েছে—তাকেই তিনি সযত্নে পরিহার ক'রে নিজের ধারণামতো বিশুদ্ধ কবিসত্তাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাই, চেয়েছেন সেই 'আর কিছু'-কে ভুলে থাকতে—'ভুলিয়া থাকিতে চাই'। কিন্তু বাস্তব জগতে বাস ক'রে বাস্তব ঘটনাগুলোকে ভুলে থাকা যে সহজ ব্যাপার নয় তা-ও তিনি জানেন—'তবু, হায়, পারি না ভুলিতে'। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বাস্তব পরিবেশের ভয়াবহতাকে তিনি লক্ষ্য না ক'রে পারেন নি :

সভ্যতার শ্মশান-শয্যায়
সংক্রমিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায় ;
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা। রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিনে
সুন্দরেরে বিদ্ধ ক'রে, মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো।'
দেশে-দেশে সমুদ্রের তীরে-তীরে কাঁপে থরোথরো
উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ।

প্রাণ রুদ্ধ, প্রাণ স্তব্ধ। ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে
লুব্ধতার লালা ঝরে। (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

বুদ্ধদেব সাম্রাজ্যবাদীর লুব্ধতার লালা-ক্ষরণ শুধু ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলেই যে লক্ষ্য করেছেন তা নয়, আফ্রিকাতেও সেই বর্বর রাক্ষসের বর্বরতাকে উপলব্ধি করেছেন :

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
শেষ তব শীর্ণ ছায়া শুষে নিলে আজ
শুভ্র সভ্যতার সূর্য।
(ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা : দময়ন্তী)

ইথিওপিয়া আফ্রিকার 'শেষ শীর্ণ ছায়া'-ই বটে! বস্তুতঃ, তখনো পর্যন্ত একমাত্র ইথিওপিয়াই ছিল আফ্রিকার শেষ স্বাধীন রাজ্য। রাজনৈতিক ঘটনাকে বুদ্ধদেব তাঁর কবিতায় স্থান দিতে না চাইলেও সেই সমস্ত ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি যে অনবহিত ছিলেন তা মনে হয় না। পুঁজিবাদী সভ্যতা তার অস্তিত্বের জন্য বাজার দখল করার যে-বণিকবৃত্তি গ্রহণ করেছিল, তা তাকে যেভাবে আগ্রাসী ও নিষ্ঠুর ক'রে তুলেছিল তা-ও তিনি লক্ষ্য করতে ভোলেন নি, এবং এটাও তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ঐ সভ্যতা এবারে অবসন্নতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে :

স্থূলোদর লোলজিহ্ব লোভ
রক্তস্ফীত বাণিজ্যের বীজ
হোক, পূর্ণ হোক।

করো
বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত-পঙ্গু, নপুংসক বিকৃত জাতক,
তার জয়ধ্বনি করো।...
হে আফ্রিকা,
অবসন্ন বণিকবৃত্তির নিহিত মৃত্যুর 'পরে
বিদ্যুৎ চমকে
কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে।
(ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা : দময়ন্তী)

সাত

বর্তমান আলোচনা-চক্রের অন্তর্ভুক্ত কবি-ষষ্ঠকের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হচ্ছেন বিষ্ণু দে। কিন্তু আলোচ্য কবিদের মধ্যে তাঁরই কবিতায় সর্বাধিক রাজনৈতিক সচেতনতার প্রতিফলন দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র নয় বৎসর। অতএব সেই ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য বোঝার বয়স ঠিক সেই সময়ে অন্ততঃ তাঁর হয় নি। কিন্তু তাঁর প্রথম কবিতার বই যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স তেইশ। অর্থাৎ তখন তাঁর এটা বোঝার বয়স হয়েছে যে, বুর্জোয়াশ্রেণীর বাজার দখলের রাজনীতির ফলেই বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আর, তারপর থেকেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শ্রেণীতত্ত্বে আস্থাবান হ'য়ে নিজেকে উত্তরোত্তর শোষিত শ্রেণীর পক্ষে নিয়ে গেছেন। তবে, তাঁর প্রথম দিক্‌কার কবিতায় এই শ্রেণীভুক্তির স্বাক্ষর নেই—যদিও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় যথেষ্ট রয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত সাধারণ মানুষের মধ্যে যে জাগরণ ঘটেছে তা বিষ্ণু দে লক্ষ্য করেছেন—দেখেছেন কিভাবে প্রবল বর্ষণের মতো 'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার'। কিন্তু, তখনও পর্যন্ত শ্রেণীচেতনার আদর্শকে গ্রহণ ক'রে নিজেকে সেই জোয়ারে ভাসাবার তাগিদ তিনি অন্তরের মধ্যে অনুভব করেন নি। সম্ভবতঃ, তৎকালীন মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরিবেশগত প্রভাবে প্রথম দিকে বিচ্ছিন্নতাবোধের কিছুটা ছোঁয়া তাঁকেও হয়তো লেগেছিল এবং সেই কারণেই তাঁর পারিপার্শ্বিক নাগরিক জীবনে, বোধ করি, জনসমুদ্রের সেই জোয়ারকে তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি—প্রত্যক্ষ করেছেন 'কোলাহল-কুৎসিৎ নগরের ভিড়ে দুষ্ট শ্বাস জনতা-আঁধার'-কে। অবশ্য, 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় জনতা সম্পর্কে ঠিক এইরকম মনোভাব আর না থাকলেও, নিজেকে জনতার কাছে নিয়ে গিয়ে তখনো দাঁড় করাতে পারেন নি। তাই, জনসমুদ্রে জোয়ার নামলেও কবির হৃদয়ে তখনও চড়া—জোয়ারের ঢেউ সেই চড়াকে ঢেকে দিতে পারে নি। তবে, এই সময়েই তিনি সমাজে মানব-পশুর মদমত্ততা লক্ষ্য করতে ভোলেন নি :

মাটি কাঁপে, ছোটে বেগে মদমত্ত নেআণ্ডরতাল ;
(সন্ধ্যা : ঊর্বশী ও আর্টেমিস)

একদিকে মানবসমাজে পশুশক্তির মদমত্ততা এবং অন্যদিকে জন-জাগরণ—এই দুই পরস্পর বিপরীত আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়াই তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজনীতি-সচেতন কবিতে পরিণত করেছে। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, '১৯৩৭' কবিতাটি বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে তাঁর সচেতন মানসিকতারই পরিচয় বহন করছে :

চাচার আপন প্রাণ-বাঁচানোর ক্ষেত্রে
শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রু-মিত্র ॥ (পূর্বলেখ)

এখন, ঐতিহাসিক দিক থেকে আমাদের দেখা দরকার, ১৯৩৭-এ এমন কি ঘটনা ঘটলো যার ফলে বৎসরটি তাঁর কাছে এইভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হ'য়ে ধরা দিল ? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাজার-দখলের রাজনীতিকে কেন্দ্র ক'রে বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্ড একটা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বর্তমান ছিল। কিন্তু, শ্রেণীস্বার্থ যেখানে বিপন্ন সেখানে তারা সেই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-জনিত শত্রুতাকে সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে মৈত্রী-চুক্তিতে স্বাক্ষর করতেও পিছপা হয় না। তাই, ১৯৩৭-এর ৬ নভেম্বর দেখা গেল, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'Anti-Comintern Pact'-এ আবদ্ধ হ'লো ইতালী সেই তাদেরই সঙ্গে, যাদের সঙ্গে একদিন সে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। সেই সঙ্গে বিষ্ণু দে আমাদের দেশের নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেকার বিশ্বরাজনীতি-কেন্দ্রিক ভাব-বিলাসিতার ছবিটাও তুলে ধরেছেন :

যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাড়ির রং
আমার চোখে তো নেশাই ঘনায়—
রাজাস্ পেগ্।
লেনিনের চিঠি পড়েছ, রিমার্ক-
-এব্‌ল্ ইন্-
-টারেস্টিং।
বলো ভাববে না পাগল সং ? আচ্ছা, না-হয় হেসো।
কানে কানে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়
অলকা, আমার দিন-রজনীর স্বপ্ন ভাসে
নিদ্রাহীন
পাঁচ বছর, স্টালিনের মতো
—ওই কি লিলির টেনিসের জুড়ি খস্‌রু বেগ্ ? (জন্মাষ্টমী : পূর্বলেখ)

'রাজাস্ পেগ্'-এর সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে লেনিনের উল্লেখ করতে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর বিন্দুমাত্র বাধে না! কিন্তু, বিষ্ণু দের রাজনৈতিক চেতনা উপলব্ধি করেছে—স্বপ্ন দেখেছে : 'দূর স্তালিনগ্রাদে বাংলা দেশের প্রান্ত মিলায়'। বিশ্বরাজনীতির অনিবার্য পরিণাম থেকে বিষ্ণু দে এখন আর নিজের বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে পারছেন না। তাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় যদিও তিনি দেখছেন :

জাপানের লুব্ধ দূত ভাসে
এক-এক কামানের অমর-সম্ভাষে
... ...

বিদ্যুৎ-আবেগে জাগে উদ্ভাসিত দেশ,

আসন্ন সমাজে কাঁপে ঘুমন্ত জনতা (কোডা : সাত ভাই চম্পা)

তবুও তিনি শেষ পরিণামটি উপলব্ধি করেছেন এবং বলেছেন :

তবু এ জীবন শুধু হানাহানি নয়।
তবে কেন আজ শেষ শ্রেণী-সংঘর্ষে
নৈতিপ্রতিষ্ঠ সন্দেহ আর ভয় ? (কোডা)

'শেষ শ্রেণী সংঘর্ষে'-র চরম পরিণাম সম্বন্ধে বিষ্ণু দে'র নিজের কিন্তু এখন আর কোনও 'সন্দেহ আর ভয়' নেই।

আট

রাজনীতি—আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উভয়ক্ষেত্রেই—বর্তমান যুগের সমাজব্যবস্থার অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক শক্তি। সমাজ-সচেতন কবি-মাত্রই এই শক্তির দ্বারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রভাবিত না হ'য়ে পারেন না। কিন্তু রাজনৈতিক কার্যকলাপ মাত্রই যেহেতু কোন একটা অবস্থান-বিন্দুতে স্থির হ'য়ে থাকতে পারে না, সেইহেতু ব্যক্তিমনে তার প্রভাবের মধ্যেও অনড় একটা স্থিতিশীলতার অভাবও অপ্রত্যাশিত নয়। এবং কোনও কালসীমায় সংঘটিত বিশ্বরাজনৈতিক ঘটনাসমূহের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ কোন্ ঘটনাকে সমধিক প্রাধান্য দেবেন বা দেবেন না, তা নির্ভর করে একদিকে যেমন তাঁর সামাজিক অবস্থান-জনিত সামান্য বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিমনের গঠন-প্রকৃতির ও বিশিষ্টতার ওপর, তেমনি অন্যদিকে নির্ভর করে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে উপলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘটিত ঘটনাবিশেষের মধ্যে একটা সমতা-আবিষ্কারের মধ্যে।

আলোচিত কবি-ষষ্ঠক তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব সামাজিক অবস্থান-বিন্দু থেকে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার আলোকে, পরিগৃহীত সময়সীমার মধ্যে জাতীয় ক্ষেত্রে সংঘটিত ঘটনা বা ঘটনাসমূহের সঙ্গে যে-অনুপাতে বিশ্বরাজনীতির ঘটনা বা ঘটনাসমূহকে যুক্ত ক'রে যতখানি তার বা তাদের তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন, সেই অনুপাতে ঠিক তত-খানিই তার প্রতিফলন তাঁদের মধ্যে দেখা গেছে। কিন্তু, বিশ্বরাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় রাজনীতির পরিবর্তনশীলতার ধারা অনুসরণ ক'রে পরবর্তীকালে এ'দের সামাজিক অবস্থান-বিন্দুর সরণ (dispiacement) যে-অনুপাতে ঘটেছে সে অনুপাতে উভয়ক্ষেত্রে সংঘটিত ঘটনাসমূহের মধ্যে সমতা ও তাৎপর্য আবিষ্কারের ব্যাপারেও আনুপাতিক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু, সে আর এক ভিন্ন প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর

ভবতোষ দত্ত

বাংলা কবিতায় আধুনিকতা বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি তার সত্যিকারের শুরু হয়েছিল জীবনানন্দকে দিয়ে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা বস্তুটার একটা নির্দিষ্ট অর্থই তৈরি হয়ে গিয়েছে আমাদের মধ্যে,—রবীন্দ্রনাথ যে ভাবনা ও শৈলীর প্রতিষ্ঠাতা তার থেকে আলাদা একটা কোনো রীতি। রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা যে-কোনো একটা রীতিই যে আধুনিকতা বলে আমাদের কাছে অভিনন্দিত, তার প্রমাণ জীবনানন্দ, তার প্রমাণ সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে। এ'দের তিনজনের কাব্যরীতিই আলাদা—রবীন্দ্রনাথের থেকে স্বতন্ত্র তো বটেই, নিজেদের মধ্যেই তাঁরা স্বতন্ত্রচিহ্নাঙ্কিত, তবু তিনজনেই আধুনিক, যেহেতু রবীন্দ্ররীতিকে এঁরা অনুসরণ করেন নি।

কিন্তু তিনজনেই একই যুগের। এ-যুগটার আরম্ভ ১৯২৫-এর পরে। সময়টাকে মনে রাখতে বলি। এর আগে কল্লোল-কালিকলম শুরু হয়ে গিয়েছে, সেই পত্রিকাকে ঘিরে দেখা দিয়েছে এমন সব লেখক যাঁদের নিয়ে বাংলায় কয়েক বৎসরব্যাপী বাদ-বিতর্কের ঝড় বয়ে গেল। কল্লোলের লেখকরা অশ্লীলভাবে দেহবাস্তবের নগ্নতাকে উদ্‌ঘাটন করছেন, এই অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে দিলেন সজনীকান্ত দাস। শুধু সজনীকান্ত নয়, অমল হোমও 'অতি আধুনিক কথাসাহিত্য' নামে প্রবন্ধ লিখে বাংলা সাহিত্যের এক নতুন সঙ্কটের ইঙ্গিত করলেন। রবীন্দ্র-যুগে নানা সময়ে নানা সমস্যা এসেছে, তবে ঠিক এই সমস্যাটি এমনভাবে এর আগে দেখা দেয় নি। তখনও জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব তরুণ, কবিতা লেখার অভ্যাস করছেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথকে চকিত করেছিলেন যাঁরা তাঁরা হচ্ছেন নজরুল, মোহিতলাল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ইত্যাদি ত্রিরিশোত্তীর্ণ অথবা উপত্রিশোত্তীর্ণ কবিরা।

রবীন্দ্রনাথ পূরবীর কবিতার পালা আরম্ভ করেছেন ১৯২৩ থেকে। সেই সময়েই কল্লোলের প্রকাশ, তার কিছুদিন পর বের হ'ল কালিকলম আর ওদিকে শনিবারের চিঠি। পূরবীর সময় থেকে ১৯২৭-এ প্রগতি প্রকাশিত হবার সময় পর্যন্ত এই পাঁচ-ছয় বছরে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার যে-চেহারা ছিল, পরে তা বদলে গিয়েছে। জীবনানন্দ ছিলেন পরবর্তী আধুনিকদের পুরোধা। এই দুই যুগের আধুনিকতার স্বরূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

বাংলা কবিতায় যে একটা ভিন্নতর রসের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, রবীন্দ্রনাথ সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন পূরবীর যুগেই। সেইজন্যই তাঁর এই কাব্যের নাম পূরবী, তাতে সায়াহ্নের রাগিণী বাজছে। 'লীলাসঙ্গিনী' নামে কবিতায় কবিমনের নিঃসঙ্গতাও স্পষ্ট। কর্মজীবনের দিক দেখলে কিন্তু এ-সময়টা মোটেই অবসরের সময় নয় বরং অবিচ্ছিন্ন চঞ্চলতারই সময়। বিশ্বভারতীর নানা কাজ শুরু হয়েছে, কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বান এসেছে, এসেছে চীনের আমন্ত্রণ, কিছুদিন পরেই যাবেন আরজেনটিনা। এমন সময় তিনি লিখলেন—

দেখ নাকি হায় বেলা চলে যায়
সারা হয়ে এল দিন।

এ-ক্লান্তি তাঁর অন্তর্জীবনের। তাঁর কবিতা আর সাথী খুঁজে পাচ্ছে না। কাশীনাথরা এসে গিয়েছে, বরজলালরা এবার সভা ভঙ্গ করে বিদায় নিতে চলেছে।

এই কাশীনাথরা কারা? আমাদের সাহিত্যের আধুনিকতার যাঁরা সূত্রপাত করেছিলেন রবীন্দ্রাদর্শের বিরোধিতা করে, ভারতী-যুগের শেষে তাঁরা হলেন যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল। রবীন্দ্রনাথের রসের আদর্শ অপরূপত্ব পেয়েছে পূরবীর 'তপোভঙ্গ' কবিতায়। বাস্তববিমুখ মৃত্যুহীন সৌন্দর্য এবং চিরজীবী প্রেমের জয়ধ্বনিতে মুখর এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ আর একবার রসের শাশ্বত আত্মাকে প্রতিফলিত করলেন। কিন্তু সাহিত্যের নবীন বাস্তবতা তাতে বিচলিত হ'ল না। নজরুল ইসলাম জনপ্রিয় কবি হয়ে উঠলেন, মোহিতলালের পান্থ মনোহরণ করল উদীয়মান তরুণ কবিদের। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতার পংক্তিও তাঁদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। শুধু কবিতা নয়, গল্পে উপন্যাসেও নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গিমা স্থায়ী হয়ে বসল। শরৎচন্দ্র শৈলজানন্দ প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্য সেনগুপ্তের বাস্তবতা ক্রমেই দুঃসাহসিক হয়ে উঠতে লাগল। শনিবারের চিঠি যে-দৃষ্টান্তগুলি মণিমুক্তা নামে সংকলন করত, সেগুলি স্বভাবতই রুচিবিরোধী বলে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য রসবাদীদের মনে হয়েছে কিন্তু এ ধরনের লেখা যে সংকলিত হবার মতো প্রাচুর্য লাভ করেছে তা তো অস্বীকার করা যায় না।

১৯২৭-এ ঢাকায় প্রগতি পত্রিকা ছাপার অক্ষরে বের হল। দুজন লেখক—নজরুল ইসলাম এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—প্রগতিতে লিখছেন—তাঁরা দুজনেই তখন বিখ্যাত। এ-ছাড়া আর যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা অখ্যাতনামা, তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দ এবং বিষ্ণু দে। বুদ্ধদেব বসু কল্লোলে জীবনানন্দের 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা পড়ে অনুভব করেছিলেন এর অভিনবত্ব। তিনিই জীবনানন্দকে প্রগতিতে লিখবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। প্রগতিতে শুধু যে জীবনানন্দের কবিতাই বের হত তা নয়, জীবনানন্দের কবিতার রবীন্দ্রোত্তরত্ব বুঝিয়ে মন্তব্য বেরিয়েছে কয়েকবারই। ১৩৩৫-এর আশ্বিন মাসের প্রগতিতে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—

"জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন ব'লে আমার মনে হয়। তিনি এ পর্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেন নি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধহয় বিমুখ.—অচিন্ত্যবাবুর মত তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য imitator জোটে নি। তার কারণ বোধহয় এই যে জীবনানন্দবাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময় সাপেক্ষ।

তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার করেই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁব নিজস্ববস্তু হয়ে পড়েছে—তার অনুকরণ করাও সহজ বলে

মনে হয় না। এমন সব কথা বসাচ্ছেন যা পূর্বে কেউ কবিতায় দেখতে আশা করে নি—যথা, 'ফেঁড়ে', 'নটকান', 'শেমিজ' 'থুতনি' ইত্যাদি।" *

সংকলিত অংশে বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের কবিতার বিশেষ শব্দ ও diction-এর উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এখানেই তাঁর রবীন্দ্রোত্তরত্ব সুপ্রমাণিত এবং স্পষ্ট। প্রগতির পূর্বে যাঁরা রবীন্দ্রোত্তর কবি বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন, তাঁদের নূতনত্ব কাব্যব্যবহারে নয়, বাস্তবতা-সন্ধানে—সে-বাস্তব সমাজেরই হোক আর মানবমন অথবা মানবদেহেরই হোক। শব্দ-ব্যবহারে লৌকিক প্রবণতা অবশ্য দেখিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন ভারতীর কিছু কবি। সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবও জীবনানন্দের একেবারে প্রথম দিকের কবিতায় ছিল। কিন্তু তাঁর শব্দ ব্যবহারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে পরে—গম্ভীর টোনের কবিতাতে লৌকিক শব্দের প্রয়োগে. বুদ্ধদেব বসুর দেওয়া একটি দৃষ্টান্ত—

> আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
> বিয়োবার দেরি নেই,—রূপ ঝরে পড়ে তার,—
> শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে।

'ভব্যসমাজে অনুচ্চার্য একটি ক্রিয়াপদের জন্যই হেমন্ত ঋতুর এই ছবিটি এমন উজ্জ্বল হতে পারলো।'

জীবনানন্দের কবিমানসের প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে। তাঁর বাঙলাদেশের হেমন্ত প্রকৃতি, প্রেমের নশ্বরতাবোধ, বিষণ্ন জীবনের ক্লান্তি, অস্তিত্বের মরবিড চেতনা, নিঃসঙ্গ নির্জনতা—এসব দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পর অভিনবত্ব স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ ও অরূপতত্ত্বের পর জীবনানন্দকে অভিনব ঠেকবেই। তবু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রমণের দৃষ্টান্ত যতখানি তাঁর ভাষা এবং শব্দপ্রয়োগে স্পষ্ট ততখানি এই ভাবমণ্ডলেও নয়। শুধু জীবনানন্দ নয়, সত্যকার রবীন্দ্রোত্তর নামে যাঁরাই চিহ্নিত তাঁদের মধ্যেই এই লক্ষণ স্পষ্ট। বিষ্ণু দের কবিতায় ইমেজ রচনা যত সচেতন এবং প্রধান, অন্য কারো মধ্যে এতখানি প্রাধান্য না পেলেও সেখানেই তাঁদের বিশেষত্ব এ বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ নেই। বুদ্ধদেব বসুর রোমান্টিকতা বা সুধীন্দ্রনাথের নাস্তিকতা বা সমর সেনের বাস্তবতা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের পর নতুন ঠেকে, তথাপি এই নতুনত্বে হয়তো বিদ্রোহিতার উগ্রতা তত নেই, যতখানি উগ্রতা আছে প্রকাশ-ভঙ্গিমার বিদ্রোহিতায়। কখনো ইমেজে, কখনো বাক্য-গঠনে, কখনো পংক্তি রচনায়, কখনও শব্দের বিশিষ্ট পদপ্রকৃতির পরিবর্তনে বাংলা কবিতায় যে স্টাইলের প্রবর্তন হল অনেকের কাছেই তা দুর্বোধ্য ঠেকল। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের এটাই হল দ্বিতীয় এবং প্রধানতম লক্ষণ। প্রথম লক্ষণ মানসিকতার পরিবর্তন যার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল ভারতীর যুগের শেষ দিকে, কল্লোলের পৃষ্ঠায়। রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে'র কবিতা পড়ে বলেছিলেন যদি মানে করে দিতে পারো, তবে শিরোপা দেব। রবীন্দ্রোত্তর এই দ্বিতীয় পর্বের কবিদের সম্পর্কেই উঠেছিল দুর্বোধ্যতার অভিযোগ, প্রথম পর্বের সম্বন্ধে ছিল অশ্লীলতার নালিশ—যার পরিণাম রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম, (১৩৩৪ শ্রাবণ)

* কবিতা ১৩৬১, পৌষ-এ উদ্ধৃত।

প্রবন্ধে এবং বিচিত্রার সাহিত্যসভায় (১৩৩৪ চৈত্র)। সেই সভায় আজকাল রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবি বলে যাঁরা সুবিদিত, তাঁরা কেউ ছিলেন না কারণ তাঁরা তখনও কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে দোলাচল।

এই কবিকিশোররা যখন বড়ো হয়ে উঠলেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের কবিতার বই পাঠাতেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অভিমত জানাতেন। জীবনানন্দও তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ঝরা পালক' (১৯২৮) পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। এ-সময় জীবনানন্দ কলকাতার সিটি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। এম-এ পাশ করার পর সেটাই তাঁর প্রথম চাকরি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বই পেয়ে লিখলেন—

'তোমার কবিত্বশক্তি আছে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারি নে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে।

বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উলটো।'*

ভাষা নিয়ে জবরদস্তির কথাটা রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দকেই প্রথম বললেন কিনা, ঠিক বলতে পারছি না, তবে ওই পর্বের কবিদের একেবারে প্রথম দিকেই যে বললেন তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের এই মতটা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তারও প্রমাণ আছে। ১৯৩৮-এ রহস্যচ্ছলে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি চিঠি—

'একেবারে খাঁটি আধুনিক তুমি। পাঁজিও সেই কথা বলে, তোমার ভাষার থেকেও তার প্রমাণ পাই। এ ভাষায় শব্দ আছে যথেষ্ট, কিন্তু অর্থ খুঁজে পাই নে। ভাষা যে কিছু বোঝাবার জন্যে সে দায়িত্ব বুঝি একেবারে অস্বীকার করেছ। আমি সেকেলে লোক আমার কেমন একটা ধারণা হয়ে গেছে যে, যা বলব সেটা যেন পাঁচজনে বুঝতে পারে। যেন না ভাবতে বসে আমি পাগল হয়েছি, না, তারা পাগল হয়েছে। পাঁচজনের সম্বন্ধে তোমার মনের এই দীনতা নেই—তার থেকে প্রমাণ হয় তুমি আধুনিক।' **

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি কোনো কবিকে লেখেন নি। অন্য প্রসঙ্গে এক কিশোরকে লেখা। কিন্তু এ যেন আধুনিক কবিতার রঙ্গমঞ্চে জনান্তিক ভাষণ। কবিরা যখন তাঁর কাছে বই পাঠিয়ে অভিমত চাইতেন, তখন তিনি তাঁদের কবিতার সৌন্দর্যটুকু খুঁজে বের

---

* দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২। পৃ ১৪। এই চিঠির তারিখ ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩২২। এ-তারিখটা স্পষ্টতই ভুল। কারণ ১৩২২-এ জীবনানন্দের কোনো কবিতার বই বের হয় নি। সেজন্য কেউ কেউ মনে করেন ষোলো বছরের কিশোর জীবনানন্দ তাঁর কৈশোর-রচনা কিছু রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এ-অনুমান বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই চিঠির উল্লেখ জীবনানন্দ করেছেন ১৯৩৭-এ ধূসর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে। তাতে লিখেছেন 'প্রায় নয় বছর আগে আমি আমার প্রথম কবিতার বই একখানা আপনাকে পাঠিয়েছিলুম। সেই বই পেয়ে আপনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন ; চিঠিখানা আমার মূল্যবান সম্পদের মধ্যে একটি।'—দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২, পৃ ২৯। এই চিঠিখানার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রীমতী সুতপা ভট্টাচার্য।

** চিঠিপত্র ৯, পৃ ৪২৭।

করতেন ঠিকই, এবং তার প্রশংসা করতেন কিন্তু আধুনিক কবিতার ভাবাশৈলী সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা কখনো ঘুচেছিল বলে মনে হয় না। ১৯৪০-এ কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছেন—

'এলিয়ট অডেন প্রভৃতি আধুনিক ইংরেজ কবির মনে বর্তমান কালের দুর্যোগের যে আঘাত লেগেছে সেটা সত্য এবং প্রচণ্ড। সেই সংঘাতে চিন্তার তরঙ্গ উঠে আগেকার কালের অভ্যস্ত ধারার কাঠামো ভেঙ্গে ফেলেছে। ভঙ্গী বদল হয়েছে কিন্তু তাঁদের রচনায় এ যুগের বাণী উঠচে জেগে কতক স্পষ্ট রূপ নিয়ে কতক অস্পষ্ট ব্যঞ্জনায়। তাঁরা যথার্থ কবি এই জন্যে বাণী তাঁদের মনে আলোড়িত হয়ে উঠলে সেটা ব্যক্ত না করে থাকতে পারেন না বলেই লেখেন। কিন্তু যে সাহিত্যে মানুষকে বলবার মতো কোনো বাক্য দুর্নিবার হয়ে ওঠে নি কেবলমাত্র এলোমেলো প্যাটার্ন চলেছে আঁকাবাঁকা আঁকজোক কেটে সেখানে মন কোনো একটা দান পায় না কেবল হুঁচোট খেয়ে মরে। সে সাহিত্যে একটা কোনো তাৎপর্য হাতড়িয়ে বেড়ানোর মতো ক্লান্তিকর আর কিছুই নেই। হালের বাজার দর অনুসারে ভোজের আয়োজনকে অবজ্ঞা করতে পারো তবু পাতে যদি মুড়ি মুড়কি থাকে তবে অভাবপক্ষে সেও ভালো কিন্তু কেবলমাত্র হাপুস হুপুস শব্দের বিচিত্র স্বরভঙ্গীর দ্বারা নিমন্ত্রণের মর্যাদা রক্ষা হয় না।'*

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি কাব্যের আধুনিক ভাষাভঙ্গিমাকে তাদের স্বাভাবিক চিন্তাজাত অভিব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। বাঙালি আধুনিক কবিদের মধ্যে স্থানে স্থানে কাব্যসৌন্দর্য পেলেও মোটের উপর আধুনিক কবিতার ভাষাকে বলেছেন এলোমেলো। ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রদ্ধার কারণ তাঁর কবি-সাহিত্যসচিব অমিয় চক্রবর্তী। অমিয় চক্রবর্তী নিজেরই আগ্রহে ইংরেজ কবিদের কবিতার বই সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথকে পড়িয়েছেন। সেই পড়ার ফল ছিল 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটি। 'সাহিত্যের পথে' নামক রস-সমালোচনার বইটি তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে উৎসর্গ করেছিলেন, এ তথ্য সুবিদিত।

এ-প্রসঙ্গে আর-একটি কথা উল্লেখযোগ্য। 'সাহিত্যের পথে' বইতে নানা সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ আছে। কিন্তু সাহিত্যের সম্বন্ধে মূল তত্ত্বটা কি? মনে রাখা ভালো, এই বইয়ের প্রবন্ধগুলির রচনাকাল বাংলায় রবীন্দ্রোত্তর কবিদের সাহিত্য-আন্দোলনের সময় থেকেই অর্থাৎ ১৯২০-র সময় থেকেই। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে আধুনিক কবিদের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করেই কবি এই প্রবন্ধগুলি লিখছেন। প্রথম দিকের লেখা 'বাস্তব', 'তথ্য ও সত্য'। স্বভাবতই রবীন্দ্রোত্তর প্রথম পর্বের কাব্যান্দোলনই এগুলির লক্ষ্য। তাতে তাঁর বক্তব্য সমাজ ও বাস্তবতার চেয়ে সাহিত্যের সত্য আরো বড়ো। ক্ষণকালীন বাস্তবকে চিরকালীন রস বলে বিবেচনা করাই বিচারমূঢ়তা। পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য রবীন্দ্রোত্তর দ্বিতীয় পর্বের কাব্য। সেখানে তুলেছেন সাহিত্যসৃষ্টির ঐক্যবোধ এবং রূপসৃষ্টির কথা। আধুনিক কবিতার ভাষা-ভঙ্গিমায় তার শব্দের দুর্বোধ্য প্রয়োগে পাঠকের সঙ্গে কবির মানসিক ঐক্য খণ্ডিত হচ্ছে—রূপের সমগ্রতাও গড়ে উঠছে না।

* দেশ, ১৩৮২, সাহিত্য সংখ্যা, পৃ ২২।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের তিনি প্রশংসা করেছেন 'নবযুগের কাব্য' লিখে। অমিয় চক্রবর্তী প্রথম দিকে একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। পরে তিনি যে কাব্যশৈলী আয়ত্ত করেছিলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন যে-শক্তি ইংরেজ কবি এলিয়ট অডেনরা দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বস্তুতই আধুনিক কবিতা নিয়ে উৎসাহিত ছিলেন না। তার চেয়ে বড়ো কথা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আধুনিক কবিতা তিনি পড়ছেন না। তাঁকে বই পাঠালে তিনি পড়তেন এবং অসাধারণ সৌজন্যবশতঃ মতামত দিতেন। সেই সূত্রেই তিনি জীবনানন্দের কবিতাকে বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'। জীবনানন্দ প্রকৃতিতে লাজুক ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে যান নি। বুদ্ধদেব বসু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণু দে ও অন্যান্য তরুণরা রবীন্দ্রনাথের সম্মতির শুধু নয় সান্নিধ্যের প্রত্যাশী ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছাড়াও অন্যবিধ যোগাযোগ ছিল। তাঁদের সেই চিঠিপত্রে আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত কিছু পাওয়া যায়। নইলে বাংলা আধুনিক কবিতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের থেকে কিছু লেখেন নি। পরোক্ষতঃ যা পাওয়া যায় তাকে ঠিক অনুকূল বলা যায় কিনা সন্দেহ।

'আধুনিক কাব্য' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত প্রবন্ধটির কথা ভুলি নি। এ-প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল অমিয় চক্রবর্তীর প্ররোচনায়। অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক ইংরেজ কবিদের বই এনে দিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতেই এই প্রবন্ধটি লেখা। কিন্তু এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বলেছেন, আধুনিক এ্যাটিটুউডের কথা— নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জীবনের দিকে তাকানোর বিশিষ্টতাই আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার এই সংজ্ঞাটিকে শুধু মানতেন না, নিজের রচনায় রূপ দিয়ে গিয়েছেন। জীবনানন্দের সুররিয়ালিজম, বিষ্ণু দে'র চিত্রকল্প, বুদ্ধদেব বসুর ব্যঙ্গাত্মক বাক্‌রীতি—এই সব বহিরঙ্গ ভাষাভঙ্গিমার দ্বারা তিনি কিছুমাত্র প্রভাবিত হন নি। কিন্তু পুনশ্চ থেকেই তাঁর কাব্যে বুদ্ধিগত জীবনচেতনার প্রসার ঘটেছে। তাতে নির্মোহতা ছিল, অন্তত অনাসক্ততার সাধনা ছিল। এ-অনাসক্ততা জীবনমুক্তির অর্থাৎ জীবনে থেকেও নির্লিপ্ত থাকার। বৈজ্ঞানিক নির্মোহতা অবশ্য অন্য রকম। বস্তুজগৎকে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষবর্জিত রুচি-অরুচির মোহ থেকে মুক্ত করে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করাকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বলা যেতে পারে। আধুনিক কাব্যে নির্মোহতা আছে সত্য কিন্তু আবার রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন এর মোহ আছে উলটো দিকে অর্থাৎ অরুচিকর প্রসঙ্গের দিকে। এই মোহ থেকেও আধুনিক কাব্য মুক্ত হতে পারে নি। জীবনের প্রেম ও কল্যাণবোধে রবীন্দ্রনাথের আস্তিক্যবুদ্ধি কখনো বিনষ্ট হয় নি, বহু বছরের লালিত বিশ্বাস ভেঙে গেলেও বিশ্বাসহীনতাকেই অটল সত্য বলে তিনি ভাবতে পারেন নি। এই মাটির পৃথিবীর স্নেহ, প্রতিবেশীর প্রেম, মানুষের প্রতি কর্তব্য, চিরকালের শ্রমজীবী মানুষের শ্রমমূল্য, হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুটে নেওয়া আলোর অঞ্জলি, ধ্যানমগ্ন কবির আত্মহারা উচ্চারণ 'আমি আনন্দিত'—এর কিছুই রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনা থেকে হারায় নি। তবে আসক্তির বাঁধন কেটেছে—এ বৈরাগ্যের সুর আছে তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যে যখন আধুনিক কবিদের কাব্য ব্যঙ্গে বিদ্রূপে বিদ্রোহে, পৃথিবীর প্রতি ক্ষোভে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আর কাব্যভাষা? গদ্যছন্দে তাঁর চারখানা বই আছে। আধুনিকতা বলতে রবীন্দ্রনাথ যে বুদ্ধিবাদকে বোঝেন, জীবনোপলব্ধির সেই তত্ত্বগত চিন্তাকে ভাষারূপ দিয়েছেন এই বই কয়খানাকে। ভাষাতে বা চিন্তাতে কোনো দিক দিয়েই তিনি আধুনিকতার দ্বারা প্রভাবিত হন নি, তেমনি আধুনিকরাও শ্রেষ্ঠ কবির বিশ্বাসে বা ভাষায় প্রভাবিত হন নি। সমস্ত চতুর্থ দশকটাই (১৯৩০—১৯৪০) কেটে গেল রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের সহাবস্থানে। তারপর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী,
অবিশ্রাম সারি সারি কুচকাওয়াজের পদক্ষেপে
উঠেছে অধীর হয়ে খেপে।
লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন,
নিয়েছে অবুদ্ধি লোকে অবন্ধ ভাষণ,
ছিন্ন করি অর্থের শৃঙ্খল পাশ
সাধুসাহিত্যের প্রতি ব্যঙ্গহাস্যে হানে পরিহাস।
সব ছেড়ে অধিকার করে শুধু শ্রুতি—
বিচিত্র তাদের ভঙ্গী, বিচিত্র আকৃতি।

জন্মদিনে, ২০

আধুনিক বাংলা কবিতা

ভূদেব চৌধুরী

আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে এই আলোচনাচক্র। আধুনিকতার চরিত্র আর মাত্রা নিয়েই প্রথমে প্রশ্ন জাগে। 'সাম্প্রতিকতা' আসলে কালবাচক অভিধা, কিন্তু 'আধুনিকতা' একটি 'মর্জি'। আর মানুষ রয়েছে সেই মানসিকতার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে—মানবিক কৌতূহল, মানবিক জিজ্ঞাসা, মানবিক সমস্যা নিয়ে। চেতনার সর্বাত্মক আলোড়নই আধুনিক মেজাজের সারাৎসার !

পৃথিবী জুড়ে সেই মেজাজের সূচনা সন্ধান করা হয় সাধারণত রেনেসাঁস-এর কাল থেকে ; 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনকেই 'আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের দ্বারমোচনকারী' বলে নির্দেশ করেছিলেন—আমাদের এই আলোচনাচক্রে আধুনিক মেজাজের ঊর্ধ্বসীমা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বলয়সীমা ঘিরে ! তাই যদি হয়—পুরোনো আধুনিকতা আর নতুন আধুনিকতায় মর্জিগত তফাৎ কোথায় তবে ?

সেই সূত্রেই মনে আসে, মানুষের সকল সৃষ্টি—কবিতা তো বটেই—আসলে উত্তরণের প্রত্যাশা, না হয়ত উত্তরণের সমস্যা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মানুষের জীবনটা 'পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা', তাই ও নিয়ে তার কোনো তৃপ্তি নেই ; কাব্যে-সাহিত্যে সে নিজেকে নিজের মত করে গড়তে চায়। আসলে মানুষের মধ্যে মানবিকতা যাকে বলি, সে তার ঐ আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মৌলিক আগ্রহে—যে-কোনো কালেই 'আধুনিক' মেজাজের উৎসার ঐ আত্মকর্তৃত্ববোধের সচেতনায় !

উত্তরাধিকার-সূত্রে মানুষও জীবজগতের অংশীদার, জীব-জীবন প্রকৃতি-জাত, প্রকৃতি-লালিত কিংবা প্রকৃতি-তাড়িত। জৈবতা তাই পরানুশাসিত। প্রথমাবধি সেই একান্ত প্রকৃতিশাসন থেকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিবশে মুক্ত হবার প্রয়াস এবং প্রত্যাশা নিয়েই মানুষের ইতিহাসের যাত্রারম্ভ। তার গতি প্রথম থেকেই দ্বিমুখী—প্রকৃতিকে জয় করতে তার শক্তির উৎস এবং রহস্যের সন্ধান করতে হবে—সেই সন্ধানীর ভূমিকা বিজ্ঞানীর। দার্শনিকের প্রবণতাও অনেকটা একই পথ ধরে চলেছে ; বিজ্ঞান এবং দর্শন এক অর্থে পরস্পরের পরিপূরক। দার্শনিক প্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃত শক্তিরহস্যের তাৎপর্য সন্ধান করেন কার্য-কারণ-গ্রথিত যুক্তিপরম্পরার মাধ্যমে ; অতিপ্রাকৃত বলতে একান্তভাবে 'অলৌকিক' এখানে অভিপ্রেত নয়—বিশ্ব-সৃষ্টির ধারায় যা-কিছু প্রকৃতির কর্তৃত্ব-গণ্ডীর অতিরিক্ত, তাই অতিপ্রাকৃত। অন্যপক্ষে বিজ্ঞানী প্রাকৃত রহস্যের যে-সব খুঁটিনাটি আবিষ্কার বা সংগ্রহ করেন, তাকেই সাধারণীকৃত করার চেষ্টা করেন যুক্তি-চিন্তার মাধ্যমে। এই সব প্রয়াসের মূলে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রণোদনা রয়েছে। কিন্তু মানুষের আত্মকর্তৃত্বের—তার অপরতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির ঐকান্তিক প্রকাশ মানুষের সৃজন-লোকেই, অনুভব-উপলব্ধি, সর্বোপরি উদ্ভাবনী কল্পনা—'ইমাজিনেটিভ্ ফ্যাকালটি' সে পথের

একমাত্র পাথেয়। কাব্য-সাহিত্যে মানুষ আপন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বশে আপন চৈতন্যের গভীর হতে অতিক্রম করতে চাইছে প্রকৃতির বাঁধন-গণ্ডীকে। অথচ প্রকৃতির কর্তৃত্বের সীমানা মানুষের প্রবহমান চেতনার মধ্যেই ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে চলেছে। সৃষ্টির আদিতে একদা প্রকৃতিকে মনে হয়েছিল জড় ; তার পরে দেখা গেছে জীবনের অভ্যন্তরে তার অধিকার গভীর-প্রোথিত। আজ তার অপ্রতিহত প্রভাব চৈতন্যকেও আচ্ছন্ন করতে চাইছে।

আসলে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রকরণ জৈবতাধর্মী—পরানুশাসিত, সন্দেহ নেই মানুষের অন্তর্ভেদী সন্ধানী দৃষ্টি, তার বিচার-বিন্যাস এবং চিন্তাশক্তি প্রকৃতির অন্তর্লোকে প্রবেশ করে অসাধ্য সাধন করেছে, তাকে আয়ত্ত করেছে বহুলাংশে। কিন্তু এই সব কিছুর ওপরেই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ভূমিকা আজও অস্পষ্ট। আজও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী যে-কোনো একটি পরীক্ষায় রত হয়ে সাফল্য-অসাফল্যের দ্বন্দ্ব-দোলায় অবিরাম কম্পিত হতে থাকেন। অনেক অসাফল্যের ধাক্কা খেয়ে পৌঁছে যান দৈবাৎ কোনো বিস্ময়কর সফলতার চূড়ায়। চূড়ান্ত মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত সবটুকুই অনিশ্চয়তার পত্রপুটে অজ্ঞাত—আবৃত। সাম্প্রতিকতম মানুষের সমস্যাও সেইখানে। তার অনুসন্ধানী প্রয়াসের অভাবিত সফলতা সারা পৃথিবীকে এনে দিয়েছে হাতের মুঠোয়—অথচ মানুষের উদ্ভাবনী কল্পনা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে তার ওপরে অপ্রতিরোধ্য আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক মানুষের সেই অমেয় পরাভবের ছবি এঁকেছিলেন 'রক্ত-করবী'র আত্মবন্দী রাজার মধ্যে।

আমাদের আলোচ্য আধুনিক সাহিত্য—আধুনিক কবিতারও মূলগত মর্জির উৎস ঐখানে। স্রষ্টা মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বশে প্রকৃতির ওপরে আপন অধিকার—আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। আসলে সে লড়াইটা তো দুপক্ষের শক্তি এবং আয়োজনের পরিমাণকে অবলম্বন করেই ! আর এ-দুয়ের পারস্পরিক সংযোগ-সংঘর্ষে দুয়েরই চরিত্রেরও পরিধি এবং প্রকরণ পরিবর্তিত হচ্ছে। আগে বলেছি, মধুসূদনকে নিয়ে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যে আধুনিকতার 'দ্বার উন্মোচন' হল, তা পৃথিবী-জোড়া 'নবজাগরণধর্মী' মানবিক অভ্যুদয়েরই গোত্রভুক্ত। খ্রীষ্টাব্দের প্রায় চতুর্দশ শতকের সীমানা থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত এই অভ্যুদয় ছিল সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষের একচ্ছত্র বিজয়ী পরাক্রমের ক্রমপ্রসারিত নিশানা। আমাদের দেশেও উনিশ শতকের নবজাগরণের মূলমন্ত্র ছিল 'সাধারণ জীবনযাত্রা আর উচ্চভাবনা'—ঐ উচ্চভাবনা অর্থে কেবল চিন্তাশক্তি নয়—ইচ্ছাশক্তির অবাধ প্রসার সাধনের চেষ্টা। মননের সঙ্গে সম্পন্ন মনোধর্মের অবিরাম ব্যাপ্তি ছিল তার প্রধান প্রেরণা।

কিন্তু বিশ শতকে এসেই ধীরে ধীরে সেই অর্ধসহস্রাব্দ ব্যাপী মানবিক ইতিহাসের চরিত্রে ফাটল ধরেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুনে পুড়ে সেই নূতন মূর্তিটি তার নিটোল রূপে বেরিয়ে এল। প্রকৃতির এ এক ভয়ালতর শক্তির ছবি—মানুষের আত্মকর্তৃত্বচেতনার বুঝি পরাভবের প্রথম দিক্-চিহ্ন। শুরু থেকে পরাভব ঘটল মানবিকতা নামক মৌল ধারণাটিরই। মানুষের মধ্যে হিংস্র জান্তবতা তার নখদন্ত নিয়ে নিষ্ক্রান্ত বেরিয়ে পড়ল ; এতো জৈবধর্ম ! মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ঐকান্তিকতা দিয়েও তাকে রোধ করা গেল না। রবীন্দ্রনাথের মত প্রবল উদ্ভাবনী কল্পনাসিদ্ধ কবি ভরসা করেছিলেন,

'রাত্রির তপস্যা' এক সময়ে 'দিন' ফিরিয়ে আনবে ; কিন্তু আজও পৃথিবী জুড়ে মানুষের সৃষ্টির ইতিহাস—কবিতার ইতিহাসও অন্ধকারের অতলান্ততায় দিনের আলোই বুঝি খুঁজে ফিরছে।

তাতেও সমস্যা রয়েছে ; এ-ইতিহাস পৃথিবী-জোড়া আপামর মানুষের সার্বিক ইতিহাস নয় ; প্রধানত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজের অভিজ্ঞতা-অনুভবের ফসল ; কেউ হয়ত বলবেন তার মনগড়া ! আজও সৃজনকর্মের—কাব্যকবিতা সৃষ্টিরও—সাধারণ অধিকার জগৎ জুড়ে থেকে গেছে ঐ জনগোষ্ঠীরই হাতে প্রধানভাবে। আমাদের গ্রামে-গাঁথা দেশে আরো এক সমস্যা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর উচ্ছিন্ন একান্ত নাগরিকতা। অথচ ঐ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত সারা পৃথিবীতেই মধ্যবিত্ত জীবনের বনিয়াদ ভেঙে দিয়েছে নানা দিক থেকেই। সে-সব প্রসঙ্গ এই আলোচনাচক্রের প্রথম অধিবেশনে বিস্তারিত বিবেচিত হয়েছে—দেখেছি পরিকল্পনা-সূচী থেকে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য—চারদিক থেকে চক্রব্যূহে পরিবদ্ধ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী চেতনা ঐ-সময় থেকেই ধীরে ধীরে বিনষ্টির অনুভবে আচ্ছন্ন হতে শুরু করেছে—বিচ্ছিন্নতাবোধ, অস্তিত্বের সংকটচিন্তা প্রধানত পৃথিবী-জোড়া বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরাভববোধের লক্ষণ। মানুষের ইতিহাসকে এই সমস্যার উত্তর একদিন পেতে হবে—সেই চতুর্দশ শতক কিংবা তারও পূর্ববর্তী কাল থেকে আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের গর্বে স্বতোবিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বৈভব কি করে আপামর মানুষের সার্বিক সম্পদে পরিণত করা যাবে,—বিজ্ঞানের নিরীক্ষামূলক প্রয়াসে উৎসারিত প্রাকৃতিক শক্তির অপর উত্তাল সম্ভাবনাকে কি করে মানবিক উদ্ভাবনী কল্পনার আয়ত্তীকৃত করে মানব-স্বাধীনতার সর্বায়ত—পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে !

সে সমস্যা বর্তমান আলোচনাচক্রের সীমানার বাহিরে—এবং বর্তমান আলোচকেরও। আপাতত আধুনিকতার দুটি মাত্রার পরিচয় আমরা পেয়েছি—উভয়ের সামান্য চরিত্র লক্ষণ, প্রকৃতি-প্রবর্তিত জীবযাত্রার ওপরে মানুষের আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অবিরাম অন্তঃপ্রবণতা। প্রাথমিক মাত্রায় সে প্রবণতা প্রাকৃতিকতার সীমানা উত্তরণের প্রত্যাশায় উদ্বুদ্ধ, বাংলা কবিতায় মধুসূদন থেকে 'গীতাঞ্জলি'-যুগ পর্যন্ত রবীন্দ্র-রচনায় সেই আধুনিকতাবোধের অকম্প্র প্রসার। তার পরে এসেছে নূতন ধরণের আধুনিক চেতনা—তার মাত্রা প্রাকৃতিকতা উত্তরণের সমস্যায় আবিল—বিমর্ষ; অনেক সময়ে হতাশ অবদমনে পীড়িত।

আসলে মানবিক উত্তরণ-চেতনার এই দুইমাত্রাই মানুষের স্বভাবের গভীরে প্রোথিত। এবং স্রষ্টার অভিজ্ঞতা ও অনুভাবকতার চারিত্র-সূত্রে কবিতার দেহেমনে তার বিচিত্র অভিব্যক্তি। উনিশ শতকেই বোদলেয়র এবং তাঁর অনুবর্তী কবিগোষ্ঠীর মধ্যে অবক্ষয়-পীড়িত চিত্তের উত্তরণ সমস্যা আক্ষেপ এবং আক্রোশের ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার অনেকটাই ছিল কবির ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতার ফসল। কিন্তু সমসাময়িক য়ুরোপেও 'ডেকাডেন্ট সিম্বোলিজম্'-এর পাশে, কিংবা তার পরেও, 'স্পিরিচুয়্যাল সিম্বোলিজম্' গড়ে উঠতে পেরেছিল। অন্যপক্ষে কুড়ির দশকের প্রারম্ভিক পাদেই এলিয়ট যখন 'এপ্রিল'-কেই 'নিষ্ঠুরতম মাস' বলে অনুভব করলেন, তখন পৃথিবী জুড়ে তার অনুরণন শোনা গেল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী চেতনায়। অন্যপক্ষে এলিয়ট-এর পরবর্তী উত্তরণ-প্রয়াসকেও ভুলবার উপায় কোথায় ?

অতএব সারা পৃথিবী জুড়েই আধুনিক মেজাজের আজ দুই স্বতন্ত্র মাত্রা—এক মানবিক উত্তরণের প্রত্যাশায় প্রত্যয়বদ্ধ—আরেক মানবিক উত্তরণের সমস্যাভিঘাতে প্রহৃত—সংশয়াচ্ছন্ন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা-চরিত্রের সন্ধান প্রসঙ্গে এ-কথা বিশেষ স্মরণীয়—বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসে তিনি এই দুই মাত্রার সীমান্তভূমির কবি। কালের হিসেবে অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব সমগোত্রের কবি ; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুদ্ধোত্তর আধুনিকতাবোধের সূচনা হয়েছে তখন সবে—প্রধানত কুড়ির দশক হতে। তাহলেও বুদ্ধদেব প্রথমাবধি দ্বিতীয়তর আধুনিকতার মাত্রাবিদ্ধ—বোদলেয়রপন্থী : প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঝোঁক বেশি করে রবীন্দ্রপন্থায়। কবিতার সৃজনলোকে ইতিহাসের স্বাক্ষর কেবল কালের কালিতেই লিখিত নয়—কলমটি ধরা থাকে কবির ব্যক্তিগত মর্জির হাতেই।

তরুণ বয়সের উচ্ছ্বাসভরে বন্ধু অচিন্ত্যকুমারকে কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র—তার কিছু 'কল্লোল যুগ' বইতে উদ্ধৃত আছে। একটিতে লিখেছিলেন, "আনন্দ কল্যাণের সঙ্গে না মিশলেই যায় সব ভেঙে। অনেক ধনী হয়ে অনেক টাকা বাজে অপব্যয় করার আনন্দ আছে, খুব ব্যভিচারী লম্পট হওয়াতেও আনন্দ আছে, সর্বত্যাগী বৈরাগী তপস্বী সন্ন্যাসী হওয়াতেও আনন্দ আছে, কিন্তু কল্যাণের সঙ্গে আনন্দ মেশে না, তাই এত গোল। এগিয়েও ভুল করতে পারি, পেছিয়েও। পাল্লা সমান রেখে কেমন করে চলা যায়, তাও তো ভেবে পাই না।"

আরেকটা চিঠি লেখা হয়েছিল, কবির বয়ঃসন্ধির উত্তর সীমানায়—"বিচিত্র জীবনের কাহিনী। শুধু মনের মধ্যে মন্ত্র হোক—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। যদি কেউ ঐশ্বর্য নিয়ে সুখী হয় হোক, ক্ষুদ্র শান্তি নিয়ে সুখী হয়, হতে দাও, আমরা জানি 'নাল্পে সুখমস্তি'। অতএব 'ভূমৈববিজিজ্ঞাসিতব্য'। সেই ভূমার খোঁজে যেন না নিরস্ত হই। আর যৌবনকে বলি, 'বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে হবে খণ্ডিতে।"

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে, এ তো অপরিণত মনে রবীন্দ্রকথার অন্ধ উচ্চারণ ; শেষের কথাগুলো তো সব রবীন্দ্র-উদ্ধৃতি কিংবা উদ্ধৃতির-উদ্ধৃতি ভরা। তাহলেও আসলে এরই গভীরে কবির নিজের দেশকালের অভিঘাত-প্রহৃত মনের কথাটি আত্মগোপন করে আছে। ভরা যৌবনে তাঁর শিল্পীমন এমন কালের মার খেয়েছে, যেখানে 'আনন্দ কল্যাণের সঙ্গে মেশে না' কিছুতেই, তাঁর সমস্যা—'পাল্লা সমান রেখে কেমন করে চলা যায়', তাও তাঁর জানা নেই। এ-সমস্যা তো রবীন্দ্রনাথের নয় ; তিনি তো স্বভাবসামঞ্জস্যের কবি :—প্রথম যুদ্ধের রক্তাক্ততার প্রেক্ষিতেও তাঁর বিশ্বাস :—"এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল / নইলে নিখিল / এতবড় প্রবঞ্চনা / হাসিমুখে কিছুতে সহিতে পারিত না।"

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাল, তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা—প্রবঞ্চনার বোধকে কবিচেতনার নাড়ির গভীরে জড়িয়ে দিয়েছে পাকে পাকে ; তবু রবীন্দ্রনাথের মতই তাঁরও মন বলে 'ভূমৈববিজিজ্ঞাসিতব্য' ; কিন্তু কি করে ? সেই সমস্যার—সেই উত্তরণ-সমস্যার ব্যক্তিগত উত্তর-খোঁজা নিয়েই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা।

একেবারে প্রথম স্তরে আত্মকর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত স্বরাট মানুষের বন্দনা গেয়েছেন কবি ; রবীন্দ্র-প্রত্যয়ের সগোত্র এ ভাবনা, কিন্তু তার বাণী স্বতন্ত্র এক কাল-পীড়াবোধের ভাষায় গড়া :—

এ-জীবন ধ'রে এই পথটিতে যা-কিছু দেখেছি,
শুনেছি, ভালোবেসেছি,—সব-কিছুর গান গাইব।
তার সঙ্গে গান গাইব মানুষের
যে-মানুষ পথ সৃষ্টি করেছে,
মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার পথ !

অরণ্যে পথ আছে।
শ্বাপদেরা যে-পথ দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ
তৈরি করেছে বন মাড়িয়ে—মাড়িয়ে
শিকারের চেষ্টায় আর জলের অন্বেষণে
—মৃত তৃণের পথ !
সে-পথ হিংসার, সে-পথ ক্ষুধার, সে-পথ কামের।
মানুষ প্রথম মৃত লতা-গুল্ম-তৃণের একটি
অবিচ্ছিন্ন রেখা সৃষ্টি করেছিলো—কবে ?—কেন ?
আমি বলি প্রীতিতে !
যে-মানুষ প্রথম পথ সৃষ্টি করেছিলো মানুষের সঙ্গে মেলবার জন্যে
তাকে নমস্কার !
সে-পথ আরো বিস্তৃত হোক,
যে-পথ মানুষকে বৃহৎ করেছে।

কিন্তু কোথায় সেই মানুষ ?—ক্ষণ পরেই অধীর হয় কালপ্রহত তরুণ কবিমন—কি সে মানুষের পরিচয়—তার মানে কী ?—

"মানুষের মানে চাই—
—গোটা মানুষের মানে !
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসাসমেত—
গোটা মানুষের মানে চাই।
মানুষ সব-কিছুর মানে খুঁজে হয়রান হ'ল—
এবার চাই মানুষের মানে—নইলে যে সৃষ্টি ব্যাখ্যা হয় না !
এই নিখিল-রচনার অর্থ মানুষের অর্থকে
আশ্রয় ক'রে আছে যে—!
তাই, তোমারও মানে চাই আর আমার।
দূর নীহারিকায় নব নক্ষত্র যে জন্মলাভ করছে
সেই অর্থের ভরসায় !"

মানুষের মানে চাই—তবু মানুষের মানে মেলে না :—

"মানুষের মানে কি ল্যাংড়া তৈমুর ?—হূন আত্তিলা ?
মানুষের মানে কি শুধু বুদ্ধ ?—শুধু খ্রীষ্ট ?
তবু কাফ্রী—ক্রীতদাসও তো মানুষ—
মানবীর গর্ভ হ'তেই তৈমুরের জন্ম, বুদ্ধ খ্রীষ্ট দেবতা ছিলেন না।
মানুষ কি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা ?
তাই কি মহাকালের পাতায় তার অর্থ কেবলি লেখা আর মোছা
চলছে ?"

এ-সব উদ্দীপনা-উত্তেজনাই উত্তাল উদ্বিগ্ন যৌবনের—'প্রথমা'র কবিতা এ-গুলো। ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন ১৯৩২-এ প্রকাশিত কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই ১৯২৪ থেকে '২৮ এর মধ্যে লেখা। অতএব কবির বয়স তখন ২০ থেকে ২৪ এর মধ্যে। তাঁর ত্রিশ-উত্তর কবিতার প্রথম সংকলন 'সম্রাট' (১৯৪০) :—ত্রিশের দশকও সেটা—পৃথিবীজোড়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিতার বিনষ্টি পীড়িত প্রথম তুঙ্গলগ্ন। শুরুতেই মানুষের নগরে অরণ্যের 'বাঘের কপিশ চোখ' কবির চোখেও ধাঁধা ধরায় :—

"স্রোতোহীন চেতনায় গাঢ় গূঢ় অতল সলিলে,
অনেক প্রাচীরে ঘেরা,
অনেক শৃঙ্খলে জোড়া,
নগরের ছায়া গেছে নেমে
নেমে গেছে অরণ্যে আরেক—
সে-অরণ্যে নব-মৃত্যু মোরা সৃজিয়াছি।"

মানুষের আপন হাতের রচিত নবমৃত্যুর চেতনা কবি-ভাবনাকে ছায়াচ্ছন্ন করেছে : মানুষের উত্তরণ-সম্ভাবনায় সংশয় আজ অনপনেয়, তবু প্রত্যাশাকেও মুছে ফেলা যায় না শেষ পর্যন্ত :—

"আকাশের আলো স্তিমিত হয়ে এল শ্রান্ত মানুষ ও পশুর সঙ্গে
আনন্দের অবসাদে।
সর্বস্বরিক্ত প্রান্তরের নিঃশব্দ হাহাকারের ওপর
রাত্রি বুলালে অন্ধকারের সান্ত্বনা।
কাল পৃথিবীতে ব্যস্ততা জাগবে, শস্য বহনের আর বিতরণের
আর হায় লোভের সংগ্রাম।
আজ শান্তি !

মাঠের শস্য গৃহে এল,
এল মানবের শক্তি ও যৌবন,
এল নারীর রূপ ও করুণা,
পুরুষের পৌরুষ,
ভবিষ্যৎ মানব-যাত্রীর পাথেয়।

সমস্ত ভাবীকালের ইতিহাসে, মানবের কীর্তি-কাহিনীর তলায়
অদৃশ্য অক্ষরে
এই শস্যের আগমনী লেখা থাকবে না কি ?"

এইটুকু জিজ্ঞাসা—ঐটুকু প্রত্যাশাও ! যদিও পুরোই কাকুবক্রোক্তি নয়—যেমন আছে রবীন্দ্রকবিতায়—"স্বর্গ কি হবে না কেনা ?"—ঐভাবেই প্রেমেন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও তাঁর থেকে কত দূরে ? রবীন্দ্র-উত্তরকালের কবি তিনি !

তাহলেও, আগে বলেছি, কবিতায় আধুনিকতা নামক মেজাজ সবটুকুই কালের হাতের দান নয়—প্রধানত কবির ব্যক্তিগত মর্জিরই ফসল। চল্লিশের দশকের কবিতায়—বয়সেরও চল্লিশের ঘরে লেখা কবিতায়—ঐ অনিশ্চিত জিজ্ঞাসার পুঁজি হাতে সঠিক প্রত্যাশা না হোক, তার ভরসার দিগন্তটুকু ছুঁতে চেয়েছেন কবি 'ফেরারী ফৌজ'-এ (১৯৪৮)। 'ফেরারী ফৌজ' কবিতার সেই 'সূর্যসেনা'-দের কথাই ভাবুন, যারা "রাত্রির সাম্রাজ্যে আজো / সন্তর্পণে ফিরিছে ফেরারী।"

তবু 'আদ্দিকালের বুড়ি' সেই খাইখাই করা 'অ্যামিবা'ই তো শেষ বিশ্লেষণে মানুষ হয়েছে,—তার ভবিষ্যৎ কি কোথাও আছে—তার পশ্চাদ্ধাবন কি কেবল "ভস্মে ঢালা ঘি"—এ সংশয়ও তো ঘোচে না ! কালের সঙ্গে কবি মনের ওঠা-পড়ার এ-ছবি বাংলার সাহিত্য-ইতিহাসের দুর্মর সম্বল। কিন্তু সে আলোচনার অবকাশ এখানে নয়। কেবল শেষ কথাটি বলতে হয়, পঞ্চাশের সীমানা পেরিয়ে—জীবনের এবং বিশ শতকেরও—কবি সেই প্রত্যাশার ভরসাটুকুকেই কেবল খুঁজে নিয়েছেন, 'সাগর থেকে ফেরা'য় (১৯৫৬)। 'ফেরারী ফৌজ'-এর কালেই অনুভব করেছিলেন :—

"আলোয় যাহা পেয়েও হারাই,
আজ সুড়ঙ্গ-পথে
সেই শপথের ছোঁয়ায় যেন
গভীর আমার মনে
অয়স্কঠিন ব্রত কোনো, জন্ম নিতে চায়।" ('সুড়ঙ্গ')

সেই ব্রতেরই পূর্ণ উদ্‌যাপন 'সূর্যবীজ' আবিষ্কারের মগ্ন প্রত্যয়ে :—

এই অকিঞ্চন পৃথিবীর মৃত্তিকায়
যে সূর্য-বীজ তুমি রোপণ করো
তা ব্যর্থ হবার নয় !
মোহাচ্ছন্ন বর্তমানের সমস্ত কুজ্‌ঝটিকা অতিক্রম করে
সুদূর যুগান্তে তার সঙ্কেত প্রসারিত।
মানবতার গভীর উৎস-মূলে
অক্ষয় তার প্রেরণা।

হে মহাকাল, তোমার অনন্ত পারাবারে
আমরা ক্ষণিকের বুদ্‌বুদ্‌,

তবু সেই সূর্য-শিখা যে আমাদের মাঝে
প্রতিফলিত হয়,
এই আমাদের গৌরব।"

'সূর্যবীজ' কবিতায় রবীন্দ্রকবিতার উদ্ধারণও আছে; এ-কবিতার প্রত্যাশাও কি ত্রিশ-উত্তর রবীন্দ্র-কবিতার সমসাময়িক, কবি যেখানে অকুণ্ঠিত স্বীকৃতিতে উচ্চারণ করেন, 'এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্মরোমাণ্টিক'! প্রেমেন্দ্র মিত্রের আধুনিক কবি-কৃতিত্ব সম্পর্কে এইখানেই কোনো কোনো মহলে প্রশ্নচিহ্নও প্রসারিত হয়ে থাকে। কিন্তু উত্তরকাব্যের রবীন্দ্রনাথও যদি রোমাণ্টিক হন, সে কেবল এই কারণে যে, যুদ্ধোত্তর আধুনিককালের 'অমঙ্গল চেতনা'-কে প্রত্যক্ষ করলেও, এই নতুনকালের পরাভবপীড়াচ্ছন্ন চেতনায় সংক্রমিত উত্তরণ-সংশয়ের দোলাচলবৃত্তি থেকে তিনি সর্বদাই মুক্ত; জীবনের শেষ মুহূর্তেও মানুষের শক্তিতে বিশ্বাস হারানোকে তিনি পাপ মনে করেছেন। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি-চেতনা তাঁর আপনকালের দ্বিধা-সংশয়ে কম্পিত—অনিশ্চিতির সীমানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে জীবনের পথ চলতে গিয়ে মানবিক উত্তরণে নিশ্চিত প্রত্যাশার আশ্রয় তাঁর মেলে নি; তবু সেই 'বেনামী বন্দরটি'-কে তিনি খুঁজে ফিরেছেন ব্যাকুল ভরসায়,—'অল্পতা'র গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়ে সন্ধান করছেন 'ভূমা'র। সেই অসাধ্য-সাধনের জর্জরতা তিনি আপন কবি-চেতনার গহনে ধারণ করেছেন—বদলে তাঁর কবিতার দেহলিতে আমরা আবছা দেখতে পাই মানুষের ইতিহাসে প্রবহমান আধুনিকতার দুই মাত্রার দিগন্তভূমি। এই অর্থেই বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিনি আধুনিকতার সীমান্ত-লগ্নের কবি। কবিতারসিকেরা জানেন, তাঁর কবিতার রূপকলাতেও এই চরিত্রের স্বাক্ষর অনির্বাণ।

স্মৃতির আকার : জীবনানন্দ দাশের কবিতা

শক্তিব্রত ঘোষ

আমরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সিনেট হলের কবি-সম্মেলনে জীবনানন্দ দাশ স্বরচিত কবিতা পড়ে গেলেন। পড়েছিলেন আরও অনেকেই। এর পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আলাদা করে এসে কবিতা পড়ে গেলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। 'কৃত্তিবাস' তখনও বোধহয় বেরোয় নি, কিন্তু 'কবিতা' চলছে। আমরা তাকিয়ে থাকতুম 'কবিতা ভবনের' দিকে, আর সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে এলে বাঁ-দিকের সেই ছোট্ট সাজানো-গুছনো দোকানটার দিকে, যেখান থেকে আমরা তখন একটার পর একটা নতুন কবিতার বই উপহার পাচ্ছিলুম,—সিগনেটের দোকান।

সমস্ত কলকাতা জুড়ে কিনা জানি না, কিন্তু কলেজ স্ট্রিট বা দেশপ্রিয় পার্কের আশপাশ অঞ্চলে তখন কবিতার বাতাস বইত। সেই সময় সিগনেট আমাদের একটা বই উপহার দিয়েছিল—দুরন্ত দুপুর—নরেশ গুহ-র সেই ছোট্ট ছিমছাম কবিতার বই, যা তিনি বুদ্ধদেব বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। বইটি এখন পাওয়া যায় কিনা জানি না, ভুলে গেছি কি কি কবিতা ছিল সেই বইয়ে : কিন্তু এখনো, কোন এপ্রিলের দুপুরে রেড রোডের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটা লাইন কখনো কখনো লাফিয়ে এসে পড়ে, যাকে চিনি বললে সব হয় না, যাকে এখনো উচ্চারণ করি :

দুপুরে দুরন্ত হাওয়া,
মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে।

না, এ কোনো স্মৃতিচর্চা নয়, অথচ স্মৃতি যে, সন্দেহ কি। সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একদিন রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল : সমুদ্র যে ধ্বনির ভাষায় উচ্চারিত হয়, একদিন তিনি সেই ভাষা জানতেন, আজ তা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু ওই ধ্বনি-সঙ্গীত শুনেই তো তিনি বলে উঠলেন : জানতুম, জানতুম। 'ডাকঘর'-এর অমল যখন বলে :

> আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি ওই রাস্তার মোড় থেকে—ওই গাছের সারের মধ্য দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল—কী জানি কী মনে হচ্ছিল।

তখন কি মনে হচ্ছিল অমলের ? যাই মনে হোক, তার কোন আকার নেই, আয়তন নেই, তবু মনে যে হচ্ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বনলতা সেন যখন শুধোন : 'মনে আছে ?', তখন বালির ওপরকার জ্যোৎস্নায় বিচূর্ণ থামের মতো খেজুরের ইতস্তুতঃ ছায়াই কেঁপে ওঠে ; 'দাঁড়ায়ে রয়েছে, মৃত, ম্লান' বা 'শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের' ইত্যাদি বিবৃতি-ধর্মী উক্তিগুলি সেখানে নিতান্ত নিঃস্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে মাত্র।

কবিরা, এই ভাবেই খুলে দেন স্মৃতির দরজা : ঘরে এসে ঢুকে যায় মস্ত আকাশ, অন্তহীন হাওয়ার রাত,—প্রায় অনিবারণীয় রূপে, ভেঙে যায় সমস্ত যা কিছু আকারগত ও অন্তরালবাচক, এবং তখনই মনে হতে পারে :

মশারীটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে।

এবং স্মৃতি সময়েরই রচনা। বনলতা সেন, মিশরের মানুষী, ভূমধ্যসাগরের কিনারে কোন নগরী, বেবিলন, বিদর্ভ নগর—ইত্যাদি পটভূমি বা চরিত্র যাই হোক না কেন, তা একটা সময়কালেই জীবিত থাকে ; কিন্তু সেই সময়ের বোধকে যদি বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয় ? তারা সময়সীমায় বিকশিত হয়, সম্পর্কে নিরূপিত হয়, রঙে রেখায় উজ্জ্বল বা বিষণ্ণ হয়, কিন্তু সেই সময়কে যদি আরও টেনে নেওয়া যায় ? তখনই তো মনে হতে পারে :

দূরে
অনেক দূরে
খর রৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান গায়—গান গায়
এই দুপুরের বাতাস।

পুরাতন সময় রূপ নিয়ে ধরা দিতে চায়, কিন্তু গান হয়ে উচ্চারিত হয়। গানেরও অবশ্য একটা শ্রুতিগ্রাহ্য চেহারা আছে, কিন্তু গান আমাদের সেই আকার থেকে মুক্তি দেয়, আমাদের চারধারে গড়ে দেয় একটা পরিমণ্ডল, যেখানে গ্রীষ্মের সন্ধ্যার মতো আকাশ অনেক দূরে উঠে যায়, নিঃশ্বাস নেবার মতো অনেক বেশি হাওয়া পাওয়া যায় যেখানে :—গড়ে ওঠে একটা বিস্তীর্ণতা, জীবনানন্দ অবশ্য 'ব্যাপ্তি' শব্দটা ভালোবাসতেন :

আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি আজো যেন
লেগে আছে বহতা পাখায়
বা, আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছ তুমি।

সুসেন ল্যাঙ্গার সম্ভবত একেই বলতে চেয়েছিলেন 'musical space', বাংলায় 'সাঙ্গীতিক আয়তন' শব্দবন্ধটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহার করা যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। যাই হোক, 'হায় চিল' কবিতাটির মধ্যে জীবনানন্দ আশ্চর্যভাবে সেই আয়তনটি তৈরী করে গেলেন। 'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে', বা 'আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে' ইত্যাদি বিখ্যাত পংক্তি বা পংক্তি-খণ্ড নয়, 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে'—মধ্যবর্তী এই পংক্তিটিই প্রকৃতপক্ষে সেই spatial illusion-টি এখানে তৈরী করে গেল। আধুনিক চিত্রশিল্পীরা তাঁদের রচনায় যেমন space বা আয়তনকে ব্যবহার করেন, জীবনানন্দও অনেকটা তেমনি করে স্মৃতি-তাৎপর্যে সময়কে ব্যবহার করে গেছেন। এবং জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় স্মৃতির ব্যবহারকে একটি প্রকরণগত অভিপ্রায়ে চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হতে পারে।

আর, স্মৃতির যদি কোন কাল থাকে, তা অতীতকালীন ; বর্তমানকালে তা স্মরণ-যোগ্য মাত্র। যে কোনো সাহিত্যশিল্পই স্মৃতির উচ্চারণ, এবং স্মৃতির ব্যক্তিগত হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। 'একরাশ তারা-আর-মনুমেণ্ট-ভরা কলকাতা' যখন কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় হতে পারে, 'বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর' তখন ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সংলগ্ন না হয়েও অভিজ্ঞতার বিষয় হয়ে যায়—অস্তিত্ববোধের প্রসরণের মধ্য দিয়েই তা সাধ্য। আসলে, সচরাচর আমরা যাকে স্মৃতি বলি, অর্থাৎ প্রাক্তনের স্মরণ, তা থেকে এই স্মৃতির অন্তর্গত-প্রকৃতি একটু আলাদা : তথাকথিত বিস্মৃতির অন্ধকার ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে কিছু চিহ্ন, চিরন্তনতার প্রেক্ষাপটে চিরন্তনের স্মারকরূপে। জীবনানন্দ যখন 'হাওয়ার রাত'-এর বর্ণনা দিচ্ছেন :

জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ

তখন কি শুধু কাব্যালঙ্কারই তিনি সৃষ্টি করলেন, অর্থাৎ শুধুই তৈরী করলেন কবিতার অতি-পরিচিত শরীরাংশ ? না কি রাত্রির জ্বলজ্বলে সেই বিশাল আকাশ ছিঁড়ে নিয়ে এলো প্রাণোজ্জ্বল উষ্ণতার একটি চিহ্ন, যা অনিবার্যরূপে প্রাক্তন ? 'শিকার' কবিতায় তিনি যখন বললেন :

মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা
আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে একরাতে তেমনি—
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনো।

—তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে তিনি আমাদের উপহার দিলেন একটি বাসনাবিদ্ধ গাঢ় মুহূর্তের মুক্তো ; কবিতার অলঙ্কার সৃষ্টি করলেন না, সেই সময়হত মুক্তোর মুক্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই 'মুক্তি' শব্দটা এখানে জরুরী। তিনি কালের হাত থেকে কালের মুক্তি চেয়েছিলেন। এবং মনে হতে পারে তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন চিরন্তনতায়। চিরন্তনতা সময়হীনতা নয়, তা সময়ের সম্পূর্ণতার একটি বোধ, যার বিখণ্ডিকরণ প্রায় অসম্ভব। তথাপি জীবনানন্দের ক্ষেত্রে অনেক সময় মনে হওয়া সম্ভব যে, প্রুস্তের মতো তিনি সময়কে অনির্দিষ্টতায় লক্ষ্য করেন না সব সময়, বরং অনেকগুলি ক্ষেত্রেই তিনি সময়কে নির্দিষ্টভাবে দেখাতে চান :

সেই সব ছিলো এই জগতে একদিন।
অনেক কমলারঙের রোদ ছিলো,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিলো,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিলো অনেক ;
অনেক কমলারঙের রোদ ছিলো,
অনেক কমলারঙের রোদ ;
আর তুমি ছিলে ;

লক্ষ্য করা যাবে, উদ্ধৃত এই সাতটি পংক্তিতে তিনি অতীতকালজ্ঞাপক ক্রিয়াপদ

'ছিল' ছ'বার ব্যবহার করেছেন। এই রকম একটা ব্যাখ্যা শুনেছি যে, অতীতকে নিয়ে এইভাবে একটা নস্ট্যালজিক অনুভূতিকেই তিনি এখানে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছেন ; কিন্তু এরই মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে একটা রঙ্, ঐশ্বর্যের মধ্যেও যে বেদনার রঙ্ থাকে, সেই রঙ্। কালগত বিচ্ছিন্নতার বোধ দিয়েই কি তিনি এই বেদনার প্রসাধন রচনা করেছিলেন ? হতে পারে। নতুবা 'অপরূপ খিলান ও গম্বুজের' রেখা বেদনাময় কেন ; নতুবা 'অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি' কেন ? এখানে 'খিলান' বা 'গম্বুজ' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি virtual space-ই তৈরী করলেন ; আয়নার গভীরে আয়তন কতখানি বিস্তৃত তার যেমন পরিমাপ নেই—সেই রকম একটা spatial illusion সৃষ্টি করলেন ; এবং তাকে এসে স্পর্শ করে গেল বেদনার রেখা, অর্থাৎ সময়ের চেতনা। তাজমহলের সামনে দাঁড়ালে অবয়বশায়ী স্থাপত্যের আয়তন-গত ইমেজটি ধরা পড়ে, তেমনি তাকে ঘিরে থাকে একটা সময়ের ইমেজ। Spatial illusion সৃষ্টি করার মধ্য দিয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবনানন্দ virtual time-কেও ধরতে চেষ্টা করেছেন।

এবং দেখা যাবে, ওই বর্ণনামূলক অংশের মধ্যেই থেকে গেছে আর একটি আশ্চর্য পংক্তি বা পংক্তি-খণ্ড,—'আর তুমি ছিলে'—যার মধ্যে অতীত বিষণ্ণতার পল্লবে 'তুমি' আলোড়িত হয়ে উঠছে, অর্থাৎ প্রেম। প্রেমের যে দিকটায় কামনার তাজা রঙ্ ঝলসায়, সেখানেও প্রায় অনিবার্যভাবে বিষাদের ছায়া পড়ে :

> পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
> রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ !
> তোমার নগ্ন নির্জন হাত ;
> তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু তার মধ্যে ওই 'নির্জন' শব্দটি থামিয়ে দিল মত্ততা ও নগ্নতার মিলিত রচনা কামনার কল্লোল, আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেল, সমস্ত কিছুর সংলগ্ন হয়ে আছে দুর্মর এক নির্জনতা। কবির চেয়ে মুখর যেমন কিছু নেই, কালের চেয়ে সময়ের চেয়ে নির্জনই কি কিছু আছে ? জীবনানন্দের ক্ষেত্রে অন্তত সময়ের চেতনাই তাঁর নির্জনতার চেতনা। ওই আয়োজনের মধ্যে তিনি সেই নির্জনতা দেখলেন, প্রায় রেডিওলজিস্টের মতো করে ; একটা ঠাণ্ডা হিম এসে স্পর্শ করে গেল সমস্তকে, তবু কবির কাছে ধরা পড়ে যে--'অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ'। 'আমোদ' শব্দটির মধ্যে তরলতার একটি সংস্কার প্রচলিত হয়ে গেছে বলে আপত্তি থাকতে পারে, অন্যথায় তাকে বলা যেতে পারে আনন্দ ; এবং 'তুমি'-কে ঘিরে যে আবেগের অনুষঙ্গ রচিত হয়ে যায়, তার রঙ্ আনন্দের ; নির্জনতার ফ্রেমে উজ্জ্বল একটি মুক্তোর মতো, যেমন নিরবধি আকাশে একটি নক্ষত্র। ভয়াবহ গভীর স্তব্ধ আকাশের মধ্যে ওই নক্ষত্র তার আলোর শরীর নিয়েও স্তব্ধ হয়ে থাকে ; সময়ের গাঢ় গম্ভীর নির্জনতার মধ্যে উজ্জ্বল স্মৃতি যখন শরীরী হয়ে উঠতে চায়, তখনও সে নীরবতার অন্তরাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। সে উন্মীলিত হয়, ফুল যেমন করে উন্মীলিত হয়, কিন্তু ক্রিয়াচঞ্চল গতিশীলতায় আত্মপ্রকাশ করে না। ফলে স্মৃতি এখানে স্তরশায়ী, প্রুস্ত সম্পর্কে ক্লাইভ বেল যেমন বলেছিলেন, 'in state, not action.'

সময়ানুভূতিই জীবনানন্দের কবিতার প্রধান ভূমিস্তর। এই সময়ের মধ্যে তিনি স্মৃতির আকার গড়ে তুলতে চান, বা বলা যায়, স্মৃতিকেই তিনি বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করেন। এই ভাবেই তাঁর কবিতায় কখনো কখনো একটা musical space তৈরী হয়ে যায়, এবং এই প্রকরণের সাহায্যেই তিনি একটা spatial illusion সৃষ্টি করেন, —যা তাঁর কবিতাকে একটা বিশেষ চারিত্র্য দিয়েছে। এই চারিত্র্য শুধু অনুভূতি-তাৎপর্যের দিক থেকে লক্ষ্য করতে গেলে ভুল হবে; কবিতার সাংগঠনিক তাৎপর্যে স্থাপন করতে পেরেছিলেন বলেই এতে তিনি emotional significance রচনার দিক থেকে লাভবান হয়েছিলেন।

স্মৃতিকে জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় যেভাবে ব্যবহার করেন, তার ফলে তাঁর কবিতায় আর একটি সম্ভাবনা আত্মপ্রকাশ করে—গল্পের সম্ভাবনা—যাকে তিনি সচেতনভাবেই তাঁর কবিতার উপকরণরূপে নিরূপণ করে নিয়েছিলেন। তিনি গল্প-কবিতা লেখেন নি, অথচ গল্পের স্পর্শ এমন কি লিরিক কবিতাকেও কতখানি বিস্তীর্ণ করে দিতে পারে, তিনি তার পরীক্ষা করে গেলেন। গাল্পিক একটা অনুষঙ্গকে কবিতার সাংগঠনিক উপকরণরূপে ব্যবহারে তিনি প্রায় উৎসবের উৎসাহ দেখিয়ে গেছেন।

গল্পের প্রতি জীবনানন্দের যে মর্মগত আকর্ষণ ছিল, কখনো তিনি তা আড়াল করেন নি :

১। তাদের মাঠের গল্প—তাদের মাঠের গল্প শেষ হলে অনেক তবুও থাকে বাকি—
২। সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা।
৩। ধানের রসের গল্প পৃথিবীর।
৪। ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী।
৫। অনেক পুরোনো শিশিরভেজা গল্প।
৬। তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল

এই রকম হয়তো আরও উদাহরণ থাকতে পারে; কিন্তু লক্ষ্য করা যাবে যে এর মধ্যে কোন গল্প নেই। গল্পের মধ্যে ঘটনা ও ক্রিয়াশীলতার বেগ থাকে, এবং শ্রেণী-চিহ্নের দিক থেকে তা অব্‌জেক্‌টিভ্‌ প্যাটার্নের মধ্যে পড়ে। এখানে কবি শুধুই গল্পের কথা বললেন, অথচ গল্প বললেন না, এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা সাব্‌জেক্‌টিভ্‌ পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। গল্পের মধ্যে বিস্ময়, কৌতূহল ও কল্পনার যে মুক্তি ঘটে, সেই মুক্ত অবকাশটুকুই প্রকৃতপক্ষে এখানে কবির অভিপ্রেত।

লিরিক মগ্ন অনুভূতির উচ্চারণ; কিন্তু যাকে আমরা বর্ণনামূলক রচনা বা ন্যারেটিভ্‌ বলি, লিরিক কবিতার উপকরণ রূপে তার ব্যবহারের উদাহরণ অনেক। এতে কোন সন্দেহ নেই যে লিরিকে ন্যারেটিভের ব্যবহার নিতান্তই উপাদানগত, কেননা দুই ধরনের রচনার অভিপ্রায় ও প্রেরণাভূমি সম্পূর্ণভাবে আলাদা। যেখানে বর্ণনামূলকতাই মূল অভিপ্রায়, সেখানে ন্যারেটিভে একটা নূতন প্রত্যাশা যুক্ত হয়ে যায়, গল্পের প্রত্যাশা; কিন্তু লিরিকে ন্যারেটিভের উপাদান একটা পরিবেশ, একটা ছবি, বা অনুভূতিময় আত্ম-প্রকাশের একটি আধার-খণ্ড রূপেই সংলগ্নতা পায়। জীবনানন্দের কবিতায় ন্যারেটিভের

উপাদানের ব্যবহার বিচ্ছিন্ন ও সাময়িক মাত্র নয়, একটা গুরুতর প্রাকরণিক তাৎপর্যেই তিনি তা ব্যবহার করেছিলেন।

খুব স্পষ্টভাবে না হলেও, বুদ্ধদেব বসুই সম্ভবত এদিকে আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি যখন লেখেন 'তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল', তখন তিনি জীবনানন্দের কবিতার ন্যারেটিভ্ লক্ষণের প্রতিই সংকেত করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানি যে, ন্যারেটিভের প্রধান লক্ষণই বিষয়পরতা, অথচ জীবনানন্দ আত্মগত বলেই গীতিকবিতার লেখক। একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য-পরিমণ্ডল তিনি এই ভাবে রচনা করছেন :

> মিনারের মতো মেঘ সোনালী চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
> বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
> নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার তীরটিরে মাখে ;
> খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে,
> বাতাসে ঝিঁ ঝিঁ-র গন্ধ—

এখানে বিবরণধর্মই মুখ্য, সন্দেহ নেই ; তথাপি লক্ষণীয় যে কবির ব্যক্তি-অনুভূতির স্পর্শেই এখানে চড়ুয়ের ডিম নীল, বা উঠোনের জ্যোৎস্না জ্যোৎস্নার উঠোন হয়ে যায়। অব্‌জেক্টিভ্ প্যাটার্নের যথাযথতার ভিত্তিকে তা হলে কি এই ভাবেই তিনি শিথিল করে দিতে চেয়েছিলেন ? অথবা সাব্‌জেক্টিভ্ ধর্ম এইভাবেই অব্‌জেক্টিভ্ প্রকৃতিকে বিপর্যস্ত করে ? বাইরের দিক থেকে দেখলে এর যেকোনোওটা আপাতত মনে হতে পারে অবশ্য, কিন্তু বিবরণ-ধর্মে এই রকম ব্যাপার কার্যকালে অনেক সময়েই ঘটে থাকে, তাতে ন্যারেটিভ্ রচনার প্রকৃতি স্খলিত হয় না। 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিবরণমূলক অংশ এই রকম :

> এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অনতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিকজাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

ন্যারেটিভের এই বিবরণ-ধর্মী অংশে বিষয়ের সঙ্গে কল্পনার একটি মাত্রা যুক্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার অব্‌জেক্টিভিটির ভিতটি এতে দুর্বল হয়েছে বলে হয়তো কেউ অনমনীয়ভাবে দাবি করবেন না। Actual-এর Virtual-এ রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেই আসলে এই যোগটি থাকে।

জীবনানন্দের ঢঙ্‌টি, ফলত, ন্যারেটিভেরই। 'বনলতা সেন' কবিতায় তিনি যখন লিখলেন :

> হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
> সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
> অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
> সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
> আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
> আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

তখন এই বিবরণাত্মক অংশটিকে বিষয়গত উপস্থাপনাতেই তিনি চরিতার্থ করেন। 'আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন'—এই পংক্তির মতো নিতান্তই সংবাদ-জ্ঞাপক বিষয়নিষ্ঠ পংক্তিটিও প্রসঙ্গত লক্ষ্য করতে বলি। এই অংশের মধ্যে ব্যক্তি-স্পর্শ বিষয়নিষ্ঠাকে যদি কিছু আহত করে থাকে, তা ওই হাজার বছর ধরে পথ হাঁটবার অসম্ভাব্যতার পরিকল্পনা, এবং বহিরঙ্গভাবে উত্তমপুরুষের উচ্চারণ।

তথাপি বর্ণনামূলক কবিতা রচনা করা তাঁর অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না ; একটি পরিবেশ, একটি দৃশ্যচিত্র বা অনুভূতিময় আত্মপ্রকাশের উদ্দীপনভূমির উপস্থাপনাতেই ন্যারেটিভের ঢঙ্‌টিকে তিনি ব্যবহার করে গেছেন। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতার এই বর্ণনামূলক পদ্ধতির ব্যবহার frequency-র দিক থেকে একটু বেশি বলে মনে হতে পারে, এবং তার মধ্য দিয়ে তিনি অন্তত একটি বিশেষ ফললাভ করেছিলেন। তিনি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সূক্ষ্মতায় লক্ষ্য করবার একটি প্রকরণগত সুযোগ এই ভাবে তৈরী করে নিয়েছিলেন। বর্ণনাধর্ম লিরিকে উপাদানমাত্র বলে বর্ণনাধর্মী রচনায় বিষয়ের অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের যে সুযোগ থাকে, এখানে তা থাকে না। অথচ জীবনানন্দের বর্ণনায় এই ডিটেলের ব্যাপারটি তাঁর কবিতার আস্বাদনভূমির একটি বড় অংশ অধিকার করে আছে।

ন্যারেটিভের অনেকগুলি উপাদানই জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছিলেন। অবশ্য অন্যান্য সাহিত্যশিল্প থেকে লিরিকের গঠনগত ব্যবধানটি যে সম্পূর্ণ মৌলিক, একথা সম্ভবত ঠিক নয় ; লিরিকের মধ্যে যে-সব উপাদান ব্যবহৃত হয়, সাহিত্যের অন্য শ্রেণীতেও তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে। লিরিকের উচ্চারণ উত্তমপুরুষের উচ্চারণ ; কিন্তু ব্যালাড, উপন্যাস, এমন কি প্রবন্ধ সাহিত্যেও এই রীতির অনুসরণ কখনো কখনো দেখা যায়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে, ঐ-সব ক্ষেত্রে এই রীতির ব্যবহার ব্যতিক্রম মাত্র, লিরিকের ক্ষেত্রে তা স্বতঃসিদ্ধ। এইরকম ভাবেই আবার দেখা যাবে যে, প্রত্যক্ষ সম্বোধনমূলক উক্তি ঐ-সব রচনার একটি সামান্য লক্ষণের মতো :

মৈমনসিংহ গীতিকায় : 'তুমি হও গহীন গাঙ্, আমি ডুব্যা মরি।'

কিম্বা, চন্দ্রশেখরের উক্তি : 'প্রতাপ, তবে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন ?'

কিন্তু লিরিকে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন :

'জাগায়ো না, ওরে জাগায়ো না।
ও আজি মেনেছে হার
ক্রূর বিধাতার কাছে।'

বা, জীবনানন্দ বলেন :

'শোনো,
তবু এ মৃতের গল্প'

তখন, বহিরঙ্গে সম্বোধনধর্মী প্রত্যক্ষতায় এর উচ্চারণ নির্ধারিত হলেও, এ যে প্রত্যক্ষ উক্তিমূলক বাচন নয়, তা আমরা অনায়াসে বুঝে নিতে পারি, একে লিরিকের একটি সাংগঠনিক লক্ষণ রূপে সহজেই নিরূপণ করে নিই। এখানে কোন চরিত্র কথা বলছে না, এমন কি লেখক পাঠককে উদ্দেশ্য করেও বলছেন না, এটা নিতান্তই একটা পদ্ধতি, যাকে লিরিকের কবিরা কখনো কখনো ব্যবহার করে থাকেন তাঁদের মন্ময় আত্মপ্রকাশে নৈর্ব্যক্তিকতার একটা মাত্রা যোগ করা সম্ভব হয় বলে।

তথাপি, দেখা যাবে, ন্যারেটিভ্ কবিতার পক্ষে স্বাভাবিক উপাদান—উক্তির ব্যবহার—তার ন্যারেটিভ্ লক্ষণ নিয়েই জীবনানন্দর কবিতার শরীর-গঠনে ঘনিষ্ঠযোগে গৃহীত হয়েছে। ন্যারেটিভের উক্তি স্পষ্টতই চরিত্রের উক্তি, অর্থাৎ এক চরিত্র অন্য চরিত্রের প্রতি উক্ত ; ফলে, সেখানে উক্তির চরিত্র ব্যক্তিক। চরিত্রের মুখে উক্তি স্থাপনের এই রীতিটি জীবনানন্দ প্রগাঢ় মনস্কতায় তাঁর উচ্চারণের সংলগ্ন করে নিয়েছিলেন :

'আমাকে খোঁজ না তুমি বহুদিন—কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি না'ক ;—এক নক্ষত্রের নিচে তবু—একই আলো পৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি ; পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়,
হয় নাকি ?'—বলে সে তাকাল তার সঙ্গিনীর দিকে ;

এখানে 'সে'-সর্বনামের আড়ালে নারীর সঙ্গীর উক্তিকেই আমরা পাচ্ছি। 'হয় নাকি ?'—এই জিজ্ঞাসা বা সংশয় উচ্চারণ করেই 'সে তাকাল তার সঙ্গিনীর দিকে'। অর্থাৎ প্রত্যক্ষরেখায়, বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেই, বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে সঙ্গীর এই উক্তি সঙ্গিনীর উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত। স্পষ্টভাবে উদ্দিষ্টমুখী হলেই উক্তির যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় ; এখানে সঙ্গীর উক্তিকে সেইরকম ভাবেই যোগ্য করে তোলার চেষ্টা আছে। ঠিক একইভাবে সঙ্গিনীর উক্তির উত্থাপন করা হয়েছে :

নারী তার সঙ্গীকে : 'পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়, জানি আমি ;……'

নারীর এই উক্তিতে স্পষ্টতই সঙ্গী প্রেমিকের উক্তি-খণ্ড—'পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়'—অংশের অনুমোদন, অর্থাৎ প্রশ্নের প্রত্যক্ষ উত্তর। উক্তি-প্রত্যুক্তির এই প্রত্যক্ষতা নিয়েই ন্যারেটিভে তার সংস্থান। জীবনানন্দ চরিত্রের মুখে উক্তি স্থাপন করে ন্যারেটিভের একটি উপাদানকে প্রায় তার সামগ্রিক ধর্ম নিয়েই এখানে গ্রহণ করেছিলেন বললে ভুল হয় না। কিন্তু নারীর উক্তির পরবর্তী অংশটিও এখানে লক্ষ্য করা জরুরী : নারী তার সঙ্গীকে বলছে :

'পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি ,—তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বল :—একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা
তারপর ঝরে গেছে ; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের—প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—'

প্রেমিকের প্রশ্নে পৃথিবীর নিয়মের বর্ণনা ছিল, সঙ্গে কিছু সংশয় : 'হয় নাকি ?'। প্রেমিকার উত্তরে নিঃসংশয়তা :—'পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়', বা 'তারপর ঝরে গেছে', —সমস্তই 'জানি আমি ;' কিন্তু তবু তো কিছু থাকে, কিছু মনে হতে পারে :

'তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের—প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরত না যদি……'

এই একান্ত ইচ্ছাই বোধহয় বিষয়কে কালের হাত থেকে মুক্তি দেয় ; এখানে বিষয় প্রেম, প্রেমের অনুভূতি এইভাবে চিরন্তন বিষয় হয়ে যায় ; তথাকথিত বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হয়, ফলে তার কালগত চিহ্নেরও পরিবর্তন ঘটে। এতক্ষণ পর্যন্ত যেখানে ছিল পুরাঘটিতের সঙ্গে বর্তমান, সেখানে তাই এলো ভবিষ্যৎ :

এই নারী—অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে,

বা, খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ইপ্সিতেরে তার।

কবিতাটি এখানেই শেষ। ভালোবাসাকে কাল-নিরপেক্ষ সত্যভূমিতে আশ্রিত ও আশ্বস্ত দেখতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি কালের হাতে তার সমর্পণও দেখে এসেছেন ; দেখেছেন :

ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

এবং কবিতার ওই তৃতীয় স্তবকে, যেখানে পংক্তি-সংখ্যা মাত্র আট, তার ছোট্ট পরিসরেই কবি সমস্ত দ্যোতনাটির রচনা শেষ করেছিলেন :

সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন ; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে ;—চিলের সোনালী ডানা হয়েছে খয়েরি ;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে ;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

নিয়ম ব্যাপ্ত ; কিন্তু দুজন যে প্রান্তরে দাঁড়িয়েছিল সেই প্রান্তরও ব্যাপ্ত। চারধারে ঝরে যাওয়া আর মরে যাওয়া, তারই মধ্যে দুজনের দাঁড়িয়ে থাকা, এবং সন্ধান। সন্দেহ নেই, এ আশ্রয় ও আশ্বাসেরই সন্ধান, এবং তারা দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রান্তরে, যা আশ্বস্ত করে, আশ্রয় দেয় :

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে……

আর এখানে এসে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না, কবি পেয়ে গেছেন সেই বিষয়াশ্রিত পরম্পরতা, যার পর কবিতার অন্তিম স্তবকে প্রেমিকের মনে হওয়া—'এই নারী—অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে' ইত্যাদি সমস্ত আয়োজনই উপরন্তু বলে মনে হতে পারে। আসলে বিষয়াশ্রিত পরম্পরতা অর্জনের মধ্য দিয়েই কবিতায় নির্ব্যক্তিকরণের কাজটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে সম্পন্ন হয়ে যায় ; কবি তথাপি ন্যারেটিভের উপাদান ব্যবহার করেছেন, উক্তি স্থাপন করেছেন প্রথম পুরুষের মুখে, চরিত্র আমি নয়, শুধুই সে এবং সে। সন্দেহ নেই, ন্যারেটিভের প্রথম পুরুষ চরিত্র ও তার উক্তি একটা অব্‌জেক্টিভ্‌ প্যাটার্নেরই অন্তর্গত ব্যাপার, এবং জীবনানন্দ ন্যারেটিভের এই ধরনের উপাদান কবিতায় সাংগঠনিক তাৎপর্যে স্থাপন করে রূপগত দিক থেকে সম্ভবত এক ধরনের নির্ব্যক্তিকতা প্রতিশ্রুত করতে চেয়েছিলেন। 'লোকেন বোসের জর্ণাল' বা 'জুহু'-র সোমেন পালিতের গল্পও এই প্রসঙ্গে মনে আসতে পারে। তথাপি 'দুজন' কবিতায় যেমন দেখা গেল ন্যারেটিভের উপাদান উপরন্তু মাত্র, তা আমাদের এই রকম একটা ভাবনার ক্ষেত্রে এনে

পৌঁছে দেয়, যেখানে মনে হতে পারে, অথবা সঙ্গতভাবেই মনে হওয়া উচিত যে, তিনি সচেতনভাবেই চেয়েছিলেন আখ্যানের প্রচ্ছদ, 'ক্যাম্পে' কবিতায় যেমন করেছিলেন সেই রকম correlative রচনার জন্যে শুধু নয়, রূপের একটা নিয়মের মধ্যে, কিন্তু আখ্যানমূলক কবিতা না লিখে, লিরিকের কবি হিসেবেই।

চরিত্রের মুখে উক্তি স্থাপন করে কবিতার অবয়ব রচনায় একটি প্রকরণ জীবনানন্দ ঘনিষ্ঠ মনোযোগে চর্চা করে গিয়েছিলেন, এবং এই চরিত্র-ও বিচিত্র। ইতর প্রাণী, এমন কি অপ্রাণীর মুখেও উক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করি :

ইতর প্রাণী :

থুর থুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
চোখ পালটায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু'-একটা ইঁদুর এবার—'

বৃক্ষ :

বলিল অশ্বত্থ ধীরে : 'কোন দিকে যাবে বলো—তোমরা কোথায় যেতে চাও ?'

চাঁদ :

মেঠো চাঁদ বলে :
'আকাশের তলে
ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে,—ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে,—চলে গেছে কবে।'

নক্ষত্র :

'তোমারি নিজের ঘরে চলে যাও'—বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে—
'অথবা ঘাসের 'পরে শুয়ে থাকো আমার মুখের রূপ ঠায় ভালোবেসে'।

এইরকম ভাবে তিনি যে তাঁর কবিতাকে নির্মিত হতে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে কবির কোনো বিশিষ্ট অভিপ্রায় ছিল বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক ; ন্যারেটিভের উপাদান ব্যবহার করেও তার মধ্যে একটি নূতন মাত্রা তিনি যোগ করেছিলেন। পুরাণের জগতে বা রূপকথার জগতে আমরা এই রকম ব্যবহার দেখি ; সেখানে পাখি কথা বলে, গাছ কথা বলে, এমন কি বৃহত্তর নৈসর্গিক উপাদানের ক্ষেত্রেও মানবিক আচরণ চরিতার্থ হতে দেখা যায়। রূপকথা বা পুরাণ কথামূলক সৃষ্টি, এবং কথামূলক রচনার উপকরণ ব্যবহারে তিনি আদি অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগিয়েছেন। আদিকথাতে গল্প থাকে ঠিকই, কিন্তু সেই গল্পকে ঘিরে থাকে কল্পনার একটা বায়ুমণ্ডল, যেখানে সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা লুপ্ত হয়ে যায়, এবং গল্প তার গল্পমাত্রতাকে অতিক্রম করে একটা বিস্তীর্ণ আয়তনকে স্পর্শ করে। জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় যে আখ্যানধর্মকে সংলগ্ন করতে চেয়েছেন, তাতে আখ্যানমূলক রচনার ঘটনাঘনিষ্ঠতার বেগ নেই, এমন কি উক্তির ব্যবহারেও নেই। ন্যারেটিভে উক্তি গতিশীল ও সকর্মক, লিরিকে তা নিতান্তই একটা প্রকরণ। রূপকথার জগতের শিথিল মন্থরতা গল্পের মধ্যেই আরেকটা জগৎ গড়ে

দেয়, যা বিস্ময়ের, কল্পনার ও বিশ্বাসের জগৎ। জীবনানন্দের কবিতা ন্যারেটিভের লক্ষণকে গ্রহণ করতে গিয়ে ন্যারেটিভের ক্রিয়াশীলতার বেগকে পরিহার করে এবং সমান্তরাল মন্থরতায় তার মধ্যে একটা স্তরবদ্ধ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, যা দূরস্মৃতির কালের মতোই বিস্তীর্ণ অথচ সংবৃত ; অর্থাৎ তিনি তাকে গ্রহণ করেন 'in state, not action.'

লিরিক কবিতায় ন্যারেটিভের উপাদান রবীন্দ্রনাথও প্রায় অনর্গল ব্যবহার করেছিলেন, অন্যান্য কবিরাও স্বভাবতই করেছেন। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় ন্যারেটিভের উপাদানকে গুরুতর সাংগঠনিক তাৎপর্যে ব্যবহার করবার প্রবণতা ধরা পড়ে। হতে পারে, এর মধ্য দিয়ে তিনি ব্যক্তিত্বের নির্বাপণ সম্ভব বলে মনে করেছিলেন ; অথবা হতে পারে, এর মধ্য দিয়ে একটা spatial illusion সৃষ্টি করার প্রাকরণিক সুবিধে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ; কিন্তু এটা যে তাঁর কবিতার একটি প্রধান উচ্চারণ-সূত্র রূপে কার্যকর হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গত, একটা কথা বলে বক্তব্য শেষ করি : জীবনানন্দের এই প্রকরণের আশ্চর্য প্রাণময় উত্তরসাধনা পঞ্চাশের দশকের একজন কবির মধ্যে অন্তত বিশিষ্ট হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। তিনি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এবং স্মরণ করি, আলোকরঞ্জনকে কবিতা-সম্পর্কিত ভাবনায় এই রকম একটা জিজ্ঞাসায় অতঃপর আন্দোলিত হতে দেখা গেছে : কবিতার নূতন মুক্তি আমরা কোথায় খুঁজবো ? আমাদের আবশ্যিক মুক্তি কি তবে ব্যালাডের জগতে ? অথবা তার প্রকরণে ?

আমরা জানি যে, ব্যালাড ন্যারেটিভের শ্রেণীচিহ্নভুক্ত, এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় তা স্মৃতিকালের অন্তর্গত।

এবং এই জিজ্ঞাসার মধ্যে জীবনানন্দের উত্তরসাধনার ধ্যান নিহিত হয়ে আছে কিনা, তা নিশ্চয়ই অধিকতর মনস্ক বিবেচনায় কেউ পরীক্ষা করে দেখবেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার ভাবলোক

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

প্রেমেন্দ্র মিত্র আধুনিক কবিকুলের প্রবীণ কবি বললে বোধ হয় কিছু অন্যায় হবে না। কল্লোল যুগের যে কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শ এবং প্রথাপ্রকরণ থেকে নতুন পথের অনুসন্ধান করছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই কবিগোষ্ঠীরই একজন। বোধ হয় তিনিই প্রথম বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মর্যাদাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—যাতে বোঝা যায় যে সাধারণ মানুষের ঘরেরই একজন যেন নিজের দুঃখসুখের উপস্থাপনা করছেন। তাঁর আগে বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষকে নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রানুসারী কবিকুল সাধারণ মানুষের প্রতি সমবেদনা দেখিয়েছেন, মাহাত্ম্যপ্রকাশ করেছেন। সেখানে সাধারণ মানুষ ন্যায়ের বিচারে শাসিত হোক এমন ধরণের একটা সার্বিক আবেদন—তা সে প্রকাশ্যেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, করা হতো। সাধারণ মানুষের প্রতি যেন মমত্বের অভাব না ঘটে, সাধারণ মানুষ যেন মানবিক করুণা থেকে বঞ্চিত না হয়! এরই মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রই প্রথমে ঘোষণা করলেন—অতি সাধারণের কবি তিনি। তাঁর কাব্যে দেখা গেল অতি সাধারণ মানুষ হিসাবেই তিনি সাধারণ মানুষের কথা বলছেন, আবেদন নিবেদনের অনুনয় নেই, মানব মাহাত্ম্যের আদালতে ন্যায় বিচারের অনুরোধ নেই!

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'প্রথমা', এটি ১৯৩২ সালে অর্থাৎ কবির যখন বয়স ২৮ বছর, তখন প্রকাশিত হয়। এখানেই কবি ঘোষণা করলেন—

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের মুটে মজুরের
—আমি কবি যত ইতরের।

কামারেব সাথে হাতুড়ি পিটাই,
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে
জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায়!
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ, . .
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
—কুঠার ঘায়!
সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,

স্বপ্ন বাসরে বিরহিনী বাতি

মিছে সারারাতি পথ চায়,

হায় সময় নাই !

কবির প্রথম যৌবনে এই কবিতাটি লিখিত হয়েছে, দেশে তখনো আজকের মতো নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি এমন দরদ ও মমতা প্রদর্শনের রেওয়াজ ছিল না, মুটে মজুর, কামার কুমোর, কুলিকামিনের প্রতি সম্ভ্রমবোধের চিন্তাও খুব বেশী ছিল না, তাদের বেদনা নিয়ে এমন লেখা তৎকালীন যুগে নিশ্চয়ই গতানুগতিক থেকে সরে আসা, এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র—তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা'-তেই এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন। আর এই কবিতাটি সাময়িক পত্রে প্রকাশমাত্রই তাঁকে নতুন দিগন্তের যুগান্তকারী কবি বলে চিহ্নিত করা হয়।

'প্রথমা'-র প্রথম কবিতা 'লক্ষ্যভ্রষ্ট', সেখানেও সাধারণ মানুষের প্রতি কবির ভাবনা ও বেদনা রূপায়িত হয়েছে। মাটির পৃথিবীতে কল্পিত দেবদেবী অপেক্ষা মাটির মানুষকেই ভালবাসতে হয়। 'বেনামী বন্দর' কবিতাটির বহিরঙ্গিক অর্থের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে নিলে দেখতে পাবো যে এখানে সমুদ্র, ভাঙা জাহাজ আর বন্দরের রূপকথার আড়ালে নিপীড়িত, নির্যাতিত পঙ্গু মানুষের প্রতি কবির অগাধ সমবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের তাবৎ যুদ্ধে যারা পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে, ধনতান্ত্রিক সমাজে রসদ জুগিয়ে যারা এখন অবসিতশক্তি, সমাজের চোখে শোষকশ্রেণীর গদিতে তারা আজ ভাঙা জাহাজের মতই বাতিল বলে গণ্য। আধুনিক যুগের এই ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ যতদিন মুনাফালাভে সাহায্য করতে পারবে, ততদিনই তার খাতির, সেখানে মানবতার কোনও মূল্য নেই। ভাঙা জাহাজের রূপকতায় কবি তাদেরই কথা বলেছেন, তাদের জন্যেই তাঁর দরদ—

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙা জাহাজের ভীড়,
শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেল
আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কব্জা ও কল বেগড়াল অবশেষে,
জৌলস গেল ধুয়ে যার আর
পতাকাও পড়ে নুয়ে,
জোড় গেল খুলে,
ফুটো খোলে আর রইতে যে নারে ভেসে,
—তাদের নোঙর নামাবার ঠাঁই
দুনিয়ার কিনারায়
—যত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নীড় !

'প্রথমা' গ্রন্থের আর একটি কবিতার উল্লেখ এখানে করা একান্ত দরকার। সেটির নাম 'দেবতার জন্ম হ'ল'। এখানেও দরিদ্র সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে।

সাধারণ মানুষের গৃহে দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে মাটির কোলে মায়ের বুকে যে দেবতার জন্ম—সে ত' একেবারেই সাধারণ মানুষ। তার পরিচয়—

জীর্ণ গৃহ, আবর্জনা চারিদিকে
তার মাঝে আলোহীন বায়ুহীন কক্ষে,
ছিন্নশয্যা 'পরে শুয়ে
রোগ-রুক্ষ ক্ষুধা-ক্ষীণ দেহ লয়ে
দেবতা আমার
ফেলে দীর্ঘশ্বাস।

এবং

আজ
বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে
কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর।

'প্রথমা'র 'দ্বার খোল' কবিতাতেও নিঃসম্বল মানুষের প্রতি সমবেদনা ধ্বনিত হয়েছে—নতুন জীবনবিধান যা নিঃস্ব মানুষকে আনন্দ দেবে, কবি তার প্রতিষ্ঠাই চান। 'পাঁওদল' কবিতায় তিনি মলিন কোর্তাপরা কলকারখানার কুলি, মূর্খ মজুর, মাঠের চাষা, জাহাজের খালাসী, পথের মুটে—সকলকেই সম্মানিত আসন দান করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কবিতার নাম মনে পড়ছে, 'ফেরারী ফৌজ' গ্রন্থের 'জনৈক' কবিতাটি। কবিতাটি প্রতীকী, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি কবির ভালবাসা যে কত নিবিড়—তারই পরিচয় এই কবিতার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ধরা আছে। তাঁর 'ফোঁড়া' নামের যে কবিতাটি 'হরিণ চিতা চিল' গ্রন্থে আছে—তার প্রতীকতা উন্মোচন করলে দেখা যাবে যে 'ফোঁড়া'-কে তিনি অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়নের প্রতীক করেছেন, এই কবিতায় তিনি বলেছেন যে সাধারণ মানুষ দেহে এই বিষফোঁড়া বহন করবে না, অপারেশন করে ফেলবেই!

সুতরাং প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার ভাবলোকের পরিচয় দিতে গিয়ে আমাকে তাই প্রথমে তাঁর সাধারণ মানুষকে নিয়ে লেখা কবিতার উল্লেখ করতে হলো।

কিন্তু তাঁর সমগ্র কাব্যরাজ্য পরিভ্রমণের পর আমাদের কাছে তাঁর মানসিকতার আর একটি বিশেষ দিক চোখে পড়ে। এই শ্রেণীর কবিতার সংখ্যা যদিও খুব বেশী নয়, তবু তাঁর সমগ্র কবি জীবনেই এই চিন্তার পরিচয় রয়ে গেছে, এবং কবির ভাবলোকে তা প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

'সহজ সাধারণ ছকবাঁধা জীবনকে কবি এড়িয়ে যেতে চান, জীবন হবে উদ্দাম, মৃত্যুও ছকবাঁধা পথে আসবে না। জীবনের গতি দুঃসাহসিক অভিযানের মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হোক। 'প্রথমা' থেকেই এই বোধের পরিচয় পাওয়া গেছে। 'সুদূরের আহ্বান' কবিতাতেই প্রথম বোঝা গেল যে কবি ছক-বাঁধা জীবনকে তেমন পছন্দ করছেন না, শুধু ছকবাঁধা জীবনকে নয় ছকবাঁধা মৃত্যুও তাঁর অভীপ্সিত নয়। অগ্নি-অক্ষরে যারা নিজেদের নাম আকাশে খোদাই করার ব্রতে দীক্ষিত হয়েছে, যাদের জীবন ও মৃত্যুরূপ দুই বল্গাহীন তুরঙ্গ উদ্দাম—কবি অন্তরে তাদের দলেরই দলী।

রক্তে আমার অমনি গতির নেশা ;
নাসায় অগ্নি স্ফুরিছে যাহার, বিজলী ঠিকরে ক্ষুরে
আমি শুনিয়াছি সে হয়রাজের হ্রেষা।

ছকে ফেলা জীবন, বাঁধা সড়ক ধরে চলা, গতানুগতিক চক্রে পরিক্রমা—কবির ধাতে নেই। কবি তা থেকে বেরিয়ে আসতে চান ; দুরন্ত, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্দমের প্রতিই তাঁর আন্তরিক টান।

'নটরাজ' কবিতাতেও এই উদ্দাম বাঁধনছেঁড়া উন্মাদনার প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। সাধারণ জীবনে মায়া মমতার আবরণ, স্নেহসোহাগের টান থাকে, তবু সেখানে জীবন-মহাদেবের নৃত্য ঘটে, নীহারিকা মালায় ঠোকাঠুকি হয়, সমুদ্রবুকে বাড়বানলের জ্বালা নিয়ে দুর্দমনীয় যন্ত্রণা জাগে। কবির তখন মোহের গানে মুগ্ধ হলে চলবে না।

ইহবাদিতাই জীবনের শেষ কথা নয়, ছকবাঁধা পথে ভোগবিলাসের মধ্যে আপাত সুখের খনি মনে করে তাৎক্ষণিক আরামকে চিরকালীন ভাবা ভুল। এই জীবনে যা পাচ্ছি—তাই স্বর্গসুখ বলে খুসী হবার কারণ নেই, কালের ডঙ্কা ঠিক বেজে চেলে—

সকল সুখের পাছে আছে সমাপ্তিরই শঙ্কা রে !
শিবের সাথে শ্বস্‌ছে রে শব,
সৃষ্টি সাথে ধ্বংসোৎসব
কালভৈরবে হুঙ্কারে। (ইহবাদী, প্রথমা)

সুতরাং জীবনের সুখকে ছিনিয়ে নিতে হবে, মধুমাসের মহোৎসবকে দস্যুতার মাধ্যমে লুটে নিতে হবে। 'ইহবাদী'র মত দীর্ঘ কবিতায় কবি এই কথা বলেছেন। সর্বত্রই জীবনের অন্য এক মানে—যা পরিচিত নয়, গতানুগতিক নয়, সদা-আচরিত নয়—সেই অন্য মানের প্রতিই কবির একাগ্রতা !

'সম্রাট' গ্রন্থের 'কাঠের সিঁড়ি' কবিতা—যেটিকে প্রতীক কবিতা বলে ধরে নিতে হয়, সেখানেও তিনি বলছেন—যা অনড়, অচল, গতানুগতিক —তার কোনো সম্ভাবনা নেই ; যে বিধিবিধান ভাঙতে পারে, সম্ভাবনার নতুন দিগন্তে উন্মুক্ত হতে পারে—তারই জয় হবে। কাঠের সিঁড়ি—যে নাকি নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতার প্রতীক—কোনোদিন আকাশে পৌঁছতে পারবে না।

বাঘের কপিশ চোখে কবি জঙ্গলের ছায়া দেখেছেন, চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্ধ বাঘের চোখে কবি কিন্তু টেরাই-এর জঙ্গলের ছবিই দেখেছেন, তার নিঃশব্দ বিক্রমে সঞ্চরণ, বজ্ররব, তীব্র আর্তনাদ, নখদন্ত-আস্ফালন—সবই যেন নিরর্থক ; কিন্তু অরণ্যে হিংসা বর্ণহীন ক্ষুধার মতো, 'বস্তুর প্রবাহচক্রে মৃত্যু শুধু দ্বার'। অরণ্যে যে শিশু-তরু আকাশ দেখতে পায়নি, সে তবু কৃপার কাঙাল নয়, বনস্পতির সঙ্গে দয়াহীন মৃত্যুর সংগ্রামে রত থাকে।

দুর্বোধ দৃষ্টিতে তার
আমি দেখি টেরাই-এর জঙ্গলের ছবি !
—উদ্ভিদের নিঃশব্দ সংগ্রাম
নির্লজ্জ ভয়াল

কাঁটায় কাঁটায় দ্বন্দ্ব, শিকড়ে শিকড়ে,
মহীরুহ রুদ্ধশ্বাস লতিকার মৃত্যু-আলিঙ্গনে ;
শিশুতরু পায় নি আকাশ,
তবু নহে কৃপার কাঙালী ;
বনস্পতি সাথে যোঝে দয়াহীন মৃত্যুর সংগ্রামে।
(বাঘের কাঁপশ চোখে)

'নীলকণ্ঠ' প্রেমেন্দ্র মিত্রের বহুপঠিত একটি বিশিষ্ট কবিতা, এখানেও কবির সেই একই জীবন-দর্শন। যে জীবন দুর্দ্ধর্ষ, যে জীবন দুঃসাহসিক, কবি সেই জীবনের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়েছেন, সেই জীবনকে প্রশংসিত উচ্ছ্বাসে বরণ করতে চেয়েছেন—

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !
অরণ্য ডাকে ওই,—যাই !
সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার
চোখে তার মৃত্যুর রোশনাই !
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !
বনপথে বিভীষিকা, বিঘ্ন,
আমাদেরো বল্লম তীক্ষ্ণ !
কাপুরুষ সিংহ ত' মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই !
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই ! (নীলকণ্ঠ, সম্রাট)

এই নিয়ম ছাড়া, রীতি বিগর্হিত জীবন মৃত্যুর তীব্র তপ্ত ঝাঁঝালো স্বাদেই কবির পরিতৃপ্তি, তাই কবি অনায়াসেই বলেন—

ভরাট-করা সমুদ্র আর উচ্ছেদ করা অরণ্যের জগতে
কি লাভ গড়ে কৃমিকীটের সভ্যতা
লালন করে স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ু
কচ্ছপের মত ?
অ্যামিবারও তো মৃত্যু নেই।
মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার
আর
শিব নীলকণ্ঠ !

'সাগর থেকে ফেরা' গ্রন্থের 'আবিষ্কার' কবিতাতেও এই সুর। মৃত এক মহাদেশ তিনি আবিষ্কার করেছেন—যার নদী প্রান্তর পাহাড় কতবার জীবনের ছক পেতে খেলা সাজিয়েছে, শেষে মাৎ হয়ে মহা বিলুপ্তির দণ্ড মাথায় পেতে নিয়েছে, সেই খানেই

নিঃসঙ্গ নাবিক ফের
বাঁধি পোত শ্মশান-বন্দরে
তরীর কঙ্কাল যত, যেখানে বিছানো স্তরে স্তরে
—দুঃসাহসী দুরাশাবশেষ।

কবির ঘোষণা—

মৃত সেই মহাদেশ
আরবার করি বিদ্রুপ,
একটি 'পুদগল' বীজ করিতে বপন।

'হরিণ চিতা চিল' গ্রন্থের শীর্ষনাম কবিতাটির মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যলোকের এই ভাববলয়টি পূর্ণাঙ্গরূপ নিয়েছে। কবি প্রত্যেক কবিতাতেই নতুন পদ্ধতির আশ্রয় নেন, এবং ক্বচিৎ তিনি একই প্রকরণ ব্যবহার করে থাকেন। 'হরিণ চিতা চিলে' কবি প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। হরিণ হলো স্বাধীন মানসের প্রতীক। কবি প্রশ্ন করছেন—কঠোর দুরন্ত জীবন থেকে কি পালানো যায়? আর পালালে কি সেই শান্তি কাম্য বলে গণ্য হবে? মৃত্যুর ঝুঁকি যদি বহন করতে না হয়—তবে সে জীবন পঙ্গু; হরিণ—যে স্বাধীন বোধের প্রতীক—সেও যদি ঝুঁকি না নিয়ে পালাতে চায়—তবে তার আশ্রয় হবে জাদুঘরে, তার অবোধ চাউনি থাকবে বরফে জমানো।

চিতাকে কবি আদিম বন্যতার প্রতীক করে এঁকেছেন, সব প্রাণীর মধ্যেই সহজাত আবেগ-প্রাধান্য পাক—কবি তাই চান, তাতে ভালবাসা যদি দুঃসহ হিংসার তাপে পুড়েও যায়, ক্ষতি নেই, দুর্দ্ধর্ষতার মহিমাই কবি চান। আর চিল হলো নিয়মতান্ত্রিকতা এবং গতানুগতিকার প্রতীক। সে নিয়ন্ত্রিত জীবনের প্রতি মোহাবিষ্ট—আকাশে উঠলেও তাকে নামতে হবে নীচে, ছোঁ মেরে যা নেবে—তাও যে 'স্বস্তির উচ্ছিষ্ট'—সে কথাও কবি ঘোষণা করেছেন। গতানুগতিকতায় বাঁধা পড়লে জীবনের অর্থই ত' সে হারিয়ে বসবে।

'অথবা কিন্নর' গ্রন্থের 'বুড়ি' কবিতাটির কথাও স্মরণ করা চলে এই প্রসঙ্গে। এখানেও প্রতীকতা, অবশ্য এই প্রতীক ব্যবহার হরিণ চিতা চিলের মতো দুরূহ নয়। কবিতাটির মাধ্যমে কবি ছকবাঁধা গতানুগতিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখিয়েছেন, এবং সে জীবন যে ছায়াবাজির সামিল—সে কথা বলতে দ্বিধা করেন নি। কবিতাটির গোড়ার দিকটা এই রকম—

বুড়িটা ছিল ছোঁবার।
তাকেই ঘিরে সাজানো সব খেলা,
—রাতের ঘুম দিনের ঘাম, দোকানপাট, পুজো
ধু ধু শূন্যে রং লাগাবার মেলা।
বুড়িটা গেল কোথা?
নিশানগুলো যেখানে ছিল পোঁতা,
সেখানে শুধু উদোম ফাঁকা মাঠ।
ঝিনি ঠেকোয় ভেস্তা সব ঠাট।
নতুন বুড়ি খুঁজি।
যেদিকে চাই ধাঁধা লাগায় চুড়ো কি গম্বুজ-ই।
কোথায় পাব বুড়ি?
গুঁড়ির খবর নেইক', জীবন শুধুই আলগা ঝুরি।

মানুষের জীবন একটা কিছু কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, একটা ছক থাকে—তাকে আশ্রয় করেই তার জীবন আবর্তিত হয়। সেই ছকটা হলো বুড়ি। কেরাণীর জীবন গতানুগতিক পথে চলে, ধর্মপ্রাণ মানুষের জীবনও অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাসের আদলে অনুবর্তিত হয়, ব্যবসায়ী মানুষ, শিল্পী-শিক্ষক,—সকলের জীবনের যে আশ্রয়, যাকে কেন্দ্র করে জীবনের পথপরিক্রমা চলে, সেই আশ্রয়ই হচ্ছে—বুড়ি। আর এই আশ্রয়কেন্দ্রিক জীবনের প্রতিই কবির অনীহা। সাজানো ছকে জীবনকে না গেঁথে চলাই কবির কাম্য, কিছু মানুষ যদি দেখে যে তার জীবনের বাঁধা গৎ সে ভুলে গেছে, তবে তার সুর যায় হারিয়ে। কাণ্ডহীন গাছের মতো চারিদিকে আলগা ঝুরির জীবনকে শিথিল অর্থহীন মনে হয়। কবি সে জীবনকে নিন্দা করেন।

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সব গ্রন্থেই প্রেমেন্দ্র মিত্র এই বোধের পরিচয় দিয়েছেন, কখনো সরাসরি বক্তব্য প্রকাশে, কখনো ইঙ্গিতে, কখনো বা প্রতীক দ্যোতনার মধ্যে দিয়ে। তাই তাঁর কবিতার ভাবলোকের প্রধান পরিচয়ই হলো—তাঁর জীবন ও মৃত্যুর প্রতি এই দুরন্ত বোধ, গতানুগতিক নয়, দুঃসাহসিক চেতনার মধ্যে দিয়ে জীবনের উন্মেষ ঘটুক, মৃত্যুকেও ছক-বাঁধা পথে এলে চলবে না, তাকেও দুরন্ত হয়ে আসতে হবে।

এ ছাড়া কবির আরো কিছু অনুভব আছে। একটা কথা বলা বোধহয় এখানে অসঙ্গত হবে না যে বিষয়-বৈচিত্র্যে এমন সমৃদ্ধ একালের আর কোনো কবি চট করে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন, অন্ততঃ আমার তা জানা নেই। জীবনানুভূতির সর্বব্যাপক ক্ষেত্রেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিচরণ, জীবনচর্যার প্রতি অভিক্ষেপই তাঁর কাব্যের বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। শহর-জীবনের প্রায় সব দৃশ্যই তাঁর কাব্যে রূপলাভ করেছে, ভাড়াটে কুঠি ও তার বাসিন্দাদের পরিষ্কার চিত্র, গৃহে পুরানো খবর কাগজ বিক্রী থেকে চৌরঙ্গীর জনসমুদ্র, বড়বাজারের ঠেলা-রিকশা-লরি ও মোটরে ঠাসা এবং কিলবিল করা পায়ে হাঁটা মানুষের ভিড়, রোদে হাসা উজ্জ্বল দিন, বৃষ্টিতে ভেজা শপশপে দিন, সমবায় সমিতির সুখ সুবিধা, অলস নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে ডাকা কাকের ছবি, শহর ছাড়িয়ে দূর প্রান্তে একাকী শিমূল গাছের দাঁড়িয়ে থাকা, ভাঙা জীর্ণ নিস্তব্ধ ঘাটের ধারে পুরানো বটগাছের পাতা ঝরানো, যুদ্ধের বিভীষিকা—('আমরা যাই নি যুদ্ধে' কবিতায়) কাঠের টুলে স্থাণুর মতো বসে থাকা প্রহরী, সাগরের আকাশে উড়ন্ত গাঙ-চিল, মঠের বুড়ো সাধু, হৃদয়ে কখন জং ধরে—তার খবর, পর্বতারোহীর দুরন্ত উৎসাহ ('শিখর ছুঁয়ে নামা' কবিতা), পল্লীর মেলার বর্ণনা, দোকানের কথা, রেলপথের সুড়ঙ্গ, ইস্পাত, জাহাজের ডাক, শিকারের চিত্র, দুর্ভিক্ষের সময় ফ্যান চেয়ে খাওয়া মানুষের ছবি, নিষ্ঠুরভাবে তিনটি গুলির সাহায্যে গান্ধীজীকে হত্যা করা—কি নেই তাঁর কবিতায় ? সাময়িক ঘটনা ও চিরন্তন বোধ—সব কিছুই কবির কাব্যকে পুষ্টি দান করেছে।

এতদ্ব্যতীত তাঁর প্রেমের কবিতারও উল্লেখ করতে হয়, তবে বিভিন্ন বিষয় ও প্রেমের আত্মতন্ময় বোধ নিয়ে লেখা কবিতা সাধারণভাবে সকল কবিরই আবশ্যিক কবিকর্ম। সেগুলিকে কোনো কবির ভাবলোকের পরিচয়ে বড় করে তুলে ধরা যায় না, যদি না সেখানে বড় রকমের কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রেমের কবিতায়ও কবির

বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ব্যক্তিক প্রেমের প্রকাশ যেমন আছে, তেমনি প্রেমের সাধারণ বোধ নিয়েও তাঁর কবিতার অভাব নেই। ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম লেখেন চল্লিশ বছর বয়সে, তিনিই একথা ঘোষণা করেছেন 'একক' পত্রিকা আয়োজিত এক কবি-সভায়। তার আগে অবশ্য সাধারণ বোধের বা ধারণার প্রেম-কবিতা তিনি দু একটি লিখেছেন, 'প্রথমা' গ্রন্থের 'ছাদে যেও নাক' কবিতাটির কথা স্মরণ করলেই তা বোঝা যাবে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি প্রেমের কবিতায় প্রেমের ঘনীভূত আবেগ রূপায়িত হয়েছে, আবেগ-ঘনত্বের এমন প্রকাশ আধুনিক প্রেমের কবিতায় বড় একটা দেখা যায় না ; তাঁর 'কথা' কবিতাটির স্বল্পাংশের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কবি আবেগ প্রকাশ করেছেন সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে—

অনেক আশ্চর্য কথা হয়তো বলেছি তার কানে।
হৃদয়ের কতটুকু মানে
তবু সে কথায় ধরে !
তুষারের মতো যায় ঝরে
সব কথা কোন্ এক উত্তুঙ্গ শিখরে
আবেগের।
হাত দিয়ে হাত ছুঁই
কথা দিয়ে মন হাতড়াই,
তবু কারে কতটুকু পাই।
সব কথা হেরে গেলে
তাই এক দীর্ঘশ্বাস বয়।

প্রেমের কবিতায় তিনি বলেছেন যে পুরানোকে কখনোই তিনি ত্যাগ করেন নি। পুরাতনের প্রতি একটি রোমান্টিক রোমন্থনে তিনি বিভোর হয়ে আছেন ; যা-কিছু পুরানো, তার সুরভিত স্মরণ তাঁর কাছে মুগ্ধতার একটা আমেজ এনে দেয়। পুরানোর মধ্যেও কবি এক নূতনতর হর্ষ পান, পুরাতন নামে ডাকার মধ্যে প্রেমিকসত্তা উদ্বেল হয়—

সে নাম কি সত্যি গেছ ভুলে ?
 পুরাতন সেই নাম !
আমাকে সেই পুরানো নামে ডাকো,
 আর শিউরে উঠুক আনন্দে
অনেক আগের সেই বসন্ত
 যা আছে আমার ভেতর। (পুরাতন নাম)

কবির মনে অতীতচারিতার প্রতি একটা অভিনিবেশ দেখা যায়। এই অতীত-চারিতার সঙ্গে তাঁর রোমান্টিক মানসপ্রবণতার মেলবন্ধন ঘটেছে। পিছনের দিকে, দূর অতীতের ধূসরতায় তাঁর মানসগতি লক্ষ্য করা যায়। কখনো ইতিহাসের অতীত পাতায়, কখনো ভূগোলের সুদূর এবং দুস্তর আস্তানায় তাঁর মন ছুটে গেছে—

সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে ;—
 কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে

খোরাসান থেকে বাদকসান,
পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান্ ;—
শ্রান্ত উটের পায়ে পায়ে যেখানে উড়ছে মরুর বালি,
চমরীর খুরে লেগেছে বরফগলা কাদা !

অবশ্য তাঁর কাব্যে রোমান্টিক চমক লাগাবার জন্যে তিনি ভৌগোলিক কিছু নামের ব্যবহার করেছেন, বক্তব্যকে তীক্ষ্ণমুখ স্পষ্টতা দেবার জন্য, পাঠকের মনে নতুন এক রহস্যময় দিগন্তের ছোঁয়া এনে দেবার জন্যই কবি ভৌগোলিক চেতনাকে এমন করে ব্যক্ত করেছেন। 'জনৈক' কবিতায় তিনি বলছেন—

অমরত্ব লোভী কোন্ ফারাও-এর মৃত্যু সমারোহ
সেও বয়ে নিয়ে গেছে অগণন বাহকের সাথে
গিজে না মেদুমে ;
মুহূর্তের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে তপ্ত বালুকায়
জনারণ্যে গিয়েছে হারিয়ে।

শ্রাবস্তীর জেতবনে
সুগর্তের মহা উপস্থানে
সেও বুঝি কোন দিন দূর হতে করেছে প্রণাম।

রোমান্টিক মানসপ্রবণতার মতো প্রেমেন্দ্র মিত্রের মননের আর এক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করি। তাঁর কবিতায় সাগরের কথা বার বার এসেছে, নদী-চেতনাও প্রখর হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নামই ত' 'সাগর থেকে ফেরা'। বন্দর এবং নাবিকের কথা প্রায় কবিতায় ঘুরে এসেছে। 'প্রবাদ' কবিতায় কবি নিজের নাবিক সত্তার কথা বলেছেন। 'বেনামী বন্দর' কবিতার প্রসঙ্গ ত' আগেই উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর 'দ্বীপ', 'স্মৃতি', 'শূন্য', 'জিৎ' 'কাল রাত' প্রভৃতি কবিতায় সাগরের ছবি আছে। নদীচেতনাও তাঁর কাব্যে অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। 'নদীর নিকটে' নামেও তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ আছে। 'নদী ও যদি' 'নিঃসঙ্গ', 'উনিশশো সত্তর' প্রভৃতি কবিতায় নদীর ভূমিকা প্রধান।

তাঁর কবিতায় পাখির উল্লেখও প্রচুর। 'স্মৃতি' মূলতঃ প্রেমের কবিতা হলেও পক্ষীচেতনায় এটি আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। 'সাগর থেকে ফেরা' কবিতায় তিনটি গাঙ্ চিলের বিষয়ই প্রাধান্য লাভ করেছে। 'মৃত্যুত্তীর্ণ' পক্ষীচেতনার কবিতা। 'পাখি' নামের কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। আরো উল্লেখ করতে হবে 'প্রাচীন পদ্ধতি কোনো' কবিতাটি যেখানে পাখির কথা আছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নাগরিক মনস্কতার কবি বলে অনেকে অভিহিত করে থাকেন, এর কারণ—শহর-জীবনের যাবতীয় চেতনাই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে গণ্য হয়েছে। শহর কলকাতার একটা জায়গার কথা কবি বলছেন—

যেখানে থাক,
পেট্রোল আর ডিজেল-ধোঁয়ার
খুনে গন্ধ পাপের মত টানে,
সঙ্গে ফেরে রক্তে বিষের মত
চৌরঙ্গী !

যেখানে রোজ
কেউ-না হবার ঢালাও নিমন্ত্রণ,
'আমি-তুমি'র শূন্য খোলস
ভরাট করে রাখা
ঝলমলানো নিয়ন-বিজ্ঞাপন।
চৌরঙ্গী!

অন্য আরেক কবিতায় কলকাতারই অন্য এক অংশের বর্ণনা রয়েছে—

ভুলতে চাই, তবু পারি কই,
বড় বাজারের ঠেলায় রিকশায়
লরীতে মোটরে ঠাসা
পাঁওদলে কিলবিল বুকচাপা গলিটা,
নোংরা রুগ্ন কামুকতার চেয়ে
বীভৎস এক লুব্ধতা
পান জরদার উগ্র সুবাস ছড়িয়ে
ফিনফিনে আদ্দির উদ্ধত শুভ্রতায়
নির্লজ্জভাবে যেখানে আস্ফালিত। (ছাপ, নদীর নিকটে)

আশীর্বাদ কবিতাটি নগরীকে নিয়ে লেখা, নগরজীবনের নারকীয় চেতনার ইঙ্গিত আছে এবং নগরীকে শেষে কবি 'উন্মত্তা নারী-কাপালিক' বলেছেন। এছাড়া 'পোলের ওপর পাঁচুই মাঘ' কবিতায়ও নগর-জীবনের কথা আছে। এছাড়া আরও অনেক কবিতাতেই নগরের ছবি আছে।

কিন্তু তবু বলবো নগর-মনস্কতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে প্রাধান্য লাভ করেনি। প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা, পল্লীগ্রামের ছবি, নদনদী গিরিপ্রান্তর—সবই সমানভাবে বরং কিছু বেশীই তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। শহরের ক্লান্ত পরিবেশ থেকে ছিটকে যখন আমরা প্রকৃতির বিস্তৃত অথচ নির্জন অঙ্গনে হারিয়ে যাই—দিশেহারা হয়ে পড়ি মাঠের প্রান্তে একটি শিমূল গাছ নিয়ে, যেখানে আকাশের সময় কাটে—

সেখানে অনেক পথ খুঁজে
পৃথিবী শুয়েছে চোখ বুজে
এলিয়ে হৃদয়।
শিয়রে শিমূল শুধু একা
চুপ করে রয়।

প্রকৃতির স্নিগ্ধ মনোহর রূপ তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত নেই। তবে প্রকৃতি তাঁর কাছে সব সময় অঙ্কনযোগ্য চিত্রবৎ বলে প্রতিভাত হয় নি। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তিনি মানব-মানবীর কাছে অভ্যস্ত বলেই এঁকেছেন, অর্থাৎ সব সময়ই নির্জীব পদার্থে সজীব-নায়ক-নায়িকার কাজ বা ব্যবহার আরোপ করেছেন, অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে সমাসোক্তি

অলঙ্কার বলা হয়, কবি সেই অলঙ্কারের প্রচুর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন ; এই রকম একটি কবিতার উদাহরণ দিই—

সমস্ত দুপুর ধরে
একা একা ঘাটের কিনারে,
ঝাঁকড়া অশত্থ গাছে একটি কি দুটি পাতা নাড়ে,
দু একটা উদাস ভাবনা
হঠাৎ ভাসিয়ে দেয়
ঘুরে ঘুরে খসে-পড়া শুকনো পাতায়।
কখনো বা স্তব্ধ হয়ে শোনে
ঘুঘু নয়, কে গোঙায়
ধরণীর মনে। (প্রেতায়িত)

সমাসোক্তি অলঙ্করণের সাহায্যে বর্ণিত নয়, নিছক সুন্দর বর্ণনা—এমন প্রকৃতি-চিত্রণও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় অনুপস্থিত নয়। 'সাধু' কবিতায় শরৎকালের মেঘের বর্ণনার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। তবে কখনো কখনো তিনি ভিজে মেঘলা আকাশ, বৃষ্টিভেজা সপ্‌সপে দিনের বর্ণনা করেছেন—'নওই আশ্বিন' কবিতাটি স্মরণীয়। তবে টুকরো টুকরো কথা দিয়ে প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন, যেমন—'শস্যের তরঙ্গে ঘেরা দূরগ্রাম', 'আকাশ মুখর করে উড়ে যায় যে কটা শালিখ' (দাম)। 'তেরোনদী' কবিতাতে পাই—

মেঘেরাও বুঝি আকাশের ধেনু,
দিগন্তে থাকে আঁকা,
নড়ে না হাওয়ায়।
সেখানে যা কিছু
অজর আরকে রাখা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রায়শ স্মৃতি-আতুর এক রোমাণ্টিক দৃষ্টিতে অতীতকে আঁকড়াবার চেষ্টা করেছেন ; তাই যা গতায়ু, যা চলে যেতে বসেছে, যা ভাঙা বা ভাঙতে বসেছে, যা পুরানো—তার কথা, আবছা স্মৃতির ঝাপসা ছবির মতো ফুটে উঠেছে। পোড়ো বাড়ী, ভাঙা ধ্বসা, মন্দির, প্রাচীন বট-অশত্থের গাছ, পুরানো দিনের নড়বড়ে ঘাটের দৃশ্য—সবই ইতস্ততঃ ভাবে তাঁর সব কাব্যগ্রন্থে ঘুরে ফিরে এসেছে। তাঁর ভাবলোকের বিন্যাসে এ বিষয়টাও লক্ষ্য করার কথা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার গঠন-শিল্প

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

কবিতার অপর নাম : বাঙ্ময় আবেগ। কবিতা কবির আবেগের প্রতিরূপ, যা শব্দ-বিন্যাসের মাধ্যমে গ'ড়ে ওঠে। সুতরাং কবিতার উপাদান বলতে বোঝায় : আবেগ ও শব্দ। কিন্তু কবির আবেগ যেহেতু শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাই কবিতার উপাদান কেবলমাত্র শব্দ, শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই কাব্য-বিচারকালে আলোচক-কে শব্দ-বিচারে প্রবৃত্ত হ'তে হয় ; তার ওপর আলোচনার বিষয় যদি হয় কবিতার গঠনশিল্প, তাহলে তো কথাই নেই। কবিতায় প্রযুক্ত সকল শব্দের মূল্য কিন্তু সমান নয়। মূল্যের দিক থেকে শব্দকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : বিশিষ্ট বা অপরিহার্য (essential) শব্দ এবং অতিরিক্ত বা তাৎক্ষণিক (immediate) শব্দ। বিশিষ্ট শব্দ যদি হয় সিনেমার নায়ক বা একটি প্রধান চরিত্র, অতিরিক্ত শব্দ তাহলে সিনেমার 'এক্স্ট্রা', যে এখনও 'স্টার' হ'য়ে ওঠেনি। সে জনতার একাংশ মাত্র, ভিড়ের মধ্যে থাকে, পরিবেশ রচনা করে, একটি বিশিষ্ট শব্দের সংগে অন্য একটি বিশিষ্ট শব্দের সংযোগ ঘটিয়ে দেয়। প্রয়োজন হ'লে কবি কখনো কখনো একটি অতিরিক্ত শব্দকে অপ্রধান চরিত্রের ভূমিকা দিতে পারেন। বলা বাহুল্য, একটি কবিতায় যা অতিরিক্ত শব্দ অন্য কবিতায় তার বিশিষ্ট, এমন কি, বিশিষ্টতম শব্দ হ'তে কোনো বাধা নেই।

"কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুণ,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে
জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায়
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ
কোথা **অরণ্য** উচ্ছেদ করি ভাই
—কুঠার ঘায়।" (আমি কবি : প্রথমা)

এ-কবিতাংশে 'অরণ্য' শব্দটির বিশিষ্ট কোনো ভূমিকা নেই। শ্রমিকের কাজের যে তালিকা পেশ করা হয়েছে, অরণ্য উচ্ছেদ তার একটি পদ (item) মাত্র। তার জায়গায় অন্য কোনো 'আইটেম' বসিয়ে দিলে (অবশ্যই ছন্দ বজায় রেখে) ক্ষতি হয় না। তালিকাটি পূর্ণ করতে সাহায্য করা তার একমাত্র কাজ। 'অরণ্য' এখানে অতিরিক্ত শব্দ।

"হে-ইডি হাইডি হা-ই !
অরণ্য ডাকে ওই—যাই !" (নীলকণ্ঠ : সম্রাট)

এখানে 'অরণ্য' একটি বিশিষ্ট শব্দ। অরণ্যকে ঘিরেই কবির আবেগ উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে। কবির কাছে অরণ্যের ডাক যেমন অপ্রতিরোধ্য, কবিতাংশটিতে 'অরণ্য' শব্দটির আবির্ভাব তেমনই অপরিহার্য। এ অরণ্য যে 'আমি কবি'-র অরণ্য নয়, তা অন্যমনস্ক পাঠকও বুঝতে পারেন।

"তুমি আছ, তুমি আছ,
এ বিস্ময় সওয়া যায় নাকো :
অরণ্য কাঁপিছে।" (নীলদিন : সম্রাট)

এখানেও 'অরণ্য' একটি বিশিষ্ট শব্দ, যদিও আগের-উদ্ধৃতির অরণ্যের মতো বিশিষ্টতম নয়। সেখানে 'তুমি' ছিল না, এখানে 'তুমি' এসে গেছে। অরণ্যের যে প্রাধান্য ছিল, তার কিছু অংশ 'তুমি' অধিকার ক'রে নিয়েছে। 'তুমি'-কে ঘিরে কবির আবেগ আবর্তিত হয়েছে। তবু কবি যখন ঐ আবেগের স্বরূপ দেখছেন, অনুভব করছেন তার আলোড়ন, তখন বুঝতে হবে 'তুমি'-র তুলনায় অরণ্যের প্রাধান্য কিছু কম নয়।

"আমাকে সনদ দাও
শান্তি, সুখ, শস্যের গোলার।
থেকে থেকে শুধু শোনা যাক,
ঘরের লাগাও আদি অনুচ্ছিন্ন **অরণ্যের** ডাক।"
(আরণ্যক : কখনো মেঘ)

এখানেও 'অরণ্য' একটি বিশিষ্ট শব্দ, তবে তার প্রাধান্য আরও কিছু কমেছে। এখানে অরণ্যের ডাকে উন্মাদনা নেই, উদ্দীপনাও নেই। অরণ্যের ডাক-কে কবি স্বীকৃতি দিয়েছেন মাত্র, সংগে সংগে একথা জানাতেও ভোলেন নি যে তাঁর কাছে শান্তি-সুখ-শস্যের গোলার আকর্ষণ প্রবলতর।

আমরা দেখলাম, প্রাধান্যের তারতম্যের জন্য অরণ্যের রূপ ক্রমশ বদ্‌লে গেছে। 'অরণ্য' যেখানে অতিরিক্ত শব্দ, সেখানে অরণ্য বলতে যে-কোনো অরণ্য বোঝাচ্ছে, অরণ্য স্বতন্ত্র সত্তা পায় নি। যেখানে অরণ্য বিশিষ্টতম, সেখানে আমরা আফ্রিকার অরণ্যে উপস্থিত হই। 'তুমি আছ'-র অরণ্য আফ্রিকার নয়, হয়তো ছোটনাগপুরের। আর একেবারে শেষে ঘরের লাগাও আদি অনুচ্ছিন্ন অরণ্যটি আগাছার জঙ্গল, যা বর্ধমানেও দেখা যাবে। অবশ্য এই অরণ্যটি যে ক্রমবর্ধমান, আধুনিক সাহিত্যে, এমন কি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাতেও, তা-তে কোনো সন্দেহ নেই।

Perspective-এর পরিবর্তনের জন্য এই রূপান্তর। অরণ্য যেখানে ছিল সেখানেই আছে, শুধু বদ্‌লেছে শিল্পীর দৃষ্টিকোণ। দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের ফলে আফ্রিকার অরণ্য ছোটনাগপুরের বন অথবা বর্ধমান আগাছার জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়েছে।

কবিতা যেহেতু অল্প পরিসরে বেশি কথা বলতে চায়, তাই কবিকে মিতব্যয়ী হ'তে হয়। কবিতায় একই কালে একটি শব্দ একাধিক অর্থের দ্যোতনা বহন করতে পারে। কেবলমাত্র দ্ব্যর্থবোধকতা নয়, কখনো কখনো একটি শব্দের মধ্যে ঘট্‌তে পারে দুটি বিপরীত অর্থের সমন্বয়।

"টঙের ঘরে একা একা
শুধু নিজের নাইকুণ্ডল খুঁজে,

হয়ত আগের পাকা হোতো। করবে কখন,
মেলায় বেসাতি মজায় যদি!
বসেই থাকো কিম্বা চলো, বেচো কিম্বা কেনো,
প্রাণের মেলায় তুমিও পাঁওদল,
ভালোবাসায় ভিড়ের মানুষ।
তোমার আখের চলায় পায়ে-ই মাটি।"
(দোকান : সাগর থেকে ফেরা)

এখানে 'মাটি' শব্দটি দুটি বিপরীত অর্থের সমন্বয় ঘটিয়েছে। একটি অর্থ হলো 'ব্যর্থ', অন্যটি 'সার্থক'। একদিকে যা ব্যর্থ, অন্যদিকে তা-ই সার্থক। এতে কবির মিশ্র অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। একটি শব্দ আবার অনুষঙ্গের সাহায্যে অনুল্লিখিত একটি শব্দ-কে টেনে আনতে পারে, যার ফলে উল্লিখিত শব্দটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ হয় :

"একবার চাই শুধু সে তির্যক দেখা,
—যে দেখে ও যারে দেখি
দুজনেই যে দেখায় মরে
টাঙানো যখের যাদুঘরে!" (তির্যক : কখনো মেঘ)

'যখ' শব্দটি ধ্বনিসাদৃশ্যহেতু পাঠকের মনে 'সখ' শব্দটিকে নিয়ে আসে, যদিও 'সখ'-এর উল্লেখ নেই। 'যখের যাদুঘর' যে 'সখের যাদুঘর নয়', এ-প্রতিতুলনার মধ্যে যখের যাদুঘরের অর্থ অনেকাংশে আত্মপ্রকাশ করে।

কখনো কখনো একটি শব্দ কবির মনোভঙ্গির পরিচয় দিতে পারে। যেমন 'আমি কবি'-র 'ভাই'। পৃথিবীর যাবতীয় শ্রমিকের মতো পাঠকের সংগেও কবিচিত্তের একটি নিবিড় আলিঙ্গনের বাসনা ঐ শব্দটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। কবির সামাজিক সত্তার প্রাবল্য এত বেশি যে, যদিও তিনি ইতরের কবি হ'তে চান, চান বিশ্বকর্মার চারণ হ'তে, তবু শেষ পর্যন্ত সেই দূরত্বটুকুও সরিয়ে কখন যে তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে আল কাটতে, বোঝা বইতে, খোয়া ভাঙতে শুরু ক'রে তাদেরই একজন হ'য়ে ওঠেন, পাঠক তা খেয়াল করতে ভুলে যান।

আবার ঐ কবিতায় 'হায়' শব্দটি কবির অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় দিচ্ছে।

"সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,
স্বপ্ন-বাসরে বিরহিনী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই!" (আমি কবি : প্রথমা)

স্বপ্ন-বাসরে তিনিও রাত্রিযাপন করতে চান, কিন্তু 'হায় সময় নাই।' স্বপ্নের জন্য একটি দীর্ঘনিশ্বাস 'হায়' শব্দটির মধ্যে সঞ্চিত হ'য়ে আছে।

'হায়' শব্দটির প্রবলতা কম, কাজেই কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে, তাই কবি স্বপ্ন-ভঙ্গির আশ্রয় নিয়ে একটি স্বপ্নচিত্রের উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁর

অন্তর্দ্বন্দ্ব-কে আরও একটু পরিস্ফুট ক'রে তুলেছে। কবি যদিও বলছেন সময় নাই, তবু ওরই মধ্যে একটু সময় ক'রে নিয়ে এক ফাঁকে একটু স্বপ্ন দেখে নিয়েছেন :

"জাফ্‌রি কাটান জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ
ঘনায় নিশীথ মায়া।
দীপহীন ঘরে আধো নিমিলিত
সে দুটি আঁখির কোলে,
বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের
মধুর মিনতি দোলে, ..." (আমি কবি : প্রথমা)

ফ্রয়েড হয়তো এ-কে 'Hypocrite dream' বলবেন। 'হিপোক্রিট' বলতে নিন্দনীয় কিছু বোঝাচ্ছে না। মনের একটি অংশ স্বপ্ন দেখতে চাচ্ছে, অন্য অংশ বাধা দিচ্ছে। সামাজিক মনের 'সময় নাই সময় নাই' বলার ফাঁকে ব্যক্তিমন কবিতার মধ্যে আলগোছে এক টুকরো স্বপ্ন, একটি চিত্রকল্প ঢুকিয়ে দিয়েছে। এ যেন নিজের মন-কে নিজের চোখ-ঠারা !

স্বপ্ন হলো বিবদমান দুই সত্তার আপস। সামাজিক সত্তা জৈব সত্তার দাবী মেনে নিয়েছে, জৈব সত্তাকেও সামাজিক সত্তার খাতিরে কিছু দাবী ছাড়তে হবে। তাই প্রিয়ার সংগে মিলনের ছবি না ফুটিয়ে কবির স্বপ্ন-সত্তা বিরহের ছবি এ'কেছে। বিরহের হোক আর যা-ই হোক, এই ছবির মধ্যে কিছুক্ষণ ধ'রে প্রিয়াকে দেখে নেওয়া গেল তো ! তাছাড়া বিরহিণী প্রিয়ার ছবিটির মাধুর্য, কে অস্বীকার করবে ! প্রিয়ার বিরহের বেদনাটি কবিচিত্তেরই বিরহ-বেদনার অভিক্ষেপ (Projection)।[১]

কবিতার একমাত্র উপাদান : শব্দ। শব্দের আবার দুটি রূপ : ধ্বনিরূপ ও চিত্ররূপ। শব্দবিন্যাসের সাহায্যে কবিতায় যে ধ্বনিরূপ ও চিত্ররূপ গ'ড়ে ওঠে, দুয়ে মিলে কবিতার ভাবরূপ রচনা করে। গল্প-উপন্যাস অথবা নাটকের তুলনায় কবিতায় ধ্বনিরূপের প্রাধান্য অনেক বেশি। সংগীত যে ধ্বনিরূপ সৃষ্টি করে, কবিতা অবশ্য তা পারে না। আবার রঙ ও রেখায় চিত্রশিল্পীর ছবির মধ্যে যে চিত্ররূপ গ'ড়ে ওঠে, তার সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কবিতার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ধ্বনিরূপ ও চিত্ররূপের সমন্বয়ে কবিতা যা দিতে পারে, একক ভাবে চিত্র অথবা সংগীত তা দিতে পারে না। এখানেই কবিতার জিৎ।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ বলেন : 'উপমাই কবিত্ব'। আমরা তাঁর এই উক্তিটিকে নিতান্তই কবি-সুলভ অতিশয়োক্তি ব'লে দূরে সরিয়ে রেখেছি, গভীর ভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করিনি। এখানে উপমা শব্দটি অবশ্যই বিস্তৃততম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হলো প্রতিতুলনা। আমরা বলেছি, কবিতা হলো কবির আবেগের প্রতিরূপ, সুতরাং একটি কবিতা একটি উপমা বা প্রতিতুলনা ছাড়া আর-কিছু নয়। কবিতার সব অঙ্গগুলিও এক একটি অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ। চিত্ররূপ অথবা ধ্বনিরূপ যা-ই বলি না কেন, ওরা এক একটি উপমা। ছন্দের (এবং চিত্রেরও) সেজন্য

বাস্তিক বিচারের তুলনায় প্রতিরূপ হিসেবে সার্থকতার বিচার আমাদের কাছে বেশি মূল্যবান।

"হে-ইঁডি, হাইঁডি, হা-ই
অরণ্য ডাকে ওই—যাই।
সিংহের দাঁতে ধার সিংহের নখে ধার
চোখে তার মৃত্যুর রোশ্‌নাই
হে-ইঁডি, হাইঁডি, হা-ই।" (নীলকণ্ঠ : সম্রাট)

ছন্দ টান-টান ; অতএব স্বাধীনতার অবকাশ কম। তবু পর্বাঙ্গে ও পর্ব-বিন্যাসে বৈচিত্র্য এনে এবং অতিরিক্ত পর্বাঙ্গ যোগে কবি যে স্বাধীনতার অবসরটুকু সৃষ্টি ক'রে নিয়েছেন তাতে দেখা দিয়েছে ধ্বনি-বৈচিত্র্য, যার ফলে ছন্দ একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। কবি যেমন আবেগ-কে প্রসারিত করার সুযোগ পেয়েছেন, তেমনই আবার একটি সুগঠিত বলয়ের মধ্যে তা-কে বেঁধে রাখতেও পেরেছেন। ই-ধ্বনি, যুক্তব্যঞ্জন-ধ্বনি ও হসন্ত-ধ্বনি ছন্দস্পন্দে প্রয়োজনীয় তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা সঞ্চারিত করেছে। অন্ত্যানুপ্রাস, ধ্বনিসাম্য, পুনরাবৃত্তি, নিয়মিত ছন্দস্পন্দ একটি বৃত্তাকার গঠনের আভাস এনেছে ; এবং প্রথম বাক্যবন্ধ 'হে-ইঁডি, হাইঁডি, হা-ই' refrain হিশেবে শেষে ফিরে এসে ধ্বনি-কে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে। শব্দ ও মাত্রার পুনরাবৃত্তি যেমন একটি ভাবের প্রতি মনের একাগ্রতা-কে গাঢ়তর করেছে, তেমনই দ্রুত ছন্দস্পন্দ পুনরাবৃত্তিগুলিকে ক্ষিপ্রতার সংগে কানের কাছে ফিরিয়ে এনে তাদের দিয়েছে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। ফলে, ছন্দ ভাষার গড়ন ও তাৎপর্যে বিশিষ্ট ধ্বনির নকশা বুনে দিতে সক্ষম হয়েছে। কবির মনে যে আবেগের জন্ম হয়েছে, তার মধ্যে বন্য আদিমতার রহস্য মেশানো। ঐ রহস্য একই সংগে ভয় ও বিস্ময়ের সমাবেশ। রক্তের আদিম রহস্যের ডাক অপ্রতিরোধ্য, চিন্তা-বিচারের সময় নেই ('অরণ্য ডাকে ওই—যাই'), ভয়ঙ্কর সুন্দরকে বরণ করার জন্য ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। ধ্বনিরূপের গঠনেও আদিম মানবের নৃত্যের ভঙ্গি আভাসিত। নৃত্য আত্মপরিক্রমা ও আত্ম-অতিক্রমণার প্রতীক।

নৃত্যের ভঙ্গির মধ্যে আবার একটু নাটকীয়তা আছে। প্রথমেই কবি শোনালেন একটি রহস্যজনক শব্দ : 'হে-ইঁডি, হাইঁডি, হা-ই'। তারপর জানিয়ে দিলেন ওটি অরণ্যের ডাক, অপেক্ষা করার সময় নেই, কেবলমাত্র একটি দ্বি-স্বরধ্বনির ('ওই') ব্যবধান রেখে ঐ ডাকে সাড়া দিলেন। ধ্বনিরূপ ফুটিয়ে তুলতে তুলতে তিনি অরণ্যের ছবিও আঁকলেন। অরণ্য হ'য়ে গেল সিংহ। কবি সিংহের ধারালো দাঁত ও নখ, এবং তার চোখের ভয়াবহ মোহময় আলোটি ফুটিয়ে তুললেন। 'রোশ্‌নাই'-এর হসন্ত-ধ্বনি যেমন ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করেছে, তেমনই শব্দটি মুদ্রিত করেছে উৎসবের ছবি।

সব মিলিয়ে কবিতার গীতিধর্মী সুর বাঁধা হ'য়ে গেল, যে সুর হলো উন্মাদনার, যার প্রভাবে 'মৃত্যু ও রমণীতে ভেদ নাই'।

'তুমি আছ, তুমি আছ,
এ বিস্ময় সওয়া যায় নাকো ;
অরণ্য কাঁপিছে।

মনে মনে নাম বলি,
আকাশ চুইয়ে পড়ে
গলানো সোনার মতো রোদ।
গলানো সোনার মতো
রোদ পড়ে সব ভাবনায় ;
সোনার পাখায়,
গাহন করিতে ওঠে
নীল বাতাসের স্রোতে
রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক।" (নীল দিন : সম্রাট)

এখানেও আত্ম-পরিক্রমা, এবং আগের মতোই আত্ম-অতিক্রমণও। তবে আত্ম-পরিক্রমা আমি-কে ঘিরে নয়, তুমি-কে ঘিরে। কবির কাছে তুমি-র অস্তিত্ব একটি পরম আবিষ্কার। সেই আবিষ্কারের বিস্ময় অসহ্য আবেগে কবির গহন মন কাঁপিয়ে দিয়েছে। সেই কাঁপনের অভিব্যক্তি হিসেবে 'অরণ্য কাঁপিছে-'র যুক্তব্যঞ্জন-ধ্বনি ও ই-ধ্বনিটুকু অপরিহার্য। আভ্যন্তর বিস্ময়ের সুর যা সমগ্র কবিতায় আধিপত্য বিস্তার করবে, তা আমরা প্রথম উক্তি 'তুমি আছ, তুমি আছ'-র মধ্যে ধ্বনিত হ'তে শুনি। সমগ্র কবিতাংশটির মধ্যে আবেগের আলোড়ন কিছু কম প্রকাশিত হয় নি, আবেগ যেন উপ্‌চে পড়ছে, তবে 'হে-ইঁডি হাইঁডি হা-ই'-এর উন্মাদনা নেই। এর সুর হলো উদ্দীপনার। উদ্দীপনার মধ্যে বিস্ময় আছে, কিন্তু ভয় নেই। সেই উদ্দীপনা গলানো সোনার রোদ হ'য়ে চু'য়ে চু'য়ে পড়েছে (আফ্রিকার অরণ্যে রোদ ছিল না, ছিল রহস্যজনক অন্ধকারে সিংহের চোখের মশাল আলো)। 'তুমি আছ'-র অরণ্যে সিংহ নেই, আছে রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক। এখানে অন্ত্যানুপ্রাস নেই (একটি ছাড়া), নিয়মিত ছন্দস্পন্দ থাকলেও আছে অনেক বেশি স্বাধীনতা। পুনরাবৃত্তি আছে। আবেগ সোনা হ'য়ে গ'লে গ'লে পড়ছে, সেই সোনার স্রোতে অবগাহন করার জন্য নীল বাতাসে উড্ডীন হয়েছে একঝাঁক শাদা পায়রা। এর কাঠামোও নৃত্যের, তবে এ-নৃত্য আদিম মানবের নয়, নির্ঝরের। ঝর্ণার জল ঘুরে-ঘুরে আবর্ত রচনা করলেও ধাপে ধাপে ঝ'রে পড়ছে এবং সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঝর্ণার গতিবেগে উৎক্ষিপ্ত পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র জলরাশি 'রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক'। পংক্তিবিন্যাসের মুদ্রিত রূপের মধ্যেও সেই গঠন অনুসৃত।

"ছাদে যেও নাক সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমানা-হীন।
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।" (ছাদে যেও নাক : সম্রাট)

তুমি-র অস্তিত্ব ঘিরে কবিমনের উদ্দীপনার প্রকাশ নেই ; 'তুমি' এখানে সশরীরে হাজির। একেবারে মুখোমুখি দেখা, তাই সরাসরি তুমি-র সঙ্গে সংযোগ ঘটানো হয়েছে। 'তুমি' যদি কবিসত্তার একটি অংশ হয়, তাহলেও দুটি অংশের মধ্যে ভাব-বিনিময় চলছে। কবিতার ছন্দে এসেছে একটি হার্দ্য সুর, যার মধ্যে উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা ও আত্মীয়তা মিশে আছে। গঠন নাট্যধর্মী : তুমি-র মুখে কোনো সংলাপ দেওয়া হয়

নি, তবু তার চোখে আমরা জিজ্ঞাসার ঝিলিক ফুটে উঠতে দেখছি। চিত্রকল্প কিছুটা আভাসিত, কিছু প্রকাশিত : সিঁড়ি, সিঁড়ি উঠে গেছে ছাদে, সিঁড়ির প্রথম ধাপে একটি পা, ছাদের উপরে সীমাহীন নক্ষত্র-খচিত আকাশ (যা কবির প্রশ্ন-জর্জর হৃদয়ের প্রতিরূপ)।

"মানুষের মানে চাই—
গোটা মানুষের মানে!
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসাসমেত—
গোটা মানুষের মানে চাই।
মানুষ সব কিছুর মানে খুঁজে হয়রান হ'ল—
এবার চাই মানুষের মানে—নইলে যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয় না।"

এখানে ছন্দে উদ্দামতা নেই, উদ্দীপনা নেই, হার্দ্য সুরও নেই। আছে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তের সুর। তাই ছন্দস্পন্দে আবেগ স্তিমিত। মূল সিদ্ধান্ত : গোটা মানুষের মানে চাই। তাই বাক্যবন্ধটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ঐ পুনরাবৃত্তি এবং বাক্যবন্ধগুলির ভার-সাম্য ধ্বনিরূপে এনেছে সুব্যবস্থিত অগ্রগতি, যাকে cadence বলা হয়। গোটা মানুষের মানে কেন জানা চাই, গোটা মানুষ বলতেই বা কি বুঝি, তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। গোটা মানুষের ছবি প্রধানত বক্তব্যপ্রধান ভাষায় আঁকা। গঠন ব্যাখ্যানধর্মী। এইভাবে দেখা যাবে যে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় ধ্বনিরূপে সুর ও গঠনে কোনো বিরোধ নেই, চিত্ররূপ ও ধ্বনিরূপ পরস্পরের হাত ধ'রে চলেছে, এরা পরস্পর-নির্ভর এবং পরস্পর-প্রবিষ্ট।

ধ্বনিরূপের মতো চিত্ররূপও প্রসারিত উপমা ছাড়া কিছু নয়। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি রক্তের আদিমতার প্রতিরূপ হ'য়ে যেমন 'অরণ্য' শব্দটি কবিতায় এসেছে, তেমনই আবার অরণ্যের ছবি কবি এ'কেছেন সিংহের প্রতিমূর্তিতে ; সিংহের ধারালো দাঁত, ধারালো নখ, এবং ভয়ঙ্কর সুন্দর চোখের রোশ্‌নাই কবির আবেগের প্রতিরূপ। কবির মনের উদ্দীপনা বাতাস হ'য়ে অরণ্য কাঁপিয়ে দিয়েছে, গলানো সোনার মতো রোদ হ'য়ে ঝ'রে পড়েছে, যে-রোদে তপ্ত হ'য়ে অবগাহন করেছে এক ঝাঁক উড্ডীন পায়রা, যারা কবির কোমল কয়েকটি ভাবনার প্রতিরূপ। এই ধরনের চিত্ররূপগুলিকে আমরা স্বাভাবিক চিত্রকল্প (Natural Image) বলতে চাই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় স্বাভাবিক চিত্রকল্পের প্রাধান্য বেশি। তার কারণ, তিনি কবিতাকে দুর্বোধ্য ক'রে তুলে পাঠকের সংগে ব্যবধান রচনা করতে ভালবাসেন না। যিনি নিয়মিত কবিতা পড়তে অভ্যস্ত, তাঁর কাছে স্বাভাবিক চিত্রকল্প কখনো দুর্বোধ্য হ'তে পারে না।

কাঠের টবে পাম গাছ, কাঠের টুলে বেয়ারা এবং একটি কাঠের সিঁড়ির ছবি এ'কে প্রেমেন্দ্র মিত্র বর্তমান সভ্যতার যান্ত্রিক জীবনের রূপদান করেন। তাঁর কাছে অরণ্য, সমুদ্র, পর্বত-শিখর, আকাশ ও পথ বৃহত্তর জীবনের প্রতীক। সমুদ্রের অতলতা, পর্বতের উত্তুঙ্গতা, অরণ্যের গভীরতা, আকাশের ব্যাপ্তি ও পথের বিস্তৃতি তাঁর অন্বিষ্ট। আকাশের খবর নিয়ে আসে পাখি, তাই পাখি তাঁর কবিতায় সর্বোচ্চ মর্যাদা পেয়েছে। যখন পাখির খোঁজ তিনি পান না, তখন তাঁর চিত্ত-সহচর হয় একটি নিঃসঙ্গ ফুল, যা

মাটির উপহার। ফুল তাঁর কাছে চিত্ত-সহচর, আর নীলতারা আত্মা-সহচর। এই মাটি আর আকাশ নিয়েই তাঁর কবিতা। সমুদ্রের অনুষঙ্গ হিশেবে এসেছে জাহাজের ডাক, জাহাজ, বন্দর, কম্পাসের কাঁটা, নির্জন দ্বীপ ; আকাশের অনুষঙ্গ হিশেবে পাখি (চিল, গাঙচিল, শ্যেন, হাঁস, পায়রা), নীলতারা ; অরণ্যের অনুষঙ্গ হ'য়ে সিংহ, চিতা, হরিণ, পাখি ; পর্বতের অনুষঙ্গ হ'য়ে চড়াই,* উৎরাই, খাদ, পাকদণ্ডী ; এবং পথের অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে নদী, স্টিমার, সেতু, পাথুরে পোল, সরাই ইত্যাদি। অনুষঙ্গ হিশেবে এলেও এই সকল চিত্ররূপ কবির বিভিন্ন উপলব্ধি থেকে জাত এবং বিচিত্র ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ, ফলে এরা আর অনুষঙ্গ থাকে নি, স্বাধীন চিত্ররূপ হ'য়ে কবির বিভিন্ন মানসিক অবস্থা-কে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। যে-কোনো সৎ কবির মতো প্রেমেন্দ্র মিত্রও তাঁর প্রথম জীবনের কবিতার বিষয়গুলি (Properties)-কে পরবর্তী জীবনে প্রতীক ক'রে তুলেছেন। আবার এক-একটি প্রতীক যতবার ব্যবহৃত হয়েছে তত-ই কবিমনের নতুন-নতুন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নির্যাসে স্নান ক'রে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। এ-প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে লাভবান হয়েছে 'পাখি'-র চিত্রকল্প বা প্রতীক। এই সব চিত্র-কল্পের অনেকগুলি স্তর, এবং সেই স্তরগুলি সূক্ষ্ম তন্তুতে পরস্পর-সংলগ্ন ও পরস্পর-প্রবিষ্ট। কবি এ-সম্পর্কে সচেতন, কেননা তিনি জানেন : 'নিত্য নব যোজনাই এ সত্তার হেতু ও আহুতি' (যোজনা : অথবা কিন্নর)। মনোবিজ্ঞানীরা এ-ধরনের ইমেজ্‌কে বহুযোজী চিত্রকল্প (Polyvalent Image) বলেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় ঐতিহ্যস্মৃতিসমৃদ্ধ চিত্রকল্প (Traditional Image)-এর ব্যঞ্জনাও কিছু কম গভীর নয়।

"মেঘের ঢাকা দিলেই নাগরালি
তুফানে মাতে, ঘোচায় তপোচর্যা।
উর্বশীই মুকুরে উমা নয় কি ?" (শুদ্ধি : অথবা কিন্নর)

উর্বশী উচ্ছৃংখল কামনার প্রতীক, উমা পবিত্র ভালোবাসার। এরা পরস্পর-বিরোধী হ'লেও এদের মধ্যে কবি সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। উর্বশীর ছায়া যখন মুকুরে পড়ে তখনই সে উমা-য় রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর সাধন করে 'মুকুর'। মনে হয় কবি সেই মুকুরের খোঁজ পেয়েছেন। কবিসত্তাই হলো সেই মুকুর যার প্রভাবে স্থূল অভিজ্ঞতা বিশোধিত হ'য়ে নান্দনিক তাৎপর্য পায়।

"রাজার কুমার বৃথা
এই অসি খোঁজে তেপান্তরে,
সদাগর ঘুরে মরে বন্দরে বন্দরে
সপ্তডিঙা নিয়ে।
এ কৃপাণ যায় না তো কেনা।" (ইস্পাত : ফেরারী ফৌজ)

কবি এখানে প্রতীকের খোঁজে রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। চিরকাল মানুষ যার খোঁজ ক'রে এসেছে এবং যার সাহায্যে সে অসম্ভবকেও সম্ভব ক'রে তুলেছে 'কৃপাণ' সেই দুর্লভ সম্পদ ('treasure difficult to attain')-এর প্রতীক।

"সে কোথাও দেয় না ডুব, নদীতে কি জীবনে, সৃষ্টিতে।
চায় না কিছুরই মানে, শুধু বোঝে মুহূর্ত-মর্মর,

ব্যাখ্যা নয় ব্যঞ্জনাই। প্রপঞ্চে সে স্বেচ্ছা-প্রবঞ্চিত,

অবান্তর ক্ষণিকের নিরাসক্ত কামুক কিন্নর।" (কিন্নর : অথবা কিন্নর)

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে কিন্নর হলো কবি তথা শিল্পীর প্রতীক। কিন্নরের বিশেষণ হিশেবে তিনি দুটি বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করেছেন : নিরাসক্ত ও কামুক। কবির চেতনায় একই সংগে এই দুটি বৈপরীত্যের সমন্বয় প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্ত-কে পান করার জন্য চাই সকাম তৃষ্ণা, আবার অভিজ্ঞতাকে রূপদান করার জন্য চাই নিরাসক্তি। কবিতাকে একই সঙ্গে ক'রে তুলতে হবে personal ও impersonal, ইন্দ্রিয়ময় ও ইন্দ্রিয়াতীত।

এইভাবে তাঁর কবিতায় পরাশর, হলধর, বলরাম, ত্রিশঙ্কু, সংশপ্তক সেনা, শক-হূণ-তাতারের বন্যা, ধর্মরূপী বক ও জলা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার উপলব্ধির সঙ্গে জড়িত হ'য়ে বর্তমানের সংগে অতীতের সংযোগসাধন করেছে, যার ফলে পাঠকের চেতনা বিস্তৃত ও গভীর হয়েছে। তাছাড়া কবিতার শরীরও টান টান, সংহত ও দ্যুতিময় হ'য়ে উঠেছে, বিকিরণ করেছে প্রগাঢ়তার দীপ্তি।

কেবলমাত্র ব্যক্তি ও সমাজের, বহির্মুখিনতা ও অন্তর্মুখিনতার, অথবা বর্তমান ও অতীতের সমন্বয় নয়, চেতনা ও নিশ্চেতনার সমন্বয়সাধনও কবি-কৃত্য। যিনি সৃষ্টির ব্যাখ্যার জন্য 'গোটা মানুষের মানে' জানতে চান, তাঁকে অবচেতনার গভীরে প্রবেশ করতে হবে। তাছাড়া আমাদের অস্ফুট অধরা অপ্সরা অনুভবগুলি, যারা চেতনার প্রান্তে এক একবার উঁকি মারে, আবার অতলে তলিয়ে যায়, কবির কাছে তাদের দাবীও কিছু কম নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র সে-দাবী মেনে নিয়েছেন এবং কবি-চেতনায় চেতনা ও নিশ্চেতনার দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করেছেন। এই পলাতক ভীরু চেতনাগুলি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় কখনো হয়েছে হরিণ, কখনো মাছ, কখনো বা শুধু কলধ্বনি। এই চিত্রকল্পগুলিকে আমরা স্বপ্ন-চিত্রকল্প (Dream Image) আখ্যা দিতে চাই। এরা যেন : 'শোনা না-শোনার মাঝে অপ্সরা-ঝঙ্কার'। এই ঝঙ্কৃত আঁধার নিয়মিত জীবনের চিহ্নিত পথ বানচাল ক'রে দিতে পারে, এ-কথা কবির অজানা নয়, তবু তিনি প্রাণের ব্যাস ও কবিতার ব্যাস বাড়িয়ে তুলতে চান ব'লে মর্মমূলে সেই ধ্বনি গেঁথে নেন। তাঁর কবিতায় লুপ্ত ভাষার অপঠিত লিপি-তে প্রাচীন মুদ্রিত ধ্বনি আজো মানুষের চেতনার কাছে পাঠোদ্ধার চায়। ভাঙা এক টুকরো শিলালিপি-তে মূর্ত অপ্সরার উরসের অংশে শিলীভূত কামনার যৌনসৌন্দর্য রূপায়িত হয়। ঘৃণাপিচ্ছিল বিবরের সরীসৃপের বিষফণার মধ্যে কবি আদিম প্রবৃত্তির হিংস্রতার খোঁজ করেন, পাখির মধ্যে দেখেন প্রবৃত্তির আত্মিক নীলমুক্তি।

আরো এক শ্রেণীর চিত্রকল্প আছে যাকে একান্ত গোপন চিত্রকল্প (Private Image) বলা সমীচীন। বাঙ্ময় হ'য়ে উঠলে পর একান্ত গোপন আর একান্ত গোপন থাকে না, তবু একটি রহস্যের কুয়াশা-বলয় এই সব চিত্রকল্পগুলিকে ঘিরে থাকে। হয়তো এগুলিই যথার্থ প্রতীক, যাদের সম্বন্ধে বলা চলে : এরা অনুবাদ নয়, এবং কখনও অনূদিত হ'তে পারে না।

"আরো একজন আছে
নাম যার ধরিনা কখনো ;

মনে পড়ে যায় শুধু
কাজ সেরে ক্ষেতে ও খামারে,
ঘাম মুছে এক হাতে
জীবনের বেড়াটার ধারে এসে দাঁড়াই যখন ;
শুনি তার নিশ্বাসেতে উথলায় রাতের আঁধার,
শিহরায় অরণ্য গহন ।" (আরো এক : ফেরারী ফৌজ)

এই 'আরো একজন' একটি প্রাইভেট ইমেজ । কারো কাছে 'আরো একজন' ভগবান, কারো কাছে জীবনদেবতা, কারো কাছে কবিতাসুন্দরী, আবার কারো কাছে নিশ্চেতনসত্তা বা মগ্নচৈতন্য । কবির কাছে এ হয়তো প্রথম প্রণয়, অথবা প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণা, অথবা সব-কিছুর মিলিত রূপ, তবু তা যেন মিলিত রূপকেও অতিক্রম ক'রে চ'লে যায়, চ'লে যেতে পারে । 'আরো একজন' হলো অজ্ঞাত অসংজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত সত্তার গূঢ় পরিচয়ের প্রতিরূপ ।

শহরে ভিড়ের ঘেষাঘেষি-তে শরীরে ও মনে কত ছোঁয়া লাগে । সে-সব ছোঁয়ার দাগ আবার মুছেও যায় । কেবলমাত্র একটি গভীর ছোঁয়া মোছে না, হৃদয়ের একেবারে কাছে লেগে থাকে । এ-ছোঁয়া হলো সেই আরো-একজন না-দেখা বন্ধুর ছোঁয়া ;

"চোখ তারে চেনে নাকো
মন তার জানে না প্রমাণ,
চেতনার অন্য পিঠে শুধু
আজীবন বয়ে ফিরি সুগোপন এক অভিজ্ঞান ।
(ছোঁয়া : ফেরারী ফৌজ)

এই 'আরো একজন' কখনো বা কবির চেতনায় 'নীল তারা' হ'য়ে ফুটে ওঠে ('তোমার জীবন ফোটে শুধু এক নীল তারা পানে' : নিঃসঙ্গ : ফেরারী ফৌজ), আবার কখনো এক আশ্চর্য পাখি হ'য়ে আলিসায় অথবা মাস্তুলে এসে বসে । যে-পাখি কোনোদিন কোনো জালে ধরা পড়ে নি, খাঁচায় তাকে ভরা যায় না । সে শুধু আকাশ নয়, বন নয়, বিফল স্বপ্নও নয়, সে হলো :

"ভাবী সূর্য হতে ছেঁড়া
কোন এক ভয়ছাঁকা রোমাঞ্চিত রাত
—জীবনের আশ্চর্য সাক্ষাৎ ।" (পাখি : ফেরারী ফৌজ)

আরো একজন-নীলতারা-আশ্চর্য পাখি কবিসৃষ্ট একটি মিথ, ফেরারী ফৌজের অন্তর্ভুক্ত 'জনৈক' কবিতায় যা দানা বেঁধে উঠেছে । হাজার ভিড়ের মধ্যে থাকলেও এখনো আমরা কোনো অখ্যাত গলির নাম ভুলতে পারি না, 'আজো যার পাইনি ঠিকানা' । কবিসৃষ্ট আরও একটি মিথ হলো সূর্য-সেনার মিথ, সংশপ্তক বাহিনীর মিথ, যাকে তিনি মহাভারত থেকে মহাবিশ্বে সম্প্রসারিত করেছেন । একটি হলো প্রগাঢ় ধ্যানের নীল প্রশান্তির মিথ, অন্যটি তিমির-বিনাশী প্রাণপ্রাচুর্যের উদ্দীপ্ত আশার মিথ । মানব-সমাজের অনুমোদন ও স্বীকৃতি আদায়ের অভিপ্রায়ে কবি মানবসভ্যতার ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর মিথ দুটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । এরা দূর অতীত থেকে বর্তমানে উপস্থিত হয়েছে, আবার বর্তমান অতিক্রম ক'রে চলেছে দূর ভবিষ্যতের পানে ।

এ-দুয়ের মাঝখানে কবি একটি সূক্ষ্ম উপলব্ধির সেতু-ও রচনা করেছেন, যাতে একটি মিথ থেকে অন্য মিথে চলে অবিরাম যাওয়া-আসা। নীল প্রশান্তির রহস্যময় গভীরে সৃষ্ট হয় যে আত্মপ্রত্যয়ের আগুন, মাটির গর্ভের চাপ চাপ অন্ধকার তা-তেই বিশোধিত হয়ে কঠিন বিদ্যুতের মতো নীলাভ ইস্পাতে পরিণত হয়; সেই ইস্পাতে নির্মিত হয় যে আশ্চর্য কৃপাণ, তা-তে ঝলসিত হ'য়ে ওঠে সূর্যের মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ। সেই কৃপাণ হাতে পেলে মানবসমাজের প্রতিনিধি কবি পৃথিবীর অন্ধকারে বিচ্ছিন্ন সূর্যসেনাদের সাত সাগরের তীরে জড়ো হ'তে আহ্বান জানাতে পারেন, উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন : 'এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হলো ফেরারী ফৌজের'।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার কাঠামোতে আমরা কবির সামাজিক মনের পরিচয় পেয়েছি, দেখেছি তিনি পাঠকের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনে উৎসুক। তাঁর কবিতার গীতিধর্মী, নাট্যধর্মী ও ব্যাখ্যানধর্মী কাঠামো সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও করেছি। এর সংগে যোগ করা যেতে পারে কাহিনীধর্মী আঙ্গিক, যেখানে কাহিনী ক্রমশ আশায়, উদ্বেগে নাটক হ'য়ে ওঠে এবং কাব্যিক অনুভূতিতে শেষ পরিণতি লাভ করে। উদাহরণ হিশেবে 'লগ্ন' (কখনো মেঘ), 'জনৈক' (ফেরারী ফৌজ) ইত্যাদি উল্লেখ-যোগ্য। এছাড়াও তাঁর কবিতায় কয়েকটি গাঠনিক বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ে। কেবলমাত্র চিত্রকল্প ও প্রতীকের ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহ্য-কে নতুন ক'রে আবিষ্কার করেন নি, কবিতার গঠনের মধ্যেও ঐতিহ্য-কে নতুন মর্যাদা দিয়েছেন।

"সময় শাসিত হোক, ধেনু ধান্যে পূর্ণ হোক ধরা
প্রাণের বিক্রম নিত্য দিগ্বিজয় ছড়াক উল্লাসে।
সে শুধু না নির্বাসিত হয়, যার উঞ্ছতৃপ্ত মন
খোঁজে না আয়ুর উহ্য, ভ্রান্তিকেই সেধে ভালবাসে।"

(কিন্নর : অথবা কিন্নর)

সংস্কৃত নাটকের শেষে প্রথাসিদ্ধ আশীর্বচনের ভঙ্গিটি কবি নিজের কাব্যাদর্শের অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছেন, এবং এই প্রাচীন রীতির সাহায্যে তিনি স্মরণ করেছেন প্লেটো-কে, যিনি তাঁর কল্পিত রিপাবলিক থেকে কবিদের নির্বাসন দিয়েছিলেন।

রূপকথার ভঙ্গির সাহায্যে তিনি কবিতায় রূপকথার আমেজ ছড়িয়ে দেন :

"দমকা হাওয়ার সকাল, তুমি কার ?
নয় ইতিহাস নয়কো পঞ্জিকার।
হারিয়ে গিয়েই পায় নিজেকে
শুধুই বুঝি তার।" (তারিখ : অথবা কিন্নর)

কোথাও বা এনেছেন লোক-গীতির আঙ্গিক :

"যাদের তুমি চিনতে, তারাও
হারিয়ে যাবে,
এই শহরে। শহর বড় কঠিন।
মাটিকে সে পাথর করে,
অরণ্যকে কাঠ,

আকাশটাকে ছাদে ঢেকে
ভেজিয়ে দেয় কপাট।
কঠিন শহর !" (এই শহরে : অথবা কিন্নর)

কখনো আঙ্গিকের জন্য তিনি ছড়ার রাজ্যে প্রবেশ করেছেন :

"এ তো বড় রঙ্গ যাদু
এ তো বড় রঙ্গ !
নিজেই আগুন জেলে
আবার
নিজেই হই পতঙ্গ !
ওপর তলায় আসর মেলা।
চলছে সতরঞ্চ খেলা।
খুঁটি কিন্তু নীচের তলায়
যা নড়ে তার ব্যঙ্গ !" (রঙ্গ : কখনো মেঘ)

এ-সবের উদ্দেশ্য একই : প্রথমত কবিতার বৈচিত্র্য সাধন করা, দ্বিতীয়ত ভাষার প্রকাশক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া ; এবং তৃতীয়ত দেশের নাড়ির সংগে যোগ স্থাপিত ক'রে সামাজিক অনুমোদন আদায় ক'রে নেওয়া, যা যে-কোনো শিল্পকর্মের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কয়েকটি কবিতার মধ্যে স্বপ্নের বিচিত্র আঙ্গিক দেখা যায় : প্রতিটি স্তবকের শেষে একটি আলগা পংক্তি, যার সঙ্গে স্তবকটির বিষয়বস্তুর কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না ; মনে হয় একটি ভাবের সংগে জড়িত হ'য়ে আছে অন্য একটি ভাবের ভগ্নাংশ। কবিতা যতই অগ্রসর হয়, ততই আলগা পংক্তিগুলি পাঠকের অজ্ঞাতে মনে দানা বাঁধতে থাকে, এবং কবিতা শেষ হ'লে টের পাওয়া যায় ঐ আলগা পংক্তিগুলি মূল বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। দুটি ভাব পরস্পর-কে গড়ে উঠতে সাহায্য করে, তারপর দুয়ের মিলনে হঠাৎ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে ভাবসত্যের তৃতীয় পরিসর। এ-রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ : রোদের প্রার্থনা (সাগর থেকে ফেরা) ও জানলায় (অথবা কিন্নর)।

কবিতার শেষে একটি মন্তব্য করার রীতি তাঁর অনেক কবিতায় অনুসৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও এতে লাভ হয়েছে, পাঠক হয়তো এর ফলে নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছেন, যা তাঁর চেতনায় ধরা দেয়নি ; কোথাও বা কবিতার শিথিল ভঙ্গি সংহত ও নিবিড় হবার সুযোগ পেয়েছে। যেমন, 'বারান্দা' কবিতার শেষ পংক্তি 'ত্রিশঙ্কু একা—দেবতা-ঈর্ষিত' অথবা 'হরিণ চিতা চিল'-এর শেষ পংক্তি 'অগ্নিগর্ভ গহ্বর সব বোজানো ?'-তে কবিতার এলোমেলো চুলের গুচ্ছিগুলি জড়ো ক'রে কবি টান-টান বেণী রচনা ক'রে দিয়েছেন, তা-তে কবিতার সৌন্দর্য অনেক বেড়েছে। কিন্তু যেখানে প্রাঞ্জল হ'তে গিয়ে কবি মাত্রা ছাড়িয়েছেন এবং একাধিক পংক্তি ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ যেখানে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যঞ্জনা নয়, ব্যাখ্যা, সেখানে তিনি নিজের সৃষ্টি-কে বিপন্ন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'ইশারা' (হরিণ চিতা চিল) ও 'লগ্ন' (কখনো মেঘ)-র উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-রীতির ফলে অল্প-বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন কবিতার সংখ্যা কম নয়। একটি নির্দিষ্ট অর্থে কবিতা-কে বাঁধার তাগিদে, কবিতা চারিপাশের প্রয়োজনীয় মুক্ত পরিসর থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যেখানে ব্যঞ্জনা ডানা মেলার

অবকাশ পায়। সার্থক কবিতাগুলির সংগে ক্ষতিগ্রস্ত কবিতাগুলির তুলনা করলে এ-সত্য ধরা পড়ে যে, বনিতার মতো কবিতারও সৌন্দর্য বিস্তারের জন্য একটু মোহিনী আড়ালের প্রয়োজন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কাব্যসৌধ 'মার্বেল' দিয়ে গাঁথেন নি, 'ইট' দিয়েই গেঁথেছেন, আবার পাকা দেওয়ালের কঠোর জ্যামিতি ভাঙতে জানলায় বন্যলতাটা তুলে দিতে ভোলেননি। সামনে রেখেছেন বাগান, পেছনে একফালি আগাছার জঙ্গল। দিনের বেলায় গলানো সোনার মতো রোদ, আর রাত্রিবেলায় নীল তারা তাঁর সঙ্গী। তিনি ঝুল বারান্দায় ব'সে একই সংগে জীবনের ঢেউ আর উধাও আকাশের আস্বাদ নেন, কোথাও তিনি প্রবাসী নন। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে আমরা আত্ম-পরিক্রমা করি, শুনতে পাই আত্ম-অতিক্রমণার দূর সমুদ্র-স্বর; আমাদের সংকীর্ণ পাঁচিল-ঘেরা জীবনে বয়ে যায় এক ঝলক টাটকা হাওয়া, যা আমাদের বুকের অশ্বত্থগাছের পাতাগুলিকে কাঁপিয়ে দেয়। আর তখনই আমরা কবির পরামর্শ মেনে নিতে বাধ্য হই:

"সমস্ত শব্দের মাঝে
যে বিদ্যুৎ-চঞ্চল শূন্যতা
তাই যদি খুঁজে পাও
উদ্ভাসিত চেতনায় নিরর্থক সব মুখরতা।" (শব্দ: কখনো মেঘ)

---

১ কবিতা-রচনায় যে কবির নিশ্চেতনা-(unconscious)র কিছু সক্রিয় অংশ থাকে, তার প্রমাণ হিশেবে ঐ কবিতাংশটিকে ব্যবহৃত 'নিমীলিত' শব্দটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বানানের একটু বিপর্যয় ঘটিয়ে কবিতায় ওটি ছাপা হয়েছে 'নিমিলিত'। এ-কে আমি প্রুফ-রীডারের ভুল বলতে চাই না। আমার বিশ্বাস, মূল পাণ্ডুলিপিতেই এ-ভুল ছিল। কবির অন্যমনস্কতা এর কারণ। কবির অবদমিত অথবা নিরুদ্ধ মিলন-বাসনা এই বানান-বিপর্যয়টুকুর সাহায্যে চেতন মনের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে এবং নিজেকে ছদ্মবেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যদি বানান-ভুল নাও থাকে, তাহলেও 'নিমীলিত' শব্দের উচ্চারণের মধ্যে কবির প্রিয়ার সংগে মিলনের অভীপ্সা স্বপ্নের মতো পরিপূর্তি লাভ করে। আমরা যেন ভুলে না যাই: "A dream is a (disguised) fulfilment of a (suppressed or repressed) wish".

(The Interpretation of Dreams : Sigmund Freud.)

বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ভাবলোক

কমলেশ চট্টোপাধ্যায়

আজ থেকে অর্ধশতাব্দী কাল পূর্বে এক অতি তরুণ বাঙালিকবি পাঠকসমাজে আলোড়ন তুলে ঘোষণা করেছিলেন, ভগবান ও মানুষ পরস্পরের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী। ঘোষণাটি তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক : "যে আদিমানব বিধাতার সৃষ্টি সে অসহায়ভাবে পাশববৃত্তির অধীন, কিন্তু সেই মানুষই তার আপন সাধনার দ্বারা নিজেকে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত করেছে, হয়ে উঠেছে কবি ও শিল্পী—ঈশ্বরের সতেজ স্রষ্টা" বলেছে, "আমি যে রচিবো কাব্য, এ উদ্দেশ্য ছিলো না স্রষ্টার। / তবু কাব্য রচিলাম। এই গর্ব বিদ্রোহ আমার। /"১

শিক্ষিত বাঙালি কাব্যরসিকের কাছে বলা বাহুল্য যে কাব্যের নাম "বন্দীর বন্দনা", এবং কবি কুড়ি বছরের তরুণ বুদ্ধদেব বসু।

বুদ্ধদেবের কবিতার অনুরাগী বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তরুণ কবির এই বিদ্রোহের মধ্যে কবির মনের পরিণতির একটা তথ্যের দিক আবিষ্কার করেও বলেছেন, " 'বন্দীর বন্দনা'র বিধাতা কবির একটা বিশেষ ভঙ্গী প্রকাশের উপলক্ষ্য মাত্র। পুতুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মনে বিদ্রোহ রস জাগানো সম্ভব নয়।"২

পরিণত শিল্পী বুদ্ধদেব অতুলচন্দ্র গুপ্তের সস্নেহ অভিযোগের উত্তর দিয়ে সশ্রদ্ধভাবে বাঙালি পাঠককে নিবেদন করছেন, " 'বন্দীর বন্দনা' কবিতাটি যুক্তির দিক থেকে সমর্থনযোগ্য হয়ে ওঠে যদি ভগবানের জায়গায় 'প্রকৃতি' শব্দটি ব্যবহার করা যায়।" কারণ "ভগবান যদি মানুষকে জান্তবলালসাদি দিয়ে থাকেন তাহলে তার চিত্তের উন্নত প্রেরণাগুলিও তাঁরই দান। কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি উত্তেজনার উৎসস্থল প্রকৃতি ; সে আমাদের অনবরত আহ্বান করছে জৈবতার স্রোতে গা ঢেলে দিতে, কিন্তু কবিতা একটি চিন্ময় পদার্থ তা সৃষ্টি করতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য জৈবধর্মকে অস্বীকার করতে হয়, ঘোষণা করতে হয় চিত্তবৃত্তির ক্ষণিক ও বলীয়ান স্বাধীনতা। অতএব কবিতা লেখার কাজটিকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বললে ভুল হয় না।"৩

বন্ধু সুধীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব সুধীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা বিষয়ে যে কথাগুলি বলেছেন—তার মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব শিল্পীমনেরও পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, ফুটে উঠেছে তাঁর একান্ত ভাবজীবনের গতি-পরিণতির ইতিহাস : "তিনি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন—যা আমার উপলব্ধি করতে অন্তত কুড়ি বছরের সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন হয়েছিলো যে কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে

চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনিমাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ।"[৪]

বুদ্ধদেব সুধীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা সম্পর্কে যে মূল্যবান কথাগুলি "সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহের" ভূমিকায় বলেছেন—তার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেবের নিজের এবং যুদ্ধোত্তর কালের আধুনিক কবিশিল্পীদের ভাবজীবনের মর্মকথাটিও ব্যক্ত হয়েছে। আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিনিধি টি. এস. এলিয়ট কবির ভাবলোকের ঐ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের রূপটি তাঁর "Four quartets" কাব্যের "East Coker" কবিতায় এইভাবে ব্যক্ত করেছেন, "···Leaving one still with the intolerable wrestle / With words and meanings···।"[৫] বুদ্ধদেব তাঁর সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ক আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথের "আশুচেতন" মনোভাবের সঙ্গে তাঁর শিল্পীজীবনের দীর্ঘ শিক্ষানবিশীর কথা যেভাবে ব্যক্ত করেছেন—ঐ কথাগুলিই এলিয়টের উক্ত কবিতায় কবি-ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, "···having had twenty years— / Twenty years largely wasted,···Trying to learn to use words,···।"[৬]

বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ভাবলোক বা তাঁর কবিজীবনের পরিণতির কাহিনী অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যায় যে 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যের তারুণ্যজনিত উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসুর কাব্যভাষা ও ভাবনার পরিণতির প্রথম স্বাক্ষর সেই কাব্যে যথার্থভাবে অঙ্কিত হয়েছে—যার ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন চলেছে তাঁর কাব্যে পরবর্তী চল্লিশ বছরের অধিককাল। বুদ্ধদেবের কাব্য ভাবনায় তাঁর দ্বন্দ্বময় চৈতন্যের বিবর্তন ও বিকাশের যে ছন্দোময় এবং ধ্বনিময় অক্ষুন্নরূপ আমরা তাঁর দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অধিককালের কাব্যজীবনের মধ্যে লাভ করি—তার তুলনা আধুনিক যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যেই পাওয়া যায়। কাব্যজীবনে 'অকপটতা' এবং 'অবৈকল্যে'র সাধকরূপে তিনি তাঁর কবি-বন্ধু সুধীন্দ্রনাথের কেবল সহমর্মী নন—যোগ্য একজন সহধর্মী। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে 'বন্দীর বন্দনা'—যুগ থেকে বুদ্ধদেবের 'স্বাগত বিদায়" পর্যন্ত তাঁর সেই ভাষাময়, ধ্বনিময় এবং সর্বোপরি দ্বন্দ্বময় কাব্যভাবনার বিকাশ তাঁর ভক্ত পাঠকেরাও অনেকে লক্ষ্য করেন না। যার কারণস্বরূপ সুধীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের কাব্যের সম্মোহনকারী 'প্রসাদগুণের' কথা বলেছেন: "নির্বিকার স্বাচ্ছন্দ্যের আড়ালে তাঁর নিরন্তর পরিণতি আপাতত চোখে পড়ে না।"[৭]

কিংবা শ্রীযুক্ত নরেশ গুহ 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত "বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতার" আলোচনা করতে গিয়ে 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে প্রকাশিত এবং পরবর্তীকালে অবিরাম পরিবর্ধিত ও পরিশীলিত বুদ্ধদেবের কাব্যভাবের মর্মকথাটিকে বা তাঁর কাব্যপ্রকাশের সমস্যাটিকে তুলে ধরেছিলেন, "এ সমস্যা পরলোক ঈশ্বর আর অনন্ত জীবনে আস্থা হারিয়ে ইহলোকেই শিল্প আর জীবনের দারুণ দ্বন্দ্বে নতুন করে সমন্বয় সাধনের সমস্যা···।"[৮] শ্রীযুক্ত গুহ নিশ্চিতভাবেই বলেছেন, "··· এবং সেই সমন্বয় খুঁজতে গিয়ে আঙ্গিক, ভাষা, ছন্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা সব কিছু নিয়ে তাঁর কাব্যের চরিত্র এমন অত্বরান্বিত অথচ নিশ্চিত গতিতে বিবর্তিত হয়ে উঠেছে যা তাঁর মুগ্ধ পাঠকমণ্ডলীকেও প্রথম প্রথম এড়িয়ে যেতে পারে।"

বুদ্ধদেবের কাব্যের পরিণতিসন্ধানী একজন নিবিষ্ট পাঠক লক্ষ্য করতে পারেন যে,

ইয়েটস যেমন তাঁর উত্তরকালের কাব্যে এবং রিলকে তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনে কেবলই অনুসন্ধান করেছেন—জীবনের সঙ্গে শিল্পের, প্রাণের সঙ্গে মনের, দেহের সঙ্গে প্রাণ ও মনের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের পথ, বুদ্ধদেবও তেমনি উত্তরোত্তর তাঁর 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী', 'নতুন পাতা', 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর', "যে আঁধার আলোর অধিক", 'মরচে পড়া পেরেকের গান', 'স্বাগত বিদায়' প্রভৃতি কাব্যে তাঁর নিজস্ব জীবনদৃষ্টির আলোকে উক্ত সব দুরূহ প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন।

আধুনিক কাব্যের এবং আধুনিক কবিচরিত্রের আলোচনায় বুদ্ধদেব বলেছেন "যাকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলি—আর তার মধ্যে উনিশ শতকের অবদানও প্রচুর—তার একটি মূল সূত্র হলো, প্রাণ ও মনের দ্বৈত, প্রকৃতি ও চৈতন্যের বিরুদ্ধতা।...এর উচ্চারণ প্রথম যাঁর মধ্যে স্পষ্ট হলো তিনি বোদলেয়ার... ।"[৯] বোদলেয়ার-ভক্ত বুদ্ধদেবকে আরো বলতে শুনি, "তাঁর (বোদলেয়ারের) ধারণায় নারী স্বাভাবিক বলেই ঘৃণ্য, এবং এক উদ্ভিদহীন ধাতুনির্মিত প্যারিস তাঁর স্বপ্নকামনা।"[১০] কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁর কাব্যজীবনে বোদলেয়ারের কাছে "ক্ষমাহীন ভাবে আত্মপরীক্ষার ব্রত" গ্রহণ করলেও নারীকে 'স্বাভাবিক' বলেই কখনো 'ঘৃণ্য' মনে করেন নি এবং শিল্পপ্রেমের সঙ্গে নারীপ্রেম মিলিত করার দ্বন্দ্বময় সাধনাই হয়তো তাঁর কবিজীবনের ইতিহাস,—যেখানে তিনি বোদলেয়ার বা কোনো পাশ্চাত্ত্য কবির সহযাত্রী নন, এমনকি তাঁর সমকালীন তাঁর প্রিয় কবি সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের সঙ্গেও যেখানে তাঁর প্রভেদ ধরা পড়ে। সুধীন্দ্রনাথ বলেন, 'মানসীর দিব্য আবির্ভাব, / সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী /"[১১] জীবনানন্দের কাব্যে 'বনলতা সেনে'র অমর প্রেমের উদ্ভাস থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই—কবির সমস্ত হৃদয় 'ঘৃণায়' 'বেদনায়' 'আক্রোশে' ভরে গেছে তাদের কথা ভেবে, 'যাদের অনেক সময় সন্তানের জন্ম দিতে দিতে কেটে যায়,' এবং তাঁর কবিচেতনায় প্রতিফলিত হয়, 'পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ' যারা "স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে,—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে...শূয়োরের মাংস হয়ে যায়?"[১২] পক্ষান্তরে প্রৌঢ়ত্বের শেষধাপে আরোহণ করে বুদ্ধদেব 'মন ও প্রাণের এক অন্তহীন বিতর্কে' জড়িয়ে পড়েও তাঁর একটি কবিতায় বলেন,

"কিন্তু আজও যার কথা ভাবি
সে মরত্বে রূপসী—পাষাণ নয়—আমি ম'জে আছি তার প্রেমে।"[১৩]

যৌবনের ঔদ্ধত্যে, 'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু'রূপে আপন জাতিস্মরতার উপলব্ধিতে অর্থাৎ নিজের কবিপ্রতিভার বিকিরণের অপারবিস্ময়ে নারীকে প্রথম যৌবনের কিছু কবিতায় যথা 'বন্দীর বন্দনা'য় বুদ্ধদেব ব্যঙ্গ করেছিলেন,

"আর নারী? আমরা ভালোবাসিতে পারি হেন নারী / আছে কি মরতে?... সুচরিতা কভু জন্ম নেয়, মররমণীর গর্ভে? দেখিতে কি আশা করো সখা, / পারিজাত সূর্যালোকে গড়ুইন দুহিতারে কভু?[১৪] কিন্তু নারীর প্রতি এই ব্যঙ্গপূর্ণ মনোভাব তাঁর নিতান্তই অচিরস্থায়ী। ইতিমধ্যে ঘটলো জয়েসের "A portrait of the artist as a young man"-এর ভাষায় "Epiphany" আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ", কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে লাভ করলেন প্রেমের পরম প্রসাদ। রক্তমাংসের প্রেয়সীর মধ্যেই আবিষ্কার করলেন তাঁর কল্পলোকের কঙ্কাবতীকে।

'আমার যৌবন' নামক তাঁর স্মৃতিচারণে এবং 'কঙ্কাবতী' ও 'নতুন পাতা'র কবিতায় শিল্প চেতনার সঙ্গে নারী-প্রেম চেতনার পরিপূর্ণ মাধুর্যের অনুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মোহিনী কবিতা এবং কাম্য নারীর সৌন্দর্য তাঁর কাছে একই অদ্বৈতের লীলারূপ বলে মনে হয়েছে। 'কবিতা ও আমার জীবন' নামক তাঁর আত্মকথায় তাঁর সেই আনন্দিত অনুভব ব্যক্ত হয়েছে : " 'চিল্কায় সকাল' কবিতাটি সত্যি চিল্কার ধারে বসেই লিখেছিলাম, সত্যি এক সকালবেলায়—আমার জীবনের নিবিড় এক আনন্দের মুহূর্তে। যেন মুহূর্তটিকে হাতে হাতে গ্রেপ্তার করে ফেলেছিলাম, তার সব গন্ধ ও সজলতাসুদ্ধ্"। আর তাঁর কবিভাষায় তাঁর সেই আনন্দের প্রকাশে তাঁর বাঞ্ছিতা নারী এবং কাব্যশিল্প যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে :—

"...কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে যেতে আমরা দেখেছিলাম / দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে / জলের উপর দিয়ে।—কী দুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে, আর আমার কী ভালো লেগেছিলো..." /[২৫]

বুদ্ধদেব তাঁর পরিণত বয়সে রচিত তাঁর উক্ত 'আত্মকথা'য় কেমন ক'রে তাঁর 'বয়স' এবং 'স্মৃতি' যুগপৎ বেড়ে উঠেছে এবং তাঁর জীবন ও শিল্পের মধ্যে প্রথম যৌবনের সেই অদ্বৈতবোধের পরিবর্তে এক তীব্র আর্তি এবং দ্বৈতের চেতনা জেগেছে, সেই সংগ্রাম ও যন্ত্রণার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। 'দ্রৌপদীর শাড়ি', 'দময়ন্তী' কাব্যপর্যায়ে এসে সময় এবং মরত্ব সচেতন কবি যেমন একদিকে সুধীন্দ্রনাথ কথিতভাবে তাঁর কবিতায় 'গদ্য পদ্যের বিরোধভঞ্জনের' চেষ্টা করছেন—কাব্যিক ভাষা বর্জনের চেষ্টা করছেন—তাঁরই ভাষায় 'তাঁর নিজস্ব রচিত নিয়মেরই অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়ে,'—তেমনি ক্ষণকালের জন্য পাওয়া 'নতুন পাতা' যুগের সেই এলিয়ট কথিত 'still-point' থেকে স্খলিত হয়ে জীবনের এবং নরনারীর জৈব-প্রেমের অনিবার্য কঙ্কালরূপ দেখে বেদনার্ত হয়েছেন। যেজন 'দময়ন্তী' কবিতায় নলরাজারূপী কবি তাঁর যৌবনেই বার্ধক্য চেতনায় আক্রান্ত হয়ে বলছেন 'বিনয় বৃদ্ধের বিদ্যা'। কোনো কোনো সমালোচক 'ত্বরাগত' এই বার্ধক্য চেতনার জন্য কবিকে কটাক্ষ করেছেন কিন্তু—এই পুরাণাশ্রিত কবিতাটির ভাব ও বিন্যাস (Pattern) লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কবি যেমন একদিকে নরনারীর সৌন্দর্য ও যৌবনের অনিবার্য ক্ষয় ও দেহের মৃত্যুর কথা ভেবে পীড়িত হয়েছেন, তেমনি উক্ত পৌরাণিক কাহিনীটির আশ্রয়ে—জৈবপ্রেমের নশ্বরতা জেনেও—তার মধ্যে কবি শিল্পীর চিরকালীন প্রেরণার রূপটিও তিনি আবিষ্কার করেছেন।

বুদ্ধদেবের 'দময়ন্তী' কবিতাটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি নল ও দময়ন্তীর বিবাহিত জীবনের ভাগ্য-বিপর্যয় ও পুনর্মিলনের কাহিনীর কোনো সঙ্কেত তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেন নি, কিন্তু দময়ন্তীর অলৌকিকভাবে পতি নির্বাচনের কাহিনীর মধ্যে নশ্বর মানুষের আদি তথা আবহমান জীবনধারার একটি রহস্য আবিষ্কার করেছেন। সে রহস্যটি হলো এই যে, মানবজীবনের অনিবার্য জরা, বার্ধক্য ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে যুগে যুগে মর্ত্য মানবমানবীর প্রেম দেবতার তথা নিয়তির ছলনা সত্ত্বেও জয়ী হয় :

"স্বর্গ তোকে চায়, যজ্ঞ তোকে চায়,
মৃত্যু তোকে চায়।

কিন্তু যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে জন্তুর গুহায়,
নাভিমূলে যজ্ঞবেদী, মৃত্যু আরো নিচে।
একদিন হংসদূত এসে
তারই সংগোপনমন্ত্র জপে গেছে তোর
কানে কানে,
শুনায়েছে প্রিয়তম নাম।
প্রণাম, প্রণাম,
দেবগণ, ক্ষমা করো, ত্রাণ করো বিপন্নারে,
যেন চিনি তারে
সহস্র নলের মধ্যে, এই বর দাও।"[১৬]

বুদ্ধদেব তাঁর যুগের পটভূমিকায় দময়ন্তীর বিবাহঘটিত মহাভারতীয় উপাখ্যানের ব্যক্তিধর্মী রূপান্তর সাধন করেন নি, বরং ঐ অলৌকিক বিবাহঘটনার সাংকেতিক রূপ তিনি আক্ষরিকভাবেই তাঁর কবিতায় গ্রহণ করেছেন। 'যজ্ঞ' এবং 'যজ্ঞবেদী'র উল্লেখে যেমন বুদ্ধদেবের অভিলষিত, মানবজীবনের অনাদিকালের যৌনপ্রেমের চেতনা প্রকাশিত হয়েছে—তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত চেতনা বা অবচেতনার অভিঘাতের সমান্তরালভাবে এই কবিতায় লিখিত পুরাণকাহিনীর-স্তর-অতিক্রান্ত আদিকালের মানুষের মনোভূমিতে-রচিত নশ্বর মানুষের স্বর্গজয়ী প্রেম-কাহিনীর প্রকাশও ঘটেছে।

কবি পিতা (নলরাজা) তাঁর কন্যাকে সম্ভাষণ করে তাঁর বার্ধক্য-পীড়িত জীবনের বিলাপ শোনাচ্ছেন না, বরং শোনাচ্ছেন কন্যার মাতা ও পিতার সেই দেবজয়ী স্বয়ম্বর ও দেহমিলনের কাহিনী, যে মিলনের ফল আজকের এই যৌবনবতী কন্যা (দময়ন্তী) এবং যার মধ্যে নিহিত আছে সেই চিরন্তন প্রেম ও যৌবনের জাদু, যার আকর্ষণে স্বর্গের দেবতারাও আকৃষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত মর্ত্যের প্রেমিক মানুষের জন্য সসম্মানে পথ ছেড়ে দেন এবং মর্ত্যমানুষের প্রেমের আন্তরিক প্রেরণা ও সৃষ্টিশক্তিকে জানান অভ্যর্থনা :

"লক্ষ রাত্রি, লক্ষ দিন
কেটে যায়—নাকি আসে ফিরে ফিরে,
মৃত্তিকার মূর্তি দিতে চিরন্তনী দময়ন্তীরে?"[১৭]

'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' নামক অলৌকিক রসের পৌরাণিক ঘটনার মধ্যেও বুদ্ধদেব মানব ইতিহাসের একটি 'আদি সত্য' এবং 'পবিত্র কাহিনী'র সন্ধান পেয়েছেন এবং 'দ্রৌপদীর শাড়ি' নামক তাঁর কবিতাটি-তে তিনি তা প্রকাশ করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন যে সেই আখ্যানের যেটি প্রত্যক্ষ অলৌকিকতা, অর্থাৎ অন্তরালে থেকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দ্রৌপদীকে অনিঃশেষভাবে লজ্জাবস্ত্র দান করার কাহিনী—সেটি আজকের বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার যুগে গ্রাহ্য নয়—কিন্তু তথাপি দুঃশাসনের সেই অবিরাম এবং নিষ্ফল দ্রৌপদীর ঐ লজ্জাবস্ত্র আকর্ষণের অলৌকিক ঘটনার সাঙ্কেতিক আবেদন এ-যুগের পক্ষে কিছুমাত্র কম নয়, বরং বেশি। বুদ্ধদেব পাশ্চাত্ত্য দেশের মিথ-ব্যবহারকারী কবিদের মতোই তাঁর উক্ত কবিতার বিষয়বস্তুতে এবং প্রকরণে মিথ-পুরাণের

গূঢ় ব্যবহার ঘটিয়ে দেখাতে চাইলেন যে, আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও কারিগরি তন্ত্রে জড়শক্তি, দুঃশাসনের মতো প্রত্যক্ষভাবে কেবলই প্রেম ও সৌন্দর্যরূপিনী দ্রৌপদীকে তথা—প্রকৃতিকে বিবস্ত্র করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও জড়শক্তির সমস্ত দুঃশাসনধর্মী বিশ্লেষণী শক্তিকে উপেক্ষা করে নরনারীর প্রেম, সৌন্দর্য এবং কবিশিল্পীর মনে সৃষ্টির-স্বপ্ন 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র মতোই অন্তহীনভাবে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে :

> "ভাঙলো ঘুম, লাল আগুন / ধৈর্যহীন শিরায় / উল্লসিত হুল্লোড়ের / আনলো কড়া নাড়া। / আকাশে তারই স্বৈরাচার ; / কখনো নীল মেঘের ভার, / আলোর বাঘ কখনো ছায়া- / হরিণে করে তাড়া ; / আশার দাঁত চিবিয়ে ছেঁড়ে / দ্রৌপদীর শাড়ি।"[১৮]

পরবর্তীকালের কাব্যগুচ্ছে যথা 'যে আঁধার আলোর অধিক', 'মরচেপড়া পেরেকের গান' প্রভৃতি কাব্যে বুদ্ধদেবের কবিজীবনের প্রধান সমস্যা হলো :—রোমাণ্টিক কবিদের চিরকালীন ঐতিহ্য তথা নিসর্গজাত বহিরাশ্রয়ে তিনি আর অবলম্বন খুঁজে পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন না 'অগ্রজ কবির' 'অনন্ত প্রেমে' বিশ্বাস। অথচ নাস্তিকের মনোবৃত্তিও তাঁর নয়। একদিকে জীবনে, প্রেমে এবং শিল্পে তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস, অপরদিকে ক্ষয় এবং ধ্বংসচেতনাজনিত দোলাচল চিত্তবৃত্তি, তাঁর এই পর্বের কবিতার বিষয়বস্তুতে এবং প্রকরণে গভীর রূপলাভ করেছে। একদিকে তিনি নিসর্গপ্রকৃতি এবং জীবনের জৈবতাকে বিদায় দিয়ে ব'লে উঠছেন "প্রান্তরে কিছুই নেই ; জানালায় পর্দা টেনে দে। / ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায়—ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ ; / ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস ; / ডুবে যা নিরভিমান, একতাল, বিশ্বস্ত নির্বেদে।" এই উচ্চারণ অনেকটা উত্তর-জীবনের ইয়েটস-এর মতো—যিনি তাঁর 'Sailing to Byzantium' কবিতায় বলেছিলেন :

> "Once out of nature I shall never take / My bodily form from any natural thing, / But such a form as Grecian Goldsmiths make / Of hammered gold and gold enamelling / To keep a drowsy Emperor awake ; / Or set upon a golden bough to sing / To Lords and Ladies of Byzantium / Of what is past, or passing, or to come."[১৯]

কিন্তু পরিণত জীবনেও বুদ্ধদেব প্রকৃতি, প্রেম ও 'জৈব জাদু'কে পরিহার ক'রে তাঁর 'শিল্পের মিনারে' স্বস্তি পান না, সেজন্য তিনি মিথ-পুরাণের বিষয়বস্তু ও প্রকরণের সাহায্যে তাঁর কবিতার ভাবলোকে একটি নূতন মাত্রা যোগ করতে চান। তাঁর সেই মিথিকাল চৈতন্যের আলোকে আমরা তাঁর কবিতায় আবহমান কালের নরনারীর কাম ও প্রেমের সঙ্গে এ-যুগের তথা চিরযুগের মানুষের শিল্পসৃষ্টির গূঢ় সংযোগসূত্রটি দেখতে পাই :

> "...তবু দ্যাখ, প্রবল প্রেতের মতো দলে দলে নামে দুই তীরে / অতীত আসন্ন কাল : সেতু বাঁধে শ্রমিক সম্প্রতি— / যার কূট কুয়াশায় কেলি করে ঋষি আর ধীবর যুবতী।"[২০]

এই কবিতায় এবং 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যের আরো কিছু কবিতায় কবিমানসে যে অনন্ত কালচেতনা ব্যক্ত হয়েছে—তার সঙ্গে 'ফোর কোয়ার্টেটস্' কাব্যের কবি এলিয়টের গতিবাদী মনোধর্মের মিল আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে। এলিয়টের উক্ত কাব্যের 'East Coker' কবিতাটির শেষ পংক্তিতে আছে, '...In my end is my beginning.' আর বুদ্ধদেব তাঁর উক্ত কবিতাটিতে বলেছেন, '...অনবরত অবসানে আরম্ভ গতির'। কিন্তু বুদ্ধদেবের এই পর্ব থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের অন্তিমলগ্নের কাব্যসাধনা অভিনিবেশপূর্বক লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যধর্মী-জীবন ও কালচেতনার পরিবর্তে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যসম্মত জীবনচেতনা এবং ভারতীয় পুরাণের চক্রগতিসম্পন্ন সময়চেতনার ভাবটিই অধিকতরভাবে তাঁর কবিমানসে অঙ্গীকার ক'রে নিতে চেয়েছেন।

বুদ্ধদেব অনুভব করেছেন যে, আদি মানব মনুর মতো আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু যুগের চৈতন্যবান মানুষ, সময়ের সমুদ্রে স্বচ্ছন্দে ভাসমান নয়। মীনরূপী-ভগবানকে মস্তকে বহন কিংবা প্রলয়লগ্নে তাঁর দিব্য আবির্ভাবে উদ্ধারের আশা থেকে সে বঞ্চিত। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত, তার অবস্থা আক্ষরিক অর্থেই আজ 'জলহীন মীন'। তাই কবি তাঁর শেষ জীবনের কাব্যপর্বে তাঁর বিসর্পিলচেতনাকে ব্যক্ত করেছেন—ভারতীয় আদি-পুরাণ বা মিথের অনন্ত সময়চেতনার প্রতীকী আশ্রয়ে। তাই দেখা যায় প্রকৃতির-সৌন্দর্য-শোষক আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী-তন্ত্রের 'সেতু'র মধ্যে কবি দেখেছেন মহাভারতীয়, পরাশর-মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতীর চিরকালীন কামলীলা। ঐ কামলীলার মধ্যেই কবি আবিষ্কার করেছেন এ-যুগের জীবন্মৃত সভ্যতার বিশল্যকরণী বা প্রাণমন্ত্রকে। আধুনিক সভ্যতায় নিন্দিত এবং রিরংসায় অধঃপতিত এই 'কাম' যে কবিচেতনায় গৃহীত হ'য়েছে—তার মূলেও আছে—কবিমানসে আহৃত ভারতীয় জীবনদর্শনের প্রসাদ। তাঁর উত্তর-জীবনের 'নাটক' বা তাঁরই ভাষায় 'কাব্যজাতীয়রচনা' 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র মূল উপজীব্য-বিষয়ই হলো "আদি তপঃ আবহমান মানবজীবনে কামের প্রভাব—যার ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ এবং বারাঙ্গনা তরঙ্গিণী পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো।" উক্ত নাট্য কাহিনীর অন্তিমে বুদ্ধদেব প্রধান পাত্রপাত্রীর, কামের 'অভিঘাতে' পুণ্যের পথে নিষ্ক্রমণের যে রূপ দেখালেন, সেটি একই সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ঋষ্যশৃঙ্গ মিথ কাহিনীর অঙ্গীভূত এবং বুদ্ধদেবের সারাজীবনের অভিষ্ট কামসম্ভূত প্রেমচেতনার ফল হ'য়ে উঠতে পারলো। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে—ঋষ্যশৃঙ্গ আদি পুরাণ বা সেই আদিকালের তপস্বী ও বারাঙ্গনাকে নিয়ে নাটক রচনা করলেও—বুদ্ধদেব তার মধ্যে তাঁর অন্তর্জীবনের কাহিনী বলতে চেয়েছেন। তাঁর নিজস্ব ধ্যান, অর্থাৎ কাম ও প্রেমের সহযোগে 'দ্বন্দ্বময়-চৈতন্যে'র রূপায়ণ ঘটাতে চেয়েছেন। তাঁর প্রথম যৌবনের 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে যৌনকামনাগত উত্তেজনার সঙ্গে তাঁর শিল্পীসত্তা এবং প্রেমিক সত্তার দ্বন্দ্বের কথা তিনি বলতে চেয়েছিলেন :

"হিরণ্ময় প্রেম পাত্রে হীন হিংসাসর্প গুপ্ত আছে।
আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা।"[২১]

'বন্দীর বন্দনা'র পর বুদ্ধদেব তাঁর গল্পে, উপন্যাসে এবং কাব্যে কামোত্তীর্ণ যথার্থ প্রেমের অন্বেষণে ব্রতী হয়েছেন এবং সেই প্রেমের সঙ্গে তাঁর শিল্পবোধের সমীকরণ ঘটাতে চেয়েছেন। তাঁর শিল্পী-জীবনের দুরূহ দ্বন্দ্বের সমাধান তিনি অবশেষে পেয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় মিথ-কাহিনীভুক্ত একজন তপস্বী যুবরাজ এবং একজন প্রেমিকা বারাঙ্গনার জীবনের দেহ-কামনার উত্তরণ কাহিনীতে, যেখানে বন্ধ্যানগরীতে বৃষ্টি নামার পূর্ব মুহূর্তে মিলনের বর্ণনা প্রতীকী তাৎপর্যে এবং কাব্যসৌন্দর্যে অনুপম হয়ে ওঠে, "জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হলো। যারা জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হলো মনোরথ, উচ্ছল হলো নির্ঝর। মেঘ জমলো আকাশে, চমক দিলো বিদ্যুৎ, বিলোল হলো বজ্র। নামলো বৃষ্টি। জাগলো ধ্বনি—প্রতিধ্বনি। প্রাণ থেকে প্রাণে, অঙ্গ থেকে অঙ্গে, তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণায়—প্রতিধ্বনি।...তুমি আমার তৃষ্ণা, তুমি আমার তৃপ্তি। আমি তোমার তৃষ্ণা, আমি তোমার তৃপ্তি। সর্প তোলে ফণা, ফেনিল হয় সমুদ্র। চলে মন্থন—মন্থন—মন্থন। দীর্ণ মেঘ, তীব্র বেগ। রন্ধ্রে, রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ধরণী। বর্ষণ—বর্ষণ—বর্ষণ।"[২২]

মনে হতে পারে যে দেহনির্ভর অথচ দেহোত্তর প্রেমের রূপায়ণের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব ডি. এইচ. লরেন্সের কাছে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। যেসাসের পুনরুজ্জীবনের গল্পে ("The Man who died.") লরেন্সের দেহচেতনার যে প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে—বুদ্ধদেবের উক্ত কাব্যনাটকে এবং তাঁর সারাজীবনের কবিতায় প্রথমদৃষ্টিতে উক্তরূপ দেহবাদের প্রকাশ লক্ষ্য করা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, বুদ্ধদেব বিশেষ করে উত্তর-জীবনের কাব্যপর্বে, দেহকে অবলম্বন করেই তাকে উত্তীর্ণ হওয়ার যে কথা বলেন—তার মূল তিনি লাভ করেছেন প্রাচীন ভারতীয়-জীবনের ধর্মচর্চা এবং ধর্মবিষয়ক কাহিনীর মধ্যে। ভারতের প্রাচীন ধর্মজীবন এবং দেহচেতনার ঐতিহ্য আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব তাঁর কাব্যে-নাটকে আধুনিক কালের দেহ-বিষয়ক ছুঁৎমার্গ পরিহার করতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতা বুদ্ধদেবের 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকের 'উৎসভূমি' হলেও, বিশেষভাবে কোনখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বুদ্ধদেবের স্বভাবিত ঐতিহ্যবোধের পার্থক্য ; তাও উক্ত আলোচনায় বোঝা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু রচনায় দেহের আবেদন যথা উক্ত কবিতায় নারীর 'আনন্দময়ী মূরতি' স্বীকার করলেও দেহসম্ভূত কাম এবং তার উত্তরণক্রিয়াকে জীবনের কেন্দ্রভূমি বলে মান করেন নি,—তাঁর ছিলো অন্য কেন্দ্রীয় অবলম্বন—যথা নিসর্গ প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র জীবনসাধনার মূলধারাটিকে তাই দেহভাবিত বলা যায় না,—পক্ষান্তরে বুদ্ধদেব ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাণ, মিথ, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যে দেহচেতনার ধারণাটি—তাকেই সমগ্রভাবে তাঁর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাট্যে এবং শেষ জীবনে বহু কবিতায় গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধদেব জানতেন 'Puritanism' দেশে আছে, সেই সঙ্গে জানতেন যে 'Puritanism' গ্রহণ করলে সাহিত্যশিল্পের ক্ষতি হয়,—রূপ তখন দেহবিচ্যুত হয়ে বিদেহী ধারণায় পর্যবসিত হয়। জগতের সব কবি-শিল্পীই দেহ ও আত্মার আর্তিকে যুগপৎ প্রকাশ করতে চান, 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকায় ইয়েট্স যাকে বলেছিলেন, "...Where the cry of the flesh, and the cry of the soul seem

one...”[২৩] বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিও সেই দেহ ও আত্মার আর্তিময় যুগ্ম উপলব্ধিতে পূর্ণ :

"বুঝিনি ইন্দ্রিয় ঠকাতে পারে এত,
স্মৃতির যূপে দেয় নিজেকে বলিদান !
বুঝিনি ব্রহ্মার দ্বৈত মায়াজালে
আখেরে আত্মার সেবক হয় প্রাণ।"[২৪]

বুদ্ধদেবের 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যপর্ব থেকে শুরু করে উত্তর-জীবনের কাব্যপর্বে, বিশেষভাবে লক্ষণীয় আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে, কবি মিথ-পুরাণের ইয়ুং (Jung) কথিত 'আর্কেটাইপ' (Archetype) বা লোকায়ত জীবন থেকে গৃহীত 'বহিরাশ্রয়ের' সাহায্যে কাব্যসৃষ্টির দুরূহ প্রক্রিয়াটি কেবলই ব্যক্ত করতে চাইছেন—বাংলাকাব্যে তাঁর পূর্বে আর কোনো কবি সেই প্রক্রিয়াকে অমন বলিষ্ঠ এবং রসঘনভাবে ব্যক্ত করতে পারেন নি। কাব্যসৃষ্টি প্রক্রিয়া এবং কবির অন্তর্জীবনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ঐ পর্বের কাব্যরচনার নেপথ্যভূমিকা আমাদের শুনিয়েছেন তাঁর স্মৃতিকথায়, "আমাকে ছেড়ে দিতে হবে সরলতার পথ ; বলতে হবে উক্তির বদলে চিত্রকল্প দিয়ে, ঘোষণার বদলে ছবির সাহায্যে, যা বলতে চাচ্ছি তার বদলে অন্য কিছু বলতে হবে হয় তো, আসল কথাটা লুকোনো থাকবে অথচ থাকবে না।"[২৫] তাই, আমরা দেখি, কখনো মহাভারতের 'অর্জুন', কখনো 'মহাকবি গ্যেটে' ('গ্যেটের অষ্টম প্রণয়,' 'গ্যেটের নবম প্রণয়') কখনো, 'স্টিল লাইফ'-এর মহান চিত্রকর সেজান,—পরবর্তীকালে একজন নিষ্ঠাবান মৎস্যশিকারী, এমন কি একজন স্বধর্মনিষ্ঠ-বেশ্যার ('বেশ্যার মৃত্যু') জীবন থেকেও তিনি কাব্যশিল্প তথা জীবনরচনার দুরূহ প্রক্রিয়ার সন্ধান নিতে চাইছেন,-সন্ধান নিতে চাইছেন চৈতন্যের অস্ত্রকে সম্বল করে জড়দৈত্যের সঙ্গে সংগ্রামের মন্ত্রের। মহাভারতে অর্জুনের লক্ষ্যভেদী অথচ বহুবিচিত্র জীবন থেকে তিনি আধুনিক 'বহুমুখী প্রতিভা'সম্পন্ন শিল্পীর জীবন জিজ্ঞাসাকে অবিকলভাবে উদ্ধার করেছেন :

"আমি কে, তা মনে রেখো। সহজেই লক্ষ্য বেধ করে,
না-বুঝে প্রথমবার, তারপর থেকে সহজেরে
অসহ্য আত্মীয় জেনে কেবল খুঁজেছি ঘুরে-ফিরে
মায়াবন বিহারিণী নিমিত্ত চেতন হরিণীরে··· ।"[২৬]

তাঁর সর্বশেষ কাব্য 'স্বাগত বিদায়'-এ একজন অতি সাধারণ মৎস্য শিকারীর অতন্দ্র অধ্যবসায়ের মধ্যে রূপ দিয়েছেন, 'দ্রোণ' 'কর্ণ' 'অর্জুন' 'অভিমন্যু'র মত এ-যুগের একজন জীবন-সন্ধানী শিল্পী বা সচেতন মানুষের কর্মযোগকে :

"সে করে মাছের চাষ। আছে এক নিজস্ব পুকুর।
এই তার জীবিকা, বিনোদ, প্রেম, দৈনিক জোয়াল।
ছিপ ফেলে বসে থাকে উদয়াস্ত, যেন অনুপস্থিত সুদূর।
মনে হয় ঘাই মারে মহাশোল, ডিম ছাড়ে রাঘববোয়াল।"[২৭]

বুদ্ধদেবের জীবনব্যাপী কর্মসাধনার ফল কাব্য ও কাব্যনাটকগুলি থেকে বুঝে নেওয়া সম্ভব যে, তাঁর কবিতার বিরুদ্ধে যে বাস্তব জীবন চেতনার অভাবের কথা বলা হয় তা সত্য নয়। 'গজদন্তের মিনারে বসে আত্মরতির প্রবণতা', 'সমাজ বিরোধিতা' ইত্যাদি যে

সব অভিযোগ তাঁর কাব্যশিল্পের বিষয়ে উত্থাপিত হয়, তাও অলীক। জীবনবিদ্বেষী বা 'জীবনপলাতক' তিনি কিছুতেই নন, বরং চিরকালীন মূল্যবোধের সঙ্গে যোগসূত্রে তাঁর জীবন ও কাব্যভাষা দ্বন্দ্বময়-চৈতন্যে আকীর্ণ, অথচ আস্তিক্যবোধের চেতনায় উজ্জ্বল। সৌভাগ্যবলে বুদ্ধদেব বসুর ছাত্ররূপে তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যলাভ করতে পেরেছিলাম—তাই আজ নির্দ্বিধায় ব'লতে পারি জীবনের প্রতি বিচ্ছিন্নতাবোধের পরিবর্তে আমি তাঁর মধ্যে জীবনের প্রতি ধ্রুব আস্থার ভাবই দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্য করেছি। তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসু যখন গুরুতরভাবে দীর্ঘস্থায়ী পীড়ায় আক্রান্ত—তখন আমার শুভকামনাসূচক পত্রের নিম্নোদ্ধৃত উত্তর তাঁর কাছে পেলাম :

"তোমার চিঠিখানা পেয়ে আমি ও প্রতিভা বসু দুজনেই খুব খুশি হয়েছি। একটা জিনিশ বোঝা গেল—কলকাতার কফিদাদের তুলনায় তুমি দেহে-মনে অনেক বেশি সুস্থ আছো—তোমার খেতের ফসলের গন্ধে আমাদের মন আনচান করে। তুমি যে এখনো আপন মনে কবিতা আবৃত্তি করার অভ্যাসটি বজায় রেখেছো সেটাও আনন্দের কথা—যৌবনকে সতেজ ও স্থায়ী রাখতে কবিতার মতো টনিক আর নেই।…" (পত্রের তারিখ, ২০. ১০. ৭৩)

ছাত্রের কাছে লেখা ক্ষুদ্র পত্রাংশটুকুর মধ্যে পৃথিবীর মৃত্তিকা ও কাব্য প্রেমিক বুদ্ধদেব সমস্ত রোগ দুঃখকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছেন। 'জীবনশিল্পী' বুদ্ধদেব তাঁর অনেক সমালোচকের ভাষ্য অনুযায়ী 'কৃত্রিম' শিল্পের অন্তঃপুরে বন্দী থাকলে জীবনের প্রত্যয়দীপ্ত এমন উচ্চারণ তাঁর মরত্ব-সচেতন বেদনাময় মুহূর্তে কিছুতেই করতে পারতেন না :

"…তাই আমি আসন্ন মৃত্যুকে
বুকে বেঁধে, দাঁড়িয়ে ধ্বংসের প্রান্তে, বন্ধুর বিচ্ছেদে—
ভরা স্তব্ধতায়, প্রতিবাদে কণ্টকিত কণ্ঠ নিয়ে—
তবু বলি, আমিহীন বিশ্ব নেই, চরাচরে আমিই বিম্বিত :
প্রকৃতি ও কাল শুধু নটনটী, আমি নাট্যকার,
এবং দ্রষ্টাও আমি—যতক্ষণ শেষ বজ্রপাতে
বিলুপ্ত না হয় সত্তা, মহাবিশ্ব, আর ভগবান।"[২৮]

তখন, জীবন, শিল্পচেতনা তথা ভাবলোকের দুস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও বুদ্ধদেবকে 'রূপনারাণের কূলে জেগে ওঠা' 'রক্তের অক্ষরে' জীবন ও শিল্পের রূপকার রবীন্দ্রনাথেরই সহযাত্রী ব'লে আমাদের মনে হয়।

জলের মত ঘুরে-ঘুরে একা কথা

শিবচন্দ্র লাহিড়ী

এক কথায় বুদ্ধদেব বসুর কবিতার নির্মাণশিল্পের সংজ্ঞা ভাবতে ব'সে জীবনানন্দের একটি কবিতা-পঙক্তি মনে এসেছিল। 'সে কেন জলের মত ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়।' আলোচনার নামের জন্য ঐ পঙক্তির একটু অংশ ব্যবহার করেছি। আমার চিন্তা সাজাতে কবির পাঁচখানি কাব্য আর দু'খানি নাটকের আশ্রয় নিয়েছি। বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, দময়ন্তী, দ্রৌপদীর শাড়ি, শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর এবং তপস্বী ও তরঙ্গিণী, কালসন্ধ্যা।

১৯২৬-এ লেখা বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' তীব্র বিধাতা-বিদ্রোহের কবিতা। কবির বিদ্রোহ নিজের উপলব্ধিগত যৌবন-জ্বালা নিয়ে। বিরোধ যুগবাহী যৌবন-ধারণার সঙ্গে। কবিতার নামের 'বন্দী' কথায় দুটো মানে। অবরুদ্ধ এবং বন্দনাকারী। কবিতায় 'অবরুদ্ধ' অর্থে 'বন্দী' শব্দের ব্যবহার। (১) 'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রেখেছো আমায়—'। (২) 'বন্দীশালা হ'তে / বন্দনাসঙ্গীত গাহি তব।' (৩) 'লাঞ্ছিত এ বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ উচ্ছ্বাসে'। 'কথা' কাব্যে দু'অর্থেই রবীন্দ্রনাথ 'বন্দী' শব্দের ব্যবহার করেছেন। (১) 'গুরুদাসপুর গড়ে / বন্দা যখন বন্দী হইল / তুরানী সেনার করে।' (২) 'সিংহ দুয়ারে বাজিল বিষাণ, / বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান।' আবার হ্রস্ব-ইকারান্ত 'বন্দি' শব্দের অর্থ ক'রে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলেছেন,—যে কারারুদ্ধ অবস্থায় স্তব করে। বুদ্ধদেবের 'বন্দী' শব্দের বানান দীর্ঘ-ঈকারান্ত। কবিতায় কিন্তু 'বন্দী'র দুটো মানেই (অবরুদ্ধ, বন্দনাকারী) উজ্জ্বল। 'বন্দী' মানে বন্দনাকারী ধরলে শিরোনামের দ্বিতীয় শব্দ 'বন্দনা'র সঙ্গে এর অবিরোধ সম্পর্ক চেনা যায়। ফলে গোটা কবিতার বিদ্রোহের সুরে ঐ মানেওয়ালা নামকরণের সুর মেলে না। এবং শেষ দুটি চরণে সমস্ত কবিতা-বক্তব্যের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ (লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ উচ্ছ্বাসে / বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেলো হানি' / তোমার সকাশে।) আচম্কা মনে হয়। 'বন্দী' মানে যদি অবরুদ্ধ বলি, তবে 'বন্দনা'র সঙ্গে তার মুহূর্তেই বিরোধ। বন্দীর বিদ্রোহে কোনো ভাবের বাধা নেই, সেখানে অবস্থার সঙ্গে চেষ্টার মিল। আর গোটা কবিতা জুড়ে বিদ্রোহের সুর। আগাগোড়া কবিতা থেকে শিরোনামের মানে খুঁজে মনে হয়, অবরুদ্ধ অর্থেই বন্দী কথাটি ভেবেছিলেন কবি। কেননা কবিতা-নামের শব্দ-যুগলে যে বিরোধ, তা গোটা কবিতার তীব্র আবেগে ছড়ানো। আর বন্দনা যে ছদ্মনামী-বিদ্রূপ, সে কথাই কবিতার শেষ পঙক্তি।

কথা দুটির বিরোধ শুধু একটি কবিতায় নয়, পুরো কাব্যই 'বন্দীর বন্দনা'। কবির এ অবরোধ তাঁর নানা মানসিক প্রসঙ্গের, মূলত প্রেমের। অবরোধ যখন বিধাতার

প্রসঙ্গে, কবিকণ্ঠ তখন দৃপ্ত। আবার যখন 'অমিতা'র (অমিতার প্রেম) প্রেমের মুখ-চাওয়া, কণ্ঠস্বর তখন পর্যায়ক্রমে মিনতি আর আত্মকরুণায় পীড়িত। সেই অবরোধ 'নীল পূর্ণিমা'র ছোঁয়া লেগে চেতনায় স্পষ্ট হলে আবেগের বহুস্তর আলো-ফেরাফেরির পথে দার্শনিক সমগ্রতায় কবিকে পৌঁছে দেয়। হৃদয় দু'ভাগ ক'রে তাকে পক্ষে বিপক্ষে মুখোমুখি সাজিয়ে কবি নিজ সত্তার জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর খুঁজেছেন। এ কাব্যে কবির থেকে বাহিরের কোনো বিষয়বস্তু নেই। বিষয়বস্তু কবি নিজেই।

ফলে গতির দিক থেকে প্রায় সব কবিতার গড়ন আবর্তনধর্মী, রেখাকার নয়। এক আবেগ থেকে অন্য আবেগে বয়ে যাওয়ার এবং পরের আবেগকে আরও দূরে প্রসারিত করে দেবার শরবৎ গতি এ কাব্যে নেই। ছোটো ক্ষেত্রফলে অবিরত পাক খেতে খেতে একই প্রবাহ যেমন নানা গড়ন রচনা করে, অথচ ঘূর্ণী যে বহুতার একটাই নাম, বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' তাই। লক্ষ্য করে পড়লে দেখা যাবে, একই শব্দ অথবা তারই প্রতিশব্দ, একই শব্দগুচ্ছ নয়ত তারই প্রতিশব্দ-গুচ্ছ ঘুরে ঘুরে ফিরে আসছে কবিতার পঙক্তির ভিতর। না হলে একটি ভাবের কথাকে সদৃশ কয়েকটি ছবির অনুষঙ্গে সাজিয়ে দেওয়ার মনস্কতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অমিতার প্রেম (৩৫) এবং প্রেমিক (৬৩) কবিতা দুটির কয়েক স্তবক লক্ষ্য করে পড়লে কথাটা বোঝা যাবে। কবিতার প্রকরণ-প্রসাধনের প্রতি কবির অতি-মনোযোগ লেখাকে কৃত্রিম করতে পারতো, কিন্তু কবিতা-দুটিতে অজস্র কথার এত বাহারি কলাপ আবেগের মধ্যে দ্রুতসঞ্চারী, যার ফলে এ বহুক্তিগুলি পীড়ার কারণ না হয়ে কবিতাকে ঘনতর করে তুলেছে। কানে শোনার কথাগুলো পর্যায়ক্রমে ঘুরতে ঘুরতে ফিস্‌ফিস্ করে বলার সঙ্গোপন-সীমা ডিঙিয়ে উচ্চারণ সত্ত্বেও কবিতে-পাঠকে একটা নর্ম সঙ্গ রচনা করেছে। ফলে ভাষার পুনরুক্তি দোষ না হয়ে অনেক সময় গুণের কারণ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, 'কবি ঘটকের মতো : পাত্র-পাত্রীর মিলনেই তার উপকারিতার শেষ ; তার পরে তার নাম কারও স্মরণে রইল বা না রইল, তা নিয়ে মাথা ঘামানো হাস্যকর।......শুধু জগতের প্রত্যেক পাত্র-পাত্রীর নাম মনে রাখা তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সকলের প্রতি অনুকম্পাও তার অর্জনীয়, যার গুণে সে দেখবামাত্র বলতে পারে কে কার যোগ্য। এই কার্যোদ্ধারে তার নিজের বিবাহিত জীবনের সুখদুঃখ সহায় নয়, অন্তরায়।' এই উপমা থেকে দুটি কবিলক্ষণ চোখে পড়বে। ব্যাপক অনুকম্পা আর ব্যক্তিগত অপক্ষপাত। ব্যাপক অনুকম্পার টানে জগৎ আসবে কবির বেদনায় মিশতে। ব্যক্তিগত অপক্ষপাতের সিং-দরজা দিয়ে কবির 'দিনানুদৈনিক খণ্ড অভিজ্ঞতা' মুক্তি পাবে।

আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রতিমান চর্চায় উপমাটি মূল্যবান। ঘটকের নিজের বিবাহ-ফলের অভিজ্ঞতায় গড়া রুচি-মর্জিতে এতদিনকার বাঙলা কাব্যের ইমেজ লালিত। চাঁদ তারা মেঘ বিদ্যুৎ আগুন উল্কা, পারিজাত পদ্ম কেতকী কুরুবক, সাগর পাহাড় নদী বন, সিংহ হস্তী হংস হরিণ কপোত এবং আরো কিছু এই সব সংস্কৃত কাব্যকালের মূলধন ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে বাঙলা কাব্যের কাল কেটেছে। এতে একপাশের বিশ্ব আমন্ত্রিত হয়েছিল ; যা প্রধানত নিরাপত্তার, অমলতার, মাধুর্যের আর মহিমার। জীবনের করুণ অপচয়, অগাধ শূন্যতা, নিঃসীম বিচ্ছিন্নতার জ্বালাগুলিকে আশ্রয় দেবার অর্ধ বিশ্ব

সেখনে উপেক্ষিত। শুধু প্রাচীন কাব্য-ভারতের শেষ উত্তরপুরুষ রবীন্দ্রনাথের অন্য হাতে সেদিন ঐ অনাহূত বিশ্বকে বরণ করার 'মৃদু বসন্তী রঙ' 'তেঁতুল শাখার লাজুক একটি মঞ্জরী' আর একগাছি 'কন্টিকারির নীল-সোনালী বাণী'-গাঁথা মালা। শরৎ আকাশের যে মেঘ একদা স্তন্যরসপান-তৃপ্ত নীলাম্বরশায়ী গো-বৎসের ছবিতে ফুটেছিল, তাকেই বর্ষাশেষের সকালে একদিন আকাশের গায়ে হেলান দেওয়া ক্লান্ত পালোয়ানের দল বলে তাঁর মনে হল।

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের বিশ্বঘটনা সেদিন আমাদের এই সাবেক দেশে লক্ষ্মণের গণ্ডিটানা ভূগোলের সীমা ভেঙে দিয়ে জীবনের ব্যাপ্তির সঙ্গে নানা ছোটো বড়ো স্বার্থের বিচিত্রজটিল যন্ত্রণা উপহার দিয়ে গেছিল। সেই উপহারের ভারে স্বকাল-সচেতন আধুনিক কবিমনীষার নবজন্ম, দেশ যার বিশ্ব, বাসা যার সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্তে ঘেরা অনাম মহল্লায়। তার মানে এই নয়, সেদিন থেকে কাব্যে সুন্দরের পূজা বন্ধ হল। কবিভাবনার প্রসঙ্গ আর সেই প্রসঙ্গে জন্মানো আনন্দবেদনার টানে কবির বিশ্ব-অভিজ্ঞতার অন্তরপথ দিয়ে যে জগৎ মূর্তি নিচ্ছিল, তার একহাতে নন্দনের পারিজাত অন্য হাতে নর্দমার পাঁক। 'কেউ কেউ বলে, আমার মিনারে আমি একলাই বাসিন্দা। ভুল বলে। এখানে আমার সঙ্গী আছে অনেক সুন্দরী, অনেক পণ্ডিত, অনেক হরিণ আর নর্দমার ইঁদুর, ভিখিরি আর দুর্গন্ধি বেশ্যারা।......আসলে আমার মিনারে কোনো আগল নেই, পাঁচিল নেই, পাহারা নেই।' ১৯৬৪-৬৭'র 'একদিন : চিরদিন' কাব্যে কবির এই মিনারটির (আশার মিনার) পাশে রাবীন্দ্রিক মিনারের সাবেক গড়নটা মনে রাখা ভালো। 'এ পারে নির্জন তীরে / একাকী উঠেছে ঊর্ধ্বে উচ্চ গিরিশিরে / রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল / তোমার প্রাসাদসৌধ, অনিন্দ্যনির্মল / চন্দ্রকান্তমণিময়। বিজনে বিরলে / হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে / মঞ্জরিত-ইন্দুমল্লী-বল্লরীবিতানে, / ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোতকলগানে / একান্তে কাটিবে বেলা, স্ফটিক প্রাঙ্গণে / জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোলক্রন্দনে / উচ্ছ্বসিবে দীর্ঘদিন ছলছলছল—/ মধ্যাহ্নেরে করি দিবে বেদনাবিহ্বল / করুণাকাতর। অদূরে অলিন্দ প'রে / পুঞ্জ পুঞ্জ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্বভরে/ নাচিবে ভবনশিখী, রাজহংসদল / চরিবে শৈবালবনে করি কোলাহল / বাঁকায়ে ধবল গ্রীবা, পাটলা হরিণী / ফিরিবে শ্যামল ছায়ে।' রাজরাজেশ্বরীর কাছে মালঞ্চের মালাকর (১৮৯৫) এমনই এক মিনারের প্রার্থনা জানিয়েছিল, যার সঙ্গে উত্তরমেঘে যক্ষপ্রিয়ার অলকায় কালিদাসীয় মিনারের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। বাছাই-ছাড়া বিশ্বজগৎ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে কবিতার উপমান হল। রূপের এ আম্-দরবারী বিশ্বে পিছনের সারিতে হলেও রবীন্দ্রনাথের পাকা আসন। বলে রাখা দরকার, এ শতাব্দের নতুন কবিতা অনেকাংশে সাম্প্রতিক, অল্পাংশে আধুনিক। অখণ্ড কালজ্ঞানের বদলে খণ্ড আর প্রখর স্বকাল-চেতনা। এটা ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে প্রথম আধুনিক হতে চাওয়ার তীব্র প্রতিক্রিয়া। 'বন্দীর বন্দনা'য় কবির নিজের সুর বেজেছে, খানিকটা যার প্রতিক্রিয়াজাত। প্রতিবাদ করতে গেলে প্রতিবাদীর কণ্ঠে বাদীর কথা যেমন সজ্ঞানে এবং অসাড়ে এসে পড়ে, বুদ্ধদেবের কবিতায় সে লক্ষণ আছে।

'বন্দীর বন্দনা' নির্ধারিত ব্যবস্থা না-মানা উচ্ছ্বাস আর আবেগের কাব্য। সে উচ্ছ্বাসে দু'ভাগ কবিসত্তার বিরোধ, যার পরিণামে সমন্বয়ের শান্ততা। সাধারণত তাঁর

কবিতার শেষ স্তবক অথবা ঐ স্তবকের শেষদিকের চরণগুলি পূর্ব অংশের তুলনায় অনুত্তরঙ্গ আবেগে কোনো বোধে সুস্থির হওয়ার অভিমুখী। কবির ভাবনার এ পদ্ধতি কবিতার প্রতিমান জুড়ে। 'শাপভ্রষ্ট' কবিতার প্রথম স্তবক—'যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভুমে / ব'সে আছি আমি। /…ঊর্ধ্বে মম রক্তিম আকাশ— / প্রভাত সূর্যের লজ্জা রঞ্জিত করিছে অরণ্যানী। / সদ্য-নিদ্রা-জাগরিত গগনের পাণ্ডুভাল-'পরে / বহ্নিশিখা করিছে অর্পণ ; / কামনার বহ্নি সে যে, স্বপনের সলজ্জ বিকাশ।' আকাশে-অরণ্যে সাগরে-সূর্যে ভাসানো উচ্ছ্বসিত কামনার এ যৌবনবন্যা পরের স্তবকে 'গোলাপের …আরক্তিম কামনায় আঁকা' হল না। সেখানে 'ম্লানমুখে ঝরি' পড়ে কাননে অস্ফুট শেফালিকা।' আগের স্তবকের যৌবন-উচ্ছ্বসিত সিন্ধুই তখন 'সম্মুখে গরজে সিন্ধু বেদনার দুসঃহ পীড়নে। / লক্ষ লক্ষ লুব্ধ ওষ্ঠ মেলি' / চুম্বিয়া মুছিতে চাহে গগনের তরুণ রক্তিমা, /…নিষ্ফল আক্রোশে তার ক্রূর জিহ্বা উদ্গারিছে বিষ, তরঙ্গমথিত ফেনা রেখে যায় সৈকত-শিয়রে।' যে বিশাল উন্মুক্তি বাসনার রাঙা আলোয় চেতনাকে উত্তাল করে, অন্ধকার আর অমঙ্গলে পরের স্তবকে সে আলো নেভানো। 'গাঢ়কৃষ্ণ জলরাশি অনচ্ছ অতল / নিত্য নব অমঙ্গলে করে জন্মদান / গোপন গভীর গর্ভে ; / …সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায় / হেরি' মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দিরপ্রাঙ্গণ।' 'উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতট' এর স্থানে 'গাঢ়কৃষ্ণ জলরাশি' স্বর্ণরেণু বালুরাশির 'বিপুল বৈভব' এর বদলে 'ক্রূর জিহ্বা উদ্গারিছে বিষ /—সৈকত-শিয়রে।' প্রথম স্তবকের Verb-image 'লুটায়', 'রঞ্জিত করিছে', 'করিছে অর্পণ'। দ্বিতীয় স্তবকে 'মুছিতে চাহে', 'রিক্ত করি দিতে চাহে', 'নির্বাপিত করি' দেয়', 'ঝরি' পড়ে', 'ফিরিয়া যায়'। এক স্তবকে দু'হাত বাড়ানো আলো, অন্য স্তবকে মুষ্টিবদ্ধ অন্ধকার।

তৃতীয় স্তবক আবার ফিরেছে প্রথম স্তবকের অনুগমনে। 'তরঙ্গের 'পরে / গগনের স্নিগ্ধ শান্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হ'য়ে যেন লাগে ; / ফুটে ওঠে সোনার কমল /…সেই পদ্মগন্ধখানি এনে দেয় মোর পরিচয় / পল্লবসম্পুটে।' চতুর্থ স্তবক এই সুরেরই অনুপন্থী। 'তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লবমর্মর।' 'রবির গভীর স্নেহে, শিশিরের শীতল প্রণয়ে / শুষ্ক শাখে তাই ফোটে ফুল।' 'রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা।' পঞ্চম স্তবকের সূচনা পুনরায় দ্বিতীয় স্তবকের সুরফেরতা আবেগে ভারাক্রান্ত। 'অক্ষম, দুর্বল আমি নিঃসম্বল নীলাম্বর-তলে, / ভঙ্গুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা— / জীবনের দীর্ঘ পথে যাত্রা করেছিনু কোন স্বর্ণরেখাদীপ্ত উষাকালে— / আজ তার নাহিকো আভাস। / আজ আমি ক্লান্ত হ'য়ে পথপ্রান্তে পড়ে আছি নীরব ব্যথায় শান্তমুখে / ঝ'রে-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।' লক্ষ্য করার ব্যাপার, তৃতীয়-চতুর্থ স্তবকের লাইনে লাইনে ক্রিয়াপদ, কবিসত্তার ঊর্ধ্বগ যাত্রার পথে যেন উপরে ওঠার সচল সাজানো সিঁড়ি। 'বিচ্ছুরিত হ'য়ে…লাগে', 'ফুটে ওঠে', 'এনে দেয়', 'বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি', 'উড়ি যেতে চায়', 'অমৃত ঢালে', 'ফোটে ফুল', 'আন্দোলিয়া যায়', 'সযত্নে সাজাই', 'মুক্ত করি রাখি' ইত্যাদি। উদ্ধৃত পঞ্চম স্তবকের অংশটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানে ক্রিয়াপদ এক-আধটি, বিশেষণ অনেক। বাক্যের ক্রিয়া বক্তার ইচ্ছাকে, কর্মকে গতির রূপ দেয়। গতির নিয়ত ঘসা লেগে গতিবানের বোঝা হাল্‌কা হয়ে আসে। এ অংশের মূল ক্রিয়াপদ 'পথপ্রান্তে পড়ে

আছি', সে প'ড়ে-থাকা ঝ'রে-পড়া বকুলের ছবিতে ফোটানো। অন্যদিকে বিশেষণের চরিত্র হ'ল, রূপের অবস্থাটিকে গুণযুক্ত ক'রে, তাকে অচল রেখে উপভোক্তার মনোযোগ আকর্ষণ করা। বস্তুকে ঘিরে স্থিতি উৎপাদন করা বিশেষণের ধর্ম। আরো কথা এই, এখানকার বিশেষণগুলির সর্বাঙ্গে ক্ষয়ের দাগ।

সম-চরিত্রের আট-ন'টি বিশেষণে 'বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা'র রূপ মাত্র ছ'টি পঙক্তিতে আঁকা। অথচ ঊনত্রিশ পঙক্তির তৃতীয়-চতুর্থ স্তবকে সে তুলনায় বিশেষণের আয়োজন অনেক কম। তাছাড়া ক্রিয়াপদগুলির বেগে তারা কোথাও স্থিতির নোঙর পুঁততে পারেনি। 'শুষ্ক শাখে তাই ফোটে ফুল'—কথায় 'ফোটে' ক্রিয়াপদের টানে শাখার শুষ্কতা দর্শকের স্থির মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি, ফুল ফুটে ওঠার উদ্গ্রীব লাবণ্যখানির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আর একটি দৃষ্টান্ত। 'সুধায় নির্মিত মোর দেহসৌধখানি, /…মুক্ত করি রাখি তারে আকাশের অকূল আলোকে'—এ পঙক্তিতে আমি—এই অনুক্ত কর্তার ক্রিয়াপদ-আশ্রয়ী চেষ্টার বেগে সৌধখানি দীপ্ত হয়ে উঠেছে, কোন্ অকূল আলো লেগে তা দীপ্ত হল, সে ভাবনা এই গতির সহযোগী।

অগ্রাধিকার-পাওয়া বিশেষণ কবির আবেগে বিশ্রান্তি এনে দেয়, তা প্রসন্ন বিষণ্ণ যা-ই হোক না কেন। যে-সব বিশেষণে পঞ্চম স্তবকের ঐ পঙক্তিগুলি গড়া, তাদের সমবেত ব্যঞ্জনা এ অংশের 'সহস্র পঙ্গুতা'কে এতই অশেষে-বিশেষে ফুটিয়েছে, যার ফলে 'আজ আমি ক্লান্ত হ'য়ে পথপ্রান্তে প'ড়ে আছি নীরব ব্যথায় শান্তমুখে'—পঙক্তিটি এ কবিতার বয়ানে অত্যন্ত করুণভাবে অবান্তর। সুধীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন, 'আবেগ আর বেগ বিষমার্থবাচক, আবেগের মধ্যে বেগের চেয়ে বিরামই বেশি। অর্থাৎ মুখর আবেগ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায় না, চলে বিরতিবহুল গতিতে'। শূন্য সত্তা যেখানে একসারি বিশেষণের ভারে মুখ থুবড়ে পড়েছে, সেখানে ব্যঞ্জনার কম্পন ফুরোবার আগেই তার কাঁধে গুচ্ছের বিষয়ী কথার বোঝা চাপিয়ে না দিয়ে কবি যদি এ অংশে ভাষাকে বিরল করার চেষ্টা করতেন, তাতে তাঁর নির্মাণশিল্পের মান বাড়তো।

অথচ এ কথাও ঠিক, ঝরা বকুলের গন্ধ-ছাওয়া নির্জন বীথিতে হতাশ হৃদয়ের যে ধরাশায়ী ছবিখানি কবি এঁকেছেন, রূপের আবেদনে তা একেবারে আনকোরা। 'আজ আমি ক্লান্ত হয়ে পথপ্রান্তে প'ড়ে আছি নীরব ব্যথায় শান্তমুখে / ঝ'রে-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।' প্রথম পঙক্তিতে স্টেটমেন্টের মত ভূলুণ্ঠিত সর্বস্বান্তের ছবিটি নতুন। নতুন কেননা সত্তার এমন নিরঙ্কুশ রিক্ততা বকুলবীথির পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর আগে কখনো ফুটেছে ব'লে আমার জানা নেই। বুদ্ধদেবের এ লেখার দু'বছর পরে (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যে 'ঝরা-বকুলের কান্না' শোনালেন, 'কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে, / বসন্তবাতাসে, / অতীতের তীর হতে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস, / ঝরা-বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ, / সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে / তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃতপ্রদোষে / হয়তো দিবে সে জ্যোতি,' তাতে রোমাণ্টিক বিষাদ থাকলেও প্রেমের স্মৃতির মধ্যে সঞ্চয়-করা জীবনের কিছু সম্বল থেকে গেছে। বকুল ফুলের পরিচয়-আঁকা পরের পঙক্তির ছবি, 'ঝ'রে-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে', সাবেককালে বাণভট্টের মহাশ্বেতা বৃত্তান্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের আগাগোড়া কবিতায় বারে বারে ঘুরে ঘুরে এসেছে।

'কিংশুকের…গর্ব' 'অশোকের অতিথ্যাতি' 'মালতীর মল্লিকার অভ্যর্থনা'র মত 'বকুলের মুখর সম্মান' (মহুয়া / মহুয়া) বহুকাল ধরেই এদেশের কবিরা জুগিয়ে এসেছেন। কবিতার এ চরণে বুদ্ধদেব বসু ঐতিহ্যেরই অনুপন্থী। এখানকার দুটি পঙক্তিতে দুটি আলাদা কালের মানসিকতা। সাম্প্রতিকের আর ঐতিহ্যের। আবার পঙক্তি দুটি জুড়ে কবির একটাই বক্তব্য। আগে বলেছি, বুদ্ধদেবের কবিতায় ভাবের মুখোমুখি বৈপরীত্য ক্রমশ সমন্বয়ের পথে উপসংহারের দিকে টানা। এ কবিতায় এখানেই প্রথম সে ইঙ্গিত।

ঠিক এ পঙক্তি দুটির পর থেকে আরো যে কয় ছত্রে পঞ্চম স্তবক শেষ হল, ঐতিহ্য আর সাম্প্রতিকতা বোধের থেকে আলাদা কোনো সুরে মহাবিশ্বের মৌল অথচ রহস্যময় শৃঙ্খলার একটা অস্ফুট কম্পন সেখানে কবিচেতনাকে স্পর্শ করেছে দেখি। 'সেই মোর গোধূলির সুরভি আঁধারে / যার সাথে দেখা, / …নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি, / …দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মতো অপরূপ, / ভাস্করের মতো জ্যোতির্ময় ;— / তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি, / নিষ্কলঙ্ক রবি।' কবি বলেছেন, 'গোধূলির সুরভি আঁধারে / যার সাথে দেখা'। আমাদের প্রশ্ন, কার সঙ্গে দেখা হল। কবির কাছে এ প্রশ্নের উত্তর নেই। আদি কবি থেকে কোনো সৎ-কবিই এর উত্তর জানেন না। 'কে সে ? জানি না কে। চিনি নাই তারে— / শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে / চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে…।' (এবার ফিরাও মোরে / চিত্রা)। 'মুখ থেকে 'মা নিষাদ' ইত্যাদি নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদি কবি বিস্মিত হয়ে, চমকিত হয়ে বললেন 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'। কেন বলেছি, কেমনভাবে বললাম নয়, কি উচ্চারিত হলো সেইটাই তাঁর বিস্ময়পূরিত জিজ্ঞাসা।' ('অমোঘ শর' প্রবন্ধ / তরুণ সান্যাল)। 'গোধূলির… আঁধারে' যার সঙ্গে দেখা হল, তার 'নেত্রের মুকুরে' কবি দেখলেন 'কান্তি মম… / ভাস্করের মতো জ্যোতির্ময় .—'। বলা বাহুল্য, এ দেখা লৌকিক সাক্ষাৎকার নয়, আবার ভগবান দেখারও কোনো ব্যাপার নয়। কবিআত্মার এ এক অলোকসামান্য স্পন্দন, যাকে যার যেমন ক্ষমতা, সেই অনুসারে ধরতে পারলে ঐতিহ্য-সাম্প্রতিকতা সংক্রান্ত কবির সম্মুখস্থ সঙ্কট কেটে যায়। তখন 'পঙ্কের কলঙ্কবারি' থেকে 'পঙ্কজের শুভ্র অঙ্ক' পর্যন্ত আগাগোড়া 'আছে মোর স্থান' ভেবে কবির বিশ্বাস জাগে।

নীলপূর্ণিমা, ক্ষণিকা, শাপভ্রষ্ট, কালস্রোত, বন্দীর বন্দনা ১৯২৬ এ লেখা। সব-গুলিই ভাবের বিরোধ-মিলনের বৈপরীত্যে সাজানো কমবেশি ছকবাঁধা কবিতা। এখানে শুধু 'নীলপূর্ণিমা'র গড়ন আলোচনা করব।

এ কবিতার দ্বিতীয় পর্বের প্রথম স্তবক (আজ রাত্রে মনে পড়ে…স্মৃতির সৌরভ) দুটি বিপরীত বক্তব্যে সমদ্বিখণ্ড (৮ ছত্র + ৮ ছত্র)। সে বক্তব্য মিলন ও বিরহের। পূর্ণতার এবং রিক্ততার। দ্বিতীয় স্তবকে প্রেমের পূর্ণতা। তৃতীয় স্তবকে প্রেমের শূন্যতা। আবার দ্বিতীয় স্তবকের সূচনা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কবির আবেগ প্রেমের উচ্ছ্বাসে এবং প্রেমের বেদনায় পর্যায়ক্রমে ওঠানামা করেছে পাঁচ পাঁচ পঙক্তিতে। চতুর্থ বা শেষ স্তবকে এ টানাপোড়েন মিলিয়ে দেওয়া।

কবিতার তৃতীয় পর্ব এক স্তবকে গড়া। এতে চারটি সমান ভাবের ভাগ। প্রথম ভাগ 'কিন্তু সেই সূর্য' থেকে 'চন্দ্রালোকসম' পর্যন্ত। বিরহের স্বীকৃতি এ অংশের ভাব।

প্রত্যাশিত হতাশা আর নিষ্ফল আশা সমদ্বিখণ্ড (দুই দুই) পঙক্তি-ইউনিটে পরপর সাজানো। দ্বিতীয় ভাগ 'আজ ভাবি' থেকে 'অন্ধ নিয়তির কাছে' পর্যন্ত, প্রেমপূর্ব নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা। তৃতীয় ভাগের ('হে রসরঙ্গিনী নারী' থেকে 'ঝরে যেতে চাই' পর্যন্ত) 'হে রসরঙ্গিনী নারী' এই সম্বোধন বাদ দিলে দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গে প্রায় সমান আয়তনের পঙক্তিসজ্জায় অধুনাব্যর্থ একদাবিহ্বল প্রেমের ক্ষুব্ধ স্মৃতি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগ পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করানো। চতুর্থ বা শেষ ভাগ ('ফিরে এসো' থেকে 'শ্রাবণ-বর্ষণে' পর্যন্ত) প্রার্থনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রথম ভাগের শান্তকঠিন বিরহ-স্বীকৃতির মিতবাক ইউনিটটির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

চতুর্থ পর্বে গোটা কবিতার সার সংকলন। এখানের বক্তব্যের চার বাহু। প্রথম দু'ছত্রে 'অপার বিরহ'। পরের তিন ছত্রে স্মৃতিচারণ। তার পরের দু'ছত্রে অন্তরঙ্গ আলাপন'এর প্রত্যাশা। শেষের ছয়টি ছত্রে পর্যায়ক্রমে দুবার মিলন আর বিচ্ছেদের চিত্রল দ্বৈরথ। এর মাঝখানকার দু'টি ছত্র আবার কবির মানসিক পরিবেশের যোজক।

কবিতার প্রথম পর্বেও চার ভাগ। প্রথম ভাগ (মধ্যরাত্রে···জ্যোৎস্নার ধারা) নির্জন জ্যোৎস্না রাত্রির রূপ। সেখানে শুধু একটি মুখ (ম্লান তার মুখ) 'নিদ্রাহীন শশী'র। দ্বিতীয় ভাগ (দিগন্তবিলীন···বেদনাবিচিত্র রসে) 'শূন্য ঘরে শূন্য মনে···আছি একা'র আসঙ্গ বেদনা। তৃতীয় ভাগে (নামহীন···সঞ্চারিবো সব) বিশেষ রাত্রিটিকে সুখদুঃখময় প্রেমের অনুষঙ্গে সাকার করার ইচ্ছা। চতুর্থ ভাগ শূন্যতাকে পূর্ণ করে তোলার 'আনন্দ-বেদনা'ঘন অভিব্যক্তি। এই বিমূর্ত বাসনা (এই রাত্রিটিরে···রক্তস্রোতে সঞ্চারিবো) কবিতার দ্বিতীয় পর্ব থেকেই কবিপ্রিয়াতে (হে প্রিয়া আমার) মূর্ত হয়েছে। কবিতাটির গড়নের আড়ালে একটা নিয়মিত জ্যামিতিক পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়।

এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যের 'জ্যোৎস্নারাত্রে'এবং 'পূর্ণিমা'র উপস্থাপনাগত প্রতিধ্বনি স্পষ্ট। পূর্ণিমা চাঁদের জ্যোৎস্না ক্রমশ প্রেয়সী হল—এ রূপান্তরের মিল দুই কবিরই মধ্যে। প্রেমে মিলন বিরহের আলোছায়া জীবনকে এই পৃথিবীতে স্মৃতি-সম্প্রতির কালরেখায় কেমন ধারাবাহী করে দেয়, বুদ্ধদেব তা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুটিতে সে কথা নেই। রবীন্দ্রনাথেও সমুদ্রমন্থনের প্রসঙ্গ, কিন্তু সেখানে মন্থনের শেষতম উৎপাদনরূপে লক্ষ্মীর আবির্ভাব, যা নন্দনকানন পেরিয়ে অমরাবতীর দিকে কবিব্যক্তির যাত্রার দিশারী। বুদ্ধদেবের কবিতার প্রতিমান নিঃসন্দেহে ভিন্ন। 'অন্তরের সমুদ্রমন্থনে / যত দুঃখ, যত সুখ উচ্ছ্বসিয়া ওঠে অবিরল, / আজি মুহূর্তের তরে রক্তস্রোতে সঞ্চারিবো সব।' মন্থনের সুরু থেকে শেষ উৎপাদনের সমস্ত ফল ও অফলের অনুষঙ্গে দুঃখসুখের দ্বৈবতা নিয়েই 'নীল পূর্ণিমা'র প্রেম।

'ম্লান তার মুখ . / রুগ্নকান্তি, ভঙ্গুর, অথচ / সুস্নিগ্ধ, সুনীল। / সুনীল রজনী আজি, সুনীল আকাশ, / সুনীল জ্যোৎস্নার ধারা।' বহুবার ব্যবহৃত 'সুনীল'এর থেকে ঐ রঙের বিশেষ মানে কবি নিতে চেয়েছেন মনে করি। রঙ দিয়ে ছবি আঁকেন যাঁরা, তাঁরাই জানেন, ঘন নীল রঙ দৃশ্যের ভিতরকার দূর স্থান চেনাবার অথবা গভীরের ব্যঞ্জনা জাগাবার একমাত্র উপকরণ। কালো রঙে সেই দূরত্ব বা গভীরতা ফোটানো যায় না। কালো রঙ থামিয়ে দেয়, নীল সম্প্রসারিত করে, সবুজ নিকটকে চেনায়। যে বুনো পাহাড় কাছের থেকে সবুজ, দূরের থেকে তাকেই নীল দেখাবে। নীল রঙ আকাশের

সাগরের। দূরের আর গভীরের। উদ্ধৃত অংশে 'সুনীল' এই রঙের কথাটা ঘুরে ঘুরে এসেছে। চাঁদ আর তার পরিজন মিলে দৃশ্যের গোটা পরিমণ্ডল সুনীল। রাত্রির কাল-পরিমণ্ডল এ পূর্ণিমা-দৃশ্যের আধার। 'সুনীল রজনী আজি' কবিই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত কবিতা দু'টিতে রাত্রির কোনো রঙ নেই। মনে হয়, এই দৃশ্য নীল কবি-অভিজ্ঞতার কোনো অ-দৃশ্য দূরত্ব কিংবা গভীরতা বোঝানোর জন্যই। কবিতার এ পর্বে দু'বার 'মুহূর্ত' শব্দের ব্যবহার থাকলেও (আজি মুহূর্তের তরে···লবো একেবারে) সে মুহূর্তই 'অগাধ প্রহর' হয়ে গেছে (জেগে আছি একা / পরিপূর্ণ করি নিতে এই শান্ত, অগাধ প্রহর) যখন—'অবরুদ্ধ হৃদয়েরে মুক্ত করি দিবো / সুনীল গগন হতে সুনীল জ্যোৎস্নায়'। কবি-ব্যক্তির দিক থেকে কালের মাত্রা 'মুহূর্ত'। আর কবি-অভিজ্ঞতার দিক থেকে কালের মাত্রা 'অগাধ প্রহর'।

'মুহূর্তে' আর 'অগাধ প্রহরে' মিলে একটা সমন্বয়ী বিরোধের শিল্পযাত্রা এ কবিতা। চাঁদের মুখ তাই 'রুগ্নকান্তি, ভঙ্গুর, অথচ / সুস্নিগ্ধ, সুনীল'। এ বিরোধ কবির ভিতরের সঙ্গে বাহিরের, একই রূপের আড়ালে, একই কবিতা-পঙক্তির শব্দে শব্দে (কল্পনায় কত ফুল ফোটে, ঝরে পড়ে ; সিঞ্চিলে অমৃতবারি অসহন আমার উত্তাপে), পর পর দুই পঙক্তির ভিতরে (শূন্য ঘরে শূন্য মনে জেগে আছি একা / পরিপূর্ণ করে নিতে এই শান্ত, অগাধ প্রহর / বার-বার গড়ে তুলি মিলনপ্রতিমা, / বার-বার ভেঙে ফেলি। অঙ্গে অঙ্গে ভাষা এনে / প্রকাশিলে অবরুদ্ধ বাণী।), পাশাপাশি বা কাছাকাছি শব্দ-বিন্যাসে (যত দুঃখ যত সুখ উচ্ছ্বসিয়া ওঠে অবিরল ; রিক্ততায় সিক্ততায় সব হোক ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল ;)। আর আগেই বলেছি, এ বিরোধ সম্প্রসারিত হয়েছে স্তবকে স্তবকে, একই স্তবকের পর পর দুটি পঙক্তিগুচ্ছে, অথবা দূরে দূরে। চলার সম্মুখ-বেগের সঙ্গে না-চলার পশ্চাৎ-টান মিলে গোটা চলনটাকে নিশ্চিত করে, সত্য করে। ভারত-চন্দ্রের দাম্পত্য-দ্বন্দ্বের মত (কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ) বিরোধে-মিলনে সমগ্র হয়ে চলার ছাঁদ কবিতাটির আগাগোড়া গড়ন।

সুধীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য : 'একটা লোকোত্তর পটভূমি না জুটলে, কবি তো কবি, খুব স্থূল অনুভূতির মানুষও বাঁচে না। ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যদি কোনও মাঙ্গলিক নিয়ম নাও থাকে, তবু কবির পক্ষে এমন একটা কাল্পনিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক, যার সূত্রে আমাদের দিনানুদৈনিক খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলো সার্থক ও সংগ্রথিত ; এবং চৈতন্য, বিশুদ্ধ চৈতন্য, আর সংকল্প, নিরহংকার সংকল্প, এই দুটি দুর্লভ গুণের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের পারিপার্শ্বিক নাস্তির মধ্যে কোনও রকমের শৃঙ্খলা আনা অসম্ভব।' (কাব্যের মুক্তি / স্বগত)। এই শৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য বস্তুকে চৈতন্যে রূপান্তরিত করার নিরলস কবিসাধনা। 'ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা, / বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী, / মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা। / জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে, / চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায়, / ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন।' (রূপান্তর, দ্রৌপদীর শাড়ি, ১৯৪৮)। এ সাধনা সার্থক হলে অন্তঃপ্রেরণা থেকে যে প্রকাশে কবিতা মুক্তি পাবে, কবি তার পরিচয়কে আরো স্পষ্ট বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। 'ঘটায়, ঘোমটার তলে মৌলিকের নিত্য রূপান্তর— / পদার্থের, চেতনায় ; স্পন্দমান মাংসের, মানসে ; / বিষ্ঠার, প্রোজ্জ্বল ফুলে ; অঙ্গারের,

নবান্ন-পায়সে ; / এবং মলের ভাণ্ডে ছেঁকে তোলে সম্ভাব্য ঈশ্বর।' (যে আঁধার আলোর অধিক, ১৯৫৮)। এই 'লোকোত্তর পটভূমি'র দিকে চৈতন্যকে সমুখ রেখে 'শাপভ্রষ্ট' কবিতায় যে চূড়ান্ত ফললাভ হল, তা-ই বুদ্ধদেব বসুর কাব্যবাণী। 'যেথা যত বিপুল বেদনা, / যেথা যত আনন্দের মহান মহিমা— / আমার হৃদয়ে তার নব নব হয়েছে প্রকাশ। / বকুলবীথির ছায়ে গোধূলির অস্পষ্ট মায়ায় / অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।'

চৈতন্য আর সংকল্প—এই দুটি গুণের সাহায্যে হতশ্রী পারিপার্শ্বিকের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে ব্যর্থ হলে নিজের সৃষ্টি-উদ্যোগের ভিতর কবির এ সংশয় জাগা স্বাভাবিক, 'পথ যদি রুধি থাকে রবীন্দ্র ঠাকুর'। উদ্যোগ-পর্বের সংশয় থেকে ক্রমশ সরে গিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর কবি-নিজত্বে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাঁর লেখা কতটা রাবীন্দ্রিক আর কতটাই বা অ-রাবীন্দ্রিক, সে পর্যবেক্ষণের দায় রসোপভোক্তার নয়। এ শতাব্দের চতুর্থ দশকের কবিরাই আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি, হাল আমলের সকল শিল্পনিষ্ঠ কবি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা রেখেই এ কথা বলছি। আর তাঁদের প্রত্যেকের লেখায় রবীন্দ্র-প্রভাব। পৃথক কবি-স্বভাবের গুণে যিনি যেমনভাবে তা আত্মসাৎ করেছেন, এই মাত্র। বিশাল বট-অশ্বত্থের মত বনস্পতি তার অতিকায় ছড়ানো শরীরের নিচে অনেকটা স্থান জুড়ে একটা শীতল সূর্যহীন ছায়াভূমি রচনা করে। সে নিবিড় ছায়াতলে পারতপক্ষে অন্য গাছ জন্মাতেই পারে না। মানুষ যেহেতু বৃক্ষ নয়, তার চেষ্টা নিষ্ঠা সন্ধিৎসা সাধনা ঐ কাছের ভূমিতেই তাকে নতুন পথ দেবে। তবু পুরুষানুক্রমের মত ক'রে অতীতের একটা অংশ বর্তমানের ভিতর সংক্রামিত হয়েই থাকে।

বড়ো কথা, সৃষ্টির শেষ লেখাটি পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সচল। প্রবাহিতকালের মাঝখানে নিজের সু-স্থির মানসিকতার মাপে চৌহুদ্দি-ঘেরা কবিতার রাজ্যপাট বানিয়ে বসে যান নি তিনি। কবিতার নতুন কাল, নতুন প্রকল্প-প্রকরণ নিয়ে নিজে ভেবেছেন, ভাবনা বিনিময় করেছেন সেই সময়ের কবি আর সমালোচকদের সঙ্গে, বহু চিঠিতে প্রবন্ধে। প্রায় সত্তর বছর বয়সে 'শেষের কবিতা' (১৯২৮) লিখলেন, যার প্রথম ক্রিয়াপদ-ছাড়া বাক্য 'অমিত রায় ব্যারিস্টর'—বুদ্ধদেবকে অবাক করে দিয়েছিল। তার উচ্ছ্বসিত স্বীকৃতি আছে পরে (১৯৩৫) প্রকাশিত কবিতা পত্রিকার কোনো পৃষ্ঠায়। অবশ্য এ কথা ঠিক, 'নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডি'র পুঁজিতে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক হওয়া আর কতটুকু। তবু তাঁর মানসিকতায় নতুন কবিতা-কালের জন্য সদিচ্ছা ছিল, সততা দিয়ে নিজেকে নতুনের মানানসই করার উন্মুখতা ছিল, এ কথাও ঠিক। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন 'বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে, প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।' সত্যি যদি কোনো সমস্যা মানতেই হয়, তবে তা কবি রবীন্দ্রনাথের নিছক অস্তিত্ববিষয়ক নয়, তা হল আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের সচলতার সমস্যা। এ সচলতায় সম্মুখ-গতি আর প্রত্যাবর্তন দুই-ই আছে। তবু নতুন দিনকে নিজের আত্মার ভিতর অভ্যর্থনা জানাবার মন তাঁর ছিল। রবীন্দ্রনাথ নতুন কালের সমস্যা—এ কথাটা হয়ত পূর্ণাঙ্গও নয়। নতুন কালের কবিতার চিন্তা চৈতন্য প্রকরণ ইত্যাদিকে বরণ করে নেবার সক্রিয় ভূমিকা হয়ত তাঁর ছিল না, কিন্তু ইতিহাসে চোখ রেখে বলা যাবে, এক্ষেত্রের আলংকারিক ভূমিকাটি একমাত্র তাঁরই।

জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ১৯৩৬-এ প্রকাশিত। উৎসর্গ বুদ্ধদেব বসুকে। বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী'র প্রকাশ ১৯৩৭-এ। এ তথ্য হয়ত দুই কবির কবিতায় নির্মাণশিল্প-সম্পর্কের কোনো মৌন সাক্ষী। 'বোধ' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন : 'সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়'। এ ছত্র বুদ্ধদেবের কাব্য ও 'কঙ্কাবতী'র নির্মাণশিল্পের সংজ্ঞা। ভাবের দিক থেকে 'বন্দীর বন্দনা' দু-ভাগ কবি-ব্যক্তিত্বের বিরোধ আর মিলনে টানা উপসংহারের কবিতাগুচ্ছ। কবিতার বিষয়বস্তু নিঃসঙ্গ কবির আত্ম-আলাপ। ভাষার স্বগত প্রকৃতি বিশ্ববস্তুর বর্ণনাকে আত্মবিশ্লেষণের মোড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এনেছে। স্তবকে স্তবকে, কখনো পঙক্তির গুচ্ছে গুচ্ছে, আবার কোথাও একই পঙক্তির পূর্বাপর অংশে উভয়পক্ষীয় বিরোধ আড়াল-করা আত্ম-সংলাপের ইশারা। নীল-পূর্ণিমা, ক্ষণিকা, কালস্রোত কবিতাগুলি একটু খুঁটিয়ে পড়লেই তা চোখে পড়বে। এ সবই বন্ধন-অসহিষ্ণু বন্দীর উচ্ছ্বসিত আবেগের নেপথ্যভূমিতে।

আবেগের ঢল্ নেমে গেলে সে নেপথ্যভূমি সামনে এল। তার নাম 'কঙ্কাবতী'। ঠিক যেন শীতের পাহাড়ী নদী। নুড়িতে নুড়িতে মৃদু লঘু শব্দ বাজানো অজস্র ধারা। সামগ্রিক আবেগের স্বার্থে স্বাতন্ত্র্য বর্জনের বদলে এখানকার কবিতায় শব্দের আর্থিক প্রবলতা। আর সেই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কবির কাছ থেকে বার বার আবৃত্ত হওয়ার প্রশ্রয় পেয়ে কবিতার কুশলী কারিগরির দিকে দৃষ্টি টেনেছে। এ কাব্যের কবিতা ছোটো ছোটো আয়তনে যেন কথার মালায় গাঁথা এক একটি মিহি ছাঁদের কণ্ঠা। যে বড়ো পটভূমি পেলে অবকাশ-মাহাত্ম্যে এগুলির শিল্পগুণ বাড়তো, কাব্যে তার অসদ্ভাব। 'কঙ্কাবতী' কাব্যেই প্রথম কথা কওয়ার সংলাপী ভাষা কবি ব্যবহার করলেন। আগের কাব্যে আত্ম-সংলাপের ইশারায় যা ছিল অস্পষ্ট, আবেগের বান্‌ডাকা উচ্ছ্বাসে আড়ালের, এখন তা কবির টুকিটাকি ইচ্ছের, খুশির কথার চমকে ঝল্‌মল্ করে উঠেছে। 'কোনো মেয়ের প্রতি' কবিতা সেই দৃষ্টান্ত।

'…একটু সময় হবে ? পাশে গিয়ে বসিবো তোমার।— / (মোদের বাড়িতে বড়ো লোকজন, বিষম বিভ্রাট, / মায়ের মেজাজ চড়া, শিশুগুলি করিছে চিৎকার।)।' ছোটো মাপের অনেক কথার ইউনিটে-ভাঙা আবেগ সুরের তান তুলতে দেয়নি। অপরিসর শহরের আসবাবে ঠাসা জীবনে আর বহু সমস্যার অলিগলি-ঘেরা সংসারে আরো পাঁচটা সাধের মত প্রেমের সাধ জাগে। 'টবেতে ফুলের চারা তোমাদের বাড়ির সিঁড়িতে, / নতুন সবুজ পাতা নড়িতেছে ঈষৎ হাওয়ায় : / সিঁড়ির সুমুখে ঘর, ছোটো ঘর, ঠাণ্ডা, পরিষ্কার, / শেলাই-কলের কাছে ছোটো টুলে রয়েছো বসিয়া। / সুতো বুঝি ফুরায়েছে ? বই খোলা কোলের উপরে, / ভিজে কালো চুলগুলি এলায়ে পড়েছে সারা পিঠে, /…শাড়ির চওড়া পাড়, শাদা শাড়ি, মিশকালো পাড়। / ঠিক তব পাশে নয়—তবু কাছে, বসিবো চৌকাঠে-- / একটু সময় হবে ?'

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল। শেলাই-কল আর ফুলের টবের মত বহু টুকিটাকি কাজ-অকাজের জিনিসে বোঝাই একফালি শহুরে সংসার। ছোটো ঘর ছোটো টুল—এই সব অনেক ছোটোতে ঘর ভরে গেলে বসার বা বাসনার ঠাঁই মেলে চৌকাঠে। 'আরোগ্য' কাব্যের (১৯৪১) 'ঘণ্টা বাজে দূরে' কবিতার শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই সব উপেক্ষিত ছবি / জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা / দূরের ঘণ্টার রবে এনে

দেয় মনে'। দূরের ঘণ্টার মত জীবনের অন্য তলের নিমগ্ন কোনো ধ্বনি কবির উল্লেখ-করা উপেক্ষিত ছবিগুলিকে বড়ো একটা পটভূমিতে ধরে রেখেছে ব'লে এ কবিতার তুচ্ছ রূপখণ্ড মিলেমিশে আকাশের মত ব্যাপ্ত কোনো আধারে স্থাপন করা। দূর ঘণ্টার সুরে ব্যাপ্তির ইশারা কবিতার সর্বাঙ্গে ফুটে থাকায় 'গঞ্জের টিনের চালাঘরে / গুড়ের কলস্ সারি সারি' কিংবা 'রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি' অথবা 'ভজিয়া যাঁতায় ভাঙে গম' ইত্যাদি তুচ্ছ ছবিও জীবনের বড়ো তাৎপর্যে মূল্যবান। কবিতার প্রতিটি ছবি এখানে আর তাদের নিজস্ব দামের দাবিদার নয়। কিন্তু 'কোনো মেয়ের প্রতি' কবিতার প্রতিটি শব্দ বা শব্দাবলী, যেমন বাড়িঠাসা লোকজন, মায়ের মেজাজ, শিশুদের চিৎকার, সিঁড়ি, ছোটো ঘর, ছোটো টুল, শেলাই-কল, ফুরোনো সুতো, ফুলের টব, কোলের বই, শাদা শাড়ি, কালো পাড়, ভিজে চুল, ঘরের চৌকাঠ—প্রত্যেকে তাদের আলাদা আলাদা অর্থবহ অস্তিত্বের দাবি তুলেছে। আর সে দাবি শক্তি পাচ্ছে. কবিতার একই স্তবকে অথবা অন্য স্তবকগুলিতে ঘুরে ঘুরে ব্যবহৃত হবার সুযোগে।

একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ পরের স্তবকে সব সময় যে ঠিক একই আকারে আসছে অথবা একই ছকে বসছে, তা নয়। উদ্দিষ্ট সিঁড়ি-ঘরের মেয়েটি আর তার চারপাশে আসবাবের ছক্ পুরোনো শব্দধারার স্থানবদল-করা অর্থের ছকে একটু আলাদা হলেই শব্দসজ্জা তার আগের অর্থচিত্র থেকে একটু সরে একটু নতুন-ক'রে-বলা পুরোনো ছবির রঙ ফেরাচ্ছে। অর্থাৎ শব্দাবলী বিগলিত করে কবিতার ভাব চলছে না। শব্দ চলছে, হেরফের-করা শব্দে বা গুচ্ছে অর্থের রঙ বদলে যাচ্ছে, একে ভর করে ভাবের প্রবাহ গা-ঢালা গতিতে বহার বদলে ঘাস-ফড়িং-এর মত মুহুর্মুহু তল-আর দিক-ফেরা ভঙ্গিমায় এগিয়েছে। এবার উদাহরণ। প্রথম স্তবকে আছে—'টবেতে ফুলের চারা তোমাদের বাড়ির সিঁড়িতে, / নতুন সবুজ পাতা নড়িতেছে ঈষৎ হাওয়ায় :'। দ্বিতীয় স্তবকে অন্য কিছু কথার ছবি এসে গেলে প্রথম স্তবকের 'ফুলের টব' আর 'বাড়ির সিঁড়ি' একই শব্দাবলীর আলাদা নতুন ছকে পুরোনো দৃশ্যকেই অন্য আলোয় দেখিয়েছে। 'নড়িতেছে নতুন পাতারা, /···সিঁড়িগুলি টবেতে সাজানো ;'। প্রথম স্তবকে ছিল—'মায়ের মেজাজ চড়া'। দ্বিতীয় স্তবকে তার স্থানে বসল, 'বাইরে দারুণ রোদ'। তৃতীয় স্তবকে পৌঁছে ঐ কথা দুটি মিলে তৃতীয় একটি কথায় রূপের নতুন মাত্রা গড়ে দিল,—'মায়ের মেজাজ হোক আকাশের রোদের মতন ;—'। 'ফুলের টব' আর 'বাড়ির সিঁড়ি'র ছবি দ্বিতীয় স্তবকে গিয়ে ফুরোলো। 'মায়ের মেজাজ' প্রথম স্তবক থেকে তৃতীয়ে, 'দারুণ রোদ' দ্বিতীয় স্তবক থেকে তৃতীয়ে পৌঁছে পরস্পরে মিলে শেষ হল।

এইভাবে 'ভিজে কালো চুলগুলি···সারা পিঠে', 'ছোটো ঘর, ঠাণ্ডা, পরিষ্কার', 'শাদা শাড়ি', 'ছোটো টুল' তাদের অর্থের আর প্রেক্ষিত-বদলের আলাদা আলাদা সামর্থ্য অনুসারে কখনো কবিতার মাঝামাঝি পৌঁছে, কখনো বা শেষ পর্যন্ত গিয়ে থেমেছে। এছাড়া রয়েছে একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের বহুবার অবিকল আবৃত্তি—'মোদের বাড়িতে বড়ো লোকজন' অথবা 'সিঁড়ির সুমুখে ঘর' কিংবা 'একটু সময় হবে'? এ কবিতায় বেশ কিছু শব্দ এনেছেন কবি, যাদের প্রত্যেকটির ভিতর নানান বিস্তারশক্তির একটি ক'রে স্প্রিং যেন বসানো। একটা বিষয়বস্তুর ছকে এগুলিকে ছেড়ে দিয়ে কবি যেন এদের চলার খেলা সকৌতুকে উপভোগ করেছেন। নিজের নিজের ইল্যাস্টিক্

লিমিট্ পর্যন্ত দৌড় দিয়েই এরা যে-যার মত থেমে গেছে। বিভিন্ন শক্তির এই শব্দ-স্প্রিংগুলির রথে প্রেম-প্রেম খেলার লঘু বিষয়বস্তুটি চাপিয়ে দিয়ে নির্মাণশিল্পগত এক ধরনের উপভোগ বানিয়েছেন কবি।

আগে বলেছি, 'কঙ্কাবতী' কথ্য কওয়ার ভাষার লেখা কবিতার বই। শব্দগুলি ডুবে গিয়ে আবেগের তান-জাগানো ভাষাগুণ এতে নেই। তবে 'বন্দীর বন্দনা'র আবর্তধর্মী প্রকাশরীতি আবেগের তান-ছুট্ শব্দ-ব্যক্তিত্বের একান্ত শরণ নিলে 'কঙ্কাবতী'র নির্মাণশিল্প পেতে পারতো। কথাটা এজন্য বলছি, 'বন্দীর বন্দনা'র 'নীল পূর্ণিমা' কবিতা বিশ্লেষণ করলে, শব্দে নয়, হেরফের-করা আবেগে ছকবন্দী জ্যামিতির চাল পরিষ্কার বোঝা যাবে। তাছাড়া, আত্ম-সংলাপের পদ্ধতি এ দু'কাব্যেই রয়েছে। 'বন্দীর বন্দনা'য় যার প্রচ্ছন্ন আভাস, 'কঙ্কাবতী'তে তা স্পষ্ট। জলের মত ঘুরে ঘুরে চলা,—আগের কাব্যে আবেগের তান থেকে তানে, তরলে তরলে গা-ঢালা মেশামেশির মত। পরের কাব্যে একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পৌনঃপুনিকতায়, শব্দের আত্মতায়, কঠিনে কঠিনে শব্দ-বাজানো ঠোকাঠুকির চালে। এ মতের আরো প্রমাণ, কাব্যের নাম-কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে কথার ক্রস-ওয়ার্ড খেলায় একই শব্দ বা শব্দপুঞ্জের যে ঘুরে ঘুরে চলা চোখে পড়বে, তার অস্ফুট পূর্বরূপ 'বন্দীর বন্দনা'র 'প্রেমিক' কবিতায় (নতুন ননীর মতো তনু তব?) পাওয়া যাবে। কঙ্কাবতী সম্পর্কিত ভালোবাসাবাসি কবিতা দুটিরই বিষয়বস্তু।

'দময়ন্তী'র কাল (১৯৩৫) থেকে কবিতার ভিন্ন এক নির্মাণশিল্পে কবি সচেতন হলেন। সাম্প্রতিক হওয়ার নতুন শপথ নিতে গিয়ে কবিকণ্ঠ তবু সংশয়ে কাঁপলো। বহমান কালের ('হে কাল') উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন: 'তুমি কি জানো না / নতুন সৃষ্টির তীব্র উন্মাদনা / বসন্তের বীজে / পূর্ণ ক'রে দেবে এই শীর্ণ শতাব্দীর / শরীর। তোমারও কি নয় / নতুন জন্মের তীব্র ব্যথা,··· / ঐতিহ্যের কঙ্কালের 'পরে / সৃষ্টির উচ্ছ্বাস?' কবির কাছে 'ঐতিহ্যের কঙ্কালের' অর্থ কালেরই 'নিভৃত গর্ভে অতীতের গতিশীল রূপ'। তাই সাম্প্রতিকে প্রতিশ্রুত হ'তে গিয়েও কবির মনে থাকে, কালের অচ্ছিন্ন বহতা। 'ইতিহাস নাগরদোলার মতো ঘুরে-ঘুরে / ফিরে পায়, হারায়, ছড়ায় স্বপ্ন।' তবু কবিতার প্রকাশরীতি বিষয়ে তাঁর প্রথম শপথ—কথ্যভাষার বাক্‌রীতি। এ শপথ-বিচ্যুতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কিছু অংশের ছাড় মানলে, আগাগোড়া 'দময়ন্তী' কবিতা। কবিতার ছাড় অংশগুলি লক্ষ্য করি। (১) 'শোন্ তোরে বলি: / যে-ত্রিবলি / তোর জন্ম-সিংহদ্বারে প্রহরীপ্রতিম / আজও তা লাবণ্যময়,'। (পঞ্চম স্তবক)। (২) 'যে-মুহূর্তে তরঙ্গিত সময়-সলিলে / দ্বিখণ্ডিত হ'লো ক্রুর অদৃষ্টের শিলা, / ম্লান হ'লো হুতাশন, ব্যর্থ হ'লো যমদণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ;— / বিশ্বাস না হয় যদি, জননীরে শুধায়ে দেখিস।' (ষষ্ঠ স্তবক)। (৩) 'এ-কথা বিশ্বাস তোর কখনো হবে না— / সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন।' (অষ্টম স্তবক)। (৪) 'ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, আর / কয়েকটি হাড়— / এ-ই আমি, এ-ই আমি। তাই বলি, / বলি বার-বার,···।' (নবম স্তবক)। চারটি উদ্ধৃত অংশে নিঃসন্দেহে কথ্য বাক্‌রীতির ছোঁয়া। কিন্তু ঐ ছোঁয়াটুকুই এ কবিতায় অন্তত কবির যথাসাধ্য লাভ। কথ্য বাক্‌রীতির অংশগুলি এ কবিতায় একটানা সনাতনী কাব্যভাষার অগাধ জলে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন

দ্বীপের মত। চলচ্চিত্র, এখন বিকেল, ম্যাল-এ, সাগর-দোলা, পদ্মা, জোনাকি—এই সব কবিতায় কবির প্রতিশ্রুত বাক্‌রীতির মুক্তি। অবশ্য এ রীতির জোরালো সূচনা ছিল 'কঙ্কাবতী'র শেষ কিছু কবিতায়। এখানে বলে রাখি, কথ্যভাষার বাক্‌রীতিতে সাধারণ মানুষের বলা কথার মধ্যে এমন একটা অপরিশীলিত সহজ ঝোঁক লুকিয়ে থাকে, যার টানটা কবিতার রাজ্যে ছড়ার মহলের দিকে। কবিতায় কথ্য বাক্‌রীতি আয়ত্ত করার চেষ্টার মধ্যেই বুদ্ধদেবের লেখা ছড়ার সপ্রাণ শক্তিটি সাড়ে-অসাড়ে অধিগত করার দিকে এগিয়েছে। 'কঙ্কাবতী' থেকেই সে লক্ষণ, বিস্তৃত হয়েছে পরের কাব্যধারায়।

বুদ্ধদেবের কবিতায় গঠনশিল্পের আর এক মূল্যবান অঙ্গীকার—চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ, সেইসঙ্গে পুরোনো কাব্যিক ছাঁদের ক্রিয়া বর্জন। অর্থাৎ কাব্যের চলতাকে মৌখিক বা কথ্যের দিকে টেনে আনার আর এক শক্ত কাছির আয়োজন। পুরোনো কাব্য চলেছিল নদীর দেহকে পায়ে চলার তল ধরে নিয়ে। সে তো চলা নয়, সাঁতার। স্থিতিস্থাপক শব্দরাশিকে দু'পায়ে দু'হাতে সারা গা দিয়ে আছড়ে দ'লে ভেঙে গোটা চলনের ভঙ্গি মসৃণ সাঁতারে ছন্দোময় করার চেষ্টা। মানুষ তো আর স্বভাবে জলবাসী নয়। তার যে-কোনো চলন, যায় কবিতার চলন পর্যন্ত, নদীর চলায় উপমা হতে পারে, কিন্তু নদীর দেহে অনায়াসে সম্ভব হয় না। স্থলেই তার সহজ পদব্রজ। প্রতি পদক্ষেপের নিচেকার শক্ত জমির ঠেলা-দেওয়া প্রতিক্রিয়া থেকে পায়ে পায়ে স্থলে চলার জন্ম। একথা বলছি, কেননা সাবেক কবিতার শব্দরা ভাবের আবেগের তানের চরণে চরণে বিগলিত হয়ে আত্মবিলোপ করেছিল। এটাই ছিল কাব্যলেখার সেকাল-রীতি। এ কালের কাব্যে শব্দরা আর আত্ম-বিলোপী নয়। তাদের আত্মতা মেনেই আজকের কবিতা। ভাষার কথ্য বাক্‌রীতির, চলিত ক্রিয়াপদের দাবি দেখা দিয়েছে, চিন্তার চলনে নমনীয় তরলের দিক থেকে সরে এসে অনমনীয় কঠিনের বুকে নিশ্চিত পদক্ষেপের সতত চেষ্টার মধ্যে। 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র বৃষ্টি কবিতার উপমা এ ব্যাপারটা বুঝতে সাহায্য করবে। 'এসো বৃষ্টি, / ··এসো তুমি অর্ধসৃষ্ট অস্পষ্ট অতলে / ···এসো মগ্ন কল্পনার মূলে,···। সে 'মগ্ন কল্পনার' মূল হল, 'মাটি যেথা জল হ'য়ে ঝরে, জল যেথা অগ্নি হ'য়ে জ্বলে, / অগ্নি যেথা বায়ু হয়ে শূন্যে মিশে যায়'। মাটি জল হয়ে ঝরলে, জল অগ্নি হয়ে জ্বললে, অগ্নি বায়ু হয়ে শূন্যে মিশলে ঐ মৌলিক পদার্থ তিনটিতে শব্দের আর্থিক আত্মতা থাকে না। তাই কবির মতে তখন তা 'অর্ধসৃষ্ট অস্পষ্ট'। তাঁর প্রার্থনা—বৃষ্টি এসে সেই অনাকার মৌলিকের রূপকে পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র নিজের নিজের আকার আয়তন মাত্রা দেবে। 'মাটি হোক কঠিন কোমল, / জল হোক তরল শীতল, / অগ্নি হোক উদ্দীপ্ত উজ্জ্বল, / রূপ হোক, ছন্দ হোক, সৃষ্টি হোক, হোক বিশ্বলোক'। শব্দের লিরিক ছেঁকে ছেঁকে কবিতার বাক্যবন্ধে রোমাণ্টিক অনির্দেশ্যতার অর্থ জাগানো আর নয়, এখন থেকে সাকার আয়তনবান শব্দের অবিকল্প অর্থ-স্থাপত্য দিয়ে মূর্তি গড়ার চেষ্টা। কাব্যভাষার এই সব নতুন নিয়ম ভাবতে ভাবতে বুদ্ধদেব বলেছিলেন 'এরই সঙ্গে ভাষা হবে সুগম্ভীর সংস্কৃতিক : সংস্কৃত শব্দ বেশি করে নিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা ছাড়বো কেন ?' কবিতার ভাষাকে সুগম্ভীর দৃঢ় সংহত করার মনোযোগের মধ্যে শব্দের স্থাপত্যগুণ উদ্‌ঘাটনের মনোযোগটাও মিশেছে।

চলিত ভাষার ক্রিয়া ব্যবহার আর কাব্যিক ছাঁদের ক্রিয়া বর্জনে বুদ্ধদেব অতন্দ্র। 'আধেক চাঁদের মতো বাঁকা ছিপছিপে ঐ খাল / পাঁচটি গ্রামের কোলে / পড়ছে ঢ'লে খলখলিয়ে হেসে, / যেন নদীর ভরা বুকের ভালোবাসার বান / আপন টানেই উপচে পড়ে, ছড়িয়ে দেয় প্রাণ / ক্ষণে-ক্ষণে বাংলাদেশের কোণে-কোণে।' (পদ্মা / দময়ন্তী)। আরও কিছু নিয়মসূত্র তৈরি করেছিলেন তিনি। কাব্যে ব্যবহৃত নাম ও অব্যয়পদ (মম, মোদের, তব, আঁধার, পরাণ, মাঝে, যবে, যেথা, সনে, সাথে) ; প্রাচীন পদ (দেখিবারে, দেহ) ; চলিত বাঙলা শব্দের তৎসম প্রতিশব্দ (হাত, গাছ, ফুল হাওয়া-র বদলে হস্ত, তরু, পুষ্প, পবন) : উপভাষার পদ (এনু, ঘরেতে, নারি)—এগুলি একেবারে বাদ দিতে হবে।* 'আমার' 'আমাদের' 'তোমার' শব্দের বদলে 'মম' 'মোদের' 'তব', 'যখন' 'যেখানে' শব্দের স্থলে 'যবে' 'যেথা' ; 'সঙ্গে' শব্দের বদলে 'সনে' 'সাথে', 'এলাম'-এর স্থানে 'এনু', 'পারি না' না-ব'লে 'নারি'। এই সব শব্দ উচ্চারণের সময় মাত্রা কিছু মেজে ঘসে নিয়ে ছন্দের বাঁধি গতের মধ্যে মিলের পথ একদা সুগম করা গেছিল। 'ছন্দ আর মিল এক জিনিস নয় ; মিল কাব্যের অপেক্ষাকৃত নূতন অলঙ্কার, ছন্দ অনাদি' (স্বগত),—বাঙলা কাব্যের কয়েকটা শতাব্দ এই সত্য ভুলেই ছিল। বৈষ্ণব কবিতায়—যদি গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হৈত / কেমনে ধরিত দে। / রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা / জগতে জানাইত কে। / দ্বিতীয় চরণের 'দে' (দেহ অর্থে) শব্দটি এই চিন্তার প্রমাণ। ভুলে থাকার কারণ, কবির আবেগের সঙ্গে ছন্দের নাড়ির টানের সম্পর্কটা সেদিনকার কবির চোখে পড়ে নি। যে কালে কবির নিজের আবেগ প্রথাশাসিত, ছন্দও, আর মিল ছন্দের মোক্ষ ব'লে শিরোধার্য, সেখানে মিল-দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে শব্দের ব্যাপক বলির ব্যবস্থা হয়েছিল।

বুদ্ধদেব এই সাবেক বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন নতুন ইস্তাহার হাতে নিয়ে। এসব পরিবর্তন নিয়মের মত বেঁধে মানবার তাগিদ, অন্যান্য আধুনিক কবির শব্দ-ভর-করা ভাষায় অনেকাংশে সমান্তরাল আঙ্গিক সাধনার পথ ধরিয়েছিল। তালিকাভুক্ত নিয়মগুলি কবিও যে সম্পূর্ণ মেনে চলতে পারেন নি, সে কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে 'আশার দাঁত চিবিয়ে ছেঁড়ে / দ্রৌপদীর শাড়ি' কথার পাশে বসেছে 'স্বর্গে আর মর্ত্যে যেন / বাঁধিয়া দিল সেতু'। 'দুঃস্বপনে পড়িলো মনে' অথবা 'দুঃশাসন করিলো পণ'—এও যেমন আছে, তেমনি আছে 'ভীষণ ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ে, / বজ্র শুনে লাফিয়ে ওঠে / বিদ্যুতের খাঁড়া :'।

'রচনায় দৃঢ়তা ও সংহতি' আনতে 'সংস্কৃত শব্দ বেশি করে' ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত : 'উমার তপস্যা ব্যর্থ, ব্যর্থ উর্বশীর / তপস্যা-মৃগয়া। উষ্ণ আর্দ্র পৃথিবীর নীবির নিগড়ে / বাঁধেনি শিবির ; পীন ঘন ঘাসের বাসর গন্ধে বন্দী সে হ'লো না ; পর্বতে কর্দমে বনে বর্তুল পৃথুল / আতিথ্যের অতন্দ্র আহ্বান পেলো না সন্ধান তার।' (স্বর্গবীজ / দ্রৌপদীর শাড়ি)।

সাধুভাষার ক্রিয়াপদ আর কাব্যিক ছাঁদের ক্রিয়াপদের বদলে চলিত ক্রিয়ার দ্রুতধাবী গতি উচ্চারণের শ্বাসের ভিতর এমন একমাপের চকিত আঘাত দিয়েছে, যাতে

* শ্রীসুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড থেকে এ অংশ নিয়েছি।

কবিতায় ছড়ার সাড়া মেলে। 'আসবে গ্রীষ্ম, আসবে আবার কৃষ্ণচূড়ার / উষ্ণ শোণিত, উচ্চ চূড়ার উচ্ছ্বাসে লাল / আকাশের সুখী রেখায়, আসবে শাখায় শাখায় সবুজ শিখায়, পথে-পথে-ঝরা আহ্লাদি-লাল- / হলদে গুঁড়োয়, চলতি পথের চপল হাওয়ার / উল্লাসে, আর তীক্ষ্ণ কঠিন শুকনো চাঁপার / রৌদ্রমদির বৈশাখী সৌগন্ধ্যে : আবার / আসবে ··।' (ফাল্গুনের গুঞ্জন / দ্রৌপদীর শাড়ি)। একই শব্দ অথবা সদৃশ নইলে নিকট উচ্চারণের ভিন্ন শব্দ শ্বাসক্রিয়ার এক রকমের চকিত আঘাতে লাল-সবুজ-হলুদ রঙের ঘাঘ্‌রা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আর সেই ঘূর্ণীর কেন্দ্রে রয়েছে বহুক্ত 'আসবে' শব্দের ক্রিয়া-শক্তি।

'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' কাব্যের তিন ভাগ। ভাগ তিনটি কালানুসারী নয়। প্রথমভাগে ষোলোটি কবিতা, সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। প্রথম কবিতাটি (মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে) কাব্যের দীর্ঘতম। কাব্যের ক্ষুদ্রতম কবিতা (যৌবন ও জরা) সূচীপত্রে দ্বিতীয়। বাকিগুলি মাঝারি থেকে ছোটো মাপের। আবেগের ঘূর্ণী কবির কবিতা লেখার স্মৃতিকাল আর সম্প্রতিকালকে একসঙ্গে ছেঁকে তুলেছে। মনন এ আবেগের অনুচর। কয়েকটি ছড়া জাতের লেখা আছে, সংখ্যায় প্রথম ভাগে এক-চতুর্থাংশ, কোথাও তাদের করুণে-কৌতুকে গল্প-গল্প উপভোগ্যতা, কোথাও বা ভারি ভাবনায় ছড়ার বহন-ক্ষমতার পরীক্ষা। কাব্যের দ্বিতীয় ভাগে এগারোটি কবিতা, বড়ো মাঝারি ছোটো মেলানো। নগরের অনুষঙ্গ এ ভাগে চোখে পড়ার মত। মিশ্র আর শুদ্ধ ছড়ার পরীক্ষাও এখানে লক্ষণীয়। নিসর্গের এক একটি বস্তু কখনো এক একটি কবিতার বিষয়, যেমন ঘাস, শরৎ, সূর্য। তৃতীয় ভাগে কবিতা সংখ্যা ছয়। প্রথম তিনটি গল্পরসের। তাদের প্রথমটিতে (মধ্যাতিরিশ) রূপক গল্প। দ্বিতীয়টি (খণ্ড দৃষ্টি) আত্মকাহিনীতে জড়ানো অন্য জীবনের তুচ্ছ বৃত্তান্ত। তৃতীয়টিকে (ব্যক্ত) একসঙ্গে প্রেমের ব্যথা ও প্রেরণার গল্প বলা যাবে। এগুলির গড়ন বর্ণনার, উপসংহার দার্শনিকতা ছোঁয়ানো। শেষ তিন কবিতা (কলকাতা, শীতরাত্রির প্রার্থনা, আবির্ভাব) মোটামুটি আত্মজ্ঞানমূলক। এ ভাগের সব কবিতা, শেষেরটি ছাড়া, দীর্ঘ গদ্য কবিতা।

'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'—কাব্যের নামেই উভয়পক্ষীয়তার ইশারা। ঋতুর সঙ্কেতে জাগানো জরা-যৌবনের, মৃত্যু আর উত্তরণের বিশ্রব্ধ সংলাপ। কবি-আবেগের বৃত্তগতি সে উপস্থাপনার পরিচয় দিয়েছে। 'বৎসরের হ্রস্বতম দিনের কবরে জন্মে / আবার দ্বিতীয় দিন, হ্রস্বতায় বৎসরে দ্বিতীয়। / দিনে-দিনে ছোটো হ'য়ে দিন সবচেয়ে ছোটো দিন আনে, / তারপর দিনে-দিনে আরো দিন, আরো, বড়ো, আরো আলো, আরো তাপ, / আরো ! / বাড়ো, দিন, বাড়ো !' (মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে)। এর সঙ্গে শব্দের ঘুরে ঘুরে কথা কওয়ার রীতিতে আবেগের ছন্দ দ্রুতগতি। 'ভালোই হ'লো, / তোমার সঙ্গে দেখা যে হ'লো। / যে-তুমি আছো দেশে ও কালে, / যে-তুমি বাঁচো দেহের সীমায়, / সে কোন্ দূরে রইলো প'ড়ে ; / তবু তো রাত, তবু তো চাঁদ / তোমাকে চায়, তোমাকে ছায়। এই তো হাত / পড়লো আমার বুকের মধ্যে, তোমারই হাত, তুমি সে-হাত ! / তুমি এ-মুক্ত মত্ত রাত, নির্মম নিঃসঙ্গ চাঁদ ; / আজ রাত্রির স্বপ্নময় আনন্দের অনিদ্রায়··· ।' (নেপথ্য নাটক)। কবির আত্ম-সংলাপী ভাষায়

এ আবেগ-নির্মিত তীব্র, আত্মমুখী। 'চেয়ে দ্যাখো, যাও ! / কলকাতায় ক্রিসমাস, দিল্লীতে উল্লাস, আর শান্তিনিকেতনে / মেলা, খেলা, সারাবেলা—বেলা যায়, যায় ! / -যাক্। / বেলা তো গেছেই, আমার তো বেলা গেছে। বুড়ো হ'য়ে উড়ো-উড়ো মন / মানায় না আর, মানায় না ইচ্ছার হাওয়ার তাড়া : / শুধু শুনে যেতে হয়, শুধু মেনে নিতে হয়, তাই / আমি তাই মেনেই নিয়েছি এই উত্তরের ঠাণ্ডা ঘর,……।' (মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে)।

ছড়ার ছন্দে নয়, তার শব্দে একটু বাচালতা, বেশ কিছু বেশি অনুপ্রাসিত শব্দ ঠুকে ঠুকে চকমকি-ঘসা কথা বলায় তার অভ্যাস। মায়ের আঁচল-ঘেরা জগৎটাকে শিশুর জীবনে সুপরিসর করতে, বাইরের নানা আলো আর আকারের দিকে তাকে কৌতুকী করতে নাবালক আবোল-তাবোলের কড়া-নাড়া শাব্দী ভাষা ছড়া নাম নিয়ে একদা জন্মেছিল। শিশুর সঙ্গে এক আঁতুড়েই তার জন্ম। তবু শিশু বড়ো হয়। ছড়াও যে বয়স্ক হয়, সুকুমার রায়ের মার্জিত, শিশুর অবোধ্য শ্লেষের 'বকচ্ছপ' মূর্তিতে নয়, প্রাপ্ত-বয়স্কের প্রেমের আবেগ পরিমাপ করার পথ ধরে, বুদ্ধদেব বসুর লেখায় তা দেখা গেছে। 'বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকেই চমকে দেখি হঠাৎ / জানলা খোলা, আকাশ খোলা, / রাতের রূপের ঘোমটা তোলা, / নিখিল-নীলের মুক্ত খিল, / মুক্ত চাঁদ, একলা চাঁদ, শান্ত বাত হালকা-নীল। /……শাড়ি না-ছেড়েই, আলো না-জ্বেলেই ব'সে পড়লুম ঠাণ্ডা চাঁদের / চোখের তলে, / বুকের মধ্যে উঠলে কেঁপে তোমার সঙ্গে একটু দেখা।' (নেপথ্য-নাটক)। বুদ্ধদেবের কবিতায় শব্দের আত্মতা-র কথা আগে বলেছি। সেই গুণে এ কবির ছড়া সাবালক।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতার প্রতিমান স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়। সে সম্পর্কে দু'একটা কথা বলব। কবির প্রতিমানের একটা ধারা : নিহারিকা-রহস্যে ঢাকা মহাবিশ্বের অনাকার আদিম অন্ধকারের ভিতর থেকে বিপুল এক প্রাণীন শক্তির বেগে বিশ্ব ও বিশ্বজৈবের জন্ম, জলে তাপে বায়ুতে ভূমিতে তা সৃষ্টির আকার আঁত যৌনতা জীবন, রাত্রির গহন মগ্নতা স্পর্শ করে কবির চৈতনা সেই নিত্য হয়ে-ওঠার সাড়া পায়। সৃষ্টি রহস্যের আদি পরিচয় সম্পর্কে কবির এ অকল্পনীয় অনুভব আমাদের পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার মত অস্মিতাহীন বিবৃতি নয়, কবির অতন্দ্র যৌন-চৈতন্যে স্পন্দিত।

(১) তুমি শুধু ভালোবাসিয়াছো, আমি ভালোবাসি নাই কভু ? / আমি তোমা দিয়েছিনু আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। / বেগের আগ্রহে দগ্ধ লক্ষ গ্রহ-উপগ্রহ-তারা / দুর্লক্ষ চলেছে ছুটি' শূন্যতার মৌনতা আন্দোলি'—/…অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে তব সুখে ত্রাসে আত্মহারা / অন্ধকার বিদীর্ণিয়া বিদ্যুতের ভ্রূণ ওঠে কেঁপে, / তোমার বন্দনাগান ঝঞ্ঝার নূপুরতালে বেজে ওঠে মহাকাশ ব্যেপে।

(মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান : বন্দীর বন্দনা, ১৯২৭)

(২) জীবলোক যেন প্রেতচ্ছায়া / পথ চলা যেন মহাশূন্য ভেদ ক'রে। / সৃষ্টির অতীত কালে / পৃথিবীর এই রূপ ছিল বুঝি—/ অনির্ণীত, অস্পষ্ট, চঞ্চল, / ধূমল মণ্ডল। / শূন্য, শূন্য, বিশ্বের প্রসারে / প্রতীক্ষায় পৃথিবীর ভ্রূণ / কত যুগ যুগান্তর ! /……শুধু আমাদের এই ছোটো ঘরে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে / ……

শুধু আগুনের লাল ছায়া / তোমার পাণ্ডুর গালে, আর শুধু তোমার চোখের / অন্তহীন মায়া।

(জলাপাহাড়ে কুয়াশা : দময়ন্তী, ১৯৩৫-৪২)

(৩) ···স্বর্গবীজ ! জ্যোতির জন্মের রীতি ! দেবতার / রেতঃস্রোত ! কোন ক্ষেত্র লক্ষ্য তার ?···/···ঐ পার হ'লো ছায়াপথ, কোটি-কোটি বিশ্ব-কলি, / আলোর বিশাল কাল— / ···ছার মানে উর্বশী-উমারে, / তবু ঝরে ; হার মানে পৃথিবীর নিবিড় প্রার্থনা, তবু ঝরে, / ঝরে স্বর্গবীজ ! জ্যোতির অমর ঝড় ! দেবতার / বৈভবের স্রোত ! ···শুধু ঝরে, কোথাও পড়ে না। আকাশে আগুনে, জলে, / জড়ে, মৃতে, প্রেতে, ভবিষ্যতে ; ঝবে স্ফীত বর্তমানে,··· ।

(স্বর্গবীজ : দ্রৌপদীর শাড়ি, ১৯৪৪-৪৭)

(৪) রাত্রি, প্রেয়সী আমার, প্রসন্ন হও, নিদ্রা দিয়ো না। /···দুই হাতে ছেনেছি তোমার অন্ধকার, উঠেছি তার ধাপে-ধাপে বেয়ে, নেমেছি তার আনন্দময় ঢালু দিয়ে গড়িয়ে, তার নরম, রোমশ, অফুরন্ত ভাঁজে-ভাঁজে জড়িয়ে গিয়েছি, তোমার বিশাল, তরল আলিঙ্গনে লীন হ'তে হ'তে বুঝেছি যে নক্ষত্রেরা আর-কিছু নয়, তামসীর চিন্ময় রূপ—

(রাত্রি, শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর [শ্রেষ্ঠ কবিতা] ১৯৫৫)

(৫) একই প্রতিমানে 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' কাব্যের 'শীত রাত্রির প্রার্থনা' (১৯৫৩) কবিতাটি গড়া।

মহাবিশ্বের বিপুল সৃষ্টিরহস্যের প্রক্রিয়া মানুষ তার নিজস্ব যৌনতা ও প্রজননরীতির অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গে বোঝার চেষ্টা করে। তার বাইরে বৃহত্তর অথবা গূঢ়তর কোনো সৃষ্টি-অভিজ্ঞতা যেহেতু মানুষের নেই, কবিরও নেই। এমন কি, কবির পক্ষে কবিতার জন্মদানও কবি-ব্যক্তির নারী-পুরুষগত যৌন অভিজ্ঞতার ছবিতেও ব্যক্ত হওয়া সম্ভব। লক্ষ্য করার বিষয়, কবি বুদ্ধদেব যখনই মহাকালের অকম্পনীয় এবং রহস্যময় সৃষ্টি প্রণালীকে অনুভব করতে চেয়েছেন তখনই তাঁর কবিতার প্রসঙ্গপটে সৃষ্টিবীজ, ভ্রূণ, রেতঃ-স্রোত, যোনি, জরায়ু ইত্যাদি যৌন-প্রত্যঙ্গ, প্রক্রিয়া কখনো বপ্র বাকৃভঙ্গে, কখনো রোমাণ্টিক আবেশে ফুটেছে। সরাসরি অভিজ্ঞতা দিয়ে সহজ প্রকাশের রীতি এই। ইমেজের Archetype-এ আকাশ জনক, পৃথিবী জননী। মানুষের যৌন অভিজ্ঞতার আদিকালে এ সম্পকের আবিষ্কার। মহাভারতে বনপর্বের বাহাত্তি অধ্যায়ে নলরাজার সমস্ত বিপদ-আপদ কেটে গিয়ে দময়ন্তীর সঙ্গে পুনর্মিলন হলে দম্পতি সুখে রাত্রিযাপন করার পর (৪৯ শ্লোক) আপ্যায়িতচিত্তা দময়ন্তীর তৃপ্তির ছবিটি কবি একটি উপমায় প্রকাশ করেছেন (৫২ শ্লোক)—'অর্ধসঞ্জাতশস্যেব তোয়ং প্রাপ্য বসুন্ধরা'। আকাশ-মাটির প্রাকৃতিক সম্পর্কের এ বৃহত্ত্ব নারী-পুরুষের যৌন-সম্পর্কের নিকট অভিজ্ঞতার আলোয় দীপ্ত। Shakespeare-এর Antony And Cleopatra নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যে Enobarbus, Agrippa, Maecenas প্রভৃতি Antony আর Caesar-এর বন্ধুরা ইজিপ্ট, রানী Cleopatra, তার সৌন্দর্য, Mark Antony-র সঙ্গে তার নতুন সম্পর্কের খোশগল্প করতে করতে Cleopatra আর Caesar এর

মধ্যে আকর্ষণের পুরোনো বৃত্তান্ত উঠে পড়ায় Agrippa মন্তব্য করল—'She made great Caesar lay his sword to bed. / He ploughed her, and she cropp'd.' এখানে পুরুষ-নারীর যৌন সম্পর্ক কৃষক আর কর্ষিতা ভূমির ছবিতে সম্প্রসারিত।

লিরিক, রোমাণ্টিক প্রতিমান বুদ্ধদেবের কবিতার অন্য বড়ো প্রকাশের দিক। এখানকার রূপের পরিমণ্ডল নিহারিকা-কল্পনার মত বিস্তৃত না হয়েও রূপের দিক থেকে সঞ্চারী। প্রকৃতির রঙে-রসে স্নিগ্ধ, দুর্জ্ঞেয় বিপুলের ভয়-জাগানো নয়।

> তারপর এলো দেবদূত।…/…নয় লাল তলোয়ারে আঁকা, / আগুনের পাখা নেই, নেই কোনো অলৌকিক অলংকার। / মনে হ'লো উষ্ণ, ছোটো, বাদামি, নরম এক পাখি / বছরের ঢেউয়ের ঝাপসা ফেনা পার হয়ে এলো ; / বুকে তার কিশোর-কান্নার দাগ হেমন্তে হলুদ, / অথচ ঠোঁটের ফাঁকে নীড়ের প্রথম তৃণ-বসন্তের ভার। অসীম নির্ভরে ভরা ছোট্ট মুঠোর মতো পাখি।
>
> (আবির্ভাব, শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর, ১৯৫৪)

এ ছবিতে 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' কাব্যের সামগ্রিক প্রতিধ্বনি। শীত আর বসন্ত—দুই কালের প্রচ্ছদ। সে কাল জরা আর যৌবনের। স্মৃতির এবং সম্প্রতির। উষ্ণ ছোটো বাদামি নরম পাখি তার নিষ্পাপ নবজাত ডানায় কালের ক্লেদ মুছে দিল। ঠোঁটের ফাঁকে নীড়ের প্রথম তৃণে নতুন জীবনের ভরসা। অনেক মায়ায় জড়ানো অতীত আর অনেক স্বপ্নের আগামী দিন নিয়ে মানুষের বিপন্ন বর্তমান, তৃণমুখ অবোধ পাখির পাখার উষ্ণতায় মুক্তি পাবে। জীবনের গুরুভার কখনো কখনো চোখে-না-পড়া একরত্তি চঞ্চলতার ছোঁয়া লেগে লঘু হয়ে যায়। এ পাখি সেই অমল নিরাময়তার প্রতীক। আর একটি অংশ—

> দূর থেকে ভালোবাসি দেহখানি তব— রাতের ধূসর মাঠে নিরিবিলি বটের পাতারা / টিপটাপ শিশিরের ঝরাটুকু / যেমন নীরবে ভালোবাসে।
>
> (প্রেমিক : বন্দীর বন্দনা, ১৯২৯)

লক্ষ্য করার ব্যাপার, ১৯২৯ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আঠারো বছর কবিতার পর কবিতায়* কঙ্কাবতী—এই নামটুকুকে প্রেমিকার মূর্তিতে সাজাতে কবি 'ক্ষীরের পুতুল' -এর সুয়োরানীর রাজার মত সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর আশ্চর্য রত্নমাণিক উজাড় করে এনেছেন সপ্তডিঙা ভবে ; তবু এ প্রেমে এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। শেষ কবিতাতে আকুলতা সত্ত্বেও কবির কঙ্কাবতী-প্রেমের একটা তত্ত্বকথা ফুটেছে। 'মনে হয়—আর কারে নয়—ভালোবাসি ভালোবাসারেই। / যে-ভালোবাসার বাসা নতুন ননীর মতো নারীর শরীরে নয়, / ঢেউয়ের গানের মতো নামে নয়, হাজার ঢেউয়ের মতো নামে নয় : / এমনকি, কবিতায় নয়,…।' এই দার্শনিকতাও নয়, নিছক বিভ্রান্তির রূপাশ্রয়ী উপস্থাপনা 'প্রেমিক' কবিতার দৃষ্টান্তটি। রাতের ধূসর মাঠে নিরিবিলি বটের পাতায় শিশিরের অস্ফুটধ্বনি শব্দের টিপটাপ ঝরে পড়ার নৈসর্গিক সম্পর্ক আত্মস্থ করে কবি তাঁর উত্তেজিত আবেগকে

---

* 'বন্দীর বন্দনা'র প্রেমিক (১৯২৯)। 'কঙ্কাবতী'র নাম কবিতা (১৯২৯ থেকে '৩৪-এর মধ্যে)। 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র 'কালো চুল' (১৯৪৪ থেকে '৪৭-এর মধ্যে) এবং 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'-এর 'মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে' কবিতাংশ (১৯৪৭)।

যতটা বিরাম দিতে পেরেছেন, ততটাই তা কবির নির্লিপ্ততার প্রকাশক। আমার কথা হল, কবিতা চারটি কালক্রম মেনে আলাদা করে না পড়ে কবির কঙ্কাবতী-আবেগের একটি বৃত্তে বেঁধে পড়লে পরিধিতে পরিধিতে চক্রাকার ব্যাকুলতা আর তার কেন্দ্রে শান্ত অনুভবটুকু একসঙ্গে আস্বাদন করা যাবে।

কেননা জীবন / যৌবনেরে ভালোবাসে—প্রকৃতির রীতি এই ; / যার আছে সে-ও ভালোবাসে, যার নেই সে-ও ভালোবাসে। / সন্তানের যৌবনের তাপে রোদ্দুর পোহায় পিতা, / তরুণী নাৎনির তাতে মাতামহী হাত সেঁকে নেন।

(মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে, শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর, ১৯৪৭)

প্রতিমানটির অভাবিত দীপ্তিগুণ। মানুষের মুখে-অস্বীকার-করা মনুষ্যত্বের সত্যে এ প্রয়োগ উদ্ভাসিত। ছবিটি এমন আচমকা জীবনের যবনিকা সরিয়ে দিয়েছে, যাতে অপ্রস্তুত সাজঘরের দৈন্যসমেত মানুষের আসল রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। এ ছবি রোদ্দুরের নিসর্গ-ছোঁয়া হয়েও কোনো নৈসর্গিক রম্যতার আবেদন জাগায় না। জীবনের এত আদিম গুহায় আলো-ফেলা এ ছবি, যার গুণে মানুষের মৌলিক স্বরূপ উদ্ঘাটিত।

বুদ্ধদেব রাত্রির কবি। 'রাত্রি আমার প্রেয়সী / তিলে তিলে করি রচনা,...।' 'মায়াবী টেবিল'-এ (দ্রৌপদীর শাড়ি) ব'সে 'সংকীর্ণ আলোর চক্রে... / ...যে-দীপের ছায়া / ঘাস, গাছ, রোদ্দুরের অন্তহীন আশ্চর্য কাপড়ে / পৃথিবীকে রূপ দেয়', তার দিকে মনের চোখ তুলে চেয়েছেন। 'রাতের বারান্দার / স্পন্দনময় তনু' স্পর্শ করলে 'পথ হ'লো নদী, রাত হ'লো লিলি,'। কবির ভরসা 'রাত শেষ হোক, শেষ নেই এই রাতের বারান্দার,'। এই রাতের বারান্দায় হাত রেখে কবি নৈসর্গিক দিনরাত্রির চক্রাবর্তন পেরিয়ে কালান্তরের যাত্রী হয়ে যান। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রাজ-তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে আসন্ন রাত্রির পটে আত্মার অভীষ্ট দূর থেকে দেখতে পেয়েছেন। বোধ করি তিনিও 'রাতের বারান্দার / স্পন্দনময় তনু' স্পর্শ করেছিলেন। চতুর্থ অঙ্কের গোড়ায় 'ঋষ্যশৃঙ্গ (অলিন্দে)' কথাটি চরিত্রের স্বগত-ভাষণের ক্ষেত্রে নাট্যকার চারবার ব্যবহার করেছেন, যদিও এ অঙ্কের সুরুতে মঞ্চ-নির্দেশের মধ্যে 'রাজপ্রাসাদের একটি অলিন্দ' 'অলিন্দে ঋষ্যশৃঙ্গ রাজবেশে দাঁড়িয়ে' এ পরিচয় দেওয়া আছে। মোটকথা, কবি বুদ্ধদেবের 'রাত্রি' আর তার মায়াবী আবেশের প্রতিক্রিয়া তাঁর সমস্ত রচনাকে ঘিরে রেখেছে। জীবনের স্বরূপ আদি সৃষ্টির কোন্ মূলে লগ্ন, এই রাত্রিই কবিকে সে সন্ধানে অনিদ্র করে। 'শ্রাবণ'কে (দ্রৌপদীর শাড়ি) ডেকে বলেছেন, 'আমার মনের অবচেতনের তিমিরে / কত যে কথার জোনাকি'। পরিশেষে কবির অঙ্গীকার, 'আদিম আঁধারে বাঁধা হীরকের যে-খনি / তোমাকেই, কবি, দেবো তা, / ধাতুর হাতুড়ি-আঘাতে জাগবে যখনই / শুভ্র শিখার কবিতা'।

কাব্য সাধনার উপান্ত পর্বে বুদ্ধদেব বসু কয়েকখানি নাটক রচনা করেছিলেন। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' (১৯৬৬)। 'কালসন্ধ্যা' (১৯৬৭-৬৮)। প্রথম পার্থ (১৯৬৯)। অনাম্নী অঙ্গনা (১৯৭০)। সূর্যাস্ত যেমন তার নিজের উদয়স্মৃতির আভাটুকু পশ্চিমের আকাশে অনুকরণের ভঙ্গিতে শেষবারের মত এঁকে দেয়, কবির নাটকগুলি সেই রকমের স্মৃতির রঙে রঙিন। অন্তত 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' এবং 'কালসন্ধ্যা' সম্পর্কে এ কথা বলা যাবে। ঐ দুটি বই, মূল প্রতিমানের দৃষ্টিকোন্ থেকে আলোচনা করব।

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র কথাবস্তু চতুর্থ অঙ্কে ঘনীভূত, যেখানে প্রেমে উন্মাদিনী তরঙ্গিণীর সঙ্গে যুবরাজ ঋষ্যশৃঙ্গের দেখা হল। ঋষ্যশৃঙ্গের রূপের মধ্যে তরঙ্গিণী তার অভীষ্টকে খুঁজে পেলো না। তরঙ্গিণীর আবির্ভাবে ঋষ্যশৃঙ্গের রাজসুখ স্বপ্নে মিলিয়ে গিয়ে তাকে তার সর্বত্যাগের গন্তব্য চিনিয়ে দিল। ঋষ্যশৃঙ্গের রাজবেশ তপস্বীর বেশে বদ্‌লে গেল। তরঙ্গিণী একে একে তার সব অলংকার খুলে ফেল্‌ল। ঋষ্যশৃঙ্গের প্রথম উক্তি—'এই অঙ্গদেশ—যেখানে আমি হর্ষধারা নামিয়েছি, আমি সেখানে শুষ্ক ছিলাম। দগ্ধ ছিলাম তারই বিরহে, তোমরা যাকে তরঙ্গিণী বলো'। ঋষ্যশৃঙ্গের শেষ উক্তি—'জানি না আমার কোন তপস্যা। তপস্যা কিনা তাও জানি না। আমার সামনে সব অন্ধকার। অন্ধকারেই নামতে হবে আমাকে।...আমরা যখন যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।...আমাকে সব কিছু নূতন করে ফিরে পেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানি না, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। যার সন্ধানে তুমি এখানে এসেছিলে, হয়তো তা আমারও সন্ধান। কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে খুঁজে নিতে হবে, তরঙ্গিণী।...আমাকে বাধা দিও না, তরঙ্গিণী। তুমি তোমার পথে যাও। হয়তো জন্মান্তরে আবার দেখা হবে'। তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ এবং বারাঙ্গনা তরঙ্গিণী একই প্রাণ, নাটকের প্রয়োজনে দুটি বৃত্তি-আশ্রয়ী চরিত্রে দু-ভাগ করা মাত্র। সাধারণ নাটকের মত এরা ভিন্ন মানসিকতার মানুষ হলে ঋষ্যশৃঙ্গের এই চির-নিষ্ক্রান্তির মুহূর্তে নায়িকার পতন ও মূর্ছা দেখানো যেতো। এ নাট্য-পরিস্থিতির প্রসঙ্গে 'বন্দীর বন্দনা'র 'কোনো বন্ধু-র প্রতি' কবিতাটি (১৯২৯) পাঠককে পড়তে হবে। যেহেতু এই নাটক আর ঐ কবিতা বিষয়ে এক, এদের মূল প্রতিমানের ঐক্য তা চিনিয়ে দেয়। 'শতদার, নারীমাংসলোভী, / কামুক রাজন্যকুল ছুঁয়ে-ছেনে বেড়াতেন ফিরি' বিশ্বের সুতনুরাশি। কুমারীত্ব করিতে মোচন / পটুতার নাহি ছিলো সীমা। নারীমেধ-যজ্ঞ-মাঝে / ইন্ধন হয়েছে শত শকুন্তলা।' এর সঙ্গে নাটকের চতুর্থ অঙ্কের সূচনায় ঋষ্যশৃঙ্গের স্বগতোক্তি, ঋষ্যশৃঙ্গ-শান্তা, এবং ঋষ্যশৃঙ্গ-বিভাণ্ডক সংলাপ মিলিয়ে পড়লে রাজবেশী তপস্বীর পরিতাপের বেদনা থেকে এ সাদৃশ্য চেনা যাবে। ঋষ্যশৃঙ্গের প্রথম উক্তি, যা উল্লেখ করেছি, তার অবিকল পরিচয় আছে—'মোরা কবি, কাব্যসরস্বতী / আমাদের চিরপ্রিয়তমা।' 'আর নারী? আমরা ভালোবাসিতে পারি, হেন নারী / আছে কি মরতে?... / ...চর্ম-সাথে চর্মের ঘর্ষণ / একমাত্র সুখ যাহাদের,... ... / ...আমাদের প্রিয়তমা অগ্নিকল্পা কবিতা-কল্পনা।—'। ঋষ্যশৃঙ্গের শেষ উক্তি, তাও উল্লেখ করেছি, একই বক্তব্যে প্রতিধ্বনিত—'তুমি আর আমি / বিধাতার নির্বাচিত, / দেবকুলবংশোদ্ভূত মোরা— / এ পন্থা মোদের নহে'। কবি তাঁর সগোত্রের বন্ধুকে ডেকে বলেছেন 'এসো, এসো, এসো তুমি ঐ রুদ্ধ অন্ধকার হ'তে' 'উদার আঁধার-ভরা / আকাশ তলে'। কবিতায় এবং নাটকেও গন্তব্যের পথ 'রুদ্ধ অন্ধকার' থেকে 'উদার আঁধার-ভরা' আকাশে। তপস্বী আর বারাঙ্গনা জীবনের নাটে একই বৃত্তিজীবিত নয় ব'লে সগোত্র নয়। তাদের গন্তব্য বা পরিণাম এক হলেও একসঙ্গে নয়। যারা স্বভাবে স্রষ্টা, নির্মাতা, তারা কোনো পূর্বনির্মিতির অনুবর্তন করে না। তারা তাদের আত্মার অভিপ্রেত নতুন লোকনির্মাণে সর্বত্যাগ করে। কবি নির্মাণ করে কাব্যলোক, তপস্বী তপোলোক, পার্থক্য এটুকুই। অথবা চূড়ান্ত পরিণামে কোনো পার্থক্যই হয়ত নেই। 'বন্দীর বন্দনা'র

উল্লিখিত কবিতা পড়তে বসে পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করবেন, এর একাধিক স্থানে রয়েছে ছোটো হরফে ছাপা অন্য ছন্দে লেখা কবিতার নেপথ্যবাণীতে নাট্যস্পন্দ জাগাবার প্রয়াস। কবিতাটিতে কবির জীবন-সাধনা ও জগতের কথা। নাটকে তপস্বী-রাজার জীবন-সাধনা ও জগতের কথা। নাট্যবন্ধের আঙ্গিকগত প্রয়োজনে কবিতার ব্যক্তিটিকেই নাটকে যুগল বিভাজনের রেখায় প্রথমে বিপরীত ক'রে পরে মিলিয়ে দেওয়া। এটুকু ছাড়া মূল প্রতিমানের নিরীখে এদের বিষয়ের সংকল্প এক, অভীষ্ট এক, দু'ক্ষেত্রেই জীবনের গতি-পরিণতির ভাবনাটিও এক—'আমাদের তপস্যায় পৃথিবীর নবজন্ম হবে— / সে পৃথিবী আমাদের। / তা-ই হোক, বন্ধু, সখা, প্রিয়'। এই একই ভঙ্গিতে কাব্যবিষয় নাট্যবিষয় হয়েছে 'কালসন্ধ্যা'য়। এ নাটকের পূর্বসূত্র পাওয়া যাবে 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' কাব্যের 'মধ্যতিরিশ' (১৯৪৪) এবং বিশেষত 'শীতরাত্রির প্রার্থনা' (১৯৫৩) কবিতায়। নাটকে আত্মস্থ কৃষ্ণ এবং ব্যাসদেবের অনুজ্ঞাবোধক (Imperatives) উক্তিগুলির সঙ্গে উল্লিখিত কবিতাদুটির অনুজ্ঞাবোধক উক্তিগুলি ভাবের সূচনা থেকে পরিণামকে সদৃশ সূত্রে মিলিয়ে দিয়েছে। 'দু'রতি সোনার সুখাতুর সংসারে' বাসিন্দা মানুষ, অর্জুনের মত, তার অতীতের কৃতি আর ভবিষ্যতের কৃত্য সাজাতে গোছাতেই তন্ময়। কালের ডাক তাই সে শুনেও শুনতে পায় না। ব্রহ্মাণ্ডের অজ্ঞেয় বিপুল সৃষ্টিলয়ের নিয়মে দৃশ্য অদৃশ্য জীবিত অজীবিত সব বস্তুই যে বাঁধা আছে, কবির কবিতার অজস্র প্রতিমানে সে ইশারার পরিচয় আগে দিয়েছি। কবিতা দুটিতে আর নাটকে সেই এক প্রতিমানের লীলা, শুধু ভিন্ন প্রতিবেশে আর অনুষঙ্গে গড়া। কবিতায় (১৯৫৩) বলেছেন—'ডিমের খোলার মতো ফেটে যাক তোমার পৃথিবী, বেরিয়ে আসুক / অন্য এক জগৎ, / এই পাতাল বেয়ে নেমে যাও আরো, আরো অন্ধকারে ; যখন সব / হারাবে, কোনো / চিহ্ন আর থাকবে না, তখনই তোমাকে ধরে ফেলবে অতীত, এগিয়ে আসবে / তোমার দিকে ভবিষ্যৎ—'। নাটকের আকুল অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেছেন—'তুমি ও আমি / দৃশ্য, শ্রাব্য, স্পর্শনীয় / এ-মুহূর্তে, এই দ্বারকায়। / কিন্তু, দ্যাখো, এ-মুহূর্ত এইমাত্র / অন্য এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো, / অন্য এক মুহূর্তে আবার। / সঙ্গে নেয় তোমাকে আমাকে টেনে, / নেয় টেনে দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, / বৃক্ষ, জন্তু, নক্ষত্র, নিখিলবিশ্ব। / ...কিংবা যদি কখনো নিজেরই মধ্যে ডুবে যাও, গভীর, গভীরতর, / হয়তো বা অগত্যা উত্তর পাবে : যা আছে, তা চিরকাল ধ্বংসের অতীত, / যা নেই তা কখনো ছিলো না। / ...একবার অস্তিত্ব সম্ভব হ'লে কোনোকালে ঘটে না বিলয় ; / যার মুখগহ্বরে অনন্তকাল ধ'রে / যুগপৎ উপস্থিত বর্তমান, অতীত ও ভাবীকাল, / জড়, প্রাণ, জীবিত, মৃতেরা'। কবিতা দুটির ভিতরকার অজানা বক্তা ('মধ্যতিরিশ' কবিতায় 'কালো কাপড় পরা প্রহরী') নাটকের কৃষ্ণ এবং ব্যাসদেবের সঙ্গে চরিত্রে এক। কবিতা দুটির ভিতরের শ্রোতা ('মধ্যতিরিশ'-এ রেলযাত্রী) আর নাটকের অর্জুনের মধ্যে অপরিণামদর্শী আটপৌরে মানুষের ছবি।

বুদ্ধদেবের কবিতায় ভাবের প্রতীয়মান বিরোধ, আত্ম-সংলাপী ভাষা কবির কাব্য-নাট্য রচনার ইচ্ছাকে উৎসাহ দিয়েছে। পুরাণের পাত্রে আর নাটকের বিরোধ-সংলাপী আঙ্গিকে তাঁর অতীত কাব্য-নির্মাণশিল্পেরই আবর্তন।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিক্রমা

অজিতকুমার ঘোষ

আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে কবি সুধীন্দ্রনাথ প্রখর মনন ও বৈদগ্ধ্যে, অতৃপ্ত হৃদয়বৃত্তির অলজ্জিত ঘোষণায়, ধ্রুপদী শব্দের অর্থবহ প্রয়োগে এবং পরিশীলিত প্রকাশভঙ্গির শাণিত দীপ্তি বিকিরণে অনন্য পথযাত্রী। তাঁর কল্পনার প্রেক্ষাপট অতি-বিস্তারিত এবং তাঁর কবিতার সীমানা দেশ ও কালের সকল সংকীর্ণ বাধা অতিক্রম করেছে। অতীত প্রাচ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য—সর্বত্র তাঁর গতি স্বচ্ছন্দ। অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনেক ভাব ও ভাবনা সঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর সবল ও স্বাবলম্বী আত্মিকশক্তি সব কিছু আত্মস্থ ক'রে এক স্বতন্ত্র মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর কবিতা পড়লেই মনে হয় ওই কবিতায় অলৌকিক প্রেরণা অপেক্ষা 'ঐকান্তিক সংকল্প তথা অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের' পূর্ণ পরিণত রূপ সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তাঁর প্রতিভা কোথাও স্থাণুত্ব লাভ করেনি, তা ক্রমাগত বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়েছে, অবিরাম তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে চলেছেন। বুদ্ধদেব বসুর কথায়, 'তাঁর প্রবৃত্তি তাঁকে চালিত করলে কবিতার পথে—সে-পর্যন্ত নিজের উপর তাঁর হাত ছিল না, কিন্তু তার পরেই বুদ্ধি বললে, পরিশ্রমী হও। এবং বুদ্ধির আদেশ শিরোধার্য ক'রে অতি ধীরে সাহিত্যের পথে তিনি অগ্রসর হ'লেন, অতি সুচিন্তিত ভাবে গভীরতম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে।' তাঁকে বুঝতে গেলে প্রতিভার এই ক্রমবিবর্তনধারাটি লক্ষ্য করতে হবে। সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সমালোচকেরা যে-সব কথা বলেছেন তা সবই সত্য, কিন্তু পুরোপুরি সত্য নয়। তাঁর বয়স, অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক চেতনা ও আত্মিক ভাবনা বিচিত্র এবং কোথাও কোথাও বিসদৃশভাবে তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত। আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁর প্রত্যেক কবিতার নীচে রচনার সময় নির্দেশিত হয়েছে। আমরা সেই রচনাকাল দেখে অচির ও অস্থির কবিমানসিকতা যেমন বুঝতে পারি, তেমনি তাঁর কবিতার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির বিবর্তনশীল স্তরও ব্যাখ্যা করতে পারি। সেজন্য সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সাধারণভাবে মন্তব্য করবার আগে তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিপ্রতিভা কিভাবে নিত্য নোতুন আত্মপ্রকাশ ও শিল্পসৃষ্টির পথে অগ্রসর হয়েছে তা দেখা দরকার। একটি বিষয় বোধ হয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁর প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলি একটি বিশেষ সুরের বাঁধনে সুসংহত হ'য়ে রয়েছে। প্রায় একই সময়ে রচিত অন্য কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির সঙ্গে যেন তাদের ব্যবধান বড় স্পষ্ট। 'একোঽহং বহু স্যাম্'—বেদান্তবিরোধী কবিসত্তার আশ্চর্য লীলা আমরা দেখেছি। তিনি নানা সময়ে যে বহু শুধু তা নয়, তিনি একই সময়ে বহু।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রকাশ-কাল ১৯২৫ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ত্রিশ বছরের সামান্য কিছু বেশি। ওই সময়ের আগে ও পাছে তিনি কিছু কিছু কবিতা লিখতে পারেন, কিন্তু সেগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। তাঁর প্রথম কাব্য 'তন্বী' এবং শেষ কাব্য 'দশমী'। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সংকলন-গ্রন্থে 'তন্বী' কাব্যের নির্বাচিত কবিতাগুলিকে প্রথমে স্থান দেন নি। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস, সুধীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে আদ্যন্ত পরিশোধন না ক'রে তন্বীর পুনঃপ্রকাশে রাজি হতেন না।' অর্থাৎ, বুদ্ধদেব বসু তাঁর নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সুধীন্দ্রনাথের মনোভাব কল্পনা করেছেন। কিন্তু 'তন্বীর' কবিতাগুলিকে আমাদের অত অপরিণত মনে হয় না। সত্য বটে, ওই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলি রবীন্দ্র প্রভাবিত। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় রবীন্দ্রপ্রভাব স্বীকরণ থেকে রবীন্দ্রপ্রভাব উত্তরণের একটি সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। তিনি উৎসর্গ-পত্রেও রবীন্দ্রনাথের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে বলেছেন, 'ঋণশোধের জন্য নয়, ঋণ স্বীকারের জন্য।' ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন, 'তবু এই চুরির জন্য আমি লজ্জিত নই, কেননা শুধু সুন্দরের মোহ যে-চোরকে পাপের পথে ডাকে, সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে।' এই ভূমিকা তিনি পরিণত কবিতা লেখার সময় (১৯৩০) রচনা করেছিলেন। সেজন্য 'তন্বী' সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর যা মত তা হয়তো সুধীন্দ্রনাথের ছিল না।

'তন্বী'র কবিতাগুলি ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে রচিত। তখন তাঁর বয়স ২৪ থেকে ২৬-এর মধ্যে। আরক্ত যৌবনের আবেগ-প্রগলভতা এবং রূপানুরাগ খুবই স্বাভাবিক। তখনও সম্ভোগরসমাদরা পানে সকল ইন্দ্রিয় উন্মুখ, মননের বক্রতা এবং প্রৌঢ় বয়সের সংশয় ও ধূসরতা তখনও আসেনি। বৈষ্ণব কবিতা থেকেও বিশিষ্ট শব্দ তখন তিনি আহরণ ক'রে চলেছেন। দাদুরী, সজনী, সখী, বঁধু, বাসরশেজ ইত্যাদি শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতিকে অবলম্বন ক'রে অনির্দেশ্য রোমান্টিক বেদনার সৌরভ ছড়িয়ে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার একটি প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণটি 'তন্বী'র কয়েকটি কবিতার মধ্যেও স্পষ্ট (শ্রাবণবন্যা, বর্ষার দিনে)। 'তন্বী'র কবিতাগুলি লেখার সময় কবির যে বয়স তাতে প্রেমের অনুভূতি যে মূল প্রেরণারূপে কবিতাগুলির মর্মস্থলে বিরাজ করবে তা প্রত্যাশিত। সম্ভোগমগ্ন প্রেমের বেদনাসিক্ত স্মৃতিচারণই অধিকাংশ কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে। 'দুর্দম প্রীতি আজি শুধু স্মৃতি মোদের কাছে' কিংবা 'কী যেন হারায়ে গেছে জীবন হ'তে'—কবি এই হারানো প্রেমের ব্যথায় বিচলিত। কিন্তু এই ব্যথা অন্ধকার নৈরাশ্য আনে না, এই ব্যথার মধ্যে যেন একপ্রকার সুখময় রোমাঞ্চ মিশে আছে। আজকের বেদনাবিদ্ধ চিত্তে অতীতের মিলনপ্রত্যাশায় উন্মুখ রঙীন লগ্নের কথাই বারে বারে আসছে, সেই লগ্নের রোমাঞ্চিত মুহূর্তগুলি কবিকে উতলা করে তুলছে (ভ্রষ্টলগ্ন)। সুধীন্দ্রনাথের চিরন্তনী রবীন্দ্রনাথের চিরায়মানার মতই কবির সঙ্গে জীবনমৃত্যুর মধ্য দিয়ে শাশ্বত সম্পর্কে আবদ্ধ। সেই চিরন্তনী প্রেয়সী আলো ও অন্ধকারে স্ফুট ও অস্ফুট। তাকে চিনেও চেনা যায় না, তাকে জেনেও জানার শেষ নেই, তাকে পেয়েও সন্ধানের বিরাম নেই। 'অচেনা অথচ জানা, প্রিয়তমা, প্রাণাধিক প্রাণ, কে তুমি রমণী ?' রহস্য ভেদ করার জন্য কবি তার কাছে ছুটে যান—'ছুটে গেনু তোমা পাশে—কোথা তুমি ? এ-শুধু শূন্যতা ! এ কেবলই

মায়া !' রবীন্দ্রনাথের মতই সুধীন্দ্রনাথ আশা ক'রে আছেন, মৃত্যুর পরে তাঁর লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে তাঁর চিরমিলন ঘটবে—'তোমার প্রমোদকুঞ্জ রচিত কি বৈতরণী তীরে, হে মোর ক্রন্দসী ?'

'তন্বী'তে সুধীন্দ্রনাথ শব্দ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন নি। চির পরিচিত শব্দের ব্যবহারই এই কাব্যে দেখি, মাঝে মাঝে 'তরোল কুন্তলগ্রন্থ', 'উল্বণ' প্রভৃতি দু'একটি সুধীন্দ্রীয় শব্দপ্রয়োগ দেখা যায় যায় মাত্র। যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট তৎসম শব্দের গাঢ় গাম্ভীর্য ও উদ্ধত মহিমা তখনও তাঁর কবিতায় আসে নি।

অনুকরণের পথ ছেড়ে স্বকীয়তার পথে কবি চলা শুরু করলেন 'অর্কেস্ট্রা' কাব্য থেকে। তাঁর কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি এই কাব্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে পরস্বগ্রহণের কোনো চিহ্নই যে এই কাব্যে নেই তা বোধ হয় বলা যায় না। সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কবিতা থেকে বহু চিত্র ও ভাবনা তিনি গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও জায়গায় জায়গায় স্পষ্ট। 'অর্কেস্ট্রা'র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৯ থেকে ১৯৩২। ১৯২৯ সালে কবি বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বিদেশে কোনো বিদেশিনী প্রিয়া জুটেছিল কিনা জানি না। কিন্তু 'অর্কেস্ট্রা'র কবিতাগুলিতে যে-সব প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সেগুলির নায়িকা হ'ল এক ক্ষণিকা বিদেশিনী। 'অর্কেস্ট্রা'র কবিতাগুলি প্রেমের উত্তপ্ত, বাসনামদির আবেগে প্রজ্বলিত। প্রেমের এরূপ ঐকান্তিক ও সর্বময় রূপ আমরা কবির আর কোনো কাব্যে দেখি নি। কবিতাগুলির মধ্যে বিপ্রলব্ধ কবিচিত্তের অতীত মিলনের রসোদ্‌গারই ইন্দ্রিয়বিলাসিত চিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। 'তন্বী'তে ব্যক্ত প্রেম অপেক্ষা 'অর্কেস্ট্রা'য় মূর্ত প্রেমের রূপরেখা অনেক বেশি উজ্জ্বল, অন্তরের জ্বালা ও অস্থিরতাও অনেক তীব্র। কবিকে অনেকেই ক্ষণবাদী বলেছেন। কবির বক্তব্য থেকেও ক্ষণবাদে তাঁর আগ্রহ সূচিত হয়। 'মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে' (হৈমন্তী), 'হে মোর ক্ষণিকা, তোমার অরূপ স্মৃতি, সে নহে শাশ্বত' (মূর্তিপূজা), 'ক্ষণিক ইন্দ্রত্ব লভি অনায়াসে তপস্যার ফলে' (ভবিতব্য), 'সমস্ত ভুবন জুড়ে, আবার এলে কি, ক্ষণিকা পরমা ?' (মহাশ্বেতা), 'ক্ষণপ্রাণ মানুষের ভঙ্গুর, রঙ্গিল অঙ্গীকার' (সর্বনাশ) ইত্যাদি নানা কবিতায় ক্ষণিকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবুও বোধ হয় কবিকে ক্ষণবাদী বলা ঠিক হবে না। কারণ যে রভসমধুর ক্ষণ অতীতে এসেছিল তাকে তো কবি মন থেকে বিসর্জন দিতে পারেন নি। এ-যেন সেই 'নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।' যে ছিল ক্ষণিকা, সে যে হৃদয়মন্দিরে শাশ্বতী হ'য়ে উঠেছে। 'The instant made eternity'—ব্রাউনিঙের কথা যেন কবি সুধীন্দ্রনাথেরও কথা হ'য়ে উঠেছে। তাই, কবি বলেন, 'তোমার ক্ষণিক প্রেমই অন্তিমের অব্যয় পারানি।' অমরার অমৃত-ক্ষণ বার বার তাঁর মনে আগুন জেলে তুলছে—'তবু চায়, প্রাণ মোর তোমারেই চায়।' ব্যথিত কবিচিত্ত অতীতের হারানো প্রেমের জন্য বারবার পরাজয় স্বীকার করছেন, 'সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে আমি ভুলিব না, আমি ভুলিব না' (শাশ্বতী)। এ-কবিকে ক্ষণবাদী বলব কি ক'রে? কবিতাগুলির মধ্যে বর্তমান বিরহের বেদনা অপেক্ষা অতীত মিলনের রসোল্লাসই প্রাধান্য পেয়েছে। কবির প্রেম উদ্ধত, অনাবৃত আবেগে তাঁর প্রিয়ার দেহ নিয়ে অলজ্জিত সম্ভোগে মেতে উঠেছিল। সেই সম্ভোগের

আশা আশঙ্কা, আনন্দবেদনা, হর্ষ রোমাঞ্চের প্রতিটি স্তর কবিতাগুলির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। 'মদমত্ত, আরণ্যিক আমার যৌবন'—সেই যৌবনের উন্মত্ত রভসলীলার প্রতিটি ক্রিয়া কবির ইন্দ্রিয়াসক্ত লেখনীতে ধরা পড়েছে।

'অর্কেস্ট্রা'য় সংস্কৃত কাব্য ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষণীয়। কবির মুক্ত কল্পনা ও চিত্রকল্প প্রয়োগে এই প্রভাব পরিস্ফুট। 'শিপ্রার অপর তটে নেমে আসে সুদীর্ঘ রজনী' (ভবিতব্য) আমাদের মনে সংস্কৃত কাব্যের অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলে। স্থূল বস্তু থেকে কল্পনারচিত সূক্ষ্ম ভাবলোকে স্মৃতিবাহিত পথে বিচরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবির ভাবানুগত্য স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। 'চপলা', 'মহাশ্বেতা' প্রভৃতি কবিতায় এ-প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। 'অর্কেস্ট্রা' থেকেই অপ্রচলিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ শুরু হয়েছে। শব্দগুলি অনেক ক্ষেত্রে একটু খাপছাড়া ভাবে কবিতার মধ্যে স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ, সাবলীল ও সুপ্রচলিত শব্দধারার মধ্যে হঠাৎ দু'একটি কষ্টকল্পিত উৎকট শব্দ উদ্ধত আত্মঘোষণার মতই যেন বিরাজ করছে। 'উল্বণ উল্লাস', 'উদীর্ণ', 'উন্মূলিত ক্রোকাস', 'পশউর্য়া', 'তুলাসাগ্রহৃত', 'চন্দ্র অলি', 'মির্মির' প্রভৃতি শব্দের কথা সকলের মনে পড়বে।

'ক্রন্দসী'র কবিতাগুলি ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে রচিত। অর্থাৎ, 'অর্কেস্ট্রা'র কয়েকটি কবিতা এবং 'ক্রন্দসী'র কয়েকটি কবিতা একই সময়ে রচিত। কিন্তু একই সময়ে রচিত হ'লেও উভয় কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতিগত মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। 'অর্কেস্ট্রা'র সেই ক্ষণস্থায়ী প্রেমের চিরস্থায়ী আর্তি 'ক্রন্দসী'র মধ্যে নেই। 'ক্রন্দসী'তে রূঢ় ও নিষ্ঠুর, হিংস্র ও উন্মত্ত জগতের দিকে কবি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। কবির মধ্যে কখনো অসহিষ্ণু প্রতিবাদ, কখনো মর্মান্তিক হতাশা আবার কখনো নিষ্ফল স্বপ্ন পরিলক্ষিত। কবিকে নৈতিবাদী, শূন্যতাবিলাসী ও অনিয়মপন্থী মনে হয় না। তিনিও আদর্শ সন্ধান ক'রে চলেছেন, 'স্থিতধী সঞ্জয় ডরায় না ব্যাধি, মৃত্যু, জরা, চিতার স্ফুলিঙ্গযোগে জীবনের দীপপরম্পরা জ্বালায় সে নির্বিষাদ নির্বাণের আগে' (সন্ধান)। কিন্তু কোথায় সে দুর্লভ আদর্শ! সেজন্য তাঁর হতাশাগ্রস্ত মন এক বিপরীতধর্মী নিষ্ঠুরতায় এবং সর্বাত্মক ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, 'হানো তীক্ষ্ণ সর্বনাশ, তীব্র ক্ষতি, বৈরিতা নির্মম, জুগুপ্সার শক্তি দাও, দাও মোরে নির্গুণ নির্বাণ' (প্রত্যাখ্যান)। মহাকালের নিষ্ঠুর আঘাতে কবিচিত্ত ক্ষতবিক্ষত। সকল আশা, স্বপ্ন কল্পনা আজ অন্তর্হিত। নিঃসঙ্গ কবিচিত্তের বিলাপ মর্মরিত হ'য়ে ওঠে। 'মিছে চাওয়া, মিছে এ-মিনতি, তোমার সংহার হতে নেই নেই কারও অব্যাহতি' (কাল)। তাই আজ বিলুপ্তির চিন্তায় কবি নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিয়েছেন, অতীতের জন্য কোনো গৌরব নেই, ভবিষ্যতের জন্য কোনো আশা নেই—'জগতের কোনও কাজে লাগেনি এ-অখ্যাত গতাসু' (অকৃতজ্ঞ)! কবি নিরীশ্বরবাদী নন, ভগবানের কল্যাণ-বিধানে তাঁর আস্থা। সেজন্য অসুর শক্তির উন্মত্ত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অক্ষম কবির কণ্ঠ আর্তনাদ ক'রে ওঠে, 'হায় ভগবান, হায় হায় ব্যর্থ ভগবান, তোমার অমিত ক্ষমা, সে কি অসুরের তরে' (প্রশ্ন)? কিন্তু তবুও এত বিশ্বাসের বিপর্যয় দেখেও কবি ভগবানের উপর আস্থা হারান নি, 'তুমি সত্য, তুমি ধ্রুব ন্যায়নিষ্ঠ তুমি ভগবান' (প্রশ্ন)। কবি স্বর্গ চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর চারদিকে দেখতে পেলেন নরকের বিভীষিকা।

'মানুষের মর্মে করিছে বিরাজ সংক্রমিত মড়কের কীট'—এই জগতে বেঁচে থাকার অর্থই হ'ল দুঃসহ জীবনযন্ত্রণা ভোগ—'অতএব পরিত্রাণ নাই। যন্ত্রণাই জীবনে একান্ত সত্য' (নরক)। জীবনের এই তিক্ত, বিস্বাদ অভিজ্ঞতাই কবিকে অনিবার্য ও দুঃখহারী মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। হতমনোরথ কবি ভাবেন, 'সত্য শুধু দুর্বার মরণ, বস্তুবিশ্ব ক্ষণস্থায়ী, শূন্য সনাতন' (ভাগ্য গণনা)। মানুষের বিকৃতি, ভ্রষ্টাচার ও লুব্ধ-হিংস্র আচরণ দেখে কবি জনসমষ্টি থেকে জনশূন্য প্রকৃতির আদিম কৌমার্যভূমিতে পলায়ন করতে চান—'রব না রব না লুব্ধ ক্ষুব্ধ বামনের এ-সমষ্টিবাদে', রবীন্দ্রনাথের মতই প্রকৃতির অন্তঃপুরে কবি শান্তি পেতে চান—'হে বসুধা, আমারে ফিরায়ে লহ মোরে' (মৃত্যু)। পলায়নী কবি কল্পিত স্বর্গলোকে সুরসুন্দরীদের উষ্ণ আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী—'যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা সুকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেলে অমৃতমদিরা, নীবিবন্ধ খুলে, শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতরুমূলে' (প্রার্থনা)।

'ক্রন্দসী'র কবিতাগুলিতে সচেতন শব্দপ্রয়োগ এবং ধ্বনিসাম্যবিশিষ্ট বাক্যের ব্যবহার লক্ষণীয়। কবির গুরু ও ভারী বিশেষণ পদ প্রয়োগের প্রবণতা এ-কাব্যে আরো স্পষ্ট। অনির্বেদ, উন্মথ, নিরিন্দ্রিয়, বমনবিধুর, দুর্হৃদ, বিনির্মোক, শটিত, নিঁনিগড়, মৃত্যু বিপ্রলব্ধ ইত্যাদি বিশেষণ পদের তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ উল্লেখ করতে হয়। অনুপ্রাসযুক্ত শব্দ সমষ্টির প্রয়োগে বাক্যের মধ্যে কবি কিরূপ ধ্রুপদী গাম্ভীর্য এনেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—'বয়স্থ বিশাল বপু বিস্তারিল বাধিষ্ণু বিচ্ছেদ', 'উন্মুখর বিনির্মোক আত্মার মর্মরে', 'উল্বণ রভসে নামে অনন্তের উন্মুদ্র অতলে', নিরতীত নৈরাজ্যের রূঢ় নিমন্ত্রণ', 'প্রমিতির বিষবৃক্ষে অমিতির অচিন্ত্য অভাবে' ইত্যাদি।

'উত্তর ফাল্গুনী'র বেশির ভাগ কবিতাই ১৯৩০ সালে লেখা, দু' একটি কবিতা ১৯৩২ সালের। তবে প্রথম ও শেষ কবিতা ১৯৩৭ সালে রচিত। এই কবিতা দু'টি যেন অন্য কবিতাগুলি থেকে স্বতন্ত্র। দীর্ঘায়িত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা দুটি লেখা, ভাষার মধ্যে শব্দাড়ম্বরের গাম্ভীর্য সমগ্র কবিতা দুটিতে ধীরগতি গাম্ভীর্যে মণ্ডিত ক'রে রেখেছে। 'উত্তর ফাল্গুনী'তে প্রেমের সূক্ষ্ম রোমান্টিক অনুভূতি পুষ্পগন্ধের মত কবিতাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এ-প্রেম যৌবনোত্তীর্ণ কবির চিত্ত থেকে উৎসারিত, এতে মিশে রয়েছে অতীত মিলনের রসোল্লাস কিংবা ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদের আশঙ্কা। এই কাব্যের প্রেমভাবনার মধ্যে রোমান্টিক স্বপ্নচারিতা, এবং আদর্শবাদী দৃষ্টি দিয়ে অমরার অমৃতসন্ধানের প্রয়াস সুস্পষ্ট। 'অর্কেস্ট্রা'র বলিষ্ঠ, আরণ্যক প্রচণ্ডতা এখানে নেই। এখানে রয়েছে কোমল চিত্তের করুণ ব্যাকুলতা, কম্পমান প্রত্যাশা ও রোদনভরা মিনতি। কবি তাঁর প্রিয়াকে কোথাও তিল তিল ক'রে তিলোত্তমা রূপে রচনা করেন (সংশয়), তার মধ্যে এক অতলান্ত রহস্য অনুভব ক'রে অবিরাম তাকে খুঁজে চলেন—'এই ভাবি বুঝিলাম, এই ভাবি কিছু বুঝি নাই' (ব্যবধান)। এক আদর্শলোকে—সব পেয়েছির দেশে কবি তাকে নিয়ে স্বর্গ রচনা করতে চান, 'নিয়ে যাব যেথা নেই দেশ-কাল। নেই ব্যাধি জরা, ক্ষয়-জঞ্জাল সত্য যেখানে স্বপ্নসুষমা' (প্রতিদান)। কবির প্রেম যখন প্রত্যাখ্যাত তখনও তিনি বিনা অভিযোগে নীরবে মনের মধ্যে সেই বিষাদ বহন করেন—'কিন্তু

তাতে বিষাদই শুধু আছে, তা ছাড়া কোনও যাতনা, জ্বালা নাই' (নিবৃত্তি)। মৃত্যুর কাছেও কবির শান্ত আত্মনিবেদন প্রকাশ পেয়েছে—'চরণে শরণ মাগি হে মরণ' (মরণতরণী)। কবির মনে আক্রোশ, ক্রোধ ও বিদ্বেষ নেই, আছে শুধু স্নিগ্ধ প্রীতি ও অপার ক্ষমা, 'জগতেরে ক্ষমা করে লভিয়াছে জগতের ক্ষমা (অননুতপ্ত)। 'উত্তর ফাল্গুনী'র শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে মৃত্যু-ভাবনা বারবার এসে কবির মনে এক ধূসর বৈরাগ্য, শান্ত নির্বেদ ও বিলুপ্তির রক্তিম আলোকে প্রেমের আস্বাদনা জাগিয়ে তুলেছে (দুঃসময়, জন্মান্তর, বিলয়, মহানিশা)।

'উত্তর ফাল্গুনী'র বেশির ভাগ কবিতাই স্বচ্ছন্দ ভাষায় এবং নির্দিষ্ট ছন্দবন্ধনে রচিত। রোমান্টিক স্বপ্নচারী প্রেমের উপযোগী কল্পনারঞ্জিত ও ইন্দ্রিয় রসাত্মক চিত্রের ব্যবহার কবিতাগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কবিতায় ব্যবহৃত দেহ-বর্ণনার অলংকৃত চিত্রগুলি কবি কোনো কোনো কবিতায় বেশি পরিমাণে ব্যবহার করেছেন (সংশয়)। জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গে দোলায়িত প্রেমভাবনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। কবির বিশিষ্ট শব্দ ও বাক্য প্রয়োগরীতি এই কাব্যেও কিছু কিছু দেখা যায়, যথা 'উল্বণ রভসে নামে অনন্তের উন্মুদ্র অতলে' (লঘিমা), 'স্মৃতির মিসরী বীজ মন্বন্তরে যথারীতি ম'জে' (শর্বরী), 'প্রাগুষার পাণ্ডুমুখে অনর্থের অপপাঠ লিখে' (প্রতিপদ), 'পৈতৃক প্ররোহে আজ পরিপ্লুত অজের দুহিতা'।

'সংবর্তে'র কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে। বেশির ভাগ কবিতাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। এই কাব্যের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক বিস্তৃতির মধ্যে কবিতাগুলির সীমানা প্রসারিত হয়েছে। যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা, শক্তিমত্ত জাতিগুলির আগ্রাসী লোভ, কুৎসিত জাতিবৈরিতা, সম্প্রসারণবাদী মতবাদের নিষ্ঠুর পীড়ন কবিকে আর্ত, অসন্তুষ্ট ও প্রতিবাদী ক'রে তুলেছে। এই কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে কবি বলেছেন, 'অথচ উক্ত যুদ্ধ যে-ব্যাপক মাৎস্যন্যায়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তার সঙ্গে পরবর্তী কবিতাসমূহের সম্পর্ক অকাট্য'। কবিতাগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী কাব্য 'ক্রন্দসী'র প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তবে 'ক্রন্দসী' ও 'সংবর্তে'র মধ্যে পারিপার্শ্বিক চেতনার দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। 'সংবর্তে'র মধ্যে যুদ্ধের সর্বগ্রাসী আঘাতে জাতিগত ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধের অমানবিক পরিণতির জন্য কবিচিত্তের খেদ ও অসন্তোষই বড় হ'য়ে উঠেছে। কবি সুন্দরের প্রশস্তি রচনা করবেন ব'লে প্রস্তুত হ'য়ে আছেন, কিন্তু বিদেশী শত্রুর আক্রমণে যে সব মানুষ বিব্রত, বিধ্বস্ত তাদের দুঃখ কবিকে বিচলিত করে (নান্দীমুখ)। আক্রান্ত মানবজাতির আকুল আর্তনাদে আজ বিশ্বের আকাশ কম্পমান, ভগবান কি এখনও অদৃশ্য ও নীরব থাকবেন? 'অদৃশ্য অম্বরে তবুও অদৃশ্য তুমি? নিরঙ্কুশ, নিঃসন্তান নিত্য মরুভূমি আস্তিকের পুরস্কার—প্রতিশ্রুত ভূস্বর্গ তর্কাতীত' (উজ্জীবন)। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আজ স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদ, লুব্ধ বিজিগীষা ও মত্ত ক্ষমতাদম্ভ আশ্রয় করেছে—'বুষের রহসে লুপ্ত লেনিনের মমি, হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রটস্কি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন, মৃত স্পেন, ম্রিয়মান চীন, কবন্ধ ফরাসীদেশ'—এই শোচনীয় বিপর্যস্ত জগতে ভগবান আজ মৃত,—'সে এখনও বেঁচে আছে কিনা, তা সুদ্ধ জানি না।' ১৯৪৫ নামক কবিতায় চলচ্চিত্রের মত তখনকার শক্তিকবলিত ও বিধ্বস্ত দেশগুলির চিত্র ফুটে উঠেছে। একনায়কত্বের আস্ফালন ও সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত

মৃত্যু কবিকে বিচলিত ও বিরস ক'রে তুলেছে—'কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে, মেদিনীমুখর একনায়কের স্তবে' (১৯৪৫)। আণবিক বোমার ধ্বংসলীলায় কবি আতঙ্কিত—'অণুবিদারণে শত সহস্র মানুষ হত, ব্যক্ত অভিব্যক্তিবাদের ফাঁকি' (প্রত্যাবর্তন)।

'সংবর্তে'র কবিতাগুলির মধ্যে ভাষা নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। কবি এই কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন, 'আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ, এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষা রূপেই বিবেচ্য। ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে লঘু-গুরু, দেশী-বিদেশী, এমন কি পারিভাষিক শব্দও আচরণীয় কিনা, সে-অনুসন্ধানও হয়তো কোনও কবিতায় রয়েছে।' যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট শব্দের ধ্বনিসাম্য একই বাক্যে লক্ষণীয়—'প্রনষ্ট পৃথ্বীর প্রান্তে তমিস্রার লজ্জাবস্ত্রে আজ', 'অগ্রগতি নিষ্কণ্টক, পর্যুষিত পাদ্যার্ঘ্য সহিত' ইত্যাদি। দুরূহ শব্দ নিয়ে কবির উৎকট বিলাস—'মাতরিশ্বা পরিভূ কবির কণ্ঠশ্বাস' (সংবর্ত), 'মুকুরিত মহাশূন্য, সমুদ্রের পিতা ও প্রতীক, দুরত্যয়, স্বস্থ, প্রগতিক' (জেসন)।

'দশমী'র কবিতাগুলি ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে লেখা। দশটি কবিতার সমষ্টি এই কাব্যগ্রন্থে কবি যেন বিদায়ের আগে তৃষিত চিত্ত নিয়ে প্রকৃতির সুধারস পান ক'রে যেতে চাইছেন। কবিতাগুলি সহজ চালে লেখা, ছন্দ অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত, শব্দ ব্যবহারেও দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দপ্রয়োগের প্রবণতা খুবই কম। প্রৌঢ় জীবনে বিদায়ের আগে মদমত্ত কামনার উষ্ণ আসব পানে তাঁর আগ্রহ নেই, কোমল অনুভূতি-সজল মুহূর্তগুলি আস্বাদনের স্পৃহাই তাঁকে বেদনবিধুর ক'রে তুলেছে। কবি অনুভব করেছেন—'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী' (প্রতীক্ষা)। নিঃসঙ্গতার নির্মোকে আবৃত হ'য়ে কবি মানুষ অপেক্ষা বিজন প্রকৃতির দিকেই তৃষ্ণাকরুণ দৃষ্টি দিয়ে তাকাতে পেরেছেন। 'খালি গোলাঘরে সারা ভাঙা হাট শুরু, পায়ে চলা পথে কে একাকী' (নৌকাডুবি)—এই একাকী পথিকের সঙ্গ কবি নিয়েছেন। কবি হেমন্তের বেলা শেষের সোনালী চিত্রে মগ্ন, কখনও বা নিরুদ্দেশের পথে একা তার তরণী ভাসিয়ে দেন (ভ্রষ্ট তরী)।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লে মনে হয় তাঁর সচেতন শিল্পবোধ ও স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশের মধ্যে যেন একটি সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্র কবিতার রসে নিগমগ্ন ছিলেন। এই সব সাহিত্য তাঁর অনুভূতি, চেতনা এবং শব্দ ও চিত্রকল্প প্রয়োগের উৎস অধিকার ক'রে ছিল। কিন্তু তাঁর সচেতন শিল্পপ্রচেষ্টা ছিল এই অধিকারকে ছাড়িয়ে একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও উদ্ধত আধুনিক শিল্পকর্মের ধারা প্রবর্তন করা। 'তন্বী'তে কবি তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু অন্যান্য কাব্যে অজ্ঞাতসারে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব চিহ্নিত ক'রে ফেলেছেন। তাঁর শেষ কাব্য 'দশমী'র মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির রস-আস্বাদনার সঙ্গে তাঁর নিজের রস-আস্বাদনার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। শব্দ প্রয়োগে বরাবর তিনি সংস্কৃতের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন। সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি ভালোভাবে জানা থাকার ফলে একই শব্দকে মূল ধাতুর সঙ্গে নানা প্রত্যয় প্রয়োগে নানা ভাবে রূপান্তরিত করেছেন। সমাসবদ্ধ ও যুক্তাক্ষরপূর্ণ বিশেষণ পদের

বহুল প্রয়োগে তাঁর ভাষার মধ্যে গাঢ়তা ও গাম্ভীর্য এসেছে। একই শব্দের প্রচলিত অর্থ উপেক্ষা ক'রে তিনি ধাতুগত অপ্রচলিত কোনো অর্থ হয়তো প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ধ্বনিসাম্যময় নানা শব্দ প্রয়োগেও তাঁর প্রবণতা দেখা যায়। একই বাক্যের অন্তর্গত দুই শব্দগুচ্ছের মধ্যে তিনি অনেক জায়গায় মিল এনেছেন। শব্দবিন্যাসের মধ্যেও তিনি বেপরোয়া অভিনবত্ব এনেছেন, তাই তাঁর বাক্য পড়বার সময় হোঁচট খেয়ে যেন চলতে হয়। যে-কোনো শব্দকে ক্রিয়া প্রত্যয় যুক্ত ক'রে ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করার দুঃসাহস তিনি দেখিয়েছেন। দুরূহ ও দুরুচ্চার্য শব্দের পাশে হঠাৎ কোনো হাল্কা তদ্ভব কিংবা বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় তাঁর ভাবনায় এবং শব্দ ব্যবহারে অতি দৃঢ়ভাবে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা : তার গঠনশিল্প

অশ্রুকুমার সিকদার

সুধীন্দ্রনাথ নিজেকে কবি হিশেবে মালার্মে-পন্থী বলে মনে করতেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও ভালেরি বুঝেছিলেন, মালার্মের কাব্যাদর্শের সব সূত্র মানা চলে না। বিশুদ্ধ কবিতা আয়ত্তের অতীত এক লক্ষ্যবস্তু। যুক্তিবুদ্ধিকে কবিতার জগৎ থেকে একেবারে নির্বাসন দেওয়া যায় না। মালার্মে শাশ্বতে বিশ্বাসী, সুধীন্দ্রনাথ একেবারেই নন। মালার্মের মিস্টিক অনুভূতিও সুধীন্দ্রনাথে নেই। মালার্মে ও তাঁর উত্তরাধিকারী প্রতীকী কবিরা যত্নের সঙ্গে কবিতায় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়কে এড়িয়ে চলতেন, সুধীন্দ্রনাথ তেমন কোনো ছুঁৎমার্গের পরিচয় দেন নি। ফরাশি প্রতীকীদের মতো তিনি মনে করেন নি যে তিনি কোনো নূতন ধর্মরহস্যের প্রবক্তা, পুরাতন অমৃতনিকেতনের প্রতিহারী, অনাগত নরনারায়ণের অগ্রদূত। তাঁদের মতো কোনো মহত্তর সুষমার পূজারী বলে তিনি নিজেকে গণ্য করেন নি, কবিতাকেও পরিণত করতে চান নি মন্ত্রে। কিন্তু এক ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথ সত্যই মালার্মের অনুগামী ছিলেন। সবাই জানেন, স্তেফান মালার্মে তাঁর চিত্রকর বন্ধু দেগা-কে বলেছিলেন, কবিতা ভাব দিয়ে লেখা হয় না, কবিতা লেখা হয় শব্দ দিয়ে। আর সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অম্বিষ্ট, আমিও জানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ…।'[১] তিনি বলেছেন, তাঁর কবিতাসমূহকে যেন শব্দব্যবহারের পরীক্ষারূপে বিবেচনা করা হয়।[২] চরণের প্রত্যেকটি শব্দকে তিনি স্বতন্ত্র ওজন ও মর্যাদা দিয়েছেন। 'মূল্যহীন সোনা হয় তব স্পর্শে, হে শব্দ-অপ্সরী'—এই চরণ সুধীন্দ্রনাথেরই। শব্দ ব্যবহারে বাস্তবিকই তিনি ছিলেন অতি সচেতন শিল্পী। বুদ্ধদেব বসুর কথায়, 'কথাকে তিনি ব্যবহার করেন, যেমন করে বাস্তুশিল্পী ব্যবহার করে ইষ্টক…।'[৩] সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠনের কথা বলতে গেলেই স্থাপত্যের তুলনা মনে পড়ে—তাঁর কবিতার সেই স্থাপত্য-কর্মের উপাদান শব্দ।

অবশ্য ব্যবহারেও তিনি অন্ধ মালার্মে-পন্থী নন। কারণ তিনি ছিলেন ধ্রুপদী স্বভাবের কবি। শিল্পের আভিজাত্যবোধে তিনি কাব্যের রূপে অর্জন করেছেন সংযম ও সুমিতির দুরূহ গুণ। যে-কালজ্ঞান ও ইতিহাসচেতনা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাও ধ্রুপদী লক্ষণ। ধ্রুপদী কাব্যাদর্শের কবির মতো অনুপ্রেরণায় তাঁর সামান্যতম আস্থাও ছিল না। ধ্রুপদী কবি ভাষার উপর স্বেচ্ছাচারী আধিপত্য করেন না, তিনি ভাষার ঐতিহ্যের সেবক হন। ভাষার ঐতিহ্যগত আইন ও নিষেধ মেনে নিয়েও তার মধ্যে শিল্পের সঙ্গত মুক্তি আবিষ্কার করতে পারেন একজন ধ্রুপদী প্রবণতার লেখক। সুধীন্দ্রনাথও এই সব বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েছিলেন; তিনি

জানতেন, 'ভাষার সঙ্গত শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া কাব্যের পক্ষে অসম্ভব।'[৪] তাই কবিতায় শব্দকে সম্মান দিতে গিয়ে তিনি মালার্মের মতো ব্যাকরণের বিপর্যয়, বাক্যের বিশৃঙ্খলা ঘটাতে রাজি হন নি। অবোধ্য ভাষার দুর্ভেদ্য পরিখা নির্মাণ করে তিনি কবিতাকে নিতান্ত ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ধ্যানের ব্যাপার করে তোলেন নি, তুচ্ছ প্রসাধন বা অলঙ্করণের স্তরে নামিয়ে আনেন নি। স্বভাবের এই ধ্রুপদী-প্রবণতার জন্যেই তিনি পুরোমাত্রায় মালার্মে-পন্থী হতে পারেন নি, যদিও জানতেন, 'কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ'।[৫] অবশ্য এ ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিক না হলেও, মনে করিয়ে দেওয়া ভালো যে, বহিঃপ্রকৃতিতে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ধ্রুপদী হলেও অন্তঃপ্রকৃতিতে তা সর্বাংশে রোমান্টিক। ধ্রুপদী স্থাপত্য সত্ত্বেও তাঁর কাব্যের ক্ষুধিত পাষাণে রোমান্টিক আর্তনাদের মুখরতা।[৬]

শব্দের ইঁট সাজিয়ে-সাজিয়ে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সংগঠিত। আর সেই শব্দের বেশির ভাগই তৎসম শব্দ—আর একজন দত্তকুলোদ্ভব কবি মধুসূদনের মতোই। সুধীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিশেষ করে যেগুলি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা, তার বেশির ভাগ শব্দ—ক্রিয়াপদ, সর্বনাম এবং অব্যয়গুলি বাদ দিলে—প্রায় সবই তৎসম শব্দ। সংহতি ও সুমিতির সন্ধানে ড্রাইডেন-প্রমুখ অগাস্টানেরা যেমন ল্যাটিনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তেমনি সুধীন্দ্রনাথ দ্বারস্থ হয়েছিলেন সংস্কৃতের। এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের 'কুক্কুট' কবিতা রচনার পটভূমি বিবৃত করা যায়। সজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' শালীন-অশালীন ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক সাহিত্যিকদের আক্রমণ করছিল, আর সেই 'শনিবারের চিঠি'-র মলাট ছিল মোরগ-লাঞ্ছিত। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ শালীনতায় এই সাহিত্যিক যুদ্ধ যথাসম্ভব এড়িয়ে চললেও, সমকালীন সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় কোনো কোনো প্রসঙ্গ যে সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না, তার উদাহরণ হিশেবে সজনে ফুল ও মুরগির উল্লেখ করেছেন। 'সাহিত্যের পথে' বইয়ের 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'কবিতায় প্রবেশ করতে সজনে ফুলের বিলম্ব হয়েছে এই কারণেই, তাকে জানি ভোজ্য বলে একটা সাধারণভাবে।...মুরগি পাখির সৌন্দর্য বঙ্গসাহিত্যে কেন যে অস্বীকৃত সেকথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে।' অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন এই সব কথার মধ্যে সজনীকান্ত ও 'শনিবারের চিঠি'-র প্রতি বক্র ইঙ্গিত আছে। সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু সজনীকান্ত-গোষ্ঠীর সমর্থক ছিলেন না। কিন্তু কোনো-কোনো প্রসঙ্গ আদপেই কবিতার বিষয় হতে পারে না, রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য তিনি মেনে নিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্ক করে তিনি প্রমাণ করতে চান, মুরগি নিয়েও কবিতা লেখা চলে। তারই ফল 'কুক্কুট' কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্কের ফলেই যে কবিতাটির জন্ম তার ইঙ্গিত আছে শেষ দুই চরণে—

শুচিগ্রস্ত সিদ্ধ কবি শুদ্ধ থাক আভিজাত্য লয়ে;
তুমি ধরো, হে অস্পৃশ্য, অখ্যাতের সহজ প্রণতি।

এই কাহিনীটি উল্লেখ করার কারণ, আমি দেখাতে চাইছি বিষয় যখন অনভিজাত তখনো ভাষার সুমার্জিত আভিজাত্য সুধীন্দ্রনাথ ত্যাগ করেন না। মুরগি নিয়ে কবিতা লেখেন, কিন্তু মুরগি হয়ে ওঠে কক্কুট। তৎসম শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দৈনন্দিনের উপর

টেনে দেন সম্ভ্রম ও শুচিতার পর্দা। এমন তৎসম শব্দ ব্যবহারেও তিনি কুণ্ঠিত নন, যেগুলি অপ্রচলিত আভিধানিক, এমন কি পারিভাষিক। যেমন—উল্বণ, তন্মাত্র, প্রমিতি, গৈবী, শটিত, ক্রন্দসী, বহিত্র, ঝাণ্টবূপ, অবচ্ছায়া ইত্যাদি, এবং ইচ্ছে করলেই তালিকা আরো বাড়ানো যায়। আর সংস্কৃতভাষায় যে সমাসবদ্ধতার প্রবণতা দেখা যায়, সেই প্রবণতাও আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথে সব চেয়ে বেশি। একটা সমাসবদ্ধ পদই কখনো-কখনো নিতে পারে চরণের একটি পর্বের জায়গা—হিতবুদ্ধিহন্তারক, ভবিতব্যভারাতুর। মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথ দুজনেই কৈশোরে বাংলা চর্চা করেন নি : তাই কি দুজনের কবিতায় তৎসম শব্দের এই প্রাধান্য! কারণ যাই হোক, ঘটনা এই। লক্ষ করি, দুজনের কবিতাতেই শেষের দিকে যেমন এসেছে বাক্‌ছন্দ, তেমনি তুলনায় কমে এসেছে তৎসম শব্দের পরিমাণ। মধুসূদনের ক্ষেত্রে 'বীরাঙ্গনা'-য় সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে 'উত্তরফাল্গুনী', 'সংবর্ত' ও 'দশমী'-তে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় শব্দনির্বাচনের প্রধান প্রেরণা অনুপ্রাসের দাবি। যে-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ, সেই ইন্দ্রিয় বেশির ভাগ সময়ে শ্রবণেন্দ্রিয়। জীবনানন্দের কবিতা দৃশ্যময়—ইমেজ উপমা-নির্ভর ; সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ধ্বনিময়—অনুপ্রাস-নির্ভর। এখানেও মধুসূদনের সঙ্গে মিল। অবশ্য মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে মিলবর্জনের ক্ষতিপূরণের জন্য অনুপ্রাসের উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন ; সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তেমন কোনো কারণ ছিল না। আর মধুসূদনের অনুপ্রাসের অতি-প্রকটতার অন্যায় সুধীন্দ্রনাথে কম ক্ষেত্রেই আছে। কিছু উদাহরণ নিলেই দেখানো যায় অনুপ্রাসের তাগিদ কী ভাবে তাঁর শব্দনির্বাচনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(১) প্রচারিল আচম্বিতে অধরার অহেতু আকৃতি
(২) অন্তরের অন্ধকারে অনঙ্গের লঘু পদধ্বনি
(৩) নশ্বর আশ্লেষে তার নিমেষের বিশ্ববিস্মরণ
(৪) শুধু গণ্ডে গ্রীষ্মের গুলাল
(৫) মমত্বের জঘন্য জঞ্জাল
(৬) তোমার নিবিড় নিঃশ্বাসবায়ু / করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু
(৭) নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ
(৮) শস্যের মিশরী শবে উপ্ত সম্ভাবনার সঙ্কেত
(৯) কৃপাজীবী ক্লীবের ক্রন্দনে
(১০) অতিক্রমি কাশবন সিতাম্বর শ্যামল আশ্বিন
(১১) অপ্রতিভ, অপাংক্তেয়, অনাহূত অতিথির মতো
(১২) অঘ্রাণের অত্যাচারে পাকা পাতা ঝরে তো ঝরুক
(১৩) চন্দ্রকলার চন্দনটীকা জ্বলে

দু-একটা ক্ষেত্রে অতি-প্রকট অনুপ্রাসের ব্যবহার শ্রুতিকটু লাগতে পারে—'বয়স্থ বিশাল বপু বিস্তারিল বর্ধিষ্ণু বিচ্ছেদ'। কিন্তু 'সিনেমায়' কবিতার উপাখ্যানসূত্রটি মনে রাখলে বোঝা যায় এখানে শ্রুতিকটুত্ব সম্ভবত কবির অভিপ্রেতই ছিল।

'তাঁর মন তার্কিকের, তাত্ত্বিকের, গদ্যের ন্যায়সম্মত ধারণা তিনি কবিতায় প্রয়োগ করেছেন'[৭]—সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই কথা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। তাই জীবনানন্দের ও

সুধীন্দ্রনাথের কবিতার দুর্বোধ্যতার চরিত্র আলাদা। জীবনানন্দের শব্দগুলি সবই পরিচিত, কিন্তু পরিচিত শব্দ দিয়ে তিনি গড়ে তোলেন এক সুররিয়াল অপরিচিত অভিজ্ঞতার জগৎ। সুধীন্দ্রনাথের শব্দগুলি অপ্রচলিত বলে দুর্বোধ্য, কিন্তু অভিধান থেকে সেই সব অপ্রচলিত শব্দের অর্থ জেনে নিলে, দেখা যায় তাঁর কবিতা প্রবন্ধের মতো ন্যায়ের পরম্পরায় সাজানো। তাঁর কবিতায়, তবু কিন্তু তাই হয়তো অবশ্য সুতরাং ফলত তথাচ অতএব—এই সব নৈয়ায়িক অব্যয়ের এত পৌনপুনিক ব্যবহার তাই আমরা পাই। গদ্যপ্রবন্ধের অনুচ্ছেদের মতো সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অনেক স্তবক আরম্ভই হয় এই সব নৈয়ায়িক অব্যয় দিয়ে। 'কস্মৈ দেবায়' কবিতার একটি স্তবকের শুরু—

ভালবাসি তোমারে **নিশ্চয়** ;
দাম্ভিক হৃদয়,
তোমার চরণচিহ্ন আজীবন বহিবে গৌরবে···।

ঐ কবিতারই পরবর্তী স্তবকের আরম্ভ—

জানি **তবু**
তোমার উদীর্ণ অভাবে
মোর শূন্য পরিপূর্ণ হয় নাই কভু···।

এবং ঐ কবিতারই শেষ স্তবকের আরম্ভ—

কিন্তু, হায়,
অতিমর্ত্য উন্মাদনা অচিরাৎ পলালো কোথায় ?

'সংবর্ত' গ্রন্থের অন্তর্গত '১৯৪৫' কবিতার ছয়টির মধ্যে পাঁচটি স্তবকের সূত্রপাতই এই রকম অব্যয়ের ব্যবহার দিয়ে। দ্বিতীয় স্তবক—'**অবশ্য** চীনে নেতারা স্বার্থপর' ; তৃতীয় স্তবক—'সত্য কি **তবে** সেদিন তোমার মুখে' ; চতুর্থ স্তবক—'**কিন্তু** জীবন এতই বিকল যে' ; পঞ্চম স্তবক—'**অতএব** হোক আহ্লাদে আটখানা' ; ষষ্ঠ স্তবক—'**তবু** জানি যবে জয় হবে বলেছিলে'।

স্তবকের আলোচনা করতে গেলে লক্ষ করি, রোমান্টিকরা স্তবকনির্মিতির বিচিত্র পরীক্ষায় সব সময় আনন্দ পেয়েছেন। আমাদের সেরা রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই পরীক্ষার অজস্র প্রমাণ আছে। এত বেশি প্রমাণ আছে যে বাঙালি সমালোচক[৮] প্রশ্ন তুলেছেন, স্তবকবৈচিত্র্যের পরীক্ষায়, সমস্ত ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের সামগ্রিক কৃতিত্ব বেশি, না একা রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব বেশি। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত নিকট সান্নিধ্যের সৌভাগ্য সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্রুপদী স্বভাবের জন্যে হয়তো এই বিষয়ে উৎসাহ বোধ করেন নি। বলাকা ছন্দে লেখা সুধীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি আপাতত হিশেব থেকে বাদ দিচ্ছি, সে-প্রসঙ্গে আলোচনা পরে হবে। 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের অন্তর্গত 'চপলা', 'উত্তরফাল্গুনী' বইয়ের অন্তর্গত 'প্রতিদান', 'মরণতরী', 'প্রশ্ন', 'সংবর্ত' বইয়ের অন্তর্গত 'নান্দীমুখ' 'উন্মার্গ', 'প্রত্যাবর্তন'—এই সব কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সুধীন্দ্রনাথের অন্য সব কবিতাই হয় প্রবহমান পয়ারে অথবা চতুষ্ক (Quatrain) স্তবক সাজিয়ে-সাজিয়ে লেখা। অক্ষরবৃত্ত চতুষ্ক এবং কিছু মাত্রাবৃত্ত চতুষ্ক সাজিয়ে তিনি সারাজীবন অনেক কবিতা রচনা করেছেন। কিছু আছে

মুক্ত চতুষ্ক (Open Quatrain), আর কিছু আছে বন্ধ চতুষ্ক (Closed Quatrain)। অক্ষরবৃত্ত মুক্ত চতুষ্কের উদাহরণ, 'অর্কেস্ট্রা'-র অন্তর্গত 'ভবিতব্য' থেকে—

তোমারে ভুলিব আমি, তুমি মোরে ভুলিবে নিশ্চয় ; ক
মদনের চিতানলে অনঙ্গের হবে আবির্ভাব ; খ
হারিবে অসংখ্য অলি যৌবনের অমৃতসঞ্চয় ; ক
সর্বস্বান্ত মর্মে শুধু পড়ে রবে অভেদ্য অভাব ; খ

অক্ষরবৃত্ত বন্ধ চতুষ্কের উদাহরণ, 'অর্কেস্ট্রা'-র প্রথম কবিতা 'হৈমন্তী' থেকে—

বৈদেহী বিচিত্রা আজি সঙ্কুচিত শিশিরসন্ধ্যায় ক
প্রচারিল আচম্বিতে অধরার অহেতু আকূতি ; খ
অস্তগামী সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি খ
অনিত্যের দায়ভাগ রেখে গেল রজনীগন্ধায় । ক

এই সব অক্ষরবৃত্ত বন্ধ বা মুক্ত চতুষ্কের নিদর্শনগুলির মধ্যে আমরা পেয়ে যাই সুধীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ আর এক ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্য। 'আঠারো মাত্রার পয়ারে আট-দশের নিখুঁত ভারসাম্য' 'পোপ ও ড্রাইডেনের অ্যান্টি-থিমিস-নির্ভর হিরোয়িক কাপলেটের কথা মনে করিয়ে দেয়।'[৯]

মাত্রাবৃত্ত মুক্ত চতুষ্কের উদাহরণ উদ্ধৃত করছি দুটো। ছয়-মাত্রার পর্বের উদাহরণ 'শাশ্বতী' থেকে—

সে-দিনও এমনি ফসলবিলাসী হাওয়া ক
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে ; খ
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া ক
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে । খ

পাঁচ-মাত্রার পূর্বের উদাহরণ দিচ্ছি 'উত্তরফাল্গুনী' বইয়ের অন্তর্গত 'সংশয়' থেকে—

রূপসী বলে যায় না তারে ডাকা ; ক
কুরূপা তবু নয় সে, তাও জানি , খ
কী মধু যেন আছে সে-মুখে মাখা ; ক
কী বরাভয়ে উদ্ধৃত সে-পানি । খ

তাঁর অপরিণত রচনা সংগ্রহ 'তন্বী'-তে মাত্রাবৃত্ত বন্ধ চতুষ্কের উদাহরণ আছে দু-একটি, পরিণত কাব্যে নেই। এবং লক্ষ করলে দেখা যাবে যে-কবিতাগুলিতে মনে হয় খানিকটা স্তবকনির্মিতিগত বৈচিত্র্য আছে, সেগুলিও আসলে দ্বিপদী ও চতুষ্কের সমাহার মাত্র। যেমন 'চপলা' কবিতায় দশ চরণের স্তবকে আছে প্রথমে ও শেষে দুটি চতুষ্ক আর মাঝখানে একটি দ্বিপদী (couplet)। স্তবকনির্মিতিতে এই বৈচিত্র্যের অভাবে আছে ঐতিহ্যের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের গভীর আনুগত্যের প্রমাণ।

এইভাবে দ্বিপদী এবং চতুষ্ক সাজিয়ে সুধীন্দ্রনাথের একুশটি মৌলিক সনেট রচিত। সুধীন্দ্রনাথ মোট একশ ত্রিশটি মৌলিক কবিতা লিখেছিলেন। সুতরাং সনেটের আপেক্ষিক পরিমাণ কম নয়। অন্যত্র একটি প্রবন্ধে—রবীন্দ্রনাথের সনেট সম্পর্কে আলোচনায় দেখিয়েছি[১০]—সনেটের নাম যদিও সঙ্গীত থেকে পাওয়া, কিন্তু তার মধ্যে ভাস্কর্য বা স্থাপত্যধর্মই প্রধান। সনেটের গঠন, সুধীন্দ্রনাথের সব কবিতার মতো, ন্যায়ের

পরম্পরায় প্রস্তুত। সনেটের তিনটি অংশ যেন সিলজিজমের তিনটি অংশের মতো ন্যায়ের সোপান পরম্পরায় সাজানো এবং তার মধ্যে রয়েছে একটি দ্বন্দ্বাত্মক বিন্যাস। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মতোই সনেটের শরীর সংস্থান ক্ল্যাসিকাল সংযমের ফল এবং তার আত্মা রোমাণ্টিক-ধর্মে আচ্ছন্ন। এই সব কারণেই নিশ্চয় সনেট ছিল সুধীন্দ্রনাথের প্রিয় ফর্ম—বারবার এই ফর্মকে তিনি আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন, 'তন্বী' থেকে 'সংবর্ত' পর্যন্ত। আর লক্ষ করার বিষয়.এই যে মোট একুশটি মৌলিক সনেটের মধ্যে পাঁচটি বাদে সবই শেক্সপীরীয় রীতির। অর্থাৎ প্রথমে তিনটি মুক্ত বা বদ্ধ চতুষ্ক এবং শেষে একটি দ্বিপদী, অর্থাৎ ৪ × ৩ + ২ = ১৪ চরণ। শেক্সপীরীয় রীতির সনেট যে সুধীন্দ্রনাথের কতো প্রিয় ছিল তার প্রমাণ 'প্রতিধ্বনি'-তে অন্তর্ভুক্ত শেক্সপীয়রের সনেটের অনুবাদ। সুধীন্দ্রনাথ আর কোনো কবির এতগুলি কবিতার তর্জমা করেন নি। দুজনেরই সনেটের বিষয় ব্যর্থ প্রেম, তবে শেক্সপীয়রের সনেটগুলি যেমন সনেট-মালায় সংগ্রথিত, সুধীন্দ্রনাথের গুলি তেমন নয়।

এখানে আমরা সুধীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উচ্চাশী কবিতা 'অর্কেস্ট্রা'-র গঠনগত আলোচনা সেরে নিতে পারি। ১৯৩৫ সালে 'অর্কেস্ট্রা' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হলে বুদ্ধদেব বসু যে সমালোচনা করেছিলেন তাতে এই বিশেষ কবিতাটির দু-তিনটি লিরিক 'বঙ্গগীতির স্বর্ণভাণ্ডারে স্থান পাবার যোগ্য' এবং এই কবিতার বিভিন্ন অংশগুলি সুধীন্দ্রনাথ 'নিপুণ শিল্পের সঙ্গে সন্বিত করেছেন' বলা সত্ত্বেও, এই কবিতার সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর মনে যেন সংশয় ছিল।[১১] পাশ্চাত্য সিম্ফনিক সঙ্গীতের সংগতি কবিতায় মূর্ত করাই যে তাঁর অভিপ্রায় এই কথা কবিতাটির প্রথম সমালোচকেরা ধরতে পারেন নি মনে করে সুধীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কবিতাটির গঠন বিশ্লেষণ করেন। 'তার সাত কাণ্ড যেমন গতিমূলক পরাকাষ্ঠার সোপান পরম্পরা, তেমনি প্রত্যেক পর্ব আবার ত্রিবিধ উপলব্ধির তাৎকালিক সমন্বয়। অর্থাৎ প্রতি ভাগে ঘুরে ঘুরে এসেছে রঙ্গালয়ের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য, শ্রাব্য ঐকতানের অতিশ্রুতি ব্যঞ্জনা আর শ্রোতৃবিশেষের সমবায়ী ভাবানুষঙ্গ…।' হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি কবিতাটির যে টেপ রেকর্ড করেছিলেন, বর্তমানে যা দুটি EP রেকর্ডে[১২] ধরা রয়েছে, তার কবিকৃত ইংরেজি ভূমিকায় 'অর্কেস্ট্রা' কবিতার গঠনের স্পষ্টতর ব্যাখ্যা আছে। এই কবিতা, 'an attempt to imitate through the media of various verseforms symphonic music as produced by many instruments. There are three strands running through the poem the first report what is happening on the stage, the second records what the music is saying and the third describes the associations in the listener's mind. The poem opens with the rise of the curtain and ends with its fall. The theme of the music is a changing day from before sunrise to well after midnight. And the hearer remembers a love affair. There are seven main movements with the three-fold variation in each.'

মোট বাইশটি অংশ আছে কবিতাটিতে। প্রেক্ষাগারের শেষ বর্ণনা নিয়ে প্রেক্ষাগারের বর্ণনামূলক কবিতা মোট আটটি, সঙ্গীতের বর্ণনামূলক কবিতা সাতটি, এবং সেই সঙ্গীত

নায়কের মনে যে স্মৃতি বা অনুষঙ্গ জাগিয়ে তুলেছে তার বর্ণনামূলক কবিতা সাতটি। প্রেক্ষাগারের বর্ণনামূলক প্রথম তরঙ্গগুলি সাজিয়ে নিলে আমরা প্রেক্ষাগারের অভ্যন্তরের পরম্পর ছবি পেয়ে যাই। এই অংশগুলি সব প্রবহমান অমিল মহাপয়ারে লেখা। প্রেক্ষাগারে শ্রোতা নায়কের পাশে 'সমাসন্ন নাগর-নাগরী'-র প্রণয়ের একান্ত প্রলাপ' বিরহী নায়কের মনে ব্যর্থ প্রণয়ের পূর্বস্মৃতি তীব্র বিষাদের সঙ্গে জাগিয়ে তুলেছে। দ্বিতীয় তরঙ্গগুলি সাজালে আমরা পেয়ে যাবো রঙ্গমঞ্চের বাদ্যসমবায়ে বেজে উঠছে যে-সঙ্গীত তার 'theme'—সেই থীম্ হচ্ছে পরিবর্তমান দিনরাত্রি। 'বিদায় মাগে মলিন শুকতারা', সেই ভোর থেকে 'আলোর সোনালী সুরা অঝোরে ঝরে' দ্বিপ্রহর তারপরে শেষে গভীর রাত্রি—'চন্দ্রের কৌস্তুভ, উরসে প্রকৃতির, মুগ্ধ নিদ্রায় স্তব্ধ'। তৃতীয় তরঙ্গের কবিতাগুলি সাজালে পেয়ে যাই পূর্বপ্রণয়ের আনন্দ-যন্ত্রণায় মেশানো স্মৃতিচিত্রগুলি—সেই বিদেশিনীর 'পাকা দ্রাক্ষার মদির কান্তি অঙ্গে', 'অবশেষে দাও দেখা / বুকে লাইলাক রাশি', এবং সব শেষে—

> মায়ামৃগী, তুমি বন্দিনী আজ আমার গেহে,—
> আমার অমরা আশ্রিত তব মানুষী স্নেহে।
> স্খলিত বসন উরুতে তোমার
> অনাদি নিশার শান্তি উদার ;
> নব দূর্বার চিকন পুলক ও-বরদেহে।
> বিশ্বের প্রাণ বিকচ আজিকে আমার গেহে।

সিম্ফনিক সঙ্গীতের প্রতিতুলনা সুধীন্দ্রনাথ কবিতায় আনতে চেয়েছেন 'various verseforms'—এর মাধ্যমে। সেই ছন্দোগত বৈচিত্র্য আছে 'অর্কেস্ট্রা' কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গে—আগেই বলেছি প্রথম তরঙ্গের সব কবিতাই প্রবহমান মিলহীন মহাপয়ারে লেখা। সেই সব 'various verseforms'-এর মধ্যে দুটি—'সপ্ততুরগ রবি আগত সহসা উদয় শৈল শিখরান্তে' এবং 'স্বর্গের মর্ত্যের সকল ব্যবধান লুপ্ত সনাতন রাত্রে'—স্পষ্টই কালিদাস-সত্যেন্দ্রনাথের মন্দাক্রান্তা ছন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সত্যেন্দ্রনাথের মহাক্রান্তা ছন্দের পরীক্ষা 'পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল' সুধীন্দ্রনাথকে যে খুব মুগ্ধ করেছিল তার প্রমাণ আছে 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধের মধ্যে তার সশ্রদ্ধ উল্লেখে। 'তন্বী' বইটি সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন, 'ঋণশোধের জন্য নয় ঋণস্বীকারের জন্য' ; আরো স্বীকার করেছেন সুধীন্দ্রনাথ—'অর্কেস্ট্রায় রবীন্দ্রনাথের একাধিক পংক্তি তো, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, এসে গেছেই…।'[১৩] সুধীন্দ্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথের বিপুল প্রভাব একটা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। আপাতত আমরা লক্ষ করি 'অর্কেস্ট্রা' কবিতার 'various verseforms'-গুলির মধ্যে বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দোস্পন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুধীন্দ্রনাথের—

> ললাট তোমার দিনের আশিসে দীপ্র ;
> নয়নে তোমার অমর প্রাণের লাস্য…।

মনে পড়িয়ে দিতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে…।'[১৪] সুধীন্দ্রনাথের—

> দখিন বায়ু আসি নির্ঝরিণী কানে
> ভনিল কোন্ কথা, তা শুধু সেই জানে।

চরণের ছন্দোস্পন্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত চরণে—

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া। (ক্ষণিক মিলন, মানসী)

ছড়ার ছন্দে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

হিরণ নদীর বিজন উপকূলে
আচম্বিতে পথের অবসান···।

এই গীতিকবিতার ছন্দোস্পন্দ স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
আমি তারে জিজ্ঞাসিলাম ডেকে···। (অনাবশ্যক, খেয়া)

সুধীন্দ্রনাথের—

আজি ফাগুনবেলার পরসাদ
যায় হারায়ে অকাল বাদলে···।

নিশ্চিতভাবে রবীন্দ্রনাথের নিচের চরণগুলির স্পন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত—

অতি চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ হে মোর, মরণ···। (৪৫ সংখ্যক উৎসর্গ)

আরো নিশ্চিতভাবে বলা যায় সুধীন্দ্রনাথের—

সন্ধ্যার রাগ ছিন্ন মেঘের অন্তরে
অঙ্গারমসি প্রেমালোকে করে পুণ্য···।

রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত—

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া···। (দুঃসময়, কল্পনা)

এইভাবে, সুধীন্দ্রনাথের 'স্বর্ণভারে তোমার মাথা লুটিছে মম ঊরুতে' কবিতার ছন্দের সঙ্গে দেখা যায় সাদৃশ্য আছে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী'-র[১৫] সঙ্গে।

শঙ্খ ঘোষের হিশেব অনুসারে সুধীন্দ্রনাথের একশ ত্রিশটি মৌলিক কবিতার মধ্যে নব্বইটি অক্ষরবৃত্তে, ত্রিশটি মাত্রাবৃত্তে এবং দশটি স্বরবৃত্তে লেখা।[১৬] লক্ষ করার বিষয় এই যে সুধীন্দ্রনাথের 'প্যাটার্ন-অনুরাগী'[১৭] ধ্রুপদী মন কখনোই গদ্যছন্দে কবিতা লেখায় উৎসাহ পায় নি। অধিকাংশ কবিতাই তাঁর অক্ষরবৃত্তে লেখা—বাংলার সব চেয়ে ঐতিহ্যসম্মত ছন্দে। তাঁর অক্ষরবৃত্তে লেখা কবিতাগুলির একটা বড় অংশ বলাকার মুক্তবন্ধ ধরণে লেখা। বলাকা ছন্দে আছে মুক্তি, আর সুধীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব স্বেচ্ছায় শাসনকে মেনে নেওয়া—সুতরাং মনে হতে পারে সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে বলাকার মুক্তধরণে কবিতা লেখা স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ হয়েছে। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, সুধীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলির ছন্দের বহিরঙ্গ ধরণ বলাকার মতো বটে, কিন্তু বলাকা ছন্দের গতি তাঁর কবিতায় নেই। সুধীন্দ্রনাথের অন্য কবিতার মতো বলাকা ছন্দে লেখা কবিতাতেও 'স্থিতির চেহারাটাই'[১৮] প্রধান।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।

তোমার ধরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে…।

রবীন্দ্রনাথের এই গতিময় ঝঞ্ঝামদমত্ত চরণগুলির পাশে সুধীন্দ্রনাথের যে-কোনো কবিতাংশ রাখলে দেখা যাবে সেই গতি অনুপস্থিত।

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈত্রিক বিধাতা
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।
যেন পূর্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি, ক্রীত, পদানত
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডূকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।
কমধবৃত্তির অহংকারে
ঢাকো ক্ষণভঙ্গুরতা। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে
আমিও ধরাকে যেন সরাজ্ঞান করি।
মর্যাদার ছিদ্রিত গাগরি
জোড়ে যেন বারংবার ডুবে আত্মপ্রসাদের স্রোতে…।

'সুধীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন অন্ত্যযতিবহুল'[১৯], এই তথ্য থেকেই শঙ্খ ঘোষ প্রমাণ করেছেন সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রবহমানতার অভাব। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-র তুলনায় সুধীন্দ্রনাথের বলাকা-ধরণের মুক্তবন্ধ কবিতায় যতিচিহ্নের ব্যবহারও বেশি—কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ির টানে অনেকটাই স্থিতিহীন তাঁর কবিতা। রবীন্দ্রনাথের বলাকা ছন্দে কবিতার মার্জিন অসমান, সুধীন্দ্রনাথের তুলনীয় কবিতাগুলির বাঁয়ের মার্জিন সমানভাবে সাজানো—এই মুদ্রণগত স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়েই তিনি যেন ইশারায় বলতে চেয়েছেন গতির টানে তিনি ঐতিহ্যের স্থিতি থেকে সরে যেতে চান না।

সুধীন্দ্রনাথের এই স্থিতিশীলতার, ঐতিহ্যানুরাগের প্রমাণ আছে এই ছন্দের ব্যবহার-ব্যাপারের অন্য বৈশিষ্ট্যে। মধুসূদন পয়ারের ছন্দোমুক্তি ঘটিয়েছিলেন অমিত্রাক্ষরে, সেই মুক্তিরই পরবর্তী স্তর রবীন্দ্রনাথের বলাকা ছন্দের উদ্ভাবনায়। সুধীন্দ্রনাথ ১৯৪০ সালে 'সংবর্ত' কবিতাটি পর্যন্ত নিজস্ব স্থিতিশীল ধরণে বলাকার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'সংবর্ত' কবিতার পরে দেখি রবীন্দ্রনাথের পয়ারের সাজ খুলে যে বলাকা ছন্দ

সৃষ্টি করেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ সেই পায়ারের সাজ আবার বলাকা ছন্দকে পরিয়ে দিচ্ছেন[২০]—অর্থাৎ ঘটাচ্ছেন একটা বিপরীত প্রবণতার সূত্রপাত, কখনো-কখনো বিরল ক্ষেত্রে। 'যযাতি' কবিতার অন্তত প্রথম স্তবক সাজানো উচিত ছিল নিম্নলিখিত বলাকা-সম্মত ধরণে—

উত্তীর্ণ পঞ্চাশ :
বনবাস
প্রাচ্য প্রজ্ঞাদের মতে অতঃপরে অনিবারণীয়,
আয়ুর সামান্য সীমা বাড়ায়েছে ইদানীং, তবু
এবং বিজ্ঞানবলে পশ্চিম যদিও
সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের প্রভু
বার্ধক্যের আত্মাপহারক।
আশ্রুত তারক···।

কিন্তু তাকে দেওয়া হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত ধরণে আঠারো মাত্রার অমিল প্রবহমান পয়ারের ছদ্মবেশ—

উত্তীর্ণ পঞ্চাশ : বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে
অতঃপর অনিবারণীয় ; এবং বিজ্ঞানবলে
পশ্চিম যদিও আয়ু সামান্য সীমা বাড়ায়েছে
ইদানীং, তবু সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের
প্রভু, বার্ধক্যের আত্মাপহারক। আশ্রুত তারক···।

বলাকার মুক্তির উপর পয়ারের সুনিয়ন্ত্রিত প্যাটার্ন পরিয়ে দেওয়া—কবিতার গঠনে এই প্যাটার্নের প্রতি অনুরাগ সুধীন্দ্রনাথের ধ্রুপদী মনেরই প্রমাণ।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন উদ্ভিদের অচিন্তিতপূর্ব নিয়মে সম্পাদিত হয় না। তার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি স্থাপত্যের মতো পূর্বপরিকল্পিত। বাস্তুশিল্পী যেমন ব্লু-প্রিণ্ট বা নক্সা তৈরি করে তারপর সৌধনির্মাণে হাত দেন, তেমনি এই কবির প্রতিটি কবিতার পিছনে আমরা এক পূর্বপরিকল্পনা বা নক্সার অস্তিত্ব অনুভব করি। ইঁটের মতো শব্দ সাজিয়ে সাজিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর কবিতার এক-একটি স্তবক। ন্যায়ের পরম্পরায় সেই স্তবকগুলি সাজিয়ে নির্মিত হয় তাঁর এক-একটি কবিতা। কবিতাগুলি যেন সঙ্গীত-বেদনায় মুখর এক-একটি কক্ষ। অনেকগুলি কবিতা নিয়ে এক-একটি কাব্যসংকলন—যেন এক একটি মহাল। সেই সব মহাল নিয়ে এই মহিমাময় কাব্যের সৌধ। একজন সমালোচক বলেছেন, 'অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী ও উত্তরফাল্গুনী, এ-তিনখানা বই আসলে একখানা বই, একই বইয়ের তিনটি অধ্যায়···যাকে বলে থীম্ সেটা অভিন্ন।'[২১] এই ভাবে যদি বলতে হয়, তাহলে 'সংবর্ত' ও 'দশমী'র নাম যোগ করে বলতে হয়, এই পাঁচখানা বই আসলে একখানা বই ; একই কাব্যপ্রাসাদের পাঁচটি মহাল। তার অভিন্ন থীম্—প্রেম।

এই বিষন্ন-বিধুর যন্ত্রণাময় প্রেমের কবিতাগুলি তীব্র নাটকীয়তায় আক্রান্ত। ধরণটা নাটকীয় স্বগতভাষণের। নায়ক বক্তা, নায়িকা কখনো নীরবে শুনছে, কখনো বাস্তবে অনুপস্থিত, স্মৃতিলোকে বিরাজমানা। টেলিফোনে এক তরফের কথা শুনে যেমন

অনুমান করে নেওয়া যায় অন্য পক্ষের কথা, তেমনি নায়কের স্বগতোক্তি থেকে এই কবিতাগুলিতে অনেক সময় অনুমান করে নেওয়া যায় নায়িকার বক্তব্য। সপ্তসিন্ধু পরপারে যে মিলন ঘটেছিল, তারই ক্ষুব্ধ স্মৃতিরোমন্থন এই স্বগতভাষণের বিষয়। নায়ককে যদি স্বয়ং কবি বলে না-ও ধরে নিই, তবু এই নায়ক যে কবিরই পার্সোনা, কবিরই মুখোশ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নায়কের মুখোশ পরে এক অপরূপ নাটকীয় দূরত্ব সৃষ্টি করে, কবি নিজেই কথা বলেছেন। 'সংবর্ত'-এর 'কঞ্চুকী' কবিতায় কবি প্রথমে বলেছেন, 'নাটকী নায়করূপে আজীবন দেখেছি নিজেকে', কিন্তু ঐ কবিতাতেই কবি পরে আবিষ্কার করলেন, 'নেপথ্যে আমার স্থান ; অন্ধকারে অধিকারী হাসে।' নিজেরই মুখোশকে মঞ্চে নায়ক হিশেবে জায়গা দিয়ে কবি চলে গেলেন নেপথ্যের অন্ধকারে, কিন্তু যে-স্বর আমরা শুনতে পেলাম তা নির্ভুলভাবে কবির। এই কবিতা-বলীতে তাই সাকার হয়েছে এক মর্মান্তিক আত্মনাট্য।

এই নাটকীয়তা প্রথমেই নজরে আসে কবিতাগুলির একটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য থেকে। বেশির ভাগ কবিতাই নাটকীয় ধরণে সম্বোধনে শুরু। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) প্রেয়সী, আছে কি মনে সে-প্রথম বাধ্বয় রজনী (অপচয়)

(২) হায়, গর্বান্বিতা, (কস্মৈ দেবায়)

(৩) অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ (মহাসত্য)

(৪) হায়, স্বপ্নসাথী,
শুধায়ো না সে-প্রথম প্রণয়কাহিনী। (অনুষঙ্গ)

(৫) চাই, চাই, আজও চাই তোমারে কেবলই। (নাম)

(৬) ক্ষমা ? ক্ষমা ? কেন চাও ক্ষমা ?
নিরুপমা
আমি তো তোমার পরে করিনি নির্মাণ
অভ্রভেদী স্বর্গের সোপান···। (মার্জনা)

(৭) আজি পড়ে মনে
মুখর নদীর তটে, মর্মরিত দেওদারবনে,
কোনও এক নিদাঘের জনশূন্য দিনে
সদ্যস্নাত দেহ রাখি তৃণে,
বলেছিলে অকপটে, হে লীলাসঙ্গিনী,
আপনার অতীত কাহিনী। (সঞ্চয়)

উপরের উদাহরণগুলি সবই 'অর্কেস্ট্রা' থেকে। এই বিশুদ্ধ প্রেমের কাব্যে সব সম্বোধনই প্রণয়িনীকে। অন্য বইতে পাই অন্যদের সম্বোধন।

(১) আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি ? (উটপাখী)

(২) ভগবান, ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলই ? (প্রশ্ন)

(৩) হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস। (প্রার্থনা)

'উত্তরফাল্গুনী' এবং 'সংবর্ত'-এ পাই আবার প্রেয়সীকে সম্ভাষণ করে নাটকীয় সূত্রপাত।

(১) তোমারে বোঝার বুদ্ধি আজও মোরে দেয় নি বিধাতা। (ব্যবধান)

(২) ওগো গরবিনী, মাত্র তোমার
যত উপবাসী নিত্য জুটে,
আমি তো তাদের একজন নই,
চাব না ভিক্ষা চরণে লুটে। (প্রতিদান)

(৩) সত্য কি বাসো ভালো? (প্রশ্ন)

(৪) তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে,
বসেছি বিজনে নব নীপবনে,
পুষ্পিত তৃণদলে। (নান্দীমুখ)

পাঁচটি কাব্যের পাঁচটি মহাল নিয়ে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসৌধ গঠিত। প্রেমই তাঁর প্রধান থীম্। নাটকীয় স্বগতোক্তির ধরণে, নাট্যধর্মের সংক্রমণে সেই থীম্ রূপায়িত। সুধীন্দ্রনাথ প্রেমের কবি—বিশ্ববীক্ষাও তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত প্রেমের পাত্রে বিধৃত। তাঁর সমস্ত কবিতাই প্রায় রাইনতীরবাসিনী বিদেশিনীর শেফালি অঙ্গুলি, নীল নয়ন এবং ধান্যসম কেলিপরায়ণ কেশদামের উদ্দেশে সমর্পিত। শেষ পর্যন্তও তার কথা, সেই দয়িতার, 'এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে' এবং 'সে এখনও বেঁচে আছে কিনা/তা সুদ্ধ জানি না।' এই কাব্য-সৌধ যেন শব্দে-রচিত এক প্রেমের স্মৃতিসৌধ॥

১ 'সংবর্ত'-এর ভূমিকা, কাব্যসংগ্রহ, ১৯৭৬, পৃ ১৭১

২ তদেব

৩ কালের পুতুল, ১৯৫৯, পৃ ৬৯

৪ স্বগত, ১৩৬৪, পৃ ৩১

৫ পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য

৬ বর্তমান লেখকের 'নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা' সুধীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়। এই প্রবন্ধের কিছু কথা বর্তমান নিবন্ধের প্রথমাংশে ব্যবহৃত হলো।

৭ বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, ১৯৫৯, পৃ ৬৯

৮ বুদ্ধদেব বসু, বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : 'মানসী', সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৩, পৃ ১৯০

৯ বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, ১৯৫৯, পৃ ৬৯

১০ রবীন্দ্রনাথের সনেট, সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প, ১৩৬৮

১১ কালের পুতুল, ১৯৫৯, পৃ ৬৫

১২ EMI—HMV/7 EPE 1137 ও 1138

১৩ 'অর্কেস্ট্রা'-র ভূমিকা, কাব্যসংগ্রহ, ১৯৭৬, পৃ ৪-৫

১৪ 'উৎসর্গ'-এর ১৭ সংখ্যক কবিতা

১৫ 'মদনভস্মের পর', 'কল্পনা'

১৬ ছন্দের বারান্দা, ১৩৮২, পৃ ৭৬

১৭ শঙ্খ ঘোষ, ছন্দের বারান্দা, ১৩৮২, পৃ ৭৯

১৮ তদেব, পৃ ৭৫

১৯ তদেব, পৃ ৭৬

২০ দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, ১৯৫৯, পৃ ২৫৮-৯

২১ বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, ১৯৫৯, পৃ ৭১

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার ভাবলোক

অরুণ ভট্টাচার্য

আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের গোড়ার দিকে অলঙ্কারশাস্ত্রকে বড় মূল্য দেওয়া হয়েছে, পরবর্তীকালে রসবাদকে, কিন্তু কবির সৃষ্টির অন্তরালে যে রহস্যঘন দিকটি রয়েছে—যে কাব্যলোকে তিনি নিরন্তর বাস করেন এবং যে-লোক থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারার মত সৃষ্টির পথ অবারিত হতে থাকে, এবিষয়ে কোন পরিচ্ছন্ন আলোকপাত হয় নি। বস্তুত শিল্পসৃষ্টির বিষয়ে যবে থেকে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি তখন থেকে এই বিষয়টির পর আমরা নিয়ত সযত্ন হয়েছি।

কোন কবির ভাবলোক বস্তুত বৃহৎ এবং সাধারণ কাব্যলোকেরই অন্তর্গত। কিন্তু এক একজন কবির মানসিকতা অনুযায়ী সেই বৃহৎ কাব্যলোক তাঁর কাছে বিশিষ্ট ভাবলোকে পর্যবসিত হয়। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ভাবলোক কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একারণে যে রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কাব্য-আন্দোলনে তিনি একটি স্বতন্ত্র পথের পথিক। সুধীন্দ্র-বিষ্ণু-সমর সেনের পথ মননশীলতার দিকটিই সূচিত করে, জীবনানন্দ-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব বা সঞ্জয় ভট্টাচার্য আমাদের প্রেম-প্রকৃতি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এক আবেগময়তার ঘন কুহেলীর কাছে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে অমিয় চক্রবর্তী অনেকটাই স্বতন্ত্র—বরং মরমীয়াবাদ তাঁর একান্ত সহজাত। এখানে হয়ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যপর্বের কবিতার কিছু আভাষ আছে তাঁর কাব্যে। আবার ঘর-ছাড়া বৈরাগীর মত সারা পৃথিবীতে তাঁর নৌকো নোঙর বেঁধেছে—দিকে দিকে তিনি মানুষের ইতিহাস-ভূগোলকে নানাভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং ঠিক একই সূত্রে আপন ঘরের প্রতি তাঁর আন্তরিক টান অনুভব করেছেন। এইসব নানাবিধ কারণে এই কবির কবিতায় এক অনন্য স্বাদ রয়েছে যা তাকে আধুনিক কবিতার পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করেও সকলের সঙ্গে এক আসনে আমি বসাতে পারছি না।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার সৃষ্টি-রহস্য একান্ত তাঁর নিজেরই. (হয়তো সব বড় কবির ক্ষেত্রেই তাই) যে ভাবলোক থেকে তাঁর কবিতার জন্ম আমি তাকে কয়েকটি ক্রমপর্যায়ে সাজিয়েছি। হাল আমলে তাঁর কবিতার বিচার আমি এভাবেই করতে চাই।

কয়েকটি কবিতার পংক্তি বিশেষ উদ্ধার করে আলোচনা শুরু করি।

গ্রাম পর্বে :

আফিমের খেতের বুকে মোটর থাম্‌ল,
ফুলে ফুলে নাম্‌ল
থম্‌থমে রঙিন আকাশ…
কার্স্‌রিন্ ফের্‌মান্ এর দূর পথে স্থিতি
ধুলোয় মাথা দুদণ্ডের অতিথি

অমিয় চক্রবর্তী তাঁর যৌবনেই জেনেছেন, এই পৃথিবীতে নানা দেশে, শুধুমাত্র দেশান্তরে তার দুদণ্ডের স্থিতি এবং তিনি অতিথি মাত্র। পৃথিবীর নানা প্রান্তে তিনি এভাবেই আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, এই ক্ষণ সত্যই মুহূর্ত-সীমা পেরিয়ে অনন্ত সময়কে ধরতে চেয়েছে তাৎক্ষণিক দেখা-শোনা থেকে কত কিছুই যে তিনি জীবনভর সঞ্চয় করেছেন—চোখ মেলে দেখেছেন, কান দিয়ে এই জগতের আশ্চর্য সব ধ্বনি শুনেছেন এই প্রত্যক্ষ, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কবির কাছে আন্তরিক সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

মধ্য পর্বে একটি কবিতা :

আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ ভুবন ভরে রাখুক,
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক ॥ (পারাপার)

পিঁপড়ে ক্ষুদ্রতার প্রতীক, বিরাট বিশ্বে তার স্থান অতি নগণ্য, কিন্তু সেই ক্ষুদ্রতম অণুই জগৎসংসারে অতীব প্রত্যক্ষ সত্য শুধু নয়, এই সৃষ্টি রহস্যের মৌল বিন্দুতেই এই অণুর একান্ত প্রয়োজন। ভুবন ভরে একটি ছোট পিঁপড়ের স্পর্শ, ধুলোর রেণু গায়ে মেখে তার ত্রস্ত ঘোরাফেরার মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীর সৌন্দর্য যেন স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

অমিয় চক্রবর্তীর পরবর্তীকালের কবিতা :

ওগো নারকল, সারি নারকল, একাকী সিন্ধুতীরে।
দিগন্ত ধ'রে দেখছো আয়না, এলেম যখন কূলে
তখনো স্বপ্নে চারুনীল ঢেউ মর্মরে রাশি রাশি
সেই গ্রেনাডিনে, দ্বীপ গ্রেনাডিনে, শূন্য তোমায় ঘিরে,
ওগো নারকল, একাকী সিন্ধু তীরে। (ঘরে ফেরার দিন)

এখানে অন্যতর একটি ছবি পাচ্ছি। সেই ছবি নারিকেল বনের। এই নারিকেল, বন অথচ একাকী। সিন্ধুতীরের বিস্তীর্ণ একাকীত্বের সঙ্গী এই নারিকেলবীথি। কবি এই নারিকেলবীথিকে আহ্বান করে কী কথা বলতে চেয়েছেন? আমরা সঠিক জানি না, অনুমান করতে পারি হয়তো।

এই তিনটি কবিতা কবির রচনাকালের তিনটি পর্বে বিধৃত। এমন নয়, এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর ভাবলোকের প্রতিচ্ছবি ধরে রেখেছেন, এমনি আরো অজস্র কাব্য-কণিকা তাঁর রয়েছে যা বাংলা কাব্যসাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার কাছে কিছু অজানা নয়। এই কবিতাগুলি আমার মনের ভাবলোকে বিশেষ অনুরঞ্জন সৃষ্টি করে, আমি মুহূর্তে একটি জগতে চলে যাই—যে জগতের আভাষ-ইঙ্গিত অনুজ কবি হিসেবে, আমি নিয়তই অনুভব করি। সে কারণে আমার এই দুর্বলতা এই সব এই ধরনের পংক্তিগুলির প্রতি।

আজকের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক এই ভূমিকার পর আমার একটি মৌল প্রশ্ন রয়েছে। সেটি সামান্য তুলে ধরি। 'ভাবলোক' এই শব্দটিতে 'ভাব' কথাটি বড়

সুন্দর, বড় চমৎকারিত্ব এনে দেয়, কিন্তু একই সঙ্গে পাশাপাশি বিভিন্ন অর্থ-সাযুজ্য বহন করে। অন্তত চার রকমের ঘনিষ্ঠ অর্থ এই একটি মাত্র শব্দে পাওয়া যাচ্ছে—যার সবগুলিই কোন কোন কবির কাব্যবিচারে প্রাসঙ্গিক। 'ভাব' অর্থে সত্তা বা অস্তিত্ব, ভাব অর্থে চিত্তবৃত্তি- বিশেষত, 'রস' বস্তুটির পরিপ্রেক্ষিতে 'ভাব' কথাটি আমরা কাব্য বা নাটক-বিচারে করে থাকি। 'ভাব' অর্থে অনুরাগ—একথা আমরা জানি এবং চতুর্থত জানি, 'ভাব' অর্থে ভাবনা, চিন্তা, কল্পনা ইত্যাদি—অর্থাৎ 'আইডিয়া' বা 'ইমাজিনেশন' এর স্বরূপ। যদিচ এই চারটি বিভিন্ন অর্থ 'ভাব' শব্দটিতে আরোপিত হয়েছে, তথাপি, একটু গভীর অনুধাবনে প্রতীয়মান হবে যে, অর্থের বিভিন্নতা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা বৃহৎ ঐক্য এবং ব্যাপ্তির রেখাকৃত এই অর্থগুলিকে ঘনিষ্ঠ এবং সন্নিবদ্ধ করেছে।

আমার সামান্য আলোচনায় দেখাবার চেষ্টা করবো, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার সীমারেখা কিভাবে 'ভাব' লোকের এই চারিটি পৃথক স্তরকে স্পর্শ করেছে একে একে, অথচ একটি সামগ্রিক কাব্যসত্যে পৌঁছেছে—যে কাব্যসত্য এই ভাবলোকেরই দ্যোতনা মাত্র।

'ভাব' যেখানে সত্তা বা অস্তিত্ব সেখানে কবি স্বভাবতই এক অন্তর্লীন গাঢ় অনুভূতিতে আচ্ছন্ন থাকবেন, এবং প্রশ্নটা যখন অস্তিত্বকে নিয়ে, তখন এক দার্শনিক চেতনা কবির মধ্যে নিরন্তর কাজ করবে। 'দর্শন' শব্দটির ব্যাপ্তি মনে রাখলে আমরা স্বীকার করব, প্রকৃত কবি অবশ্যই দার্শনিক। যে গভীরে দেখতে পারলে জগৎ-সংসারের সবকিছু অভিজ্ঞতার নিরিখ এক আত্যন্তিক স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেই দেখাই দার্শনিকের দেখা। সে-অর্থে হাল আমলে অমিয় চক্রবর্তীর চেয়ে কবি-দার্শনিক আর কে আছেন? অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে দার্শনিকের কথাটা চলে আসে। কিন্তু দুই কবির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে আকাশপাতাল। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর অধীত এবং অর্জিত দার্শনিক বোধকে কাব্যে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন—যখন তিনি বলেন. 'আমি বিংশ শতাব্দীর সমানবয়সী' তখন নিজেকে বিশ্বের পটভূমিতে সংস্থাপন করে এই যুগের দার্শনিক প্রতীতিকে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম করে বিধৃত করেন। অমিয় চক্রবর্তীর দার্শনিকতা একজন অনুভূতিপ্রবণ কবির অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত—এখানে দার্শনিকতা অধীত বা অর্জিত নয়—এই বোধ যেন সকালবেলার গাছের ফুল-ফোটা। তাই বৃষ্টির অবিরল শব্দে তিনি নিজেকে বর্ষার সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে পারেন। যখন :

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে

তখন অমিয় চক্রবর্তীর অনুভূতিমালা এরকম

যাই ভিজে ঘাসে ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্লবে
স্তম্ভিত দীঘির জলে, স্তরে স্তরে. আকাশে মাটিতে ॥
অন্ধকার বর্ষাদিনে বৃষ্টি ঝরে জলের নির্ঝরে···
সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষাজলধারে।

আবার দেখতে পাই, কবি এই বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের আকাশকে কি অনায়াসে নিজের স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন। রেখেছেন এক আত্মসত্তার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে

যুক্ত করে। এই আকাশ যদিও সীমাহীন তথাপি এ আকাশ নিতান্তই বাংলাদেশের, তাই কবির কাছে এত ঘনিষ্ঠ :

ছোটো আপন আকাশ···
নদী শাখানদী, পুকুর কচুবন, কলাবাগান, মাদার
দোপাটি ছোলাক্ষেত সর্ষে দূরে মাটির দেয়াল
কুমড়ো লতানো চাল
—বাংলা—
ছোটো ছোটো আকাশ ভর্তি

এত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ চিত্র গ্রাম-বাংলার একমাত্র জীবনানন্দে পাই, যদিচ এখানেও লক্ষণীয়, দুই কবির আবেদন পৃথক। 'বড়ো বাবুর কাছে নিবেদন' কবিতাটিতেও এমনই অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে, এমনই পরম আত্মীয়তা। এই কবি বারবার সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশীবার বিশ্বপরিক্রমা করেছেন। কিন্তু যখনই এই প্রবাসী কবি বাংলাদেশের কথা তুলেছেন তাঁর কবিতায় মনে হয়েছে, তাঁর সমস্ত সত্তায় বিধৃত হয়ে আছে আর এক রূপসী বাংলা—যে তার রূপ নিয়ে অরূপ নিয়ে মায়াময় স্মৃতি নিয়ে কবিকে যেন আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছে—এ এক ধরনের নস্ট্যালজিয়া হয়ত যা কীটস্ জেনেছিলেন গ্রীসের ভাস্কর্যে, শেলী জেনেছিলেন রোমের প্রাচীন ঐশ্বর্যে।

তাড়াও সংসার, রাখলাম
বুকে ঢাকলাম
জন্মজন্মান্তরের তৃপ্তি যার যোগ প্রাচীন গাছের ছায়ায়,
তুলসী-মণ্ডপে, নদীর পোড়া দেউলে, আপন ভাষার কণ্ঠের মালায়।

এর পরই দেখুন, কী আশ্চর্য চিত্র (যদিও স্মর্তব্য, সংস্কৃত আলংকারিকরা অনেকেই চিত্র-ধর্মিতাকে কাব্যে বড় স্থান দেননি বলে শুনেছি)—এ যেন ফোলিতোস্কোপিক, ছায়াছবির বিশিষ্ট স্বাদ রয়েছে এতে

থার্ডক্লাসের ট্রেনে যেতে জানালায় চাওয়া,
ধানের মাড়াই, কলাগাছ, পুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া,
মেঘ করেচে, দু-পাশে ডোবা···
গঙ্গার ভরা জল ; ছোটো নদী : গাঁয়ের নিমছায়াতীর
—হায়, এ-ও তো ফেরা ট্রেনের কথা।

এখানে 'নিমছায়াতীর' শব্দটি লক্ষ্য করুন—কী অসাধারণ ব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ।

গ্রামবাংলার এই নিরাভরণ রূপ আমাকেও তো বেশী কাছে টানে—'রূপসী বাংলার' চিত্রগুলির চাইতেও। কিন্তু এক সময় অমিয় চক্রবর্তীর কাছে, এই সমস্ত দৃশ্যপট ছাড়িয়ে এক তাৎক্ষণিক অনুভূতি বৃহৎ দার্শনিক সত্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখনই তাঁকে আমরা বড় কবির সম্মান দিতে বাধ্য হই। তিনি এমন কয়েকটি গভীর সত্যকে সহজে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন যা চিরকালের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, একান্ত আপন অনুভূতিতে

স্পষ্ট ; পরম অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড় যুক্ত। 'অভিজ্ঞান-বসন্ত' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করি,—আমার বক্তব্যের সমর্থনে :

তোমারও নেই ঘর
আছে ঘরের দিকে যাওয়া···
কোথায় চলেছ পৃথিবী।
আমারও নেই ঘর
আছে ঘরের দিকে যাওয়া।

এই কবির কাছে ভাব, অনুরাগ অর্থে, এক বিশেষ ভালোবাসার অঙ্গীকার যা জগৎ সংসারের সব কিছু আবিষ্ট করে রাখে। নরনারীর প্রেম যুবক-যুবতীর প্রেম, অথবা দেশপ্রেম এ সমস্তই অমিয় চক্রবর্তীর কাছে এক মানসিক উড্ডীন প্রস্থান—একে শেলীর মত ইথিরিয়াল আমি বলতে চাই না ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত, সার্বলিমেটেড তো বটেই। বুদ্ধদেব বসুর দেহজ কামনার বিন্দুমাত্র এই প্রেমের ভিত্তিতে নেই, জীবনানন্দীয় জগতের সুরঞ্জনা এখানে অনুপস্থিত। অথচ আছে দুটি ছেলে এবং মেয়ে—যে দেশ এবং কাল উত্তীর্ণ—চিরকালের প্রেমিক এবং এদের কথোপকথন শোনা যাক্, স্পন্দিত বুকে ঃ

ছুটে এসে হাতে হাত ধ'রে
ভরা চোখে চেয়ে বলে ছেলে—রিনি
তুমি কী আশ্চর্য
মৃদু গাঢ় স্বরে
মেয়ে বলে মাথা নীচু ক'রে
তুমি কী আশ্চর্য

এই ছোট্ট ঘটনাটির আবেদন কি সুদূরপ্রসারী : মনে পড়ে যায় এই কবিই অন্যত্র বলছেন 'তুমি যেন বলো আর আমি যেন শুনি' কবি এই কবিতাটির শেষে মন্তব্য করেছেন 'একটি কাহিনী'। আমি আর একটু যোগ করতে চাই এই কাহিনী কিশোর কৃষ্ণ কিশোরী রাধার, এই কাহিনী লায়লা-মজনুর, এই কাহিনী শেকস্‌পীয়ারের যুবক যুবতী। শোনা যাক প্রেমিক যুগলের মিলন দৃশ্যে, লরেঞ্জো তার প্রিয়তমা জেসিকাকে কি বলছে :

How sweet the moonlight sleeps upon this bank !
Here will we sit, and let the sounds of music
Creep in our ears : soft stillness and the night
Become the tounches of sweet harmony......
Such harmony is in immortal souls

(Merchant of Venice V. I.)

অমিয় চক্রবর্তীর এই সব কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতী আঁদ্রে বা রেনের ভালোবাসায় এক স্বর্গীয় সুষমার দীপ্তি আনে যা মর্ত্যের অবশ্যই অথচ মর্ত্যসীমা ছাড়িয়ে যেতে চায় এর অনুষংগ। এরা সব, কবির ভাষায় immortal souls, চিরদিনের—আমাদের কাছে এরা কখনো হারাবে না। লক্ষ্য করুন, ওপরের উদ্ধৃত কবিতাটির নাম দিয়েছেন

কবি 'চিরদিনের'। কিন্তু এই অনুরাগ শুধু কি মানব-মানবীর প্রেমেই নিহিত? নয়। কবির কাছে তাঁর প্রথম ভালোবাসা তাঁর ঘরের ছোট্ট আঙ্গিনা। এই পৃথিবীর যে প্রান্তেই তিনি থাকুন, অহর্নিশ তাঁকে ডাকছে কে যেন—তাঁকে যে যেতেই হবে সেই ছোট্ট ঘরের সীমানায়। শুনুন, কবি কি বলছেন—

পৌঁছতে হবেই বাড়ি
কেনা-বেচা শেষ করে
গান কণ্ঠে ভরে
ঘরে ফেরা দিনক্ষণে
দিয়ো পাড়ি।
দীপ জ্বলে ঘরের আঙনে।

বস্তুত এই কবিতাটির চিত্র তাঁর মনে এসেছে কংগো নদীর ধারে বসে, সুদূর আফ্রিকায়। তিনি ডাক শুনতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের তারা-জ্বলা গ্রামে ঝিঁঝিঁ'র ডাক; দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট ঘরের আঙিনায় সন্ধ্যাদীপ জ্বলছে। এভাবেই তাঁর প্রেম-বিষয়টি এক চৈত্যন্যের ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

বস্তুত এই ভাবেই তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁর ভাবলোক—অর্থাৎ ভাবনালোকে, কল্পলোকে, তাঁর আইডিয়া বা ইমাজিনেশনের জগতে। কত ছোট ছোট, মনে হয় সামান্য, অথচ পাঠকের কাছে অসামান্য চিত্র তুলে ধরে আমাদের নিমেষে কত দূরে নিয়ে গেছেন তিনি বার বার। আমরা মুহূর্তে সশরীরে চলে যাই উড়িষ্যার একটি ছোট্ট রেল স্টেশনে—যাকে বলা যেতে পারে ইংরেজীতে 'bodily transported'—'স্টেশনটির নাম মালতীপাটপুর' সেখানে এই

মালতীপাটপুর স্টেশনে
সোঁ সোঁ কি দূর সমুদ্রে?
সে নিস্তব্ধ স্টেশন এত নির্জন যে
দিনে দিনে ডাকে ঝিঁ ঝিঁ। তারপরই ঘণ্টা বাজে
ঢং ঢং ঢং। ফের ট্রেন চলে।

মুহূর্তে আবার দৃশ্যপট বদলে যায়। ধু ধু প্রান্তরের মাঝখানে বটগাছ, খররৌদ্রে সেই প্রান্তরে নিস্তব্ধ বটের পাশে কে?

হারানো ছড়ানো পাগল একলা
দাঁড়ালো মাঠের ধারে—
দূরে বুড়ো বট ঝিমন্ত জাগা
ঝাঁ ঝাঁ রোদ-লাগা…

মাঝখানে তারি হঠাৎ পাগল মুখ দেখে চেনে আয়নায়…
হারানো ছড়ানো পাগল।

এই পাগল কি নিছকই পাগল? কবি রহস্যাবৃত করে রেখেছেন চরিত্রটিকে। কল্পনার বাঁধ-ভাঙ্গা দূরন্ত বিস্তারে কবিতাটির রহস্যময়তা আমাদের মুগ্ধ করে। রহস্যের

জাল ছিন্ন করতে মন চায় না। এই রহস্যের আর একটি উদাহরণ পাচ্ছি 'বৃষ্টি' নামক দ্বিতীয় কবিতাটিতে

যার শুরু এরকম—

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

তারপর বর্ষার একটি অসাধারণ বর্ণনা—কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে কবিতাটির মূল কথা নেই। এক আদিম পৃথিবীর দরজার কাছে কবি আমাদের নিয়ে গেছেন ;

কী বিহ্বল মাটি, গাছ : দাঁড়ানো মানুষ দরজায়
গুহার আঁধারে চিত্র, ঝড়ে উতরোল
বারে-বারে পাওয়া, হাওয়া : হারানো নিরন্ত ফিরে ফিরে—
ঘন মেঘলীন
কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

কে সে যাকে আমি কিছুতেই আর পাবো না ? জানি না, এ রহস্যময়তা দিয়ে কবি আমাদের কোন কল্পলোকে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু পাঠক হিসেবে আমরা তৃপ্ত। এই কবিতা-পাঠে মনের দু কূল কানায় কানায় ভরে ওঠে।

এর পরও এত আলোচনার শেষেও শেষ প্রশ্ন থেকে যায় এই ভাবলোক কি আমাদের রসাভাস উপভোগ করতে দেবে না ? এই ভাবলোক—যা চিত্তবৃত্তিসঞ্জাত—আমাকে, পাঠককে, কোন সুস্থির জায়গায় পৌঁছে দেবে না ? এখানে, এই সব প্রশ্নে, শিল্পবিচার সম্পর্কিত দু'একটি কথা এসে পড়ে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, কবি নিজেই একটি কবিতার নাম দিয়েছেন 'শিল্প'—তা থেকে শুধুমাত্র একটি পংক্তি উদ্ধার করি। কবি বলছেন :

তাঁতে এনে বসালেম বুক থেকে রদ্দুরের সুতো।

আমার আজো মনে আছে, প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে, আমরা যখন যুবক ছিলাম, এই কবিতাটির প্রথম পংক্তি পড়ে বহুক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। কবিতাটির শিল্প কৌশলে শুধু নয়, অলংকারের বর্ণচ্ছটায় নয়,'শিল্প বিষয়টিকে বোঝবার জন্যই যেন এমন একটি পংক্তি কবি আমাদের চিরকালের জন্য উপহার দিয়েছেন অথচ কি অনায়াসে। একটি মাত্র পংক্তিতে আমি সে সময় শিল্পের বিষয়বস্তুর গভীরে কিছুটা যেতে পেরেছিলুম। মনে আছে।

এই একটি মাত্র পংক্তি বিশ্লেষণ করলে আমরা শিল্প-বিষয়ের মূল আধারটিকে জানতে পারবো। কিছুদিন পূর্বে অমিয় চক্রবর্তী এবং সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমি একটি নিবন্ধে লিখেছিলাম :

'সুধীন্দ্রনাথে যখন অনবরত একটি 'logical' মনোভঙ্গি কাব্যবিশ্লেষণে সচেতন ভূমিকা গ্রহণ করেছে, অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য ধারণা, সেখানে রহস্যঘন একটা সুদূর ব্যাপ্তির আলোকে চৈতন্যময়'। এই চৈতন্য বস্তুটির সন্ধান তাঁদের কাছেই একান্ত কাম্য যাঁরা শিল্পবস্তুকে হৃদয় থেকে উদ্বুদ্ধ দেখতে চান। কবির বুকের মাঝখানে রয়েছে সেই রদ্দুরের সুতো—রদ্দুর যখন আলোকের, চৈতন্যের সার্থক প্রতীক। সেই সুতো তাঁতে বসিয়ে কি করে নক্সা কাটবেন, কাপড়ের পাড় বুনবেন, সেই 'অনামী শিল্পের গায়ে' মর্ত্যের মাঙ্গলিক আঁকা থাকবে কোন এক বসন্তদিনে। কবির

শিল্পধারণায় এই চিন্তাটি তাঁর ভাবলোককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই তাঁর কবিতার শব্দগুলি এক আশ্চর্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ত জন্মলাভ করে।

দিনের কাহিনী যত রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়: আলো হয়, কথা যাই বলি।

শব্দের এই রহস্যময় রূপান্তরই অমিয় চক্রবর্তীর শিল্পসাধনার চাবিকাঠি। আর কোন কবিই তাঁর মত রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতায় শিল্পকে এত স্নিগ্ধলাবণ্যে মণ্ডিত করেন নি। তিনি হয়তো জানেন অ্যারিস্টটলের মতোই—A beautiful object depends on magnitude and order—যে order বা সুমিতি এবং সামঞ্জস্যের কথা রবীন্দ্রনাথও শিল্প বিষয়ে আমাদের শুনিয়েছেন—কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী আরও জানেন, ধ্বন্যালোকের বৃত্তিকার আমাদের যা জানিয়েছেন—ধ্বনির তিন রকম প্রতীয়মান অর্থ, বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি এবং রসধ্বনি। এই বক্তব্যের উপসংহারে আমি এটুকু যোজনা করতে চাই, এই কবি বস্তুধ্বনি এবং অলংকারধ্বনি উত্তীর্ণ হয়ে রসধ্বনিতে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন—যেমন শ্রীরূপ গোস্বামী আচার্য ভরত ব্যাখ্যাত আটটি রসের পরেও তাঁর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে একদা মধুর রসের সন্ধান করেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ভাবলোকের সন্ধানে আমি তাই শেষ পর্যন্ত রসবাদীদের দ্বারস্থ হয়েছি, কেননা যে কোন কাব্যের শেষ বিচার বোধহয় এই আনন্দ এবং আনন্দ-উদ্ভূত অমৃতত্বের সন্ধান। কবির নিজের কথা দিয়েই এই আলোচনা শেষ করি। অমিয় চক্রবর্তী বলছেন, তাঁর 'কবিতা-সংগ্রহ'-এর ভূমিকায়ঃ উপরে আকাশ, পাশে দিগন্ত। মাটি, ধরণী, বসুন্ধরা যে-নামেই হোক ভূমিস্পর্শ অভিযানই আমার স্বপ্রকাশ, তার অন্য ভাষা নেই। ভাষা নেই। সংসারে একটি মৃন্ময়ী বাসা বেঁধেছিলাম সেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা। যাবার সময় কত দূর জানি না, কিন্তু এই বেলা বলতে চাই ভূমিকা আমার শুধু এই। যা লিখেছি তারই মৃত্তিকায় গড়া প্রদীপ রইলো, আরো দু-সন্ধ্যা তুলসীতলায় জ্বলুক।

কবিতার নির্মাণ ঃ অমিয় চক্রবর্তী

সুমিতা চক্রবর্তী

কবিতার রূপনির্মাণের দিকটি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আলোচনার জন্য নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে থেকে সুষ্ঠুভাবে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। অতএব অধিকাংশ বিষয়ে বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত রেখে দু' একটি বিষয়ে আমি কিছু বিস্তৃত আলোচনা করার চেষ্টা করবো—যে বিষয়গুলি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাকে বোঝার জন্যে প্রয়োজনীয় বলে আমার মনে হয়েছে।

সাহিত্যে ভাষা ও ভাবকে বিযুক্ত করে দেখা যায় না। বিশেষ ভাবটির জন্য বিশেষ ভাষা একই প্রযত্নে জন্ম নেয়—এ আমরা বহুকাল থেকেই জানি। তবু আলোচনার সুবিধার্থে কিছুটা আলাদা যেহেতু করতেই হবে, আমি অমিয় চক্রবর্তীর মানসগঠনটি কবিতার গঠন প্রসঙ্গে পাঠকদের মনে রাখতে অনুরোধ করবো।

আধুনিককালের সংকটবোধকে অভিজ্ঞতার অঙ্গীভূত করেও কল্যাণধর্মী মানবিকতার শুভবোধে অমিয় চক্রবর্তী আস্থাশীল। বাংলা তথা ভারতীয়ত্বের সংস্কার এবং ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেও তিনি আধুনিক মানুষের আন্তর্জাতিক চেহারা, পরিচয় এবং বিস্তারে বিশ্বাসী। তাঁর স্বভাব শান্ত, কিছুটা অনুচ্ছ্বসিত ; আবেগ গভীর কিন্তু জমাট। মিলনবিরহে তো বটেই, বিক্ষোভেও তিনি তেমন উত্তেজিত হন না। সংযম তাঁর স্বভাবের মৌলিক উপাদান, তাই সংহতি তাঁর কবিতাব স্বাভাবিক লক্ষণ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সুস্মিত, পরিশীলিত, অসম্ভব মার্জিত- স্বচ্ছ, স-মনন। কখনো একটু ব্যঙ্গের মিশেল দেওয়া। তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। তিনি একজন বিশিষ্ট দার্শনিকও। একটু তাত্ত্বিক ধরনের নানা ভাবনা তাঁর মনে দৃঢ়মূল যা তাঁর কবিতাতেও স্বপ্রকাশ। সবশেষে তিনি একজন কালসচেতন কবি—আধুনিক-কাল যাঁকে কখনো ক্ষুব্ধ, কখনো চমৎকৃত করেছে এবং সব মিলিয়ে গভীরভাবে ভাবিয়েছে।

কবিতার রূপগঠনের তিনটি দিক—ভাব, ভাষা ও ছন্দ।

ভাষার প্রাথমিক উপাদান হলো শব্দ। আমরা জানি আধুনিক কবিদের শব্দচেতনা—শব্দবোধ খুব নিবিড় এবং তীক্ষ্ণ। বাহুল্যবর্জন করে শব্দের সমস্ত ব্যঞ্জনাটুকু তাঁরা প্রয়োগগুণে নিঙড়ে নেন , নতুন ব্যঞ্জনাও কখনো কখনো আরোপ করেন। এই অনিবার্য সুমিত প্রযুক্তি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সিদ্ধ। এমন কি তাঁর কোনো কোনো কবিতায় সংহতিটাই একটা ব্যঞ্জনা ; না-বলাটাই আশ্চর্যভাবে বলা। তাঁর অধিকাংশ কবিতায় বাদ দেবার মতো শব্দ পাওয়া দুরূহ। স্বল্পতম পরিসরে ব্যঞ্জনাকে বিস্তৃত

করার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। 'খসড়া'র 'কালোজলে' কবিতাটি জাহাজ যাত্রী একটি মানুষের কথা—প্রেম যার কাছে বেদনাবহ স্মৃতি—

চিনি কারে, সে কোথায় ?
নামব না ঘাটে।
দূরে ভেসে চলে যাও ছবি আঁকা পটে,
ভাঙো ঝোড়ো জল,
জাহাজ মরাল ॥

এখানে **কারে** এবং **সে** এই দুটি শব্দ ছাড়া কয়েক পংক্তি আগে **তোমার** শব্দটি একবার আছে। একশ শব্দের এই কবিতায় মাত্র তিনবার তিনটি সর্বনামের সাহায্যে অনুপস্থিত প্রেমিকার উল্লেখ, কিন্তু নিবিড়তা তাতে কমেনা। **সে কোথায় ?** এই দুটি শব্দ তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে উপস্থিত হয়, জাগিয়ে তোলে শূন্যতার বোধ। জাহাজকে বলেছেন মরাল। তুলনাটি সুন্দরভাবে ধরে দিয়েছে প্রেমের অনুষঙ্গ। রাজহংসের সঙ্গে সৌন্দর্য, প্রেম ও কামনার যোগ সাহিত্যিক ঐতিহ্য—গ্রীক পুরাণে আছে, মহাভারতে আছে, রবীন্দ্রনাথে ও ইউরোপিয় রোমান্টিক কবিদের লেখাতেও আছে। 'ঝোড়ো জল' সেই বিচলিত হৃদয়, ঝড় যাকে আশ্রয়হীন করেছে। 'ভাঙো' ক্রিয়াপদটির সাহায্যে বিষণ্ন মনকে দীর্ঘপথ বহন করে নিয়ে যাবার ক্লান্ত কষ্টকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর অমিয় চক্রবর্তী যেহেতু ভঙ্গুরতার মধ্যেও স্থিতিকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেন তাই তিনি জাহাজ-মরালকে একটা যাবার ঠিকানাও দিয়েছেন। 'ছবি আঁকা পট' অবশ্যই সেই দূরের পৃথিবী। সে আছে—কিন্তু এই মুহূর্তে সে কেবলই 'পটে লেখা ছবি'—নিরাসক্তির চোখে দেখা। এত কথা ঐ কয়েক পংক্তির মধ্যেই বিম্বিত। নতুন ব্যঞ্জনা আরোপের একটি উদাহরণ দিই। 'পালাবদল' কাব্যের 'ইতিহাস' কবিতার একটি পংক্তি—'সন্ধ্যার ধুলোয় তাড়াতাড়ি আজ বেলা নামলো/রাঙা ব্যাপ্ত লাল।' সন্ধ্যার বর্ণনায় একই অর্থবাচক দুটি শব্দ কবি ব্যবহার করেছেন, রাঙা এবং লাল। ঠিক পূর্বের পংক্তিগুলিতেই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কারখানার মালিক ও সাধারণ মানুষের ব্যবধানকে। তারপরেই **লাল** শব্দটা তীব্রভাবে আঘাত করে। বিশেষভাবে আজকের দিনেই **লাল** শব্দটির সঙ্গে যে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের অর্থ জড়িয়ে গেছে, **রাঙা** শব্দটিতে যা নেই—সেই অভিপ্রেত অর্থটি কবি সঠিক প্রকাশ করেছেন।

একজাতীয় নতুন শব্দ তৈরি করবার দিকে তাঁর বেশ একটু ঝোঁক আছে। 'তা' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষ্য—আপনতা, জীবনতা, ধন্যতা, পরনতা : 'ঈ' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ—চন্দনী, যৌবনী, মননী ; 'ইক' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ—আনন্তিক, আসন্নিক, মাননিক ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রায় সর্বদা সাদরগ্রহণে উন্মুখ সমালোচকও এই প্রবণতাটিকে একটু দ্বিধার মন নিয়ে দেখেছেন। বলেছেন—"যা ব্যাকরণদুষ্ট তাকে তখনই শুধু মেনে নেয়া যায় যখন তার দ্বারা কবিতার কোনো বিশেষ লাভ হচ্ছে..." আরো বলেছেন—"বিশেষ্য থেকে বিশেষ্য করবার কি কোনো দরকার আছে ?" (দ্রষ্টব্য : অমিয় চক্রবর্তীর পালাবদল, কালের পুতুল) আমার প্রথম কথা—শব্দগুলি কি সত্যিই ব্যাকরণদুষ্ট ? 'অপ্রচলিত' আর 'দুষ্ট' ঠিক এক নয়। আমরা বোধ হয় 'দুষ্ট' কথাটি এখানে ব্যবহার করতে পারি না। আমার দ্বিতীয় কথা—বিশেষ্য থেকে

বিশেষ্য করবার প্রয়োজন কি ভাষায় কখনও হয় না? অথবা বিশেষণ থেকে বিশেষণ? **জীবন** বলতে যা বোঝায়, **জীবনতা** বলতেও কি ঠিক তাই বোঝায়? সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য আছে। "তুমিহীন জীবনতা / তাতে রাঙা হয়ে বেলা নামে।" (প্রতিবেশী : পারাপার)—প্রিয়জনের মৃত্যুর পর জীবনমরণের সীমানা ছাড়ানো প্রশান্তির মোহানায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে নতুন ভালোবাসার চোখে দেখার কবিতা। এখানে 'জীবনতা' শব্দটির সাহায্যে কবি বোঝাতে চেয়েছেন জীবনের অবিচ্ছেদ্য লক্ষণসমূহ—এস্যেন্‌শিয়াল কোঅলিটি—যাকে ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনের ভাষায় বলি 'কনোটেশন'। 'তুমিহীন জীবনতা' এই বাক্যবন্ধটি অতঃপর তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। কবি যাকে 'তুমি' বলেছেন তার অস্তিত্ব এতদিন তাঁর জীবনের অঙ্গ ছিলো। এখন তারই অভাবে তাঁর জীবনের আসন্ন গোধূলি রক্তক্ষরণে রাঙা। জীবন রয়েছে কিন্তু **জীবনতা** নেই। তীব্র সুরে, ক্ষোভের সুরে এই কবি কথা বলতে ভালোবাসেন না। এরকম কোনো কোনো জায়গায় আমরা দেখতে পাই—মৃদুতাও মনের গভীরতম স্তরকে স্পর্শ করতে পারে। আরো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই কবিতাটিতে এই জাতের অনেকগুলি শব্দ ব্যবহৃত—অন্যতা, বঙ্কুতা, প্রসন্নতা ইত্যাদি। এবং শেষ দুটি পংক্তি—

এই ধন্যতার স্পর্শে তুমিও অচেনা অন্যযোগে
পাবে কি সে একই পরগতা?

আমার নিশ্চিতভাবে মনে হয়েছে অমিয় চক্রবর্তীর মনের গঠনে দার্শনিকতার ভাগটা বেশি বলে বস্তুভারহীন ভাবাত্মক 'তা' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি তাঁর কবিতায় বিশেষভাবে অর্থবান। আমি অবশ্যই বলবো না, এ-জাতীয় সবগুলি প্রয়োগই খুব সুন্দর হয়েছে, কিন্তু অবশ্যই বলবো যে এই শব্দগুলি কবিমানসের ইঙ্গিত সূক্ষ্মভাবে ধারণ করে।

শব্দগ্রহণ ব্যাপারে অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতোই তাঁর কোনো সংস্কার নেই তবে সচেতন মনের বিশেষ ঝোঁকটা কথ্যভাষার শব্দের দিকেই। তাঁরই কথায়—"যা মুখে বলি না তা কলমে লিখব না এরকম প্রতিজ্ঞার বিশেষ মূল্য আছে।...আমরা যথাসম্ভব ডুবাও শুকাও ইত্যাদিকে বর্জন করে ডুবোও শুকোও ব্যবহার করব। আমারে, তোমারে, নাই, মম, তব অবস্থাবিশেষে অনিবার্য হলেও বর্জনীয় মনে করাই ভালো।" (মার্কিন প্রবাসীর পত্র : সাম্প্রতিক) প্রয়োজনে কিন্তু তিনি সরাসরি সংস্কৃত বাক্যবন্ধ তুলে আনতেও দ্বিধা করেননি। 'একমুঠো'র 'মাঙ্গলিক' কবিতায় 'মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ', 'যুদ্ধের খবর' কবিতায় 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' ইত্যাদি।

দীর্ঘ প্রবাস এবং আন্তর্জাতিক দেওয়া নেওয়ায় বিশ্বাস তাঁর কবিতায় নিয়ে এসেছে অজস্র বিদেশী শব্দ। দুটি উদাহরণ দেখাবো যেখানে বিদেশী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার বিশেষ বিদেশী তাৎপর্যসহ।

উজ্জ্বল কাঁচে কাঁচে পণ্য সাজানো।
জিনিষের বিন্যাস ডলারে মাজানো॥
(মার্কিন : পারাপার)

কারো বাইবেল যুগে, কারো বৈদিকে,
কখনো মধ্যযুগে।
(মানুষের ঈশ্বর : দূরযানী)

অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায় ঈষৎ পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার প্রভাব আছে। যেমন ক্রিয়াপদে চলচে, মিলেচে ইত্যাদি। কখনো কখনো চন্দ্রবিন্দুর আগম ঘটেছে—চোখ বোঁজা। প্রথম বৈশিষ্ট্যটি রবীন্দ্র-প্রভাবিত হওয়াও সম্ভব। বললেম, করলেম জাতীয় কিছু প্রয়োগ আছে—স্পষ্টই রবীন্দ্রনাথ থেকে নেওয়া।

বাক্যগঠনে নানারকম নতুন বৈশিষ্ট্য আধুনিক কবিরা এনেছেন। কবিতার সুচারু মসৃণতার সঙ্গে কথ্যভঙ্গির মিশেল আছে যার ফলে কবিতায় পাই ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন, চিন্তা, তর্ক, রূঢ়তার স্বাদ। আছে বিপর্যয়—অর্থাৎ যে শব্দ যেখানে সাধারণত বসে না তাকে সেখানে বসানো। যেমন **চকিত গলি, দুরন্ত সিঁদুর, হাওয়া তমস্বিনী**। আছে দূরান্বয়—যেমন 'বিনিময়' কবিতায় 'তার বদলে পেলে' বলে শুরু করা। সেই 'তার' যে কার তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয় সমগ্র কবিতাটি পড়ার পর। আছে দ্রুতসরণ—অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্তর অব্যাখ্যাত রেখে পরবর্তী অনুভূতিতে দ্রুত চলে যাওয়া। যেমন—

দিগন্তে পাইন এক
বাংলা চোখ
থরথর প্রাণ (পিয়ানো : পারাপার)

কিংবা—

ত্রিশূল স্থির
সুরের শাদা চুড়ো
ভোরের দীর্ঘ স্বর্ণাভ নারকেল গাছ প্রাথমিক।
ঝরঝর ঠাণ্ডা সুরপাল সৌরভী বাগানে।
(একটি গান শোনা : পারাপার)

এসবই কমবেশি সব আধুনিক কবির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও সাধারণ গদ্যভঙ্গির মধ্যেই শব্দের অন্বয়গুণে একটা আশ্চর্য ব্যঞ্জনা তিনি বার করতে পারেন। যেমন—

"ধ্যানে নয়, টবে নয়, নয় মালায়, বোতলে গন্ধ ফোঁটায়
ফুলকে পাবো বোঁটায়।"
(বাস্তবিক : একমুঠো)

অথবা

"তখন দরজায় দেখলেম দাঁড়িয়ে—হঠাৎ
আছি সবাই, জানো ভাই,
—আর সবাই"
(রাত্রিযাপন : অভিজ্ঞান বসন্ত)

শব্দ বা বাক্যগঠন ছাড়িয়ে কবিতার চেহারাকে একটা রীতিগত সামগ্রিকতায় যদি দেখি তাহলে অমিয় চক্রবর্তীর কয়েকটি নিজস্বতা আমাদের এড়িয়ে যেতে পারে না।

প্রথমেই বলবো তাঁর কিছু কবিতা আশ্চর্যভাবে চলচ্চিত্রধর্মী। আধুনিককালে জীবনের অভিজ্ঞতা, অনুভব এবং বক্তব্য প্রকাশের ব্যাপারে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী

শিল্পমাধ্যম। এর রূপ মিশ্রিত। এখানে আমরা ছবি, গতি, ভাষা, ভাষা ছাড়াও অর্থময় আবহধ্বনি, সুর ও বর্ণের বিভিন্ন প্রচ্ছায়কে মিলিতভাবে গ্রহণ করি। চলচ্চিত্রের নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে যার সঙ্গে সাধারণ ভাবেই আধুনিক কবিতার কিছু মিল পাওয়া যায়। আপাতবিক্ষিপ্ত কাটা ছবির টুকরো সাজিয়ে অনুভূতির রূপ গড়ে গড়ে তোলার চেষ্টা, প্রতীক ব্যবহারের অপরিসীম তাৎপর্য, অবচেতনাকে ফোটাবার প্রয়াস—এসবই কবিতাতে এবং চলচ্চিত্রেও দেখা যায়। বোঝা যায়—একই যুগের মনোভঙ্গি ও সৃষ্টিশীলতা এই দুই শিল্পের ক্ষেত্রেই ক্রিয়াশীল। 'পারাপার' গ্রন্থের 'বৃষ্টি' কবিতাটি দেখা যাক—

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।
ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি নামে।
শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার।
লুটোয় পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী ;
আকাশে বিদ্যুৎজ্বলা বর্ষা হানে
ইন্দ্রমেঘ :
কালো দিন গলির রাস্তায়
কেঁদেও পাবে না তাকে অজস্র বর্ষার জলধারে।

একটি গানের সুরের মতো শুরু—কেঁদেও পাবে না তাকে—। তারপরই ছবি শুরু হয়ে যায়—ফাল্গুনের বিকেল, বৃষ্টি, শহরের রাস্তা, পাথর, জলস্রোত, তীব্র হাওয়া, আকাশে বিদ্যুৎ। প্রতিটি ছবি নড়াচড়া করে—বৃষ্টি **নামে** ; অন্ধকার **দ্রুত আসে** ; জল পাথরে **লুটোয়** ; মেঘ বিদ্যুৎ **হানে**। ছবিগুলি রং বদলায়। অন্ধকার ক্রমশ হালকা থেকে গাঢ় হয়, বিদ্যুতের সঙ্গে 'জ্বলা' শব্দটি উজ্জ্বল শুভ্রতার ছবি আঁকে ; তারপরেই **কালো** দিন। এবং তারপরেই সিনেমার থীম সং-এর মতো—'কেঁদেও পাবে না তাকে'···ইত্যাদি। ফ্ল্যাশব্যাক, জাম্প্‌কাট্‌ ও মন্‌তাজ্‌ পদ্ধতির সুন্দর প্রয়োগ বারবার তাঁর কবিতায় দেখা যায়। এ-প্রসঙ্গটি আর বিস্তারিত করবার অবসর নেই। আবার বলি তাঁর অনেক কবিতার অংশকে নরম, বর্ণময়, ইঙ্গিতবহ-ফিল্মের অংশের মতো আমার মনে হয়েছে।

তাঁর কবিতার রীতি চিত্রধর্মী বলা বাহুল্য। প্রকৃতি ও মানবসংসারের যে রূপ প্রতিনিয়ত চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয় তার প্রতি অমিয় চক্রবর্তী একান্তভাবে আকৃষ্ট। যা দেখেন তাকে পরিপূর্ণভাবেই তিনি দেখতে চেষ্টা করেন। ভালো মন্দ সব-কিছুকে ধরতে চান একটি সামঞ্জস্যের সূত্রে। চোখে দেখা তাঁর কাছে বড়ো মূল্যবান, বড়ো তাৎপর্যময়। এ-প্রসঙ্গে একটি কথা বোধ হয় বলা উচিত। বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি প্রবন্ধে (অমিয় চক্রবর্তীর পালাবদল : কালের পুতুল) বলেছেন—তাঁর কবিতায় একটি আশ্চর্য 'বৈদেহিকতা' ব্যাপ্ত হয়ে আছে। বলেছেন 'রক্তমাংসের আক্রমণ' তাঁর কবিতায় সবচেয়ে কম। প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়লে বোঝা যায় বুদ্ধদেব 'শরীরের বর্ণনা' অর্থেই 'দৈহিকতা' এবং তার অনুপস্থিতিকেই 'বৈদেহিকতা' বলেছেন। তাঁর সঙ্গে আমি এখানে একমত। কিন্তু ঐ লোভনীয় 'বৈদেহিকতা' শব্দটি এখন অমিয় চক্রবর্তী প্রসঙ্গে যত্রতত্র ব্যবহার হয়। তাতে আমার আপত্তি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে অর্থে

বৈদেহিকতার ব্যাপ্তি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় কখনই সেভাবে নয়। রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়চেতনার স্তরটি সরাসরি অতিক্রম করে বিমূর্ত ভাবময়তাকে প্রকাশ করতে পারতেন। অমিয় চক্রবর্তী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোখে দেখার স্তর পরপর মূর্ত করে গেছেন। তাতেই ভাবটি ফুটেছে। চোখ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপক ব্যবহারই তাঁর কবিতায় চিত্রধর্মের প্রাধান্য এনে দিয়েছে। এক কথায় তাঁর কবিতাকে 'বৈদেহিক' বলে দেওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। তাহলে অজস্র কবিতায় তিনি পৃথিবী ও পারিপার্শ্বিকের যে শরীরী ছবি এ'কেছেন তাকে উপেক্ষা করা হয়। রক্তমাংসের আক্রমণটাই শুধু দেহ তো নয়। চোখে দেখি, কানে শুনি, চামড়ায় স্পর্শ অনুভব করি—এগুলিও তো দেহেরই ব্যবহার।

চিত্রণপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গেই ইম্‌প্রেশনিজমের কথা এসে যায়। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় আবির্ভূত এই শিল্পান্দোলন সবদেশেই আধুনিক সাহিত্যকে নাড়া দিয়েছে। এর মূল কথা হল—বস্তুনিষ্ঠ চিত্রণরীতিকে অস্বীকার করে শিল্পীর মনে বস্তুর যে মন্ময় প্রতিফলনটি আভাসিত হয় তাকে সেভাবেই প্রকাশের চেষ্টা করা। অমিয় চক্রবর্তী এই রীতির ভক্ত বলে মনে হয় না। কোনো দৃশ্য বা বস্তুকে স্বরূপে রেখেই তার চারিদিকে একটি মনোময় আভা জড়িয়ে দিতে তিনি চেষ্টা করেন। একে ইম্‌প্রেশনিস্টিক রীতি বলা যায় না। তবু কোথাও কোথাও এই রীতির কিছু ব্যবহার আছে। যেমন 'খসড়া'-র 'কুয়োতলা' কবিতায় তাঁর কুয়োর চেহারা হলো—

"চোঙ। কালো ছলছলে তল ; উপরে চাকতি, শূন্য রঙা, 'অভিজ্ঞান বসন্তের' 'অয়ন' কবিতায়" সমুদ্রের বর্ণনা—

'আলো নীল, চূর্ণ সবুজ-শাদা, মেঘছোঁওয়া,
কালো, বাঁকা চন্দ্রিত,
রৌদ্র তরঙ্গচূড়, উদ্‌ভ্রান্ত ···।'

অনেকের মতে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার গঠনে মাঝে মাঝে একটি দোষ দেখা যায় যাকে বলে 'ক্যাটালগিং'। বস্তু বা বিষয়ের তালিকা-দৈর্ঘ্য প্রায়ই অ-কাব্যিক হয়ে দাঁড়ায়। এই অভিযোগ মোটামুটি সত্য। কিন্তু আমি বলতে চাই যে-কারণে তাঁর কবিতায় চিত্রধর্মের যাথার্থ্য দেখা যায় সেই কারণেই এই 'দোষ' বা বৈশিষ্ট্য তাঁর কবিতায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। পৃথিবী তাঁর সামনে যে রূপ নিয়ে দেখা দেয় তা তাঁর কাছে এত মূল্যবান যে তার থেকে কাটছাঁট করতে তিনি পারেন না। 'সাম্প্রতিক' গ্রন্থের 'কাব্যের ধারণাশক্তি' নামের প্রবন্ধটি থেকে তাঁর কথা একটু উদ্ধার করছি—

"পড়ন্ত রোদের একটি গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে গেল অনেক কিছু ; পানের দোকানে সবুজ পান, সোনালী ডিবে, ঝিলমিলে ঝোলানো আয়না, দোকানের লাল টালির উপরে চুপ করে বসেছে কাক।···কী বলতে চায় জানি না, কিন্তু এই একটি সমগ্র রচনা,···ছবির ঘেরে অহৈতুক একতা।···এর রহস্য বিষম ছন্দে ধরা দিতে চাইল।"

তাহলে দেখছি তিনি যা কিছু দেখছেন সবই তাঁর প্রবল সৌষম্যবোধের সংগতিতে মসৃণভাবে মিলে যাচ্ছে। মনে প্রাণে তিনি এই সংগতির, এই অহৈতুক একতার কবি।

অতএব ক্যাটালগিং হয়েছে বলে আমরা অ-খুশি হলেও তাঁর পক্ষে যা দেখেন তার তুচ্ছতম খড়কুটোও বাদ দেওয়া সম্ভব হয় না।

আরো একটি গঠনরীতি আধুনিক কবিতায় এসেছে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত থেকে। মনের বিভিন্ন স্তর-সম্পর্কিত ধারণাটি আধুনিক কবিরা কবিতার নির্মাণশিল্পে প্রয়োগ করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে কাগজে কলম ছোঁয়ানোর সময়ে আবেগ সচেতন স্তরেই থাকে। কিন্তু মগ্নচেতনা ও প্রাক্‌চেতন স্তরের স্বীকৃতির ফলে কবিরা মনের গভীরে নিহিত অনেক অ-স্পষ্ট, আপাত সংযোগছিন্ন এলোমেলো ভাবনাকে লিখে ফেলতে সাহসী হয়েছেন। যার ফলে জটিলতা একটু বেড়েছে ঠিকই, সত্যতাও একটু বেড়েছে—আপাত অর্থহীন টুকরো জুড়ে জুড়ে একটি আবেগবলয় সৃষ্টি করা কবির পক্ষে সহজ হয়েছে। পাঠকের পক্ষেও সম্ভব হয়েছে সেই অনুভূতির অংশীদার হওয়া। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা থেকে একটি উদাহরণ—

অঘ্রাণ ধান-খুশি সোনালি / প্রসন্ন মেঘ,
বিষণ্ণ পুকুর জলে চাঁদের ছায়া, ডোবা চাঁদের ফালি ;
মা কথা কননি, আমার মা,
ডালটা কাটতে হবে পুরোনো শিশুগাছের,...

(সংসার : একমুঠো)

চারটি ছাড়া ছাড়া ছবি। প্রথমটি খুশির, দ্বিতীয়টি বিষণ্ণ। হঠাৎ সম্ভবত হারানো মাকে মনে পড়া। তার পরেই কাজের চিন্তা—সব মিলে সংসার।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ব্যঙ্গের রীতির কথা বলেছেন কেউ কেউ। এই ব্যঙ্গ কিন্তু প্রায় কখনই কাউকে আঘাত করতে ইচ্ছুক নয়। ঈষৎ লঘু, তির্যক ভঙ্গিতে একটা জীবনবোধের উপস্থাপন। যেমন সাবেকি, চেতনস্যাকরা, গন্তব্য ইত্যাদি কবিতায় দেখা যায়।

আন্তর্জাতিক আগ্রহকেও আমি তাঁর কবিতার একটি রীতিই বলবো। চিত্ররচনা, শব্দপ্রয়োগ, অনপুঙ্খের ব্যবহার এবং কবিতার ভাবের ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস—সব মিলিয়ে তাঁর কবিতায় ইউরোপের যে কোনো দেশ বা এশিয়ার অংশবিশেষের রূপ ফুটে ওঠে। এটাও একটা নতুন স্বাদ—নতুন রীতি যা অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা যায়।

বাংলার লোকসাহিত্য, বিশেষত লোকসঙ্গীত ও লৌকিক সংস্কৃতিও তাঁর কবিতার কায়াগঠনে সাহায্য করেছে। ছড়া, বাউলগান ইত্যাদির কথা মনে পড়ে তাঁর অনেক কবিতা পড়লে। যেমন 'খসড়া' কাব্যের 'নাগরদোলা', 'ঠারেঠোরে' ; 'একমুঠো' কাব্যের 'গন্তব্য' , 'মাটির দেয়াল'-এর 'ঘুমের ঘোরে'। এই কবিতাগুলির বিষয়বস্তুও অনেকটা লোকসঙ্গীত ও বাউলগানের মতো—মৃত্যুর অনিবার্যতা, মনের রহস্য, জীবনের ক্ষণিকতা ইত্যাদি। বিশেষ করে বাঁকুড়া, বীরভূম অঞ্চলে যে ধরনের গান ও ছড়া বেশি শোনা যায় তাই তাঁর কবিতায় আরোপিত।

তাঁর কবিতার স্তবকনির্মাণ লক্ষ্য করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে স্তবক গঠনের চেয়ে এক একটি পংক্তিকে বাজানোর ও সাজানোর দিকেই তাঁর মন বেশি। দুই তিন বা

চার পংক্তির বহু ছোটো ছোটো স্তবক তিনি রচনা করেছেন যেগুলি হয়তো একটি স্তবকেও লেখা যেতো। প্রসঙ্গত আমার মনে হয়েছে—তিনি খুব ছোটো পংক্তি লিখতে ভালোবাসেন। ভালোবাসেন একটি পংক্তির দু'পাশে এবং ওপরে নিচেও জায়গা ছেড়ে রাখতে। সে-জন্য তাঁর স্তবকনির্মাণ খুব গাঢ় নয়। অ-স্পষ্টভাবে দু'একবার ভেবেছি—ভালো ছবির চারিদিকে যেমন শূন্যতার অবকাশ রাখা জরুরি—তাঁর চিত্ররূপময় পংক্তিগুলির চারিদিকেও হয়তো সে ভাবে জায়গা ছেড়ে রাখা তিনি দরকার মনে করেছেন।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় উপমা এবং চিত্রকল্পের ব্যবহার সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলি। উপমা বা চিত্রকল্পের মিল বা পার্থক্য সম্পর্কিত বিতর্ক আমার মনে হয় অপ্রয়োজন। উপমা ও চিত্রকল্পের পার্থক্য বোধ হয় গুণগত নয়, পরিমাণগত। কবিচিত্তের নিবিড় কল্পনা ও সূক্ষ্মবোধসম্ভূত উপমা যদি কবিতাটির নির্মাণে অনিবারণীয় হয় তাহলে তাই চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমা। বৃহৎ অর্থে সব কবিতাই ইমেজ অর্থাৎ ভাষার সাহায্যে কবির মানস-অভিজ্ঞতার এবং ইন্দ্রিয়ানুভবের প্রতিরূপায়ন। কবিতায় ইমেজ সাধারণত এককভাবে নয়, ইমেজ-গুচ্ছরূপে ব্যবহৃত হয় যা দিয়ে কবির মনকে অনেকখানি চেনা যায়।

অমিয় চক্রবর্তীর ইমেজ-নির্মাণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, তিনি বস্তুজগৎ থেকে ইমেজ নিয়ে আসেন। বস্তুগ্রাহ্য পৃথিবীর প্রতি তাঁর আগ্রহ নিবিড়। দ্বিতীয়ত, আধুনিক কবিতায় ইমেজ বস্তুগত সাদৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে মননগত সংযোগের উপরেও নির্ভরশীল। এজিনিস অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতেও আছে। 'একটি গান শোনা' কবিতায় গান শোনার রসোপলব্ধিকে তিনি মন্দিরশিখরে উপস্থিত হওয়ার চরিতার্থতায় ধরতে চেয়েছেন। তৃতীয়ত, বিজ্ঞানজগৎ থেকে তিনি অসংখ্য ইমেজ গ্রহণ করেছেন। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতাকে তিনি প্রীতির চোখে দেখেন। চতুর্থত, তাঁর কিছু কবিতা সম্পূর্ণই একটি উজ্জ্বল ইমেজের মধ্যে ধৃত। যেমন চেতনস্যাকরা, বুদ্রকামার, পিঁপড়ে, রাত্রির প্লেন, লাল মনসা।

কয়েকটি চিত্রকল্প তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হতে হতে প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ভাষা প্রয়োগের মোটামুটি তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে স্পষ্ট বাচ্যার্থ, দ্বিতীয় স্তরে ব্যঞ্জনাময় অনুভূতি—ইমেজের স্তর। এবং তৃতীয় স্তরে আবেগ ও মননের প্রগাঢ় গভীরে অব্যক্ত অনুভূতির প্রতিভূস্বরূপ একটি বস্তুকে ঘিরে স্থির সংস্কারের জন্ম হয়—তখনই সৃষ্ট হয় প্রতীক। প্রতীক সরাসরি একটি কবিতার মধ্যেও জন্ম নিতে পারে, অনুভূতির সুতীব্র চাপ থেকে তার সৃষ্টি—যেমন জীবনানন্দের 'বিড়াল'। আবার কবির হাতে বহুবার ব্যবহৃত হতে হতে কোনো শব্দ পাঠকের মনে একটা সংস্কার তৈরি করতে পারে। যেমন জীবনানন্দের 'ঘাস'। অমিয় চক্রবর্তীর অধিকাংশ প্রতীক দ্বিতীয় শ্রেণীর—যেমন সিঁড়ি, বাড়ি, বৃক্ষ, বৃষ্টি, এরোপ্লেন। প্রথম শ্রেণীর প্রতীক হিসেবে চেতনস্যাকরাকে নেওয়া যেতে পারে।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার নির্মাণে ছন্দ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। ভাষা-প্রয়োগের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাপারে অমিয় চক্রবর্তী এবং অন্যান্য আধুনিক কবির খুব বড়ো একটা পার্থক্য নেই। কিন্তু ছন্দের ক্ষেত্রে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি দেখিয়েছেন

যার চর্চা তাঁর সমকালীন কবিদের বা পরবর্তী কবিদের হাতেও তেমন হতে দেখা যায়নি।

অক্ষরবৃত্তের চালটাই তিনি বেশি পছন্দ করেন। খুব স্বাভাবিক। গভীর চিন্তা-ভাবনাই তাঁকে কবি করেছে। বিশ্বপ্রকৃতির শুভ-সুন্দরকে তিনি দেখেছেন কিন্তু ললিত, মধুর, উজ্জ্বল, কোমল, লোভন ভঙ্গিতে ততোটা নয়—দেখেছেন গভীর, মনস্ক, শান্ত, ভাবুক কিছুটা অনাসক্ত চোখে। মাত্রাবৃত্তের বা কলাবৃত্তের স্বাভাবিক লালিত্যকে তাই তিনি একটু পরিহার করেছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই একমাত্র কবি যিনি মধুরতম লালিত্য ও গভীরতম দর্শনকে একই মুষ্টিতে ধরতে পারতেন। অন্যান্য কবিরা চিন্তন-মননের গভীরতা প্রকাশের জন্য অক্ষরবৃত্তের অচপলতাই বেছে নিয়েছেন। জীবনানন্দও মাত্রাবৃত্তে লিখতেন না। অক্ষরবৃত্তে লিখলেও ধরাবাঁধা পয়ার ত্রিপদীতে অমিয় চক্রবর্তী লেখেননি। যেভাবে খুশি পংক্তি ও পর্বের দৈর্ঘ্য রচনা করেছেন। বলাকার ছন্দের কাঠামোর চেয়ে তাঁর ছন্দের কাঠামো অনেক বেশি শিথিল। গদ্যভঙ্গি এবং মিলছাড়া আচমকা এক একটি পংক্তি তাঁর লেখায় প্রায়ই দেখা যায়। মাত্রা সংখ্যাও আট, ছয়, চার, দশ যেমন আছে : সাত, নয়, এগারোও তেমনি আছে। তবে মাত্রাবৃত্তেও তিনি কিছু কবিতা লিখেছেন। স্বরবৃত্তের ব্যবহারে এই কবির বিশেষ আগ্রহ ও কুশলতা। তিনি চার মাত্রার জায়গায় প্রায়ই পাঁচ বা তিন মাত্রা ব্যবহার করেছেন। প্রতি সিলেব্‌লে একমাত্রা ধরার রীতি, পর্বের শুরুতে একটি ঝোঁক এবং পড়ার ভঙ্গিতে একটা সহজাত কাটা কাটা ভাব সেখানে স্বরবৃত্ত ছন্দ চিনিয়ে দেয়। 'বৈদান্তিক' কবি তার উদাহরণটি দেখা যাক—

প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ
বেরিয়ে এলেই নেই
ভিতরে কত লক্ষ কথা
পাতা পাতায় শাখা শাখায়
সবুজ অন্ধকার।

স্বরবৃত্ত হলে 'ভিতরে কত'-র পাঁচ মাত্রায় আটকায়। মাত্রাবৃত্ত হলে 'প্রকাণ্ড বন'-কে ছয় মাত্রার নিচে নামানো যায় না। অবশ্য আজকাল অনেকেই মনে করেছেন স্বরবৃত্তে পাঁচ বা তিন মাত্রা স্বাভাবিক ভাবেই ধরে যায়। বিশেষত ছড়ায় এর উদাহরণ এত অজস্র যে তাকে ব্যতিক্রম বলা ঠিক নয়। স্বরবৃত্ত মূলত পর্বারম্ভের ঝোঁকটি দিয়েই চেনা যায়, চার মাত্রা গুনে নয়। লৌকিক ছড়ায় ঐ প্রবল ঝোঁকই আসল কথা। শিষ্ট সাহিত্যে ছড়ার ছন্দও এসেছে একটু শিষ্টরূপে। গ্রামীণ কবির অকারণ সৃষ্টি সুখের ছন্দে তালে বেজে ওঠা ঐ ঝোঁকটি বেশি ভাবুক কবিদের ভাবনার আবর্তে পড়ে হলো মৃদুতর। ফলে শিষ্ট কবিতায় এখন স্বরবৃত্ত তার শ্বাসাঘাত প্রায় হারিয়ে ফেলেছে, রয়ে গেছে একটা কেটে কেটে তালে তালে পড়ার ভাব। 'বৈদান্তিক' কবিতার

তীব্র ঝরে, জ্যোৎস্না হিম বুক চিরিয়ে
কী প্রকাণ্ড মেঘের ঝড় বৃষ্টি সেই আরণ্যক

পড়ার ভঙ্গিতেই স্বরবৃত্ত হয়ে ওঠে। মাত্রা গুনে তো একে মাত্রাবৃত্ত বলে স্থির করাও সম্ভব। আসলে ছন্দ ব্যাপারটা ঠিক গণনা নির্ভর নয়—অনেকটাই শ্রুতিনির্ভর।

পদ্যের আবেগ আর কথ্যবাচনের স্বাভাবিকতাকে মিশিয়ে একটা ভঙ্গি অমিয় চক্রবর্তী সৃষ্টি করেছেন। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—"ইংরেজিতে আরো এক জাতের কবিতা আছে তাতে বিভিন্ন ছন্দ ও গদ্যপংক্তি মেশানো থাকে, তাকে বলে ফ্রী ভার্স। আমার বিশ্বাস অমিয়বাবু বাংলায় ফ্রী ভার্স আনবারই চেষ্টা করেছেন"—(কবিতা : আষাঢ় : ১৩৫১) মন্তব্যটি হঠাৎ পড়লে বুদ্ধদেব বসু ফ্রী ভার্সকে একটু অতি সরল করেছেন বলে মনে হয়। vers libre ফ্রান্সে উদ্ভূত এবং উনিশশো খ্রীষ্টাব্দের আগেই প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজিতে এই vers libre-কে ফ্রী ভার্স নাম দিয়ে নিয়ে এলেন ইয়েট্স্, এলিয়ট, পাউণ্ড, লরেন্স প্রমুখ কবিরা। কিন্তু এই গ্রহণে একটা ফাঁক থেকে গেলো। ফরাসীরা vers libre এবং vers libéré-র মধ্যে একটা পার্থক্য মেনে চলতেন। এ সম্পর্কে সমালোচক Graham Hough তাঁর Image and Experience গ্রন্থে বলেছেন—প্রথমটি আজন্ম স্বাধীন—"which has no connection with the traditional versification at all." এবং দ্বিতীয়টি শৃঙ্খলিত জন্মের পর শৃঙ্খলমুক্ত হতে সচেষ্ট—"takes its starting point from traditional versification but handles it with great licence." (1960 Ed., pp. 87-88)। ইংরেজ সমালোচক স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—ইংরেজিতে কবিরা গ্রহণ করেছেন দ্বিতীয়টি কিন্তু তাকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন বোধ করেননি। এবার বোঝা যায় এলিয়ট প্রমুখ কবিদের থিয়োরিতে ফ্রি ভার্সের স্বাধীনতার কথা বলা হলেও লেখায় কেন একটা ট্র্যাডিশনাল কাঠামো সব সময়েই ফুটে ওঠে। ফ্রান্সে কিন্তু বেশি চর্চিত হয়েছে প্রথমটিই। অমিয় চক্রবর্তী নিয়েছেন ইংরেজি থেকেই। ফলে তাঁর কবিতার ছন্দেও শৃঙ্খলমুক্তি আছে কিন্তু পুরোনো কাঠামো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। অমিয় চক্রবর্তীর বহু কবিতায় অনিয়মিত পর্ববিভাগ, অনিয়মিত ছন্দ গণনা রীতি, ছন্দ-ছুট পংক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য আধুনিক কবিদের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর পার্থক্য আছে। অন্যরা হয় কবিতার ছন্দ অথবা গদ্যছন্দ ব্যবহার করেছেন। মিশ্রণ আছে কিন্তু যে-কোনো একটি রীতি মূলত অনুসৃত। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এই মিশ্রণ অবাধ এবং একটি রীতির প্রাধান্য সেখানে অনুপস্থিত। ইংরেজীতে ফ্রী ভার্সের সমর্থক কবিদের তুলনায় অমিয় চক্রবর্তীর ফ্রী ভার্সের সিদ্ধি এতটুকুও কম নয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, বুদ্ধদেব ফ্রী ভার্সের বাংলা বরাবরই 'মিশ্রছন্দ' লিখেছেন। 'মুক্ত' বা 'স্বাধীন' লেখেন নি। ভালোই করেছেন। ইংরেজিতে যে পার্থক্যটি বোঝানো হয়নি, নামকরণের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব সেটি স্পষ্ট করেছেন। তাঁর সংজ্ঞা অতি সরলীকৃত নয়—ইংরেজি ও বাংলায় তাঁর সংজ্ঞাটিই সত্য। তবে ফরাসী কবিতার ব্যাপারে সম্ভবত এই সংজ্ঞাটি যথেষ্ট বিবেচিত হবে না।

তিনজন পাশ্চাত্য কবির লেখা থেকে উদ্ধৃতি এবং অমিয় চক্রবর্তীর একটি বক্তব্য পাশাপাশি রেখে দেখানো যায় যে ফ্রী ভার্সের প্রাণধর্মটি তিনি তাঁদের চেয়ে কম বোঝেননি।

(১) D. H. Lawrence, Phoenix, Ed. 1936, pp. 220-4

"This is the unrestful, ungraspable poetry of the sheer

present,...In free verse we look for the insurgent, naked, throb of the instant moment."

(২) Ezra Pound—Essays, Ed. by T. S. Eliot, 1954, P. 9.

"A man's rhythm must be interpretative, it will be, therefore, in the end, his own, uncounterfeiting, uncounterfietable..."

(৩) W. B. Yeats, Essays, Ed. 1924, p. 201.

"We would cast out of poetry those energetic rhythms as of a man running..."

(৪) অমিয় চক্রবর্তী, কাব্যের টেকনিক, সাম্প্রতিক।

"সামান্য একটা কথা রিক্শওয়ালা—কবিতায় ব্যবহার করতে হ'লে প্রাচীন ছন্দের ঘনঘোর কাঠামোতে কুলোয় না। অথচ রিক্শওয়ালা যখন বিশ্বজগতে আপন অস্তিত্বের অধিকারে বর্তমান, তখন কাব্যজগতে তার স্থান আছেই।"

দেখা যাচ্ছে কবিতার ছন্দকে যে বাস্তব জীবনের শিরাস্নায়ুর স্পন্দন থেকে উঠে আসতে হবে—এই কথাটি সকলেরই মনের কথা।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার ছন্দ সম্পর্কে আরো একটি বিষয় প্রায়ই উল্লেখিত হয় কিন্তু যথেষ্ট ব্যাখ্যাত হয় না। অনেকেই বলেছেন হপকিন্স প্রবর্তিত স্প্রাং রিদ্ম্-এর সঙ্গে তাঁর কবিতার ছন্দের মিল আছে। স্প্রাং রিদ্ম্ কি ? "What Hopkins called his sprung rhythm is a variant of strong-stress metre." (A Glossary of Literary Terms, M. H. Abrams, Ed. 1970) strong-stress metre হলো প্রাচীন ইংরেজি লৌকিক ছন্দ যেখানে প্রতি পর্বে বা 'ফুট'-এ স্ট্রং স্ট্রেস্ড্ সিলেব্ল্গুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় ; লাইট্ সিলেব্ল্গুলির মূল্যও কম থাকে এবং সংখ্যা সম্পর্কেও কোনো নিয়ম থাকে না। সাধারণত কবিতার একটি লাইনে চারটি স্ট্রং স্ট্রেস্ড্ সিলেব্ল্ থাকে। চসারের আগে পর্যন্ত ইংরেজি কাব্যে এই ছিলো প্রচলিত ছন্দ। যেমন Langland-এর Piers Plowman-এর প্রথম দুটি চরণ—

"In a Sómer Séson / whan Sóft was the Sónne /
I shópe me in Shróuds / as I á shépe were //

এখানে ছন্দটিকে পরিচালিত করেছে ঐ স্ট্রেস্ড্ সিলেব্ল্গুলি। হপ্কিন্সের স্প্রাং রিদ্ম্-এর নিয়ম হলো--প্রতিটি 'ফুট্' শুরু হবে একটি স্ট্রেস্ড্ সিলেব্ল্ দিয়ে ; তার সঙ্গে এক বা একাধিক লাইট্ সিলেব্ল্ থাকতে পারে, না থাকলেও ক্ষতি নেই। ঐ একটি স্ট্রেস্ড্ সিলেব্ল্ থাকতেই হবে এবং ঐটির ওপর জোর দিয়েই কবিতা পড়তে হবে। 'স্প্রাং রিদ্ম্'—এই বিশিষ্ট নামকরণটি সম্পর্কে W. H. Gardner বলেছেন —"Sprung Rhythm is so called because of the syncopated spring—the occasional abrupt juxtaposing of stressed syllables, as in ordinary speech." (Introduction, Poems of G. M. Hop-

kins, Ed. 1967) স্প্রাং রিদ্‌ম্ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি স্বয়ং তাঁর অপর কবি-বন্ধু রবার্ট ব্রিজেসকে লিখেছেন, "native and natural rhythm of speech"—(Letters, vol. 1, Ed. by Claude Colleer Abbott, 1955, p. 46) তাছাড়াও তিনি স্প্রাং রিদ্‌মকে "oratorical rhythm" বলেছেন। এত কথা থেকে এটাই কি শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় না যে কবিতার সঙ্গে কথোপকথন ও বাগ্‌-রীতির মিশ্রণটাই স্প্রাং রিদ্‌ম্? কথ্য ভাষায় যেমন আমরা অর্থানুযায়ী কোনো কোনো অক্ষরে জোর দিয়ে বলি—**আমি** বাড়ি যাবো, আমি **বাড়ি** যাবো, কিংবা আমি বাড়ি **যাবো**—সেরকমই আধুনিক কবিরা যখনই বাগ্‌ভঙ্গি কবিতায় মিশিয়েছেন তখনই অর্থানুযায়ী কোনো কোনো সিলেব্‌লে জোর পড়েছে এবং সেই স্ট্রেস্ অনুযায়ী আবৃত্তি করে চরণটিকে শ্রবণগৃহীত করা হয়েছে। আসলে স্প্রাং রিদ্‌ম্-কে হপকিন্সের কোনো অভিনব আবিষ্কার মনে করা বোধ হয় ঠিক হবে না। যা সকলেই করছিলেন, সবার হাতেই ধীরে ধীরে হয়ে উঠছিলো তাকেই তিনি একটা নাম দিয়ে একটু লেখালেখি করেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় 'স্প্রাং রিদ্‌ম্'-এর প্রভাব আছে কিনা—এ প্রশ্নটাই অতঃপর অর্থহীন। কথ্য ও বাক্যরীতির মিশ্রণ আছে, প্রয়োজন মতো কোনো কোনো সিলেব্‌লে জোর দিয়ে পড়ার ব্যাপার অবশ্যই আছে—তা বিশেষ কারো প্রভাব নয়। আধুনিক কবিতায় সব দেশে সব কবির হাতে এ জিনিস হয়েছে।

পরিশেষে বলি, অমিয় চক্রবর্তীকে আধুনিক বাংলা কবিতার দুজন দক্ষতম প্রকরণ শিল্পীর একজন বলে আমি মনে করি এই অর্থে যে, ভাববিযুক্ত অবস্থায় প্রকরণ তাঁকে কখনই আকর্ষণ করেনি। যেমন সময়ে সময়ে বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে হয়তো করেছে। বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় ছন্দের ব্যাপারে প্রথাভঙ্গের নিদর্শন প্রায় নেই। সেই সময়ে অমিয় চক্রবর্তী ছন্দে ও ভাষায় প্রচলিত প্রথা ভেঙেছেন প্রকরণ কুশলতার প্রমাণস্বরূপ নয়, ভেঙেছেন নিজস্ব অনুভূতির জোরে এবং এ ব্যাপারে তাঁর সমধর্মী আর একজন কবি আধুনিক বাংলা কবিতায় অবশ্যই জীবনানন্দ।

বিষ্ণু দে-র কাব্যভুবন

অবন্তীকুমার সান্যাল

বিষ্ণু দে সেই বিরল ভাগ্যবান কবিদের একজন যাঁর কাব্য কবির জীবদ্দশাতেই বহু আলোচিত (এবং এ্যাকাডেমিক পাঠ্যসূচিরও অন্তর্ভুক্ত)। আধুনিক কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র কবি যিনি প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে-মৌলিকতার স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন, কাব্জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সেই মৌলিকতার চরিত্রটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সেইজন্যে তিনি খাঁটি অর্থে আধুনিক। তাঁর মৌলিকতা আত্মচেতনায় (self-consciousness) ও আত্মানুসন্ধানে (self-exploration)। আত্মচেতনার বিপদ ঘটে আত্মবিজ্ঞাপনে (self-exhibition), যদি না আত্মসচেতনতার (self-awareness) পথে চালিত হয়। আত্মচেতনা জন্ম দেয় প্রতিবাদের (dissent), কিন্তু আত্মসচেতনতা না থাকলে, দৃশ্যমান ও অনুভবগম্য জগতকে নৈর্ব্যক্তিক চোখে দেখার বাধা ঘটে, তাই পরিণামে প্রতিবাদ পর্যবসিত হয় আত্মরতিতে (self-adulation), যার শিকার হয়েছেন তিরিশের দশকের কমবেশি প্রায় সমস্ত কবিরাই। একমাত্র ব্যতিক্রম বিষ্ণু দে। এইটিই তাঁর 'প্লাস পয়েন্ট', এইখানেই তাঁর মৌলিকত্ব (যে মৌলিকত্ব মহৎ কবিত্বের, যে মৌলিকত্ব রবীন্দ্রনাথের)।

কোনো কবির ভাবলোকের পরিচয় দিতে চেষ্টা করাটাই পণ্ডশ্রম, কারণ কবির ভাবলোকের সঙ্গে পরিচিত হতে হয় পাঠকের নিজেকে। যে কোনো দেশ দেখার মতোই সেখানে নিজে পৌঁছনো চাই; তার জন্যে চাই অবসর, উপযুক্ত পাথেয়, দীর্ঘ পথ পরিক্রমার ধকল সইবার মতো দেহমন। এবং প্রয়োজনবোধে হয়তো একজন অভিজ্ঞ গাইড। কবির ভাবলোকের পরিচয় দেবার চেষ্টাটা টুরিস্ট-গাইড-বুকের মতোই কিছু তথ্য, কিছু বর্ণনা, বিশেষ বিশেষ দর্শনীয়ের কিছু ছবি দিয়ে কৌতূহল ও আগ্রহ জাগানোর চেষ্টা মাত্র। আর সেই কবির নির্মিত ভাবভুবনের মৌল উপাদান যাকে—শাদা কথায় বলে ভাব—তাকে তথ্যের মতো করে দেখানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। তাই করতে গিয়ে সেই ভাবের অবলম্বনকে মূলত (১) প্রেম (২) প্রকৃতি ও (৩) জগৎ—এই মোটা দাগে চিহ্নিত করে নিতে হয়। এখানে 'জগৎ' কথাটি বুঝতে হবে জাগতিক ও মহাজাগতিক উভয় অর্থেই—যার মধ্যে concrete স্বদেশ, বিদেশ, সমাজ, ইতিহাস, ভূগোল—স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত—থেকে 'জ্যোতিমঞ্জীরে বাঁধা' চন্দ্রভানুর জগতও অন্তর্ভুক্ত। প্রেম, প্রকৃতি ও জগৎ তিনটি ভুবন হয়েই নিজের নিজের কক্ষে ঘুরে মরে না, তাদের সমরেখার মিলনবিন্দু আছে। অনেক কবিই তা জানেন, কিন্তু মিলনবিন্দুটির সন্ধান তাঁরা পান না, তাই তাঁদের বিচ্ছিন্ন ভুবনে অ-সুরের ও অসুস্থতার আধিপত্য। কোনো কোনো চক্ষুষ্মান সে সন্ধান পান

এবং অব্যর্থ ধানুকীর মতো সে মিলনবিন্দুটি ভেদ করতে পারেন। বিষ্ণু দে সেই চক্ষুষ্মান কবি।

(দুই)

প্রথমে প্রেম। যৌনচেতনাই মানুষের প্রথম স্থূল আত্মচেতনা; যৌনচেতনার উত্তরণ প্রেমচেতনায়, তাই প্রেমেই প্রকৃত আত্মচেতনার যাত্রারম্ভ। কবিদের যাত্রারম্ভও প্রেমকে পাথেয় করে। প্রেম গুরুতর বস্তু, কিন্তু গুরুগম্ভীর কিছু নয়। সাধারণত গুরুগম্ভীর হয়ে ওঠে এই জন্যে যে, যে-মানস রসায়নে যৌনচেতনা প্রেমচেতনা হয়ে ওঠে, তার প্রক্রিয়ায় যথার্থ ফর্মুলাটি আয়ত্তে আসে না। ফর্মুলা জানলেও হয় না, জীবনের লেবরেটরিতে নিজস্ব প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের মতো করে তা আয়ত্ত করতে হয়। তবু আত্মসচেতনতার আনাড়ি বয়ঃসন্ধিতে কবিমাত্রেই একটা ফর্মুলা আঁকড়ে ধরেন। বিষ্ণু দেও ধরেছিলেন তাঁর প্রথম প্রেমের কাব্য 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'।

দেখি মুহূর্ত বিম্বে চিরন্তনেরই ছবি
উর্বশী আর উমাকে ধরেছি এ প্রেমপুটে।

'পেয়েছি' ঘোষণা অতিভাষণ, বালভাষণ নাও যদি হয়। এ সমাজে উর্বশীর সঙ্গে উমাকে এতো সহজে পাওয়া যায় না। উর্বশী তো চিরচেনা, সে শুধুমাত্র পাওয়া, অর্জন নয়, লাভ নয়। তিনি স্বস্বরূপ উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন :

আমি নহি পুরুরবা, হে উর্বশী,
আমরণ আসঙ্গ লোলুপ,
আমি জানি আকাশ-পৃথিবী
আমি জানি ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের।

উমা নীলকণ্ঠের কঠোর তপস্যার ধন। তাই উর্বশীর প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করেছেন আর্টেমিসকে। 'সাগরে উত্থিতা' সেই ভেনাস-উর্বশীকে দেখে প্রশ্ন তুলেছিলেন :

অবগুণ্ঠিতা নারী—
শরতের সূর্য সে যে—সে তো নয় কোজাগরী শশী,
কুণ্ঠাহীন দৃষ্টি তার আমাকে সে দিলে দৃষ্টি ভরে,
তাই একা তটে বসি,
আর ভাবি রৌদ্রময়
ভাষা তার কিবা বলে—ডায়না ? উর্বশী ?

ডায়না—আর্টেমিস। শিঙাল হরিণের টানা সোনার রথে আর্টেমিস শুভ্র সুন্দর কৌমার্যের শুচিতা রক্ষায় ধনুর্ধারিণী, হিপলিটাসের আরাধ্যা দেবী। 'সুদীর্ঘ সুঠাম নগ্ন তনু বলীয়ান' সাগরোত্থিতা আর্টেমিস, না ভিনাস—কে বরণীয়া ? সম্পূর্ণ দুই কোটির দেবী, একজন কৌমার্যরক্ষিণী, অন্যজন কৌমার্যহারিণী। কবি শরণ নিয়েছেন আর্টেমিসের :

আজ শুধু প্রার্থনা আমার
আর্টেমিস, প্রার্থনা আমার…

...আজ তুমি দিয়ে যাও
দ্রুতগতি তোমার আশ্বাসে।
...   .
আর্টেমিস, হিপলিটাসেরে
সঞ্জীবনী দিলে তো সেবার,
আর্টেমিস, প্রার্থনা আমার।

উর্বশীকে অস্বীকার করা নয়, অস্বীকার করেও তাকে স্বীকার করা, উর্বশীর রূপান্তরণই কবির অন্বিষ্ট। মদনভস্ম ও পুনরুজ্জীবনের আধুনিক কালের কাহিনী। এযুগে এই সমাজে যেখানে 'সুরেশের-লাবণ্যের অশ্লীল নিঃশ্বাসে ভারাক্রান্ত হাওয়া', 'কঠিন দেয়াল কাঁপে...অলকার অসুস্থ উচ্ছ্বাসে,' যেখানে ভালোলাগা নারীটির 'শ্যাম তরুণ তমাল শরীর' শুকিয়ে যাবার আশংকায় 'বাগানে যাবার' প্রস্তাব দিলে 'নাগরী নারী'র চোখে অরণ্যের আদিম ভয় ঘনিয়ে আসে, সুবসনা দুঃশাসনের ভয় পায়, সেখানে উর্বশীর মুখোমুখি আর্টেমিসকে দাঁড় করাতেই হয়। কারণ এ যুগে—

অর্জুন আসে না আর, চিত্রাঙ্গদা কবে মুছে গেছে
তপোবন নেই আর কণ্বমুনির
আজো তবু বিপুল পৃথিবী
আজো এই আমাদের কাল
আজো এই জ্ঞানবিজ্ঞ জরাবৃদ্ধ অভিজ্ঞ ভুবন
পলাতকা উর্বশীর প্রতি পদপাতে
দুলে দুলে ওঠে স্নায়ু আলোড়িত উতলা কম্পনে।

এ সমাজে প্রেম নামধেয় বস্তুটি কি নিরক্ত, কি বিস্বাদ! 'আসল কথাটা আমি যা বুঝি / প্রম ফ্রেম বাজে / আসলে আমরা নতুন খুঁজি / নারীকে পুরুষ পুরুষকে নারী তাই তো খোঁজে —/ তার উপর তো জীবের ধর্ম উপ্‌রি আছে / এরি নাম প্রেম।' তাই 'চোরাবালি'র চোখে দূর দিগন্তে 'দীপ্ত ঘোড়সওয়ারে'র স্বপ্ন, তাই উর্বশী ও আর্টেমিসের প্রতিদ্বন্দ্বের পরে মহাশ্বেতার বন্দনা :

ভাস্বর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি,
প্রাণসূর্যের একান্ত সংহতি।
ক্লান্তিবলয়ে শিহরায় ক্রন্দসী।
উত্তর করে মুদ্রিত বরাভয়.
তামসীরে করো খণ্ডন, করো জয়।

'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর সমকালে একবার মাত্র সাক্ষাৎ পাই অর্ধনারীশ্বরের। এই সাক্ষাতের তাৎপর্য গভীর। 'দুঃস্বপ্নরুক্ষ অসিধার কঠিন আকাশ', 'পদতলে স্টীল নীল পারহীন গভীর সাগর', খরসূর্যে 'শাণিত বাতাসে' 'সবুজের বাসহীন' 'স্থূল অঙ্গ কৃষ্ণপর্বতের শিখর চূড়ায়' তাঁর মন্দির। কিন্তু 'সে উলঙ্গ পর্বতে কভু পড়ে নাই উর্বশীর শ্বাস'। সেই পর্বতে—

অকস্মাৎ হেরিলাম মূর্তি তার ক্লান্তগতভাষ।
ভাষাহীন দোঁহে মোরা পূজিলাম অর্ধনারীশ্বর।

অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি 'ক্লান্তগতভাষ'। যে-কালে যে-সমাজে নারী ভোগ্য, নারী পণ্য ছাড়া আর কিছুই না, পুরুষ ও নারীর অধিকারের কোনো সাম্য নেই, পুরুষ ও নারীর সত্তা ও চৈতন্যের জগতই স্বতন্ত্র, সে-কালে সেই সুপ্রাচীন অর্ধনারীশ্বরের ভাষা যে 'গত' হবে তাতে বিস্ময় কি। তাঁর মন্দির তাই নির্জন দুর্গম বন্ধুর পাহাড় চুড়োয়। তাঁকে পূজো করার মন্ত্র একালের সামাজিক মানুষের জানা নেই। তবু 'দোঁহে মোরা পূজিলাম'। দোঁহে' শব্দটি তাৎপর্য-গভীর। 'আমি' নয়, 'দোঁহে'। আমাদের প্রেম তো খণ্ডিত সত্তার চেতনা, প্রেমের কবিতা একোক্তি মাত্র। পুরুষের প্রেমের কবিতায় প্রেম পরিণামে একটা ভাব (idea) মাত্র, নারীর প্রেমের কবিতায় প্রেম শুধু বিলাপ। পুরুষ ও নারীর অখণ্ড সত্তা অর্ধনারীশ্বরের পূজো একক পুরুষের নয়, একক নারীর নয়, নারী ও পুরুষের মিথুনের, যুগল প্রেমের স্রোতে ভেসে আসা 'দোঁহে'র। একালে সেই দেবতার মন্দির লোকচক্ষুর অগোচর, পরিত্যক্ত, তাঁর মূর্তি 'ক্লান্তগতভাষ'। মন্ত্র জানা না থাকলেও 'দোঁহে' মিলে পূজার অভিযান।

আধুনিক অনেক কবির মতো বিষ্ণু দে প্রেম খোঁজাখুঁজি করেছেন 'অভ্যাসবশে' 'প্রকৃতির বুদোয়ারে', পার্টিতে, ড্রয়িং রুমে 'লিলি রমা অলকার' ভিড়ে; 'ফাঁকা লিবিডোকে' চালাবার চেষ্টা করেছেন 'বুর্জোয়া খেয়ালের কোনো বাঁকা খালে'। পরিণামে লাভ করেছেন ক্লান্তি, শ্রান্তি, ফরাসীতে যার খাঁটি প্রতিশব্দ ennui। এর কারণ এ সমাজে প্রেম নেই, যা আছে তা 'প্রেম নয় প্রশ্নদূত': আমরা 'প্রেমের তত্ত্বের ছাত্র, / 'নাহি রয় / বিহঙ্গের মুক্ত হর্ষ, রহে শুধু কুণ্ঠিত বিচার।' তিনি খোঁজেন লিলি নামক সামাজিকার চিত্তের চামেলি সৌরভে চেতনার সেই মায়ার বিস্তার যে 'মায়ায় ফুটে ওঠে / পৃথিবীর পরম আশ্বাস।' মুখ ফেরানো যে-নারীর দুচোখে 'স্থির নীল শর্বরীর / শংকিত ক্লান্তির দূরাভাস', 'গতিহীন অতীতের স্মৃতি বিষণ্ণ ভীতির গায়ে লাগা' পাখির পালকের মতো যে শরীর হৃদয় কাঁপে, তাকেই তিনি বলেছিলেন:

> আমি তবু বলে যাব কথা / বারবার উঠে যাব হৃদয়ে তোমার,
> পলে পলে দেব নিমন্ত্রণ। / প্রেম যে আমার হল প্রতীক্ষার
> প্রস্তুতিতে / দিনরাত্রি আজ চির জাগা
> একদা আমারই হবে জয়।

সেযুগেই ওফেলিয়ার উদ্দেশে বলেছিলেন:

> মরণে দোঁহে করিনি জয় জীবনে বাহুডোরে
> অতনুরতি বাঁধিনি আজো মোরা।
> বিদায়রবি-রক্তালোকে, শিশির-সিত ভোরে
> অনির্বাণ তবুও পথে ঘোরা।

এই অনির্বাণ ঘোরার পথেই প্রেমের গুরুভার বয়ে বয়ে তিনি যার দরজায় এসে দাঁড়ালেন, সে সখী, সে গুরুভারের অংশভাক্।

> পান্থপ্রেমের এই গুরুভার / তুমি ছাড়া বলো বইবে কে? / তোমার আঙিনা দিয়ে ভিজে যাই / দ্বার খোলো সখী তাই দেখে ॥ / নদীতে জোয়ার খেয়া পারাপার / বন্ধ

হয়েছে, হাঠ লোপাট / শুধু আছে মেঘে বজ্র আবেগে / আকাশ ছড়ানো বিজন বাট। / এই দুর্যোগে ঘর-কে বাহির, / তুমি ছাড়া বলো, বার-কে ঘর / কেই বা করবে ? তোমার হৃদয়, / আকাশের নীড়, নদীর চর। / আত্মদানের সে নীল আকাশে / বিরাট শূন্য বাঁধবে কে / তুমি ছাড়া বলো ? তোমারই হৃদয়ে / থমকাই শেষে, তাই দেখে।

'জীবনের সব লেনদেন' চুকিয়ে দিয়ে 'মুখোমুখি বসিবার' নয়, আকাশ ছড়ানো বিজন বাট পেরুতে হবে, খেয়াপারাপারহীন জোয়ারের নদী পেরুতে হবে ; নিঃসঙ্গ পথে হাজার বছর একা একা ঘুরে ক্লান্ত হওয়া নয়, গুরুভারের অংশ ভাগাভাগি করে নিয়ে পৃথিবীর পথে পথে হাঁটা : দুদণ্ড শান্তির 'পাখির নীড়' নয়, আত্মদানের বিরাট শূন্যতাকে বাঁধা 'আকাশের নীড়'।

লক্ষণীয়, 'বঁধু' নয়, সখী। এ সখী সৌখীন নাগরী নারী নয়, মামুলি নর্মসহচরী নয়। দুর্যোগে যে 'ঘরকে বাহির, বাহিরকে ঘর' করতে পারে। হৃদয় যার আকাশের নীড়, নদীর চর, আত্মদানের সুনীল আকাশে যে শূন্যতাকে বাঁধবে। সেই সখী— Camarade, Comrade-in-arms, অর্ধনারীশ্বর পূজার যোগ্য সঙ্গিনী। তাই সে পূজা আর ভাষাহীন, মন্ত্রহীন নয় :

> অমারজনীর মদিরায় নেই নীড়আকাশ / জেনেছে মন /
> তোমাতেই পাই প্রাণসত্তার নীলিমাভাস / তাই আপন।

এই 'আপন' বলে জানলেই এমন উক্তি সম্ভব :

> মরুভূমির পাণ্ডুদাহে আছে তমাল তাল :
> জীবন জানি হোমশিখায়, হৃদয় জেনো তবু
> প্রেমের গানে উজ্জীবিত গথিক ক্যাথেড্রাল।

এযুগের এক মহৎ কবি লুই আরাগঁ আর এক মহৎ কবি পল এলুয়ারের প্রেমের কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন : 'কথাটা হচ্ছে এই যে, পুরুষকে নারী ব্যতিরেকে, নারীকে পুরুষ ব্যতিরেকে আর ভাবা হয় না, এবং একালে প্রেমের উন্নত প্রকাশ আর প্রেমের একটি idea, আকাঙ্ক্ষার একপাক্ষিক প্রকাশ নয়, আর একক প্রেমিক একক প্রেমিকা নয়, প্রেমিক-যুগল…যুগলের মধ্যে পুরুষ ও নারীর প্রেম তার মিল ও সুষমা ঠিক তখনই খুঁজে পায়, যখন একই সময়ে পুরুষ ও নারী জগতের একই ধারণায় উন্নীত হয়, যেখানে অভিযান বিস্তৃততর হয়, এবং মানবিক শোভনতার প্রতি ভালোবাসা নিজেকেই একাত্ম করে।'—কথাগুলো বিষ্ণু দে'র প্রেমের ভুবন সম্পর্কে যতোখানি প্রযোজ্য তা বোদ্ধারাই বিচার করবেন। এ প্রেম যোদ্ধ-প্রেম, আক্ষরিক অর্থেই যুদ্ধ করে, যুদ্ধ করিয়েছে : স্বাধীনতা আর প্রেয়সী ছিল এলুয়ারের কাছে সমার্থক, আরাগঁর কাছে এল্‌সাই পারী, যার সোনালী কেশগুচ্ছে ছিল প্রতিরোধের লালিত বহ্নি। বিষ্ণু দে-ও লিখেছেন :

> শোনো ওফেলিয়া, তোমার আত্মদানে
> তোমার শরীরে সারেঙীর গানে গানে
> জীবনের মহামৃদঙ্গে নাচে অর্ধনারীশ্বর।
> মন দাও প্রাণ দাও সারাদেশে অনাচারে জর্জর।

(তিন)

এবার প্রকৃতি। এক কালে মানুষ ছিল প্রকৃতির অঙ্গ, বন নদী পাহাড় পশুপাখির প্রতিবেশী। সবই তারই মতো প্রাণবান, তারই ভাষায় কথা কইত। প্রকৃতি ও মানুষের এই সম্পর্কটি অনেকাংশে ধরা আছে রূপকথায়। ক্রমশ মানুষ আত্মসচেতন হয়েছে, বুঝতে শিখেছে প্রকৃতির সঙ্গে তার ফারাক আছে, মিলও আছে বিরোধও আছে ; মিলন ও বিরোধের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সে নতুন নতুন সম্পর্ক পাতিয়েছে। সে জেনেছে মানুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন, মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ হলেও প্রাকৃতিকতার ঊর্ধ্বে ওঠাই তার ধর্ম, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। ভিন্নতা বোধের মধ্যে সে খুঁজেছে সাদৃশ্য। প্রকৃতি হয়েছে উপমা। মানুষ আরও এগিয়েছে, সমাজ, রাষ্ট্র, নগরগড়া মানুষ সর্বতোমুখী জীবন গড়ে তুলতে গিয়ে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির ক্ষেত্রে যতো বিচ্ছিন্নতা এসেছে, ততোই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু ততোই আবার প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, কারণ তার আত্মসচেতনতা বেড়েছে। তার ফলে হয়েছে প্রকৃতি যেন মানুষেরই মতো, তার জীবন যেন মানুষের জীবনেরই সমান্তরাল। একটা 'যেন'। আর উপমা নয় উৎপ্রেক্ষা। কিন্তু মূলে দুই জীবনের মিল ঘটে না, দুষ্মন্ত কণ্বের তপোবনে এলে বিপর্যয় ঘটে, শকুন্তলা রাজসভায় গেলে প্রত্যাখ্যাত হয় ; মানুষে মানুষে, প্রকৃতি ও মানুষের বিচ্ছিন্নতার, অমিলের পিছনে দুর্বাসার অভিশাপ ; মিলনের অঙ্গুরীয়ক হারায়, বিস্মৃতির ঘোর লাগে। মানুষ যতো প্রাকৃতিকতার ঊর্ধ্বে উঠেছে এই অমিল ততো বড়ো হয়েছে, তখন দুটোর একটাকে বাছতে হয়েছে। যন্ত্রযুগের প্রাথমিক পর্যায় থেকে আজও তাই অশান্ত, ক্ষুব্ধ, বিচ্ছিন্ন মানুষের প্রকৃতিতে পলায়নের এতো চেষ্টা। ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিচ্ছিন্ন সম্পর্কটি যিনি জোড়া লাগাতে চান, তিনি অবশ্যই মানুষ ও প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন সম্পর্কটিও জোড়া লাগাতে চাইবেন, কারণ ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতার সম্পর্কটি অতি নিবিড়। এই জোড়া লাগাবার চেষ্টাতেই ভেদের মধ্যে অভেদ কল্পনা। আলঙ্কারিক অর্থে যাকে বলি 'রূপক'। তারই ফলে প্রকৃতি নিবিড় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে মানুষের সঙ্গে। এবং স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় একালের মানুষও আর অনাহূত থাকে না, নিছক দর্শকও হয় না, কুশীলবের সামিল হয়ে ওঠে, একাল সেকাল সর্বকালের মানুষ ও প্রকৃতির জীবন মহাজীবনের সিম্ফনি হয়ে ওঠে।

আধুনিক কবিদের বড়ো ঘাটতি, প্রকৃতির এই ভূমিকা তাঁদের কাব্যে অনুপস্থিত। তাঁদের কাব্যে পাহাড়, অরণ্য, সমুদ্র, নদী, ঋতু—সবই বিচ্ছিন্ন প্রতীক, চিত্রকল্পে পর্যবসিত। প্রকৃতির দৃশ্যাবলী যেন সযত্নে রাখা রমণীয় দৃশ্যাবলীর একটি এ্যালবাম মাত্র। হয়তো বিচ্ছিন্নতাবোধে পীড়িত নাগরিক কবিদের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিষ্ণু দে ব্যতিক্রম।

একটি মাত্র উদাহরণ দেবো। একটি নামহীন সনেট :

বর্ষে বর্ষে কাল কাটে, প্রাত্যহিক নিঃসঙ্গ করাল !
বৈশাখীর ঝঞ্ঝা জীর্ণ গ্রীষ্মে শেষে হয় ভস্মলীন,
প্লাবিত বর্ষার গান, শরতের সূর্যাস্ত মলিন,
হেমন্তের হাহাকারে পলাতক মানস মরাল !

জমে ওঠে রক্তবীজ জীবনের অলক্ষ্য অভ্যাস,
থরে থরে গুপ্তচর জলে স্থলে বায়ুহীন মেঘ।

শাণিত বিদ্যুতে চেরে ঘনঘটা, স্বনিত আবেগ,
পুঞ্জে পুঞ্জে ঘেরে ক্ষোভ, মনান্তরে ছিঁড়ে যায় ব্যাস—
ছিন্ন ভিন্ন হাওয়া ছোটে, বৃষ্টি পড়ে, ডোবায় আকাশ,
ধুয়ে যায় মাঠক্ষেত, গাছপাতা, নদীর জঞ্জাল,
সূর্যালোকে স্বচ্ছস্নাত রেঙে ওঠে দিক চক্রবাল,
ছেয়ে দেয় আদিগন্ত ইন্দ্রধনু বিরাট আকাশ।

সে অতলনীলে স্তব্ধ স্মিতহাস্য কালের রাখাল
পাহাড়ের নীল চূড়া। সে আকাশ তোমারই আকাশ॥

প্রথম স্তবকে বৈশাখ বর্ষা শরত হেমন্ত (শীত বসন্ত বাংলার ঋতু নয়, মুখ্যত কাব্যিক ঐতিহ্যের ঋতু)—সমগ্র ঋতুচক্রের আবর্তন। দ্বিতীয় স্তবকে বিদ্যুৎ, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, ঝড়, আকাশ ডোবানো বৃষ্টি, তারপর মাঠক্ষেত ধুয়ে, নদীর জঞ্জাল সরিয়ে সূর্যালোকে স্বচ্ছস্নাত রেঙে ওঠা দিকচক্রবাল, বিরাট আকাশে আদিগন্ত ইন্দ্রধনু। (ঝড়-বৃষ্টি-রোদ—খাঁটি বাংলার ঋতুনাট্যের প্রধানতম কুশীলব)। এটি বাংলার ঋতুচক্রের নিখুঁত ছবি। কিন্তু ঋতুচক্র জীবনেরই চক্র।

করাল নিঃসঙ্গ প্রাত্যাহিক জীবনের প্রতি মুহূর্তে বিক্ষোভের বৈশাখী ঝঞ্ঝা বৃথাই মাথা কুটে মরে, (গ্রীষ্ম) বেদনার গানের প্লাবনে হৃদয়কে মার্জিত করে সূর্যোদয় ঘটালেও তা মলিন অস্তরাগের চিহ্নই শুধু রেখে যায়; (বর্ষা ও শরত) স্বপ্ন কামনারা উধাও হয়, জীবনে শুধুই থাকে হাহাকার (হেমন্ত)। আর জীবনের অচেতন অভ্যাসের পুঞ্জীকৃত পৌনঃপুনিকতায় জীবন হয় শ্বাসরুদ্ধ। তারপর সেই শ্বাসরুদ্ধ অস্তিত্বকে চেতনার বিদ্যুৎ ছিঁড়ে দেয়, আবেগের অনুরণন ওঠে, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ঝড়ের মুখে উড়ে যায়, সঞ্চিত ক্ষোভের মধ্যে থেকেই জন্ম নেওয়া জীবনের ধারাবৃষ্টিতে হৃদয় আচ্ছন্ন করে যে বৃষ্টির ধারা নামে, তাতে জীবনের সমস্ত মালিন্য, ক্লেদ ধুয়ে মুছে. প্রত্যহের চলার পথের সমস্ত জঞ্জাল সরিয়ে, নির্মল চেতনার সূর্যালোকে হৃদয় আদিগন্ত ব্যাপ্ত, প্রসারিত হয়ে ওঠে। আর সেই বিরাট আকাশে ফুটে ওঠে জীবনের সাতরঙা রামধনু। এভাবেই জীবনের ঋতুচক্রের আবর্তন, প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গেই যেন সমসূত্রে বাঁধা।

কবিতাটি যদি এখানেই শেষ হত, তাহলেও এক ধরনের পূর্ণতার আস্বাদ পাওয়া যেত। কিন্তু শেষ হয়নি। কবিতার প্রারম্ভ 'বর্ষে বর্ষে কাল কাটে, প্রাত্যহিক, নিঃসঙ্গ, করাল!' একটি জীবনের গুটিকয় বছরের যোগফল নয়, যেন অনন্তকালের ফলশ্রুতি। একটি কালে অনন্তকালের আভাস, তাই এসেছে 'কালের রাখালে'র চিত্রকল্প। সে অতল নীলে জীবনের সমস্ত মালিন্য ধোয়া মাঠ-ক্ষেত-গাছ-পাতা, নদীর ঊর্ধ্বে সুনীল আকাশে তাই ইন্দ্রধনুর বলয়ে আভাসিত পাহাড়ের নীল চূড়া—নীলকণ্ঠ কালের রাখালের স্তব্ধ স্মিত হাস্যমূর্তি। আর জীবনের যে আকাশে এই মূর্তি আভাসিত হয় তা 'তোমারই হৃদয়'। কবিতাটি প্রেমের—যে প্রেমের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি, তাই

জীবনের কবিতা, যার মধ্যে মহাজীবন আভাসিত। বিশ্বতানে বেঁধে দেওয়া সেই যে ধ্রুবপদটি—যা মহত্তম কবির অনায়াসায়ত্ত ছিল, একালের বিচ্ছিন্ন, অতি নিঃসঙ্গ করাল জীবনের গানে মিলিয়েছেন বিষ্ণু দে। তাই প্রকৃতি ও মানুষ তাঁর চোখে অভেদসিদ্ধ।

বিষ্ণু দে-র প্রকৃতি দৃষ্টির আর একটি পৃথক দৃষ্টান্ত দিই। নাগরিক মানুষ শিকারের দলের সঙ্গে বনে গিয়েছেন। দুইদিকে বন। মাঝখানে ঝিকিমিকি পথ, প্রকৃতির তালে তালে এঁকেবেঁকে চলেছে, গাড়ীর হেডলাইটে থেকে থেকে জন্তুর চোখ জ্বলে, কাঁচ কাঁচ খরগোস লাফিয়ে পালায়। টিলার উপরে পলাশের ঝোপে হঠাৎ বনময়ূর নেচে ওঠে, তাঁবুর ছায়ায় বসে নদীর সুরে সেই নাচের তালের মিল ঘটান। বস্তুপ্রকৃতির কোমল সৌন্দর্য উপভোগ করেন। নদীর কিনারে চুপি চুপি জল খেতে হরিণ আসে। চিতা লাফিয়ে পড়ে। বৎসহারা হরিণের দূরাগত ডাক শোনা যায়। বন্য প্রকৃতির সে বন্য সৌন্দর্যও উপভোগ করেন—যেমন করে বয়স্ক মানুষ 'অবজেকটিভ্' চোখে প্রকৃতিকে দেখে। প্রকৃতি নিয়ে কোনো ভাবালুতা নেই, 'সাবজেকটিভ্' রং চাপাবার চেষ্টা নেই। তারপরের কথাগুলো মানুষের জীবনে প্রকৃতির বাস্তব উপযোগিতা, লাভক্ষতির হিসেবে প্রকৃতিকে বিচার :

> কোথায় সে বন, বসতিও কই বসে নি / শুধু প্রান্তর, শুকনো হাওয়ার হাহাকার /
> জঙ্গল সাফ, গ্রাম মরে গেছে, শহরের / পত্তন নেই, ময়ূর মরেছে পণ্যে।

একেবারে বনসংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণীসম্পদরক্ষার উদ্যোক্তাদের আক্ষেপ, পরিকল্পনাহীন দেশোন্নয়নের জন্যে বিশেষজ্ঞের দীর্ঘশ্বাস। ২০ পংক্তির কবিতার ১৬ পংক্তি এই নিয়ে। তারপরেই :

> কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায়? / কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ?

এখানেও মানুষের অসহায়তা ও প্রকৃতির গৌণতা নিয়ে কোনো ভাবালুতা নেই। তথাকথিত প্রকৃতি-প্রেমিকের দৃষ্টি এ নয়। কিন্তু এখানেই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে অভেদ ঘটে গেছে তা কেবল সাদৃশ্যে নয়, সাযুজ্যে ও সামীপ্যে। এ অভেদত্ব এসেছে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার অন্তর্গূঢ় সম্পর্কের বোধ থেকে। কবি এখানে সত্যিকারের প্রকৃতি-প্রেমিক এবং জীবন-প্রেমিক। সে প্রকৃতি প্রত্যক্ষ হয় ভৌগোলিক সীমার মধ্যে—যার নাম দেশ, স্বদেশ, তারই সীমার মধ্যে; সে জীবন প্রত্যক্ষ হয় নিজের মধ্যে, নিজের কাছের মানুষের, দেশের মানুষের মধ্যে। দেশের প্রকৃতি ও মানুষ বাঁধা যে-প্রীতির সূত্রে, তারই নাম স্বদেশপ্রীতি,—মানুষ, মাটির প্রতি টান। তাই কবিতাটি স্বদেশপ্রীতির। 'বন কেটে বসত গড়তে হয়', এদেশে বনই কাটা হল বসতি গড়ে উঠল না, গ্রাম মরে গেল শহর গড়ল না। পুরনো জীবনের কুটির ভাঙল, নতুন জীবনের সৌধের ভিত পত্তন হল না। পুরনো মূল্যবোধ গেল, নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠল না। গ্রাম গেল গ্রাম্যতা গেল না। কোথায় ঘর বাঁধা হবে? আত্মীয়তা পাতাবার কিছু নেই, নিজের দেশেই নিজে পরবাসী, পরদেশী ট্যুরিস্টের মতো সারাদেশময় ঘুরে মরা। তাই মমত্ববোধের বেদনায় আক্ষেপ :

> সারা দেশময় তাঁবু বয়ে বয়ে ঘুরব? / পরবাসী কবে নিজ বাসভূমি গড়বে?

বিষ্ণু দে'র এই প্রকৃতি দৃষ্টির বিশেষত্বের জন্যেই প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু হয়ে উঠেছে এমন সব উপমান, প্রতীক ও চিত্রকল্প, যাদের সাদৃশ্যধর্ম অতিস্পষ্ট কিন্তু বলিষ্ঠ। তথাকথিত নতুনত্ব তাতে হয়তো নেই, কিন্তু অভিনবত্ব আছে, আধুনিক মানসিক রসায়ণে তা নবীকৃত।

জীবনের উপমান—'আকাশ'।

জীবন যদি আকাশ হত আর / মানুষ যদি পৃথিবী হত তবে
জীবন হত হাওয়ারই মতো কবে / বৈশাখীর মেঘের বিপ্লবে
জীবন আহা জীবন শতবার / প্রবল প্রেমে বজ্র উৎসবে /
নতুন জলে শান্তি শতধার…

জীবন-আলিঙ্গিত মানুষই তো আকাশ-আলিঙ্গিত পৃথিবী—দ্যাবাপৃথিবী। এই আলিঙ্গনের—এই বিচ্ছিন্নতা ঘোচাবার চিরন্তন ক্রন্দনের জন্যেই তার নাম রোদসী—ক্রন্দসী, 'মনসি সন্ততা ক্রন্দসী'। জীবন আছে হৃদয়ে, জীবন দিয়ে আলিঙ্গন করা মানেই তো হৃদয় দিয়ে আলিঙ্গন করা, তাই হৃদয়ই 'আকাশ'। সে আকাশকে একবার ঘটাকাশে ঢালতে হয়, আবার ঘটাকাশকে মহাকাশে তাকাতে হয়—

পাশে নয়, আকাশে তাকাও ; স্নান করো / ডুব দাও বজ্র ও বিদ্যুতে, /
আষাঢ়ের আমন বৃষ্টিতে / বীজ কম্প্র শ্রাবণ ধারায় /
কার্তিকের কুয়াশায় / নবান্ন ভূষায় মাঠে বাটে।

এই হৃদয়-আকাশেই 'কালের রাখাল পাহাড়ের নীল চূড়া' জাগে। এই আকাশ ও পৃথিবী—জীবন ও মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের উপমান—'চক্রবাক' : 'হে চক্রবাক, যৌবন আমার'।

সত্তার উপমান—'ফুল'

যা শুধু ফুলের মতো ফুটে ওঠে রৌদ্রজলে ছায়ায় মাটিতে
শিকড়ে শাখায় পাতায় প্রাকৃতিক অর্কেস্ট্রায়
সত্তা যার নিহিত মাটিতে রৌদ্রজলে শিকড়ে শাখায়
এমন কি ফুলদানিতে সাজানো হলেও।

প্রেম সেই সত্তার শিকড়ের 'জল' :

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া তোমারই ঘাটের কাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে
জল দাও আমার শিকড়ে।

'অশ্বত্থ'—'পিপুল' সেই 'বৃক্ষ ইব দিবি তিষ্ঠত্যেক' :

গাছের স্তব্ধতা গড়ি দেহে মনে / মহা পিপুলের…

'সূর্য' :—শীতের ভোরের রোদ 'অলস গেঁয়োর মতো' কার্তিকের ধানের ক্ষেতে মাথা পেতে শুয়ে থাকে না—'মাঘের সকালে সূর্য ছড়ায় / দুই হাতে সোনা মুঠি মুঠি।' সে সূর্যের আলোয় 'অবসাদে ধান পাকে না'। সে 'সূর্যের নয়নে জ্বলে হীরক অম্লান', সে 'বিরাট তূর্য হিরণ্যগর্ভের'। 'চাঁদ' :—'কালীদহে বেনোজলে ভাসিয়ে' দেবার মতো 'বুড়ি চাঁদ' নয়, সে বাস্তবিক পৃথিবীকে যেমন করে টানে তেমনি—

জীবনে তার টান / চাঁদের মতো, জোয়ার টানে পূর্ণিমার মায়া।

এ চাঁদ ডোবে না : 'অতন্দ্র চাঁদ জেগে ওঠে আজো তোমার ললাটে লাগে।'

জীবনের দৃষ্টি খণ্ডিত নয় বলেই, বিষ্ণু দে-র প্রকৃতিদৃষ্টিও খণ্ডিত নয়, যে কোনো প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনাতেই সম্পর্কিত পূর্ণতা আভাসিত : ফুলদানির ফুলও শাখায় পাতায় শিকড়ে সম্বন্ধযুক্ত, বনে বনময়ূরের কথকের সঙ্গে চিতার লুব্ধ হিংস্র ছন্দের কথাকলির বেগ বিষয়-সম্পর্কে সম্পর্কিত ; বর্ষার সামনে পেছনে গ্রীষ্ম ও শরৎ। তাই কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা যে অনুষঙ্গই জাগায় তা স্বভাবতই ব্যাপক ও বিস্তারিত। যেমন : ধরা যাক 'বৃষ্টি'।

র‍্যাঁবো কবে এক সময় একটিমাত্র অন্যমনস্ক পংক্তি লিখে ফেলে রেখেছিলেন :

Il pleut doucement sur la ville.

ভের্‌লেন তারই অনুষঙ্গে একটি কবিতা লিখেছিলেন, যার পংক্তিসংখ্যা ১৬ :

Il pleure dans mon ville / Comme it pleut sur la ville.

বৃষ্টি নেমেছে, হৃদয় কাঁদছে, কী এক অবসাদ, কী এক বেদনা মনকে আনমনা করছে, এ বেদনা অকারণ, কারণ জানাকেই বলে এই বেদনা, প্রেমের আকর্ষণও নয় বিকর্ষণও নয়, তাই এতো বেদনা। কবিতাটি সুন্দর, কিন্তু পরিধি সীমিত। বৃষ্টি শুধু একটি মাত্র বোবা ভাবের মুখে ক্ষণিকের অস্ফুট ভাষা দিয়েই শেষ। জীবনের বিচ্ছিন্নতা-বোধের নিগূঢ় বেদনার একটি অভিব্যক্তি মাত্র। হয়তো ওদেশের বিষণ্ণ বৃষ্টির আমাদের দেশের ধারাসার বৃষ্টির মতো গভীর ও বিপুল বাসনা উদ্বোধের ক্ষমতা নেই।

এবারে অমিয় চক্রবর্তীর সেই আশ্চর্য সুন্দর কবিতাটি স্মরণ করা যাক : 'অন্ধকার মধ্য দিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।' এ বৃষ্টি শুধু নিজের মনের মাটিতে নয়

মরুময় দীর্ঘতিয়াষার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায় শিরায় স্নানে...
ধানের ক্ষেতের কাঁচা মাটি,
গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে।

এখানেও একটি মাত্র ভাব : মরুময় দীর্ঘতিয়াষার পর 'গভীর গূঢ় প্রাণে শিরায় শিরায় স্নানে'র তৃপ্তি। গভীর গূঢ় প্রাণের মধ্যে বিচ্ছিন্ন প্রাণের একাত্মতা। 'সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষা জলধারে।' গভীর, তবুও সীমিত।

ওই কবিতাটিকেই স্মৃতিতে রেখে বিষ্ণু দে যে কবিতাটি লিখেছেন তার পংক্তিসংখ্যা ৫৫। কারণ বৃষ্টি তাঁর চোখে একটি প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র নয়, তা ঢালে জল, যে জল প্রাণের সঞ্জীবনী, যে অর্থে জল আর প্রাণ প্রায় সমার্থক। সমগ্র প্রাণজগতের অনুষঙ্গ তাই কবিতায় ভিড় করেছে। বৃষ্টির সঙ্গীত ভের্‌লেনের মতো : 'O bruit doux de la pluie / Par terre et sur les toits' নয়, এ বৃষ্টির সংগীত : 'জীবনের বিরাট সেতারে / সপ্তকের তারে বাজে উদারায় অনস্থির।' এ বৃষ্টি শুধু ছাদে নয়, শুধু রুক্ষ, দিগন্তপিয়াসী স্তব্ধ মাঠে পড়ে না, এ বৃষ্টি পড়ে

পাতায় পাতায় দগ্ধ পথে গলাপিচে ইঁটে
বৃষ্টি পড়ে আকাশে মাটিতে
মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে ছাতে ও ছাতায়
ভিটেয় মাথায় ভিতে বৃষ্টি পড়ে...

যুগ যুগান্ত ধরে এই বৃষ্টিই পড়েছে, পড়েছে বাল্মীকির ক্রৌঞ্চ মিথুনের সুরে, চণ্ডীদাসের প্রাঙ্গণে। এ বৃষ্টি যশোদার বাৎসল্যের ধারা, 'বিগলিত চীর অঙ্গে 'রিমিঝিমি' শব্দ বর্ষণে রাধিকার বাসর জাগা। রাত্রির আঁধারে ঝরা 'স্বচ্ছ শুভ্র ধারা লক্ষ লক্ষ মানস-বলাকা', যারা বার্তা আনে—অণোরণীয়ান্। এই বৃষ্টিতেই বঁধুয়ার আঙিনায় কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজেন। ছাতের ওপরে পড়া বৃষ্টির সঙ্গীত শোনা নয়, খোলা জানালা দিয়ে 'ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির' দৃশ্য দেখা নয়। আর এ শুধু বৃষ্টি নয়, ঝড় এর সহকারী—সাদা কথায় যাকে বলি 'ঝড়জল'; সেই বৃষ্টি মাথায় করে জলকাদায় মাখামাখি মাঠে ঘাটে গলিতে রাস্তায় সহরে বন্দরে জীবন ও জীবিকার পথে পথে ঘোরা :

বৃষ্টি পড়ে সারা জীবনের মাঠে
জীবনের পথেঘাটে গাঁয়ে গাঁয়ে জীবনের ঝড়ে
প্রাণের ফোয়ারা
শহরে সদরে অফিসে অন্দরে বৃষ্টি পড়ে
সমুদ্রের মন্দারে মন্দারে ঝড়ের দাক্ষিণ্যভারে
মানসের কুরুবক হৈমবতী করকায়
ট্রামে বাসে কলের চোঙায়
আগুনে ধোঁয়ায় মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে
বন্দরের ডকে ॥

(চার)

সর্বশেষে জগৎ। জগৎ বলতে কী বুঝেছি, আগে বলেছি। কবির পক্ষে এই জগৎ দীর্ঘদিনের দুঃসাহসিক অভিযানের ফলে আবিষ্কৃত এক নতুন মহাদেশ। সেই মহাদেশের উদ্দেশে দীর্ঘ পালতোলা অভিযাত্রার রোমাঞ্চকরতা, মহাদেশের মাটিতে পা দেওয়ার আশা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, সেই দেশের পুঙ্খানুপুঙ্খের দিনলিপি কবির মধ্যে বিধৃত থাকে। বাধ্য হয়েই, এই অভিযানের ধারাবিবরণী বাদ দিয়ে কেবল মাত্র পথ ও সেই আবিষ্কৃত মহাদেশের মানচিত্রেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বিষ্ণু দে-র কয়েকটি অতি-পরিচিত প্রতীক ও কবিতার অংশের মধ্যে থেকে সেই মানচিত্র আঁকার চেষ্টা করা যাক।

বিষ্ণু দে-র ব্যবহৃত একটি সুপরিচিত প্রতীক 'সমুদ্র'। প্রতীকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্র জীবন—জীবন-সমুদ্র, বৃহৎ, বিপুল, নির্বিশেষ, দুর্জ্ঞেয়, অতলান্ত, একাকার, অশান্ত —সমষ্টি-জীবন। এ সমুদ্র জনসমুদ্র নয়, জনতার কোলাহল মুখরিত সমুদ্র। পৃথিবী তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন সত্তা। বিচ্ছিন্ন সত্তার কাছে সমষ্টি জটিল, গূঢ়, নিরাবয়ব, ভীতিপ্রদ। সমুদ্রের ঢেউ যেন সে বিপুল রূপহীন নামহীন একাকারের মধ্যে থেকে উপরে ফুটে ওঠা দৃশ্যগম্য অনুভবগম্য রূপের আভাস, কিন্তু সংগতিহীন, নিরাবয়ব অতল সমষ্টির উপরিতলের অর্থ-সংগতিহীন অলংকরণ মাত্র, চোখ ভোলালে এ মন ভরায় না, প্রাণ জাগায় না। বিশাল জনকোলাহল মুখরিত সমষ্টি সমুদ্রের জোয়ারে তলিয়ে থাকা ব্যক্তি সত্তা জোয়ার সরলেই আত্মসচেতনার মুহূর্তে অনুভব করতে পারে সে বালির

চড়া ; সে চড়া আধির, প্রাণহীন, অনুর্বর, কতো বিচ্ছিন্ন, কতো শূন্য, কতো অসহায়। বিষ্ণু দে অনেক পরে ('আলেখ্য') একেবারে শাদা কথায় বলেছেন :

এ জীবন বিচ্ছিন্নের সমুদ্রে সমুদ্রে নিরাকার ;
ঢেউগুলি নির্বিকার নির্বিশেষ, কোথায় সীমানা।
কার কোথা তীর কোথা তল কোথা দ্বীপ নেই জানা—
এলোমেলো ছবি সব মানুষের অসহায়তার।

কিন্তু তা অনেক পরের কথা যখন তিনি বিচ্ছিন্নতাবোধের রহস্য ভেদের open sesame পেয়ে গেছেন। 'চোরাবালি'র যুগে বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের আকাংক্ষা। জনসমুদ্রের সামনে বিমূঢ়, হতবুদ্ধি, অসহায় মনে হলেও সমুদ্রের দিকে পেছন না ফিরে, মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস বিষ্ণু দে-র মজ্জাগত : 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র যুগেই তাঁর উক্তি :

সাগরের অভিসার আমার চৈতন্যে নিত্য চলে।

আত্মচেতনা ও আত্মানুসন্ধান, যদি প্রকৃত আত্মসচেতন হয় তাহলে বিচ্ছিন্ন সত্তা বোঝে যে আধির চড়াই শুধু নয়, সে চোরাবালি ; নৈঃসঙ্গে, নৈরাশ্যে আত্মরতির গর্ভবতী বৃশ্চিকার মতোই নিজের মৃত্যু ঘটায় : সেখানে যদি অন্য কারুর পদপাত ঘটে তারও মৃত্যু ঘটে, বালিতে ডুবে মরে। আত্মসচেতনা থেকেই উত্তরণের আকাংক্ষা, সেই জন্যে চোরাবালি ডাকে ঘোড়সওয়ারকে। সে আসুক, সাত সমুদ্র চোদ্দ নদী পার হয়ে, বিশ্ববিজয়ী দীপ্তরূপে, ললাটে তার সূর্যের তিলক, হাতে বর্শা : সে জয় করুক, বাসর গড়ুক, অঙ্গে অঙ্গীকার দিক, চোরাবালিকে উর্বর করে তুলুক। কবিতাটিতে যৌন চিত্রকলা আছে এবং থাকবেই, থাকতেই হবে। জীবনের অধীশ্বর লিঙ্গরূপী, আদি মাতা যোনিরূপিনী, তাঁদের যুগনদ্ধ রূপের ফলেই কুমারের সম্ভব। তিনি পিতৃলোকের প্রত্যাশা পূরণ করেন, অসুর, অস্বাস্থ্যের, বিচ্ছিন্নতার দৈত্যকে বধ করে ত্রিলোকের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনেন। লাঙল ও লিঙ্গের শব্দমূল একই। সত্তা চায় অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত হতে। বর্তমানে বিচ্ছিন্ন বলে সে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন, সে বন্ধ্যা : তাই চোরাবালি পিণ্ডপ্রত্যাশী পিতৃলোকের দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এই যৌন চিত্রকল্পের জন্যে ফ্রয়েড বা য়ুং-এর সাক্ষ্য মানার কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এ ঘোড়সওয়ার কে ? সে জনসমুদ্র থেকে আসবে না, আসবে সাত সমুদ্র চোদ্দ নদীর পার থেকে। তার ঘোড়া 'সমুদ্র-তুরঙ্গম' নয়। কে সে ? সুপারম্যান ? নতুন মেশায়া ? কল্কি ? রূপকথার রাজকুমার ? রূপকথার রাজকুমার হলেও এখনো লালকমল নীলকমল নয়। যাই হোক, চোরাবালির 'আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোরে', উত্তরণের কামনারই ঘোর।

আত্মচেতনা থেকে উত্তরণের কামনা, মনের শৈশবে হয় উদ্ধারের কামনা, বা শুধু অভিলাষ, শৈশবের ইচ্ছাপূরণ ; মনের কৈশোর থেকে যৌবনে ক্রমশ আত্মসচেতনতা বাড়ে, প্রখর হয় ; ক্রমশ বোঝে উত্তরণ ঘটে না, ঘটাতে হয়, ব্যষ্টির বিচ্ছিন্নতা নিজেকেই ঘোচাতে হয়। ঘটার নয়, এই ঘটানোর আকাংক্ষা—বিষ্ণু দে-র চোরাবালির যুগেই দেখি। যেখানে, যে সমাজে প্রেম কামুকতার নামান্তর, সুরেশ-লাবণ্যের 'অশ্লীল-নিঃশ্বাসে' ভারাক্রান্ত হাওয়ায়, অলকার 'অসুস্থ নিঃশ্বাসে' কাঁপা 'কঠিন দেওয়ালে'র বাইরে

যাবার প্রস্তাব দিলে কুমারীর চোখে অরণ্যের, আদিম কালের ভয় ঘনায় ; যে সমাজে অনিরুদ্ধ রায় 'বেশে কেশে চেহারায় / বন্ধুত্বের আনন্দের / ল্যাভেণ্ডার সুগন্ধের স্বাচ্ছন্দ্য ছড়ায়', উৎসব শেষে বন্ধুকে বাড়ি পৌঁছে দেবার মতো ন্যূনতম সামাজিক শিষ্টতাটুকুও সে বেমালুম ভুলে যায় ; বিদ্যান্বেষী আত্মম্ভরী স্থূল অধ্যাপক ; বুদ্ধিদ্বেষী উদ্ধত শিক্ষক ; কুটিল সংসারী নারী ; লোলচিত্ত বন্ধু—দ্বিপ্রহর যাদের ঘুমিয়ে কাটে, পরস্বে যাদের 'ঘৃতসুচিক্কণ স্ফীত ঘাড়' ; সাহিত্যের নেশাপেশাদার, চিত্রকর, ফিল্মস্টার, নব্য ব্যারিস্টার —উচ্চমধ্যবিত্তের সেই milieu-তে তাঁর বাস। সেই অন্তঃসারশূন্য 'হৃদয়ে আধির চড়া' চোরাবালির নিজস্ব সমাজে থাকতে হলে তাঁকে পদে পদে বলতে হয় : 'সবই আজ ভালো সব ভালো'। কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন জাগে :

এই শুধু এই মনে হয়,
আমার আনন্দরাশি, মৈত্রী, ভালোলাগা,
এ আমার কাপুরুষতার প্রাণহীন গূঢ় ছদ্মবেশ ?
ছিন্ন হস্ত অহিংসার বৃহন্নলারূপ ?

তিনি এই milieu-র স্বরূপটি ধরে ফেলেছেন, এই শাণিত ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের আঘাত থেকেই বোঝা যায়, এর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ আসন্ন। পৃথিবীর আনন্দ মন্থর বাইশটি বসন্তের সংগীত তাঁর স্নায়ুতে থরো থরো কাঁপছে—'দুয়ারে প্রতীক্ষারত উদ্যত ট্যাক্সির মতো'। কিন্তু পালাবেন কোথায় ? 'বড় বাজারের উপল উপকূলে জনগণের প্রবল স্রোত উগারিছে ফেনা'। 'ট্রাফিক থমকে দাঁড়ায়'। পলায়ন নয় প্রয়োজন উত্তরণের। যা ছিল নিরাকার নির্বিশেষ জনসমুদ্র, তার বিশেষ চিহ্নগুলো চিনতে পারেন : বিড়ি, সিগ্রেট, উনুন আর মিলের ধোঁয়া ; পানের পিক, দীর্ঘশ্বাস ; বড়বাবুর গঞ্জনা, বড় সাহেবের কটা চোখের ব্যঞ্জনা ; কেরানির দাম্পত্য মিলনের শ্রান্ত সম্ভাবনা, অপত্যাধিক্যের অনুশোচনা ; ফেরিওয়ালার রলরোল, ডেলি প্যাসেঞ্জারদের শ্রান্ত পদক্ষেপ—এই জনসমুদ্র, যা বাঞ্ছিতাকে অভ্যর্থনা জানাতে হাওড়া স্টেশনে নির্দিষ্ট মুহূর্তে পৌঁছবার পথে ট্রাফিক জ্যাম করে, মধ্যবিত্ত মানসিকতায় বিদ্রূপার্থে যা 'জনগণে'র প্রবল স্রোত—জনসমুদ্র। তার কোলাহল বিরাট একটা হৈ চৈ, 'একটা লাগডাঁট আওয়াজ' মাত্র। তবু তারই মধ্যে বিশেষ চিহ্নগুলোর স্বরূপ চেনার মানসিকতা স্পষ্ট :

আশে আর পাশে, সামনে পিছনে / সারি সারি পিঁপড়ের সারি /
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো / এতলোক জীবনের বলি, /
মানিনি আগে / জীবিকার পথে পথে এত লোক /
এত লোককে গোপন সঞ্চারী
জীবনে যে পথে নামিয়েছে জানিনি মানিনি আগে
পিঁপড়ের সারি…

জানার ও মানার এই অভীপ্সা থেকেই সেই জনসমুদ্রের স্বরূপ সন্ধান। নির্বিশেষ সমুদ্র তো অগণিত বিশেষ নদীর সমষ্টি। তাই সমুদ্রের সন্ধান মেলে নদীর স্বরূপে। এ নদী সে নদীই নয়, দেশ দেশান্তরের অযুত নদীর মিলে-অমিলে মেশানো নদীস্বরূপ জানতে হয়। নদীর দিকে চোখ ফেরালেই চোখে পড়ে দেশে কালে বিধৃত ভৌগোলিক সীমা —তার নিত্য প্রবাহিত তীরে মাঠ প্রান্তর সহর গ্রাম—জীবন ও জীবিকা—অব্যাহত

ইতিহাস। মানুষের এই ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক শতমুখী প্রবাহের নিত্যকালের সম্মিলিত জলস্রোতের একাকার পরিণাম চির আন্দোলিত সমুদ্র—জনসমুদ্র। জীবনের এই মহাপ্রবাহ থেকে হাতে কাটা 'শত শত খাল' মানুষের জীবন, যে জীবন বিরাট প্রসারিত নিজের ভূগোলেই প্রত্যক্ষ :

শত শত তাল, দিঘি খাল নদী, দুপাশে সোনালি খেত,
হাজারে হাজারে দেখ জমির মালিক
কৃষাণ, কৃষাণ বৌ ভূস্বর্গ ইন্দ্রাণী যারা
সুস্থ বাল্যে, সচ্ছল যৌবনে, বার্ধক্য প্রসাদে আহা রূপসীরা
প্রত্যহের সুচির লীলায় কর্ম অবসরে
যে যার সংসার করে, এখানে ঠাকুর গাঁয়ে,
ওখানে বালুরঘাটে, কাকদ্বীপে, সুসংপাহাড়ে, সারা বাংলায়
দেহে মনে দুই তটে, খেতে খেতে খামারে খামারে, রৌদ্রজলে
দীপ্তবাহু, দৃপ্ত উরু, পূর্ণিমার মানুষ মানুষ
সত্য যারা সবার উপরে

'শত শত খাল' শতমুখী প্রবাহের মতো জীবনের স্রোতের টানেই নিয়ে যায় :

…উত্তাল ভামর
প্রতিশ্রুত স্বপ্নবীজ অবিশ্রাম ভাঙনের সাগর সঙ্গমে,
সহিষ্ণু ঘটনা স্রোতে, রুদ্র সমুদ্রের, সংগঠন, স্বাধীন সমাজে
স্বাধীন মানুষ স্বচ্ছ জীবনের, উন্মুক্ত পত্তনে।

তখনই 'বিচ্ছিন্নের সমুদ্রে সমুদ্রে একাকার' সীমাহীন, নিরুদ্দেশ ঢেউ, তলহীন, দ্বীপহীন এলোমেলো এলাকার রূপ সমুদ্রের আর থাকে না। কারণ :

তার পরে পৃথিবীর ভূগোলে শিল্পীর মেলে দিশা ;
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তীরে তীরে দেশে দেশে বন্দরে বন্দরে
প্রত্যক্ষে স্বরূপ দেয়, ইতিহাস গড়ে ঘরে ঘরে
মানুষ মানুষ চেনে, জীবনে শরীর পায় ঈশা।

তখনই সমুদ্র নতুন নামরূপে তাৎপর্যে মণ্ডিত জনসমুদ্র হয়ে ওঠে। তখনই চোরাবালির শূন্যতা তারই জোয়ারে প্রাণগর্ভ হয়ে ওঠে। তখনই সবাইকে ডাক দিতে ইচ্ছে করে (কবিতাটি অমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে) :

এসো জনসমুদ্রের জোয়ারে জোয়ারে
উদ্বেল সফেন জলে অসীম একাকী
মাতৃসমা প্রতিমায় অগণিত তরঙ্গে তরঙ্গে ঘৃণা আর ক্ষমা
নীলে নীলে একাকার জীবনে জীবনে কামনায় কামনায়
মাছে ও শুশুকে মাছে কাছিমে শুশুকে
শত শত মাছ শত শুশুক কাছিম শত পাখি
নিঃসঙ্গ সমুদ্র প্রাণ কল্লোলে একাকী
দিকে দিকে তরঙ্গ মুখর ক্ষিপ্র তরঙ্গে তরঙ্গে নির্নিমেষ।

'তখনই জীবন ওঠে তীরে', অর্থহীন ঢেউ হয়ে ওঠে 'প্রচণ্ড নাটক'। আর আমরা প্রতিটি সত্তা :

প্রত্যক্ষের নাট্যে মাতি নটনটী দর্শক পাঠক।

অর্থাৎ জীবন হয় 'কমিট্‌মেণ্ট'—জীবনে জীবন যোগ করা engagement। হাতে খাল কাটা, শত শত খাল নদীর সংযোগ ঘটিয়ে মাঠ খেত উর্বর করা, ফসলের সুনিশ্চিত আশ্বাস পাওয়া, জীবনের প্রবাহকে অবিরল স্বচ্ছন্দ অব্যাহত রাখা। নইলে রুদ্ধপ্রবাহ বন্যা আনবে, মাঠ খেত ডুববে, ফসল মরবে, মারী মড়কে জীবন উৎসন্ন হবে।

জীবনের মূলে নিজের প্রতি আসক্তি, জীবনে জীবন যোগ করার মূলে ভালোবাসা। জীবন 'কমিট্‌মেণ্ট' হলেই ভালোবাসার পাশে এসে দাঁড়ায় ঘৃণা, জীবনের পন্থী যা তার প্রতি ভালোবাসা, যা পরিপন্থী তার প্রতি ঘৃণা। এই ভালোবাসা আর ঘৃণার হাতিয়ার নিয়ে জীবনের রক্ষায়, প্রতিষ্ঠায়, বিস্তারে জীবন তাই দায়বদ্ধ সংগ্রাম। বিষ্ণু দে সে দায় অঙ্গীকার করেছেন। এ কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, একে রাজনীতি বলে না, এ জীবনবোধের প্রখর চেতনা। যা কিছু মানবিক, যা কিছু শোভন, যা কিছু সুন্দর—তাকে বাঁচাবার প্রতিজ্ঞা, পরিপন্থীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা। কবি তাই যোদ্ধা,—আক্ষরিক অর্থেও যোদ্ধা। বিষ্ণু দে'র কবিতায় তাই বাবুদের উক্তা, মাঠের ধানের পাহারায় চাষীর হাতের কাস্তের শান, মজুরের হাতুড়িধরা শক্ত মুঠোয় পেশীর বল, মিছিলের মুখের গান।

যে কবির 'কমিট্‌মেণ্ট' আছে, তার বিপত্তিও আছে। তাৎক্ষণিকতাকে তিনি কখনোই মূল্যহীন বলে মানতে পারবেন না বলে তাৎক্ষণিকের আশু দাবীর জন্যে বহু ক্ষেত্রে তাঁর আবেগের উত্তরণ ঘটে ওঠা কঠিন হয়ে ওঠে ; তাই বহু ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা চেতনাবিদ্ধ হয়ে উঠতে বাধা পায়, তাৎক্ষণিকের স্মৃতিই হয়ে থাকে। তা হয় ঘটনার নির্দেশের তাগিদে। যাকে পল এলুয়ার নাম দিয়েছেন 'Poèsie de commande', কিন্তু তাকে হতে হবে 'Poèsie de cuiconstance'। এই cuiconstance কথাটি 'পরিপার্শ্ব' বা 'পরিবেশ' বললে খুব পরিচ্ছন্ন হয় না, circumstance, occasion, incident, emergency—সব মিলিয়ে তার অর্থ। এলুয়ার বলেছেন :

> 'স্মৃতি মুছে যায়, কিন্তু চেতনা ঠিক থাকে। commande বা নির্দেশের কবিতা আর cuiconstance বা পরিপার্শ্বের কবিতাকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। নির্দেশের কবিতা দৈবাৎ কবির অভীপ্সার সঙ্গে, তার গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে মিল খেয়ে যেতে পারে। সত্যিকারের পরিপার্শ্বের কবিতা কবির মন থেকে উৎসারিত হয়ে উঠবে অন্য মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত আয়নার যথাযথতা নিয়ে। তখনই তা তারই সাড়া দেবে, মায়াকভ্‌স্কি যার নাম দিয়েছেন 'সামাজিক নির্দেশ'। যা দৈবাতের নির্দেশ-নয়, যাকে একটিমাত্র ঘটনা বলে মনে হয় না, যাকে পাল্টানো যায় না।
>
> 'বাইরের পরিপার্শ্বের সঙ্গে ভিতরের পরিপার্শ্বকে সমাপতিত হতে হয়, যেন সে কবিতা কবির নিজেরই সৃষ্টি।' তাই তখনই তা সত্য হয়ে ওঠে

প্রেমের আবেগের মতো, বসন্তের ফুটে-ওঠা ফুলের মতো, বেঁচে থাকার জন্যে গড়ার মতো। কবি নিজের ভাবকে অনুসরণ করবে, কিন্তু সে ভাবকে নিয়ে যাবে মনের প্রগতির বাঁকে নিজের নামটা খোদাই করে রাখতে। আর একটু একটু করে জগৎ ব্যক্তিকবির স্থান জুড়ে বসবে, জগৎ তাকে ঘিরে গান গেয়ে উঠবে।'

এ শর্ত বিষ্ণু দে-ও পূরণ করেছেন। তার প্রমাণ তাঁর 'সাত ভাই চম্পা', 'সন্দ্বীপের চর'। কালের ব্যবধানে আজ যখন তাৎক্ষণিকতার স্মৃতি ধূসর হয়ে এসেছে, তখনও ঝকঝক করছে কবিতাগুলোর কালোত্তীর্ণ চেতনার ধার—'চেতনা খর কুঠার', যে ধারে জীবনের পথে আগাছা কেটে চলেছি।

বিষ্ণু দে'র কবিতায় স্বদেশ-স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা অর্থাৎ স্বদেশপ্রেমের পৃথক্ উল্লেখ অধিকন্তু মনে করি। কারণ যে মহত্তর জীবনচেতনায় তিনি বুঁদ, তা মাটি জল নদী পাহাড়—স্বদেশের বিদেশের মানুষ—এদেশের ওদেশের সর্বদেশের সর্বালিঙ্গিত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক চিত্রপটে ধরা। তবু একথা মনে করিয়ে দেব, আধুনিক কবিদের দলে তিনি কতো পৃথক্। আধুনিক কবিদের কেউ হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথ হাঁটলেন দু'দণ্ড শান্তি খুঁজে পেলেন না ; কেউ দেহ ও মনের কারাগারেই চিরবন্দী হয়ে রইলেন ; কেউ বা তিক্ত ঘোষণা করলেন 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'। মানুষ, স্বদেশ, সমাজ—সবই অনেকের অগোচরে রয়ে গেল। তাঁদের কাব্যে রইল শুধু বিচ্ছিন্ন সত্তার জ্বালা, বেদনা, ক্ষত, যন্ত্রণা আর প্রতিবাদ। কারণ প্রখর আত্মচেতনায় দীপ্ত হলেও প্রকৃত আত্মসচেতন তাঁরা হয়ে উঠতে পারেন নি, পরিণামে তাই আত্মরতির কুম্ভীপাকে পড়েছেন। জীবনসমুদ্রে নামতে তাঁদের দ্বিধা ছিল, কুণ্ঠা ছিল, তাই তাঁদের ভাগ্যে মুক্তিস্নান ঘটেনি, যেমনটি ঘটেছে বিষ্ণু দে'র ক্ষেত্রে। তাই বিষ্ণু দে মানেন

শরীরের অন্তঃস্থ প্রজ্ঞানে
চৈতন্যের সাযুজ্য সঙ্গে স্তব্ধতায় শূন্যে ডুবে যায়
আকাশের পাড়ে পাড়ে সমুদ্রের বিশ্বব্যাপ্ত
রাত্রি আর দিনের একতা
যেখানে অভিন্ন এক, দেশে দেশে ধ্যানমগ্ন জয় পরাজয়ে,
ক্ষয়ের অনন্ত সুরে শান্ত শুভ উদার ভৈরবী
আয়োজন ঊর্মিময় চৈতন্যে অক্ষয়।

সত্তা যেখানে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন, সেখানে পীড়া অনিবার্য, মানবিক নৈঃসঙ্গ্য, রিক্ততা, একাকীত্ব অবশ্যম্ভাবী ; সেখানে নৈরাশ্যের ভাষা, মৌনের তিক্ততা, 'মনসা সন্তুতী ক্রন্দসীর দিগন্ত পর্যন্ত লম্বিত', কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে তিনি জেনেছেন :

অথচ যেখানে অন্তর্দৃষ্টি জলধরশ্যাম অনেক হৃদয়ে
বজ্রে বজ্রে গাজনে মন্থিত করে বিদ্যুতের নীলকণ্ঠ আশা,
দূর্বাদল অভিরাম এ-মাঠে ও-মাঠে, ধানীরঙে আদিগন্ত
অরণ্যের সংহত মিছিলে, একত্র সংহত অন্বয়ে অব্যয়ে,
আশা ও নৈরাশ্যের পর্বে পর্বে পুরুষার্থে ছন্দোত্তীর্ণ ভাষা,
যে ভাষায় জীবনের দীর্ঘছন্দ কর্মে স্বসমুখ আদিগন্ত।

এই যে 'পুরুষার্থে দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ ভাষা' বিষ্ণু দে আয়ত্ত করেছেন, তার ব্যাকরণ মার্ক্সবাদ। কার্ল মার্ক্সের সেই কথাগুলো স্মরণ করতে হবে :

> 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির, যা মানুষের নিজের থেকে নিজের বিচ্ছিন্নতার, স্পষ্ট বিলোপ হিসেবে কমিউনিজম, এবং তার ফলে মানুষের দ্বারা এবং মানুষের জন্যে মানবিক সার-সত্তার সত্যকার আত্মসাৎ-করণ হিসেবে কমিউনিজম, সামাজিক মানুষ হিসেবে নিজের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন ; এই প্রত্যাবর্তন সচেতন, এবং তা সম্পন্ন হয় পূর্ববর্তী বিকাশের সমগ্র ঐশ্বর্যের মধ্যে। পূর্ণ বিকশিত স্বাভাবিকতাবাদ হিসেবে এই কমিউনিজম মানবিকতাবাদের সমপর্যায়ে এবং পূর্ণ বিকশিত মানবতাবাদ স্বাভাবিকতাবাদের সমপর্যায়ে ; মানুষ ও প্রকৃতির এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের এটাই হচ্ছে খাঁটি নিষ্পত্তি—অস্তিত্ব ও সত্তার, স্বাধীনতা ও প্রয়োজনের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যেকার বিরোধের প্রকৃত নিষ্পত্তি।'

তিনটি আপাত বিচ্ছিন্ন ভুবনের সমরেখায় মিলনবিন্দুটির সন্ধান পেয়ে বিষ্ণু দে এই যে ভাবের ত্রিভুবন গড়ে তুলেছেন, তাঁর এই ভাবভুবনের, এই ভাবলোকের তোরণদ্বার খুলবার এই হচ্ছে 'ওপেন সিসেম'।

বিষ্ণু দে-র কবিতার গড়ন

অরুণ সেন

প্রত্যেক কবির বিচারেই তাঁর সমগ্র রচনা এবং সেই রচনার কালানুক্রম সম্পর্কে জ্ঞান খুব কাজে লাগে। কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে সেই জ্ঞান প্রায় অপরিহার্য। বিষ্ণু দে, আমাদের মতে, সেরকমই একজন কবি। অথচ বিষ্ণু দে-র রচনার সমগ্রতা ও কালানুক্রম বিষয়ে বহু পাঠকই অজ্ঞ বা উদাসীন। বিষ্ণু দে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘদিন লিখেছেন এবং প্রায় ছেদহীনভাবে লিখেছেন—যে কারণে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে চিঠিতে উচ্ছ্বসিত-ভাবে জানান, 'আপনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়'। এবং শুধু তাই নয়, একথাও হয়তো বলা যায়, তিনি অনেক লিখেছেন (এক্ষেত্রে অবশ্য বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের তুলনা ওঠে না)। তাঁর বহুপ্রসূ রচনায় আছে অনেক বাঁক, নিরবচ্ছিন্ন প্রগতি—প্রসঙ্গ ও প্রকরণের প্রগতি। আর সে-বিষয়ে অজ্ঞতা থাকলে যা হয়, তা হল তাঁর প্রথম দিককার কোনো কবিতাকে খ্যাতির কারণে মনে করা হয় তাঁর পরিণত প্রকরণের প্রতিনিধিমূলক উদাহরণ—যদিও হয়তো কবিতার সংখ্যা বা স্বভাব কোনো দিক থেকেই তার সমর্থন নেই। কবির প্রথম দিককার কোনো কবিতা কোনো পাঠকের কাছে সংগতভাবেই চূড়ান্ত সিদ্ধির উদাহরণ বলে মনে হতেই পারে (যেমন ধরা যাক, 'ঘোড়সওয়ার')—কিন্তু তখনও, কবিজীবনে তার স্থান কোথায় এবং তাঁর সমগ্র কাব্যসৃষ্টিতে তা প্রতিনিধিমূলক কিনা, এই বিস্মরণ অমার্জনীয়।

এটা বেশি বিপত্তিকর হয় বিষ্ণু দে-র কাব্যবিকাশের প্রথম পর্যায়ের কবিতা বা কাব্যগ্রন্থের আলোচনায়। কাব্যবিকাশের চুড়োয় পৌঁছবার আগেই যে-পরিক্রমা চলে, সেই পরিক্রমার পর্বে পর্বে প্রায়শই নিপুণ ও সার্থক কবিতাও বেরোতে পারে তাঁর হাত দিয়ে (যে-কথা অনেকেরই মনে হয়েছে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি'-র কোনো কোনো কবিতা পাঠ করে), কিন্তু তাকে কখনই তাঁর কাব্যস্বরূপের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা চলে না।

এর ফলে যা হয়, শুধু একটি কবিতার ক্ষেত্রেই নয়, কোনো এক যুগের কাব্যবৈশিষ্ট্য বিষ্ণু দে-র সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গেঁথে যায় বিষ্ণু দে-র নিরন্তর প্রবহমানতার কালানুক্রম বিষয়ে অজ্ঞ পাঠকের মনে। আর সেই ভ্রান্তিতে মনে হয়, বিষ্ণু দে কাব্য-প্রকরণে এলিয়টের অনুসারী—যদিও সেটা তাঁর কাব্যবিকাশের প্রথম পর্যায়ে কিছুটা বলা গেলেও, পরবর্তী পর্যায়ে, তাঁর কাব্যজীবনের দীর্ঘতর সময়ে, মোটেই সত্যি নয়। অবশ্যই প্রথম পর্যায়ের প্রাকরণিক অভিজ্ঞতাকে তিনি আত্মসাৎ করেছেন, কাজেও লাগিয়েছেন হয়তো পরে—কিন্তু তার চেয়েও সত্যি, তিনি অনেক দিন ছেড়ে এসেছেন এলিয়টী প্রকরণের সংস্পর্শ। ঠিক সে-রকমই প্রথম পর্যায়ের পরেই তাঁর কবিতার

শব্দগত বা পুরাণ-উল্লেখগত পড়াশোনাজাত দুরূহতা যদিও অনেক কমে যায়, ক্রমশই কমতে থাকে, কখনো শব্দ ও উল্লেখের-সারল্য প্রায় হয়ে ওঠে বিস্ময়কর, তবু অমনোযোগী পাঠকের পূর্বস্মৃতি অনড়। দুরূহতার অপখ্যাতি রয়েই যায়।

কালানুক্রম বিষয়ে শুধু তথ্যজ্ঞান থাকলেই অবশ্য কাজ শেষ হয় না। বিষ্ণু দে-র প্রবহমান বৈচিত্র্য, অথচ সেই সঙ্গে অবিচ্ছিন্নতা, রবীন্দ্রনাথের মতোই, তাঁর প্রকরণে এমন-একটা বৈশিষ্ট্য দেয়, যার স্বাদ পূর্বযুগের প্রকরণের আলোয় আরো স্পষ্ট হয়। এক পর্বের প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কখনো পরম্পরায় কখনো বৈপরীত্যে তিনি পর্বান্তরে চলেন। ফলে, আরো একটা বড় ক্ষতি বিষ্ণু দে-র হঠাৎ-পাঠকদের—তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয় না কোন্ শব্দ, কোন্ বাক্প্রতিমা, কোন্ উল্লেখ শব্দ-বাক্প্রতিমা-উল্লেখের অরণ্য থেকে উঠে এসে কিভাবে তাঁর সামগ্রিক কাব্য-অভিজ্ঞতায় আত্ম-উন্মোচনের কাজ করছে, তাঁর কবিতার চাবিকাঠির কাজ করছে। বুঝে উঠতে পারবেন না তাঁরা 'বীজকম্প্র' শব্দের তাৎপর্য কিংবা দীর্ঘ ব্যবহারের সুবিধায় কেন 'কপিলগুহা' শব্দটির একবার উল্লেখেই অন্য এক পাঠকের হৃদয় স্বচ্ছ হয়ে যায়। অথচ প্রথম জীবনের মুখ্য ও গৌণ অজস্র পুরাণ-উল্লেখ থেকে এভাবেই তো গড়ে ওঠে তাঁর কবিতায় কৈলাসবাসী হরগৌরী বা সতী-পার্বতী বা কুমারসম্ভবের ইঙ্গিতময় প্রতীক। শুধু তাই নয়, এক-একটি পর্বের উপমা-উল্লেখের পুনরাবৃত্তিতে ও পুনর্গঠনে তৈরি হয় স্থায়ী এক-একটি পৌরাণিক কাঠামো। এভাবেই বৃষ্টি-নদী-সাগরের প্রাকৃত উপমায় মেলান তিনি ভাগীরথী ও সগরসন্তানমুক্তির পুরাণকে। নগ্নতনু সৌন্দর্যের প্রতীক আর্টেমিস কিংবা অচ্ছোদজলে সদ্যস্নাতা কবিমানসী মিলে যায় প্রতীক্ষারতা মহাশ্বেতায়—কিংবা আরো পরে আমাদের জীবিকার লড়াইয়ে সহকর্মিণী সঙ্গিনী জঙ্গী নারীতে। 'চোরাবালি'-র নানার্থব্যঞ্জক প্রতীক ঘোড়সওয়ার লোকায়ত অবয়ব পায় লালকমল-নীলকমলে, সামাজিক-রাজনৈতিক অবয়ব তেভাগা আন্দোলনের কৃষাণকৃষাণীতে। এইভাবে পারম্পরিক সংলগ্নতায় ও বিকাশে পৌরাণিক উল্লেখগুলি বাস্তব-জীবনে তাৎপর্য পায় তাই নয়, জটিল শব্দ বা শব্দবন্ধের পাঠও পুনরাবৃত্তির গুণে অনায়াস হয়ে যায়, কবির নিজস্ব শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠতে থাকে। কবির বাক্যগঠনের ধরনও হতে থাকে পাঠকের পরিচিত। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, প্রথম জীবনে শব্দ উপমা প্রতিমা বা উল্লেখে তথাকথিত পাণ্ডিত্যের যে কিছুটা উগ্র প্রকাশ দেখা যায়, তার কোনো নান্দনিক ও ঐতিহাসিক যাথার্থ্যকে আমরা অস্বীকার করছি। সুধীন্দ্রনাথ যাকে 'নৈরাত্ম্যসিদ্ধি' বলেছেন—স্বকীয়তা প্রকাশের মিথ্যা অহংকার নয়, আত্মম্ভরী প্রগল্‌ভতা নয়, সত্যভাষণের নিরহংকার একাগ্রতা এবং পূর্বসূরীদের আশ্রয়পুটে প্রকাশভঙ্গির সংক্ষিপ্ততা ও বক্রতা—এ সমস্তই ছিল রবীন্দ্রোত্তর কবিতার জন্মকালীন দায়। সুধীন্দ্রনাথের ভাষা আবারও ব্যবহার করে বলা যায়, সভ্যতার প্রাথমিক সরলতা আজ আর সম্ভব নয়, আজকের জটিল ও কুটিল জীবনে ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ করেই কাব্য-কল্পতরুর জন্ম দিতে হয়।

কিন্তু, মানতেই হবে, বিষ্ণু দে যদি সেখানেই থেমে থাকতেন, যদি ঐ পাণ্ডিত্য কবি-ব্যক্তিত্বের-বিকাশের একটি প্রাথমিক, চমকপ্রদ কিন্তু প্রাণময় স্তরের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই না থেকে স্থায়ী সুর হতে চাইত, তবে সেই পাণ্ডিত্যের কূট ভেদ করার শ্রম হত পণ্ডশ্রম। অবশ্য, কিছু কিছু কবিতার আতিশয্য বাদ দিলে, সে-পর্বেও কূট ভেদের

অত্যুৎসাহ ততখানি আবশ্যক কিনা এটাও সন্দেহ—যদি না অবশ্য সেই পাঠককে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তর দিতে হয়। প্রকরণের কূটজালে আবৃত প্রথম পর্যায়ের কোনো কোনো কবিতা বিষয়ে সতর্ক পাঠকদের অস্বস্তি ততখানিই সত্য, যতখানি সত্য এই মেঘাচ্ছন্ন ঐতিহাসিক ক্ষণ পার হয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল সাবলীলতার জগতে পাঠকের সহজ নিঃশ্বাস। দুঃখের বিষয়ে বিষ্ণু দে-র সমগ্র কাব্যসম্ভারকে সামনে রেখে এই কালজ্ঞান অনেকেই দেখাতে পারেন না। তাঁর কাব্যের দুর্বোধ্যতা নিয়ে কিংবদন্তির পরমায়ু বড় দীর্ঘ, তার আড়ালে প্রত্যক্ষও লুকিয়ে থাকতে চায়।

কিন্তু এই সমস্তই তো বাইরের বাধা। এই ভ্রান্তিগুলো যে পাঠক উত্তীর্ণ হবেন, তিনি কি আর কোনো বাধার সম্মুখীন হবেন না বিষ্ণু দে-র কবিতার ক্ষেত্রে? কবিতার ভেতরকার বাধা? সেটাই তো আসল বাধা, বড় বাধা।

বিষ্ণু দে প্রথমাবধিই নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পরিত্রাণের কথা ভেবেছিলেন। তাই অনুশীলনী পর্বে আর কেউ নয়, প্রমথ চৌধুরীই বোধ হয় তাঁর সবচেয়ে অনুকরণীয় মনে হয়েছিল—ট্রিয়োলেটগুচ্ছ বা এমন কি গল্প রচনাতেও। পরে, আরেকটু সিরিয়স পর্বে, বিদেশী ও স্বদেশী সাহিত্য বা পুরাণ থেকে অজস্র উল্লেখ, এমন কি বাক্য বা বাক্যাংশ ব্যবহার করে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন পরোক্ষতায়। 'চোরাবালি'-তে এসে অনেক কবিতাতেই দেখতে পাই কী ভাবে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিককে মেলাচ্ছেন তিনি কবিতায় একাধিক মাত্রার সম্পাতে। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায়, ব্যক্তিগত অনুভূতির গোষ্পদে বিশ্বমানবিক ছায়া।

ক্রমশ কী ভাবে সেই মাত্রা বেড়ে যায়, রূপান্তর ঘটে তার সামাজিক-রাজনৈতিক অন্বয়ে, শব্দ-ভাণ্ডারেরও বিস্তার ও বৈচিত্র্য ঘটে—তা-ই তো বিষ্ণু দে-র কাব্যধারার ইতিহাস। ফলে, যে পাঠক একটি মাত্রা খুঁজবেন, তিনি শব্দপ্রয়োগের অসরল উচ্চাবচতায় অস্বস্তি বোধ করবেন। নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চাপ এখানেও আছে, পাঠক নিশ্চয়ই তাতে সাময়িক সাযুজ্যও বোধ করেন—কিন্তু অচিরেই অর্থান্তরের ছোঁয়া তাঁকে বিচলিত করে—শব্দপ্রয়োগের আকস্মিকতা বা দূরত্ব তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একই কবিতার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দেই শুধু নয়, একই শব্দে একাধিক মাত্রা বিপর্যস্ত করে দিতে পারে পাঠককে। একটি প্রতিমা কখনো ব্যক্তিগত উত্তাপ বিকীরণ করে, কখনো উদ্ভাসিত হয় ইতিহাসের সাঙ্গীকরণে—লুকোচুরি চলে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার। কবিতার একটি অর্থকে গ্রহণ করে যে পাঠক স্বচ্ছন্দে এগোতে চায়, অকস্মাৎ বাঁধা সড়ক থেকে প্রবল ধাক্কায় ছিটকে পড়ে—কবিতার মোচড়ে আভাসিত হয়ে ওঠে ভিন্ন মাত্রার ভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা।

'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থে 'প্রতীক্ষা' কবিতাটির শেষাংশটুকুই ধরা যাক। প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে অংশটির শুরু: 'গাঁয়ের ওপারে নদী বেগে প্রায় ঝর্ণা'। মোটামুটি কোনো অসুবিধে হয় না পাঠকের। কিন্তু খানিক পরেই অভাবিত সব শব্দ আসতে থাকে: 'তবুও নিথর পাখির ঝাঁকে জলের বাঁকে' লাইনটি থেকে। তখনই বোঝা যায় আগের প্রাকৃতিক বর্ণনা যতটা নিরীহ মনে হয়েছিল, ততটা তা নয়। নিছক প্রকৃতিপ্রেমের

মুগ্ধতায় কবিতাটি হজম করা শক্ত। কিংবা 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' বইয়ের সেই বিখ্যাত 'ক্লান্তি নেই' কবিতাটি ?

'চাই না তুমি বিনা শান্তিও,
তোমাকে চাই তাতে ক্লান্তি নেই।
কৃষ্ণচূড়া রাঙে, সেও তো হাহাকার ?
আমারই হৃদয়ের কান্তি ও।'

কবিতাটিকে কেউ কেউ নিছক প্রেমের কবিতা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার আগের স্তবকের বহু শব্দই তাঁদের অস্বস্তিতে ফেলে—'জীবন উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়' ইত্যাদি অংশে। ঐ অস্বস্তি তখনই ঘুচবে, যখন পাঠক এ-বিষয়ে সজাগ হবেন যে, 'তুমি', 'শান্তি', 'আকাঙ্ক্ষা' কোনো শব্দেই আর এখানে একটি জিনিস বোঝায় না।

ফলে যে বহুমাত্রার বিন্যাস কবির নন্দনের অম্বিষ্ট, তার শরিক হতে হয় পাঠককেও। কবিতাকে বা সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিকেই চিনে নিতে হয় শুধু কবিতা থেকে নয়, তার সংলগ্ন কবির অন্যান্য রচনা ও এমন-কি সামাজিক-রাজনৈতিক বা সাহিত্যগত কাজকর্মের পরিচয়েও। পল্‌কা, দুর্বল, অতিসরল শিল্পবিলাসী কাব্যবোধে এই জটিল বহুমাত্রার কবিতা একটা উঁচু পাঁচিল হয়ে দাঁড়ায়।

কারণ তো এই, বিষ্ণু দে-র কবিতার বিচরণভূমি বিরাট, বিস্ময়করভাবে বিরাট। অনেক ভুবন তিনি হেঁটে বেড়ান, কিংবা হয়তো সে একই বিরাট ভুবন। নিছক বিষয়ের বা উপকরণের দিক থেকে, উপমা বা উল্লেখ বা বাক্‌প্রতিমার উৎসস্থলের দিক থেকে, অনুভূতির ও কল্পনার ভিন্ন ভিন্ন তল বা পর্দার দিক থেকে তাঁর কবিতায় বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কিন্তু এ বুঝি শুধু বৈচিত্র্যই নয়, একই প্রেরণার ঐশ্বর্যরঙিন প্রকাশ। সেই ঐশ্বর্যেই ঝলমল করে তাঁর কবিতার জগৎ। বিভিন্ন বিদ্যা বা জ্ঞানের আশ্রয় তিনি নেন, সেই কৈশোর থেকেই, যে-কারণে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন 'আমাদের ভালোবাসা রিফ্লেক্‌স্‌ লিলি', এই ব্যঙ্গোক্তির প্রকাশে সাইকোলজির আকাঁড়া শব্দ-প্রয়োগের জন্য। অবশ্য অভ্যাসের এমনই গুণ যে, এখন আর প্রবলতম বিষ্ণু দে-বিরোধীও বোধহয় এই দৃষ্টান্ত এ-প্রসঙ্গে গ্রাহ্য করবেন না।

সুতরাং বিষ্ণু দে-র কবিতার জগতের এই ব্যাপ্তি এবং জটিলতাই একটা বড় বাধা। সময়ের তালে তালে যদিচ সময়ের সঙ্গে অসরল সম্পর্কে চলে বলে এই কাব্যধারাকে যেমন কালানুক্রমিকভাবে জানতে হয়, তেমনি কবি যত কিছু বিষয়কে ও উপাদানকে গ্রহণ করেন, প্রথম জীবনের বৈদগ্ধ্য-প্রদর্শনের উগ্রতায় নয়, ক্রমশ কাব্য-অভিজ্ঞতার লক্ষ্যের একাগ্রতায় ও বাক্‌প্রতিমার অন্তর্নিহিত গরজে, সেই অনিবার্যতাকে গ্রহণ করার নিরলস ক্ষিপ্রতাই চাই পাঠকদের কাছ থেকেও। বিষয় ও উপাদানের এই ব্যাপকতাকে নিছক পাণ্ডিত্য বলে মনে করলে ভুল হবে তখন, এ পরিগ্রহণ তো তাঁর নন্দনচেতনারই অন্তর্গত। সাম্যবাদীর জগৎকল্পনার বৃহৎ স্বপ্ন ও দৈনন্দিন রাজনীতির সরলীকৃত প্রয়োজনসাপেক্ষ কর্মকৌশল যেমন এক নয়—তেমনি সর্বজনবোধ্য লোক-কবিতা বা

গণ-কবিতা আর এমনকি মার্কসবাদীর আধুনিক কবিতা, এ দুয়ের লক্ষ্য কখনই এক বলে তিনি মনে করেন নি।

এ তো গেল বিষয় বা উপাদানের দিক থেকে এই ব্যাপ্তি। মেজাজের ওঠানামাও কম দিশেহারা করে না পাঠককে। কখনো বাক্‌বাহুল্যে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দেন, কখনো চলে যান প্রায় স্বল্পবাক্ নিঃশব্দের কবিতার ধার ঘেঁসে। কখনো যুক্তির গাম্ভীর্যে তিনি শুদ্ধ পিরামিড তৈরি করেন, আবার কখনো লিরিক স্বচ্ছতায় পাঠককে চঞ্চল করে তোলেন। নদীতে কখনো শান্ত স্রোত, কখনো আকস্মিক ঘূর্ণি। অনুভূতির এই বৈচিত্র্য, কখনো চড়া পর্দা, কখনো খাদ, কখনো শুদ্ধ স্বর কখনো-বা কোমল—তার ঝোঁকে শব্দেও মোচড় পড়ে—অপ্রত্যাশিত, অনভ্যস্ত টান আসে।

কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে? তাঁর পরিণত রচনায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই ওঠানামা—শব্দের এই অর্কেস্ট্রা বা ভাস্কর্য। 'অন্বিষ্ট' বা 'জল দাও'-র মতো যে-কোনো একটি দীর্ঘ কবিতার অনুসরণেই বোঝা যায় মেজাজের এই বৈচিত্র্য।

'জল দাও' কবিতাটির শুরু মোটামুটি এলায়িত নৈমিত্তিক একটা ভঙ্গিতে:

'ফাল্গুনে আরম্ভ তার—
এক হিসাবে অবশ্য মাঘেই,
কিম্বা তারও আগে,
ও বছরে—বা আর বছরে
বছরে বছরে দীর্ঘ প্রকৃতির কর্মসূত্রে অথবা নিয়মে
ছোট ঘেরা মাটির সংযমে'

এই ছেড়ে বলার ভঙ্গিটি শীগ্‌গিরিই কাটিয়ে কবির গলায় আবেগের দ্রুততা আসে:

'তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন্
বসন্তবাহার লাগে সহিষ্ণু হৃদয়ে থরো থরো
প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাগ্র নির্দেশে
আনন্দে নিমেষহীন রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল।'

তার পরই সেই আবেগ গড়িয়ে যায় ধীর স্তব্ধ উপলব্ধিতে:

'সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি
ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে
বিনীত পদ্মের মতো নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত
কর্মের সংবিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ শাদা বেলফুল।'

কখনো বেদনায় তিক্ততায় টেনে টেনে বলেন:

'এখানে ওখানে দেখ কত ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায়—

কি যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় নাকি সে ঢাকায়…'

কিংবা কখনো তত্ত্বের গাম্ভীর্য :

'হয়তো বা নিরুপায়
হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস'

কিংবা

'আমাদের ইতিহাস মুহূর্তে মুহূর্তে গোনে
তরঙ্গিত আয়ু তার জীবনমৃত্যুতে।'

তার পর অকস্মাৎ 'সতর্ক গম্ভীর' স্তব্ধ-প্রতীক্ষা ভেঙে পড়ে জলস্রোতের দোলায় :

'তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল্ ছড়াবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গ আতত
বালা সরস্বতী কিম্বা রুক্মিণী দেবীর মতো
বৈশাখীর-বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর—
কিম্বা যেন বল্গা ধরে তাতার সওয়ার একাগ্র সংহত
পামীরে আরালে কিম্বা বুঝি কাশ্যপ সাগরে
তার পর লাগে দোলা লাগে দোলা
থরথর স্রোত
কল্লোলে মুখর
সমুদ্রে সমুদ্রে ওঠে তালে তালে
সমুদ্রে নদীতে নীল মহাসমুদ্রের কান্নায় হাসিতে…।'

এইভাবে চলে আরো দীর্ঘ পতনঅভ্যুদয়ে বন্ধুর পরিক্রমা।

একেই তো বলি শব্দচিত্র। বিষ্ণু-দের কবিতায় তাকে যে সব সময় আয়নার সোজা প্রতিফলনে পাওয়া যাবে এমন নয়। তাকে পাওয়া যাবে এমন-কি কখনো বৈপরীত্যের চালে। হয়তো যাকে মনে হয় ছদ্ম-বিষাদ, আসলে তা স্যাটায়ার, তীব্র পরিহাস। কিংবা আপাত-পরিহাসের আড়ালে থাকে বিধুর বেদনা। মহাকাব্যিক বিষয়-মহিমাকে তিনি প্রকাশ করেন হাল্‌কা কথনের ভঙ্গিমায়। ফলে দ্বান্দ্বিক কৌতুকের এই মেজাজকে অনেক সময়ই ঠারে-ঠোরে বুঝতে হয় তাঁর কবিতায়।

অবশ্যই শব্দের এই ঐশ্বর্য ও গতিশীলতা এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বান্দ্বিকের তীক্ষ্ণতা—কবিতার অবয়বের এই গড়ন—রাতারাতি তাঁর কাছে পৌঁছয় নি, যতই তিনি কৈশোরেই পরিপক্ব কবি বলে চিহ্নিত হোন না কেন। এরও একটা বিবর্তন আছে, আছে কষ্টার্জিত প্রাপ্তি। যদি ধরা যায়, 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থই তাঁর এই কাব্যভাষার, তাঁর নিজস্ব স্টাইলের প্রবেশতোরণ—তবে তার আগে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে 'সন্দ্বীপের চর' পর্যন্ত ধাপে ধাপে কী ভাবে তিনি এই ভাষার অনিবার্যতায় পৌঁছলেন, সেটাও চোখ মেলে দেখতে হয়।

'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থে ইন্দ্রিয়সচেতন তারুণ্যের নিঃসঙ্গ অভিযানের কাহিনী। প্রায় ঝকঝকে তরোয়ালের মতো ঋজু, সংযত শব্দ ব্যবহারে তিনি প্রকাশ করেন এই বিষন্ন নিঃসঙ্গতার প্রতিমা, নানা পুনরাবৃত্তিতে—সঙ্গে সঙ্গে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা জ্যোতি-বিজ্ঞানী উপমায়। এক অর্থে এ পুরনোই বটে—তরুণ কবির এ নিতান্তই প্রথাসিদ্ধ যাত্রারম্ভ, আপাতদৃষ্টিতে। তবু শব্দের তীব্রতায় ও পরিচ্ছন্নতায় আশ্চর্য নতুন। প্রায় একই সময়ে রচিত 'চোরাবালি'-তে কিন্তু অনুসন্ধানী প্রকরণের পরিধি অনেক বিস্তৃত। একবার হয়তো তিনি ছুটছেন প্রতীক নির্মাণের স্বাবলম্বনে (যেমন 'ঘোড়সওয়ার'-এ), আবার হয়তো সময়ের চাপকে মেনে নিয়ে অনুভূতির অবাস্তব ঐক্যকে ভেঙে ফেলে শব্দের ও বাক্‌প্রতিমার আপাত-অসংহতির প্রতিফলনে (যেমন 'টপ্পা-ঠুংরি'-তে)। কিংবা 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা'-তে পরোক্ষ ও পরিচিত প্রসঙ্গের স্বকীয় ব্যবহারের কৌশলে। কিন্তু সব কিছুরই উদ্দেশ্য হচ্ছে এই নবলব্ধ আত্মসচেতনতাকে ছড়িয়ে দেওয়া।

কিন্তু নিছক কবিব্যক্তিত্বের এই নিরবলম্ব নিঃসঙ্গ প্রচেষ্টায় তো আত্মপ্রসারণের একটা সীমা আছে। তার ফলে 'পূর্বলেখ' বা 'সাত ভাই চম্পা'য় সেই অবলম্বন খুঁজে নেওয়ার প্রতিজ্ঞায়, ধীরে ধীরে বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক কমিটমেন্টে, তিনি, খানিকটা যেন কৌশলগত পিছুহটার মতোই, কাব্যপ্রকরণকে সংহত গূঢ়চারী করে তুললেন। উড়ন্ত পাখির ডানা কেটে দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে আনলেন 'পূর্বলেখ'-তে মৃত্তিকাসন্ধানের সচেতন পরিকল্পনায়। হাল্‌কা ভাসমান বৈদেশিক প্রসঙ্গ ও উপমার বদলে উপনিষদ বা মহাভারতের জগৎ থেকে চরিত্র ও ভারি শব্দ উপর্যুপরি ব্যবহার করে তিনি খানিকটা যেন ধ্রুপদী কঠিন ও নিশ্ছিদ্র গাঢ়তা আনলেন—সনেটের বন্ধনে, অপরিচিত শব্দের প্রাচুর্যে, দীর্ঘ কবিতার পৌরাণিক রূপান্তরে। পরের গ্রন্থ 'সাত ভাই চম্পা'-তেই আবার সেই ভাবকে হাল্‌কা করে দিলেন রূপকথার লৌকিক ছড়ার জগতে, ফ্যাসিস্টবিজয়ী রুশ অভিযানের প্রতি সহজ প্রত্যয়ে। কবিতা প্রায় ছুঁতে চাইল বাক্যের স্তবকের প্রতিমার সহজ নিটোল সাবলীলতাকে।

তার পর 'সন্দ্বীপের চর'-এ, আবার সামনে পা ফেলে ছড়াতে চাইলেন তিনি নিজেকে। আগের পর্বের অভিজ্ঞতা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু সহজ উত্তরণে তো তাঁর তুষ্টি নেই। তাই দাঙ্গার তিক্ত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে, ভারতব্যাপী মুক্তি-আন্দোলনের গৌরবময় পরিবেশে তাঁর আবেগের কেন্দ্রে যেন বিস্ফোরণ ঘটল। দীর্ঘ কবিতায় শব্দের বাধাবন্ধহারা প্রগল্‌ভতায়, উপমার বিস্তারিত সংগঠনে ও আয়োজনে তিনি তাঁর কবিতার আত্মউন্মোচক শব্দ ও প্রতিমাগুলিকে আবিষ্কার করলেন। এই প্রথম শব্দ ও প্রতিমার কিছুটা সঞ্চয়প্রবণ ও পল্লবগ্রাহী প্রাচুর্য থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত নির্বাচন ঘটতে থাকল। কবিকে চেনা যায়, বোঝা যায় এমন-সব উপমা, শব্দ—নদী-সাগর, গঙ্গোত্রী-কপিলগুহা বা উমা-সতী এই-সব প্রতিমাপুঞ্জ—কিংবা 'স্বপ্নবীজ' বা 'ঊর্মিল-বিপ্লব'-এর মতো ইশারায় ভরপুর প্রতীকোপম শব্দযুগ্ম যেন তৈরি করে নিচ্ছেন কবি এ-যুগেই।

অর্থাৎ জমি তৈরি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সমস্ত চাপটাই বাইরের দিক থেকে। বাইরের ধাক্কায় কবিব্যক্তিত্বের ঢালাই-পেটাই-গড়াই চলেছে মাত্র। কিন্তু এ-পর্যন্ত

কবির বিশ্বাসের জগতে মোটামুটি যে স্বচ্ছন্দ ধারাবাহিকতা চলছিল, তা প্রথম ধাক্কা খেল সাম্যবাদী রাজনীতির ইতিহাসের এক বিভ্রান্তিকর অধ্যায়ে। কবির বিশ্বাসের জগৎ সমানই অটুট, অথচ তিনি বিচ্ছিন্ন সহযাত্রীদের কাছ থেকে। ঠিক এ-রকম ঐতিহাসিক মুহূর্তেই, ভেতরে ভেতরে যখন তিনি প্রবল নাড়া খেয়েছেন, তখনই, ঘটল সেই রসায়ন—শব্দের আত্মসচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা প্রস্তুতির অতীত এমন-একটি ঘটনা, যখন সব উপার্জন সংশ্লিষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে একেবারে ভেতর থেকে, তার পর বাইরে এসে বিশ্লিষ্ট হয়, যেন রামধনুর সাতরঙের বিচ্ছুরণ। বিশ্বাস ও আবেগকে চূর্ণ করে প্রিজমের মধ্য দিয়ে বর্ণভঙ্গ ঘটিয়ে তিনি যেন প্রত্যেকটি রঙকে বুঝে নিতে চান। তাই কি 'রামধনু' শব্দটি তাঁর এত প্রিয় এই গ্রন্থে, এবং পরেও?

এইভাবে বেরিয়ে এল স্বতন্ত্র এক ভাষা, কবির নিজস্ব উচ্চারণ। 'অন্বিষ্ট'-তেই আমরা প্রথম পেলাম কবির উপলব্ধির সম্পূর্ণ জগৎ। তাঁর কাব্যচেতনা ও প্রকরণ-সিদ্ধির উদাহরণ। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বর। সেই স্বরের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন উচ্চারণ।

বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে, পর্ব-পর্বান্তরের প্রকরণগত নানান চমক সত্ত্বেও, এই প্রাপ্তি বা উপার্জন যেন খানিকটা, অসংলগ্ন নয় বলেই, অনায়াস। এই প্রসঙ্গে আবারও মনে পড়ে যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের কথা। কিন্তু এই বিকাশের আনুপূর্বিক সঙ্গী যে পাঠক হন নি, তাঁর আকস্মিক পঠনে অভ্যাস প্রায়শই আহত হয়। ভাষার এই বিকাশলব্ধ, কিন্তু সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত উচ্চারণে অপ্রস্তুত বাঙালি পাঠক তাই দিশাহারা। বিষ্ণু দে-র ভাষার এই নবীনতার কারণেই মাইকেলের দৃষ্টান্ত মনে এসেছে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত-র। এক-অর্থে ঠিকই। মাইকেলের কাব্যভাষার—প্রবহমান অমিত্রাক্ষরের—প্রায় বৈপ্লবিক নতুনত্বের কারণেই উচ্চারণ করতে পারেন নি তৎকালীন পয়ারে অভ্যস্ত পাঠকেরা—এমন-কি বিদ্যাসাগর, যিনি গদ্যে ছন্দের সুষমা এনেছিলেন। তাই ক্ষুব্ধ মাইকেলকে বলতে হয়েছিল: My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

বিষ্ণু দে-র এই নতুন কবিতার পাঠও ভিন্ন। তবু এ পাঠ নতুন কবিতারই পাঠ। তারই প্রয়োজনে এর জন্ম। এ কথা বলে নেওয়া ভালো, কারণ বিপত্তিটা ঘটিয়েছেন বোধ হয় বিষ্ণু দে নিজেই। রেকর্ডে তাঁর 'ঘোড়সওয়ার' পাঠের কথা বলছি। আগের যুগের কবিতাকে নতুন যুগের উচ্চারণে পড়লে যে জোর খাটানো হয়, উচ্চারণে কালানৌচিত্যের দোষ ঘটে, তা প্রমাণ করেছেন বিষ্ণু দে নিজেই, 'ঘোড়সওয়ার'-এর অতিপ্রত্যক্ষ নাটকীয়তাকে 'অন্বিষ্ট'-যুগের কথোপকথনের ক্যাজুয়াল উচ্চারণে পাঠ করে। ঠিক যেমন 'অন্বিষ্ট'-র উচ্চারণে শিখিয়েছেন এই নতুন স্বরক্ষেপের মধ্যেই আছে তাঁর নতুন কাব্যভাষার রহস্য।

তাঁর কবিতায় প্রসঙ্গের ঐশ্বর্য যখন জাঁকালো ও নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, অথচ বাইরের আঘাতে দীর্ণ হয়ে ভাষার অন্তর্মুখী প্রত্যাবিচ্ছুরণ নতুন নতুন মাত্রা পেতে শুরু করেছে, তখনই তো বাক্যস্রোতে এসেছে ঘন ঘন বিরতি বা বাঁকবদল। ঠিক দ্বিধা নয়, সাবলীলতার উচ্ছ্বাসে অবিশ্বাসী আত্মসচেতন জটিল মনের সততা, আহত সততা। স্বগতভাষণ বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে সংলাপের স্বাভাবিক মন্থর অন্তরঙ্গ সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ বাক্যের একটা আপাতশিথিল কাঠামো।

কথার চালে মেশানো থাকে অনেক অভিপ্রায়। লিখিত ভাষার ব্যাকরণকে মানলে তাকে হয় একাধিক সরল বাক্যে ছড়িয়ে দিতে হয়, অথবা উপবাক্য বা subclause ও প্যারেনথিসিসের বিন্যাসে বাক্যকে জটিল রূপ দিতে হয়। কিন্তু মুখের ভাষায় অংশ-গুলির শারীরিক নৈকট্যই প্রধান, এমন-কি সমস্ত বাক্যটিই হতে পারে অসমাপ্ত বা ছিন্ন বাক্যাংশের একটি স্বাভাবিক নক্‌শা। কিংবা কথনের চালে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা যায় এক প্রতিমা থেকে আরেক প্রতিমায়, এক ইন্দ্রিয় থেকে আরেক ইন্দ্রিয়ে—প্রতিমার শৃঙ্খলায় বা গোত্রান্তরী বাক্‌প্রতিমায়। 'এলুয়ার' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে লেখেন: 'আমরা আমাদের ঘনিষ্ঠ আলাপে দেখি যে দুজন মানুষ কথা বলতে গিয়ে পর্বে পর্বে যুক্তি বা ন্যায় সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করে কথা বলে না। একজন অবলীলাক্রমে বলতে পারে, আকাশ দেখ কী কালো। আর একজন বলতে পারে, মাটির গন্ধে বুক ভরে এল। ব্যাখ্যা করতে হয় না রং থেকে গন্ধ, আকাশ থেকে মাটিতে যাওয়ার পর্বটা। মানবিক আবেগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো বেশি মধ্যপদলোপী হয়ে যায়, অধিকন্তু পারস্পরিক পরিচয়ের অনেক ইঙ্গিত, প্রতীক, কল্পপ্রতিমা এসে পড়ে, যেমন এসে পড়ে অতীত ও বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অঙ্গাঙ্গিতা। এমন-কি ব্যাকরণও প্রথাসিদ্ধ চালে চলে না।'

'সন্দ্বীপের চর' ও 'অন্বিষ্ট'-র তুলনা করা যায় এই সূত্রে। 'সন্দ্বীপের চর'-এ বাক্যস্রোত, অভিপ্রায়ের দিক থেকে বিচার করলে, অনেক ক্ষেত্রেই একই রেখায় চলে—সেখানে বাক্যগুলি, বাক্যাংশগুলি বা শব্দ ও শব্দবন্ধগুলি অনেক সময়ই সমার্থক—সেখানে একই প্রতিমা বা প্রতিমাপুঞ্জের অনুবর্তন। তারা আবেগের বিভিন্ন পর্দা বা scale-কে প্রকাশ করে মাত্র। ফলে সব মিলিয়ে আবেগের একটা নাটকীয় উত্তেজনা প্রায় সব সময়ই থাকে। কিন্তু 'অন্বিষ্ট'-তে বহু জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ের বাক্য বা বাক্যাংশের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন সংযোগে, কিংবা ইন্দ্রিয়চেতনার প্রকৃতি পরিবর্তনে ও প্রতিমাশৃঙ্খলের বহুধা বৈচিত্র্যে বাক্যের একটা স্বতন্ত্র বহুমাত্রিক স্থাপত্য তৈরি হয়।

'কাকে বলো প্রাত্যহিকে তোমার শরীর মনে ঘরে
আমার প্রাণের বাষ্প নীড় পাবে তোমার আকাশে
যেখানে হাওয়ায় ভাসে
কখনো একাগ্র ঝঞ্ঝা কখনো উন্মনা শুকতারা
নিদ্রাহীন আমার আকাশ?'

'সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ভালো লেগে লেগে
আমারও অন্বিষ্ট তাই
অণুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।'

'অবিরাম হানা দাও একান্তে সত্তার তুমি
প্রাকৃত, অবুঝ।'

আবেগের স্রোত এখানে মাঝে-মাঝেই প্রতিহত, শব্দব্যবহারের কৌশলে। দমকে দমকে শব্দ উচ্চারিত হয়, ওঠানামা করে।

অবশ্যই এ-ভাষার সঙ্গে মানুষের কথা বলার ধরনের সাদৃশ্য আছে—হয়তো বিশ্লেষণ করলে পুরনো কলকাতার, কিংবা হয়তো বাংলাদেশেরই কিছুটা সার্বিক বাক্‌রীতির মৌল রূপের প্রভাবও আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু তা বলে বিষ্ণু দে কখনই মুখনিঃসৃত অসংবদ্ধ অসচেতন বাক্যকে আশ্রয় করেন নি। অর্থাৎ দৈনন্দিন মানুষ যে কথা বলে, তার একটা রূপ আছে—যা খানিকটা সাময়িক, চরিত্রহীন, সহজেই ফ্যাশনের দ্বারা প্রভাবিত, খানিকটা পিছল ও ফিচেল। কিন্তু দৈনন্দিন বাক্‌রীতির অন্তর্নিহিত একটা আলাদা চারিত্র্যও আছে, আছে তার মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ শক্তি ও স্বাস্থ্য। আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দ বহুলাংশে এই দৈনন্দিন বাক্‌রীতির সঙ্গেই যুক্ত! বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে অবশ্য প্রশ্নটা এভাবে ওঠেই নি। তিনি তথাকথিত গদ্যছন্দের অস্পষ্টতা বা অনির্দিষ্ট-তার প্রবল বিরোধী। আবার অন্য দিকে তথাকথিত পদ্যছন্দের সুরেলা ব্যাপারকেও খারিজ করেন। তাঁর কাছে এটা কোনো আলাদা সমস্যাই নয়। যে কবিব্যক্তিত্বে তিনি বিশ্বদৃষ্টির সমগ্রতাকে কবিতায় আনতে চান ভারমুক্ত সহজ কৌতুকে, সেই ব্যক্তিত্বেরই স্বাভাবিক নির্বাচনে বন্ধনের মধ্যেই তিনি আনেন মুক্তি, ছন্দকাঠামোর মধ্যে দৈনন্দিন বাক্‌স্পন্দ। ছন্দের লয় মেনেও কোথায় যেন এসে যাচ্ছে সহজ বাক্‌ভঙ্গি-উৎসারিত গদ্যোচ্চারণের একটা ঝোঁক। অথচ সেই ঝোঁকটাই আবার অসামান্যভাবে, যেন অন্য এক স্তরে, মেনে নিচ্ছে ছন্দের শৃঙ্খলা। ফলে ছন্দে বা উচ্চারণে তৈরি হচ্ছে একটা বিপরীতের সমন্বয়। ছন্দকাঠামো ও গদ্যস্পন্দের একটা অদ্ভুত টানাপোড়েন। এই সমন্বয় ও টেনশন তো তাঁর কাব্যভাষার আলগা বৈশিষ্ট্যই নয়. এর উৎস তাঁর কাব্য-অভিজ্ঞতাতেই। তাঁর কবিতায় যেমন গতির ও স্থিতির, কঠিন ও তরলের সিম্‌ফনি তৈরি হয়, তেমনি তারই প্রয়োজনে তাঁর ছন্দেও আসে বাক্‌স্পন্দের এই উচ্চাবচ ভাস্কর্য।

কিভাবে তৈরি করেন তিনি এই ভাস্কর্যের খাঁজ, আলোছায়ার খেলা? কখনো মাত্রাসমাবেশের চলিত রীতি ভেঙে টলিয়ে দেন সুরেলা উচ্চারণের আবেশকে। কখনো লঘু ও গুরুর, যুক্তাক্ষর ও স্বরবর্ণের স্বাধীন বিন্যাসে ধাক্কা দেন। কিংবা কম্পন আনেন আকস্মিক অনুপ্রাসের কৌতুকে। কখনো-বা শব্দনির্বাচনের কৌশলে শব্দার্থের স্বতন্ত্র মর্যাদাতেই দাবি করেন উচ্চারণের স্বতন্ত্র মনোযোগের ধরন। প্রত্যেকটি শব্দ তখন আলগা আলগা পৃথকভাবে উচ্চারিত হতে চায়। একই বাক্য বা বাক্যাংশে বা স্তবকে ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় সাজিয়ে দেন। সব মিলিয়ে তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন সুরের, বা হয়তো সুর ও সুরভাঙার একটা শব্দজাল: ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক আবেগ ও উপলব্ধিতে শব্দোচ্চারণের একটি জটিল স্বতন্ত্র রীতি।

'আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
বেঁচে মরি দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস-যামিনী,
দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে,
তোমার সমুদ্রে আর শরীরের তীরে ॥'

অর্থাৎ শব্দব্যবহারের কৌশলেই তিনি নতুন উচ্চারণ সৃষ্টি করেন, সৃষ্টি করেন তাঁর কবিতার নিজস্ব সংগীত। বিষ্ণু দে-র কবিতা প্রসঙ্গে সংগীতময়তার কথা বারবার উঠেছে। বোধহয় এই কারণেও যে সাংগীতিক উপমা বা প্রতিমা তিনি অবিরল ব্যবহার করে চলেন তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য বুঝতে সংগীতবোধ সত্যিই সাহায্য করে নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বভাবতই এই ধ্বনিবৈশিষ্ট্য এসেছে মূলত তাঁর শব্দচেতনা থেকেই। সাংগীতিক নানা রীতি তাঁর কবিতার চলনে উপমিত হতে পারে, কিন্তু তা তাঁর শব্দব্যবহারকৌশলের অমোঘ শক্তির বশবর্তী হয়েই এসেছে। সংগীতের সুরছোঁয়া থাকার ফলে হয়তো ভিন্ন মাত্রা এসেছে—কিন্তু তাঁর প্রকরণের নন্দনকে ধরতে হলে এই শব্দকৌশল থেকেই যেতে হবে সংগীতের দিকে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রাবীন্দ্রিক মাত্রাছন্দকে নিজের সুরে বাজিয়েছেন বিষ্ণু দে, এই বলে প্রশংসা করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রবহমান মাত্রাবৃত্তের আদি প্রয়োগের কথাও বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। শঙ্খ ঘোষ দেখিয়েছেন, এ তো বাইরের কথা। আসলে প্রথম থেকেই তাঁর প্রবণতা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দসঞ্চার করার তাগিদে ছন্দের সব কটি একককেই অতিক্রম করা। স্তবক গঠনে, পঙ্‌ক্তির সংখ্যা বা আকার কিংবা পর্বসংখ্যা নির্ধারণে তিনি ভাঙতে ভাঙতে চলেন, বৈচিত্র্য আনেন, দ্রুত ছন্দবদল করেন, এক চাল থেকে আরেক চালে চলে যান, এক লয় থেকে আরেক লয়ে।

শুধু স্তবকের পরিসীমার মধ্যেই নয়—দীর্ঘ কবিতার গড়নেও এই বৈপরীত্যের সমাবেশ। কখনো তা তাই ইয়োরোপীয় সংগীত সিম্ফনির গড়নের সঙ্গে তুলনীয়—পয়েন্ট/কাউন্টার-পয়েন্টের মধ্য দিয়েই কবিতারও মুভ্‌মেণ্ট। কিংবা কারোর যদি সিম্ফনির সুনির্দিষ্ট সুনিরূপিত কাঠামোর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ কবিতা সর্বত্র তুলনীয় মনে না হয়, কেউ তুলনা করতে পারেন ফ্যুগ-এর দ্বন্দ্বপ্রবাহের সঙ্গে, যেমন করেছিলেন চঞ্চল-কুমার চট্টোপাধ্যায়। কিংবা ভারতীয় রাগসংগীতের মতোই, কারোর মনে হতে পারে, এর গড়ন স্বাধীন ও বিকাশোন্মুখ। কিন্তু সর্বত্রই, এমনকি শেষোক্ত উদাহরণেও তাকে তিনি উপস্থিত করেন বৈপরীত্যেরই বিন্যাসে।

বলাই বাহুল্য, এই ছন্দ, এই ভাষা, কবিতার এই গড়নই তো তাঁর কাব্যস্বভাবের অনিবার্য আশ্রয়—বহু বিষয়, বহু মাত্রা, বহু সুরের জটিল বিন্যাসে গাঁথা কোমলেকঠোরে মন্দ্রিত মহাকাব্যিক কবিস্বভাবের ভাষা। আর তা অর্জিত হয় প্রশান্ত নির্বাচনে নয়—যে কথা বিষ্ণু দে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, দর্জির মাপ নিয়ে জামা তৈরি নয়—জীবনের যে টেনশন বা চাপ থেকে তাঁর কবিতার জন্ম, তারই দাবি এই ভাষা। এক-অর্থে তাই দ্বন্দ্বময় ব্যাপ্ত জীবন থেকেই তিনি কবিতার ভাষা সংগ্রহ করেন। তিনি জানেন, 'এখানেই খুঁজে পাবে ভাষা'।

সেই অনুসন্ধানে এক বৃত্ত থেকে আরেক বৃত্তে গিয়ে পড়েন, এক টেনশন থেকে অরেক টেনশনে। ত্রিকালকে বিধৃত করতে চেয়েছেন তিনি এভাবেই—কাল ও দেশের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চিত করতে চেয়েছেন ভাষার দ্বন্দ্বময় অবয়বে।

> 'একটি কবিতা তাই উৎসারিত মর্মান্তিক আর্তিতে মুখোমুখি বর্তমানে মুহূর্তে সঞ্চিন…।'

প্রসঙ্গ ঃ জীবনানন্দ দাশ

বিজিতকুমার দত্ত

টি. এস. এলিয়ট পরিণত বয়সে ইস্ট কোকার-এ বলেছিলেন 'অতএব অন্ধকারই হবে আলোর দূতী, স্তব্ধতা নৃত্যের ভূমিকা। স্রোতোস্বিনীর মর্মরধ্বনি, শীতের বিদ্যুৎ, অদৃশ্য বন্য গন্ধ, বনের রসালো ফল, বাগানের ফুলের হাসি, প্রতিধ্বনির তীব্র আনন্দ—কিছুই হারিয়ে যাবে না। এসবই ইঙ্গিত করছে জন্ম-মৃত্যুর বেদনার সূত্রটিকে।' রবীন্দ্রনাথও লক্ষ করেছেন 'সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন—/ কিন্তু কেন।' এই মহাজিজ্ঞাসার উত্তর তিনি কি পেয়েছিলেন ? জীবনানন্দের কালে 'কাড়াকাড়ি'-টাই বড় বেশি প্রকট হয়েছিল। এবং এক যন্ত্রণাদায়ক জিজ্ঞাসায় তার সমাপ্তি। বোধ করি সমকালীন সমাজের অপব্যয় এবং অপচয়ই কবিকে করেছিল বিক্ষুব্ধ। এবং এ বিক্ষোভ অমেয় আলোকধারার গতিকে শাশ্বত কোনো বন্ধনে বাঁধতে দিল না। জীবনের এই অপচয় নানাদিক থেকে হচ্ছে। মানুষ প্রেম চেয়ে প্রেম পায় না, মহৎ হতে গিয়ে ক্ষুদ্রতার বেড়াজালে বন্দী হয়ে পড়ে, নীতি মানতে গিয়ে দুর্নীতির গোলোকধাঁধায় ঘুরপাক খায়। এই যদি Absurd দর্শনের ভিত্তিভূমি হয় তাহলে বলতে হয় ন্যায়ের পথটাই সে পরিহার করেছে। শাস্ত্র বার বার বলেছে ন্যায়ের পথে চল, কিন্তু অ-ন্যায়ই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করছে এই কালে। ইতিহাসও সেই কথা বলবে। দূরকাল এবং অনাকাল সর্বত্রই অনিয়মের রাজত্ব। এই অনিয়মের রাজত্ব থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ? ঈশ্বরচিন্তা ! নিশ্চয়ই মনীষীরা তাই বলবেন। কেননা আমাদের সকল রকম যন্ত্রণার মুক্তি ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে। আসলে যন্ত্রণা, দুঃখবরণই তো জীবন। অতএব Suffering-এর মধ্য দিয়েই এই Absurd-কে অস্বীকার করতে পারব। উনামুনো Suffering-টাকেই জীবনের দর্শন বলেছেন। তাঁর Tragic Sense-টাই জীবনের গভীর জিজ্ঞাসাকে একটা ইতিবাচক পথে নিয়ে গেছে। কেননা তিনি দেখেছেন ঈশ্বরপুত্রের মধ্যে দুঃখবরণের ইতিহাস। Irrationality-কেই তিনি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মানবতাবাদী দার্শনিকরা একথা মানবেন না। তাঁরা বলবেন ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ আবার সেই ন্যায়ের পথকে পরিহার করা। সেখানে সম্ভবত ধ্যান, অনুভূতি, উপলব্ধির রাজত্ব। একটা অন্যায়কে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমরা আবার আর একটা অন্যায়কেই গ্রহণ করছি। অতএব তা পরিত্যাজ্য। অবশ্য আরও একটা পথ খোলা আছে। ধ্বংস, মৃত্যুকামনায় স্বস্তি বোধ করা। এক বিশাল শূন্যতাই সত্য—এই রকম ধারণাও কেউ কেউ করেন। কামুর নায়িকা মার্থা এবং তার মা যখন তার ভাই এবং মাতা পুত্র জেনকে হত্যা করল

তখন আমরা বুঝতে পারি এ পৃথিবীতে আমরা একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি না। আমাদের মধ্যে মিশবার পথে দুস্তর বাধা। এই বাধা যখন অতিক্রম করতে পারি না তখন মৃত্যুকামনাই, ধ্বংসকামনাই প্রধান হয়ে ওঠে। মার্থা তার ভ্রাতৃবধূকে এই কঠিন মন্তব্য করেছিল **neither for him nor for us, neither in life nor in death, is there any peace or homeland. For you'll agree one can hardly call it a home, that place of clotted darkness underground, to which we go from here, to feed blind animals.** এই অসহায়তা দার্শনিকের কাছে একভাবে ধরা পড়েছে। কবির কাছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার করুণমধুর প্রত্যয় রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। জীবনানন্দ উনামুনোর মতো যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছেন, হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করেছেন। উনামুনো যে প্রস্থানে পৌঁছতে চেয়েছেন জীবনানন্দ সে প্রস্থানে পৌঁছতে পারলেন না। অথচ তাঁর পক্ষে পৌঁছান কত সহজ ছিল। ব্রাহ্ম পরিবারের মানুষ তিনি। পিতার কাছ থেকে উপনিষদিক জিজ্ঞাসার কৌতূহল তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ছিল। তিনিও দেবেন্দ্রনাথের মতো বলতে পারতেন 'সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া তাঁহার আনন্দলহরী প্রবাহিত হইতেছে'। অথচ তিনি কোনো ধর্ম জিজ্ঞাসায় উৎসাহ বোধ করেন নি। একথা ঠিক তাঁর কবিতায় হিন্দু-দেবদেবীব অথবা পৌরাণিক চিত্র প্রায় মেলে না। হিন্দু সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্ম পরিবারের ব্যবধান একটা ছিল নিশ্চয়ই। এদিক থেকেও তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিলেন। তিনি হিন্দুপুরাণকে নবপুরাণে রূপায়িতও করেন নি। কিন্তু কবির চিত্ত নিশ্চয়ই একটা আশ্রয় চেয়েছিল। সে আশ্রয় তাঁকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল হয়তো কিন্তু কোনো শাশ্বত কল্যাণবোধে অথবা অনন্ত আশ্বাসে উদ্দীপ্ত করে নি।

সমকালীন রাষ্ট্রচিন্তায় জীবনানন্দ আস্থা স্থাপন করতে পেরেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধেও আমরা নিশ্চিত নই। নজরুলী উচ্ছ্বাস তাঁর মধ্যে নেই, সত্যেন্দ্রীয় ঐতিহ্যপ্রীতিও তাঁর কবিতায় দুর্লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের মতো সত্য, সৌন্দর্য, মঙ্গল বোধে তিনি আশ্রয় পান না। (গান্ধীজী ব্যতিক্রম) দেশচর্চায়ও তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পায় নি। আর জীবনানন্দের স্বভাব সম্বন্ধে যাঁরা ব্যক্তিগত সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁরা মোটামুটিভাবে স্বীকার করেছেন তিনি লাজুক, স্বল্পবাক এবং অন্তর্মুখী ব্যক্তি ছিলেন। এই অন্তর্মুখীনতাও তাঁকে নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল। শিক্ষক জীবনে তিনি সাফল্য পান নি। ক্লাশে যাবার আগে তাঁর অসহায় করুণ মুখের স্মৃতি অনেকে স্মরণ করেছেন। এই মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার স্বাদ কি সে সম্বন্ধে স্বভাবতই নানা প্রশ্ন তোলা যায়। মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন, জাতিগত ঐতিহ্য তাঁকে টানল না। তিনি তৃতীয় এক বস্তুর মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজলেন। প্রকৃতির মধ্যে তিনি আশ্রয় চাইলেন। জীবনানন্দের কবিতায় তাই বারে বারে প্রকৃতি জায়গা করে নেয়। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য তাঁর কবিতায় দৃশ্যজগৎ, স্পর্শের জগৎ, ঘ্রাণের জগৎ। সান্ত্বনা খুঁজলেই তা পাওয়া যায় না। এই না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকেই জন্ম হয় বেদনার। বেদনা—কিন্তু ব্যথা নয়। এইখানেই জীবনানন্দের কবিতার রহস্য। ব্যথা আমরা অহরহ পাই। সে ব্যথাও আমাদের ভাবনাকে উত্তেজিত করে। সে ব্যথারও তাৎপর্য আছে। বলতে দ্বিধা নেই সে ব্যথা নিয়েই জগৎ সংসার চলছে। এরও দাহিকাশক্তি কম তীব্র নয়, এর কারুণ্যও কম নয়।

আমি জানি, একদিন আমিও এমন
পতঙ্গের হৃদয়ের ব্যথা হব—সমুদ্রের ফেনা শাদা ফেনায় যেমন
ভেঙে পড়ে—ব্যথা পায়।
মানুষের মন
তবুও রক্তাক্ত হয় যেন এক অন্য বেদনায়
কীট যাহা জানে নাকো—জানে নাকো নদী ফেনা ঘাস রোদ—শিশির
কুয়াশা জ্যোৎস্না : অম্লান হেলিওট্রোপ হায়!

নদী, ফেনা, ঢেউ, কুয়াশা, পাখির হৃদয়—সকলেরই ব্যথা আছে। কিন্তু জীবনানন্দ যে বেদনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তার জন্মস্থান আরও গভীরে। সে গভীরতাকে কবি সব সময়েই যে বোঝাতে পারেন, ব্যাখ্যা করতে পারেন এমন নয়। কিন্তু তার অস্তিত্ব তিনি টের পান। এই অস্তিত্বের বেদনা-কে তিনি সত্য বলে জেনেছেন। এই বেদনাই কবির হৃদয়ে নক্ষত্রের আলোর তৃষ্ণা জাগায়, এই বেদনাই তাঁকে জলের গভীরে বিচ্ছুরিত জোনাকির আলোর পিয়াসী করে তোলে। এই বেদনা জীবনানন্দকে স্থূলেমূলে টান দিয়েছে। তাঁর কবিতার জন্মরহস্যও এইখানে। বেদনায় পীড়িত হয়েই তিনি জীবনকে, কালকে, নিসর্গকে দেখেন। সব কিছুই নষ্ট শসা, মৃত মাংস আর স্মৃতির দুর্বহ ভার বয়ে চলেন তিনি। এই বেদনা সমুদ্র থেকেই তিনি তিলোত্তমাকে তুলে আনেন এবং জানেন একে অনুভব করা যায় পাওয়া যায় না।

ঘুমায়ে রয়েছ তুমি ক্লান্ত হয়ে, তাই
আজ এই জ্যোৎস্নায় কাহারে জানাই
আমার এ-বিস্ময়—বিস্ময়ের ঠাঁই
নক্ষত্রের থেকে এল; (পাখি)

এই জাগরণের মধ্যে উত্তেজনা আছে। বিস্ময় শব্দটিও প্রথাবদ্ধ কাব্যভাষার দিক থেকে আমাদের মনকে উৎসুক করে তোলে এক অভাবনীয় চমৎকারিত্বের প্রতি। কবি জীবনানন্দ এক পরমবোধের সাক্ষাতে এই বিস্ময় অনুভব করেছেন। তাঁর হৃদয় যেন পাখি অথবা ফড়িং কীট অথবা জোনাকি। কিন্তু পাখিই এখানে বাচ্য। ফড়িং কীটের জোনাকির সৌন্দর্য, চেতনা এ পাখির হৃদয়ে, অবয়বে। এই রূপককে জীবনানন্দ অন্যত্রও ব্যবহার করেছেন। এই পাখির রূপকে তিনি তাঁর হৃদয়কে প্রকাশ করেন। এই হৃদয়ে নিস্তব্ধ ঘাসের, ধানের ছড়ার, রেশমের ডিমের শিহরণ। এই হৃদয় পাখিরই মত শিহরিত। অবশ্যই বোঝা যায় এই শিহরণের মধ্যে জীবনের উৎসার রয়েছে। এত প্রেম এত গান কার জন্যে? এই পাখি কাকে চেয়েছে? বেদনা মাড়িয়ে এই পাখির যাত্রা (রোমান্টিক কবির 'যাত্রা'র কথা অবশ্যই মনে পড়ে।) 'কোথায় বেদনা নাই এই পৃথিবীতে'। কিন্তু আমরা লক্ষ করি যে পাখির 'রোম—ঠোঁট—পালকের এই তার মুগ্ধ আড়ম্বর'। এ পাখি এসে বসল কবিরই 'কঠিন হাতে'। 'পাখি' কবিতায় পঞ্চম স্তবকে এই 'কঠিন হাতে' 'মৃত্যু দিকে-দিকে অবিরল' 'মুষড়ে ফেলিতে' 'ভয় যেন ঘেরে' 'ব্যথা ভয়' 'বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয় / এই পৃথিবীতে' এবং ষষ্ঠ স্তবকে 'ক্লেশ ইহাদের বুকের ভিতর' শব্দগুলি এবং বাক্যাংশগুলো কিসের

ইঙ্গিত দেয় ? বেদনার ভাষাকে এভাবে আবিষ্কার করেছেন জীবনানন্দ। পাখি যে আড়ম্বর নিয়ে এসেছিল, পথে যেই রঙীন তুলোর বল-কে কোমল আঙুল দিয়ে নেড়ে চেড়ে সুখ পেতে চেয়েছিলেন কবি—সেই পাখির মধ্যে কবি ভয়কে পেলেন। এবং কবির বিস্ময়ের পরিণাম আমরা দেখতে পাই

অজস্র গভীর রং পালকের 'পর
তবে কেন ? কেন এ সোনালি চোখ খুঁজেছিল জ্যোৎস্নার সাগর
আবার খুঁজিতে গেল কেন দূর সৃষ্ট চরাচর।

হৃদয়ের দ্বিধা এইখানে। বিস্ময়ের এই করুণ পরিণাম জীবনানন্দের কবিতায়। 'আবার খুঁজিতে গেল'—এসব তো জীবনানন্দের কবিতায় ধুয়াপদের মতো। রবীন্দ্রনাথের গানে—কবিতায় বেদনার বৈচিত্র্য কম নয়। বেদনাকে তিনিও জাগাতে ভালোবাসেন।

' বেদনা কী ভাষায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে ॥

রবীন্দ্রনাথের মিতা এই বেদনাকে জাগায়। কিন্তু এই বেদনা 'মনোমোহন বন্ধু'-কে স্মরণ করায়, 'পারিজাতমালার সুগন্ধ' বয়ে আনে এই বেদনা। জীবনানন্দের বেদনা এই জাতীয় নয়। এই বেদনা জানে

দুটো পাখি তাদের নীড়ের মৃদু খড়
সেইখানে চুপে চুপে বিছায়েছে .—তবু নীড়,—তবু ডিম ভালোবাসা
সাধ শেষ হয়
তারপর কেউ চায় নাকো—জীবন অনেক দেয়—তবুও জীবন
আমাদের ছুটি দেয় তারপর—

'অঘ্রাণ' মাসের প্রতি তাঁর মমত্ব। রঙের শূন্যতা তিনি ভালোবাসেন। তিনি জানেন 'ধানের সোনার কাজ ফুরিয়েছে' (এই পংক্তিটি বিশেষভাবে জীবনানন্দীয়, তিনি বললেন না 'সোনার ধানের কাজ ফুরিয়েছে'। আমার জীবনানন্দের কবিতার কারুকর্মের দিকটি আলোচনার অবকাশ স্বল্প। সুতরাং বিশ্লেষণে বিরত রইলাম), অঘ্রাণের শেষ বিষণ্ণ সোনালী তুলি ঝরে পড়ার দৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এক ধরনের নিরাসক্ত দৃষ্টি এই কবিতাটিতে পাওয়া যায়। তিনি যেন প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিপ্রবাহের অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। 'পাখি' কবিতায় বিস্ময় এবং উত্তেজনা পরিণামে বিষাদ নেই এই কবিতায়। এখানে কেবলই বিষাদ এবং বিষাদই এই কবিতার মর্ম। 'সাধ শেষ হয়' এবং 'জীবনের ছুটি'-কে কবি মেনে নেন। এবং এক গভীর প্রত্যয়ে স্বীকার করেন। এইখানে বেদনার এক তাৎপর্য পাওয়া যায়। কখনও কখনও এই বেদনাই বিস্ময়ের জন্ম দেয় এবং তিনি বলতে পারেন

জীবন একাকী আজো—ব্যথা আজো—এখন করি না তবু বিয়োগের ভয়
এখন এসেছে প্রেম :—কার সাথে ? কোনখানে ? জানি নাকো ; তবু সে আমারে
মাঠে মাঠে নিয়ে যায়—তারপর পৃথিবীর ঘাস পাতা ডিম নীড় : সে এক বিস্ময়
এ-শরীর রোগ নখ মুখ চুল—এ জীবন ইহা যাহা ইহা নয় ;
রঙীন কীটের মতো নিজের প্রাণের সাথে একরাত মাঠে জেগে রয়।

একটি অমোঘ সত্যের প্রান্ত এখানে আমরা স্পর্শ করলাম। আমরা পেয়ে গেলাম কবির মনন, মনীষা 'এ জীবন ইহা যাহা ইহা নয়'। তাহলে কি দুই জীবনের কথা জীবনানন্দ বলছেন? ইয়েটস যেমন অহং (Self) এবং আত্মা (Soul)-র সন্ধানে পেয়েছিলেন? আর এই দ্বৈতের দ্বন্দ্ব? অহং এবং আত্মার টানাপোড়েনে ইয়েটসের কবিতার বুনট। এ বোনার কাজ জীবনানন্দের কবিতায়ও লক্ষ করতে পারি। এ দ্বৈতের দ্বন্দ্বই কি কবিতার জন্মস্থান? এক্ষেত্রেও ইয়েটস্ও যেমন জীবনানন্দও তেমনি অহং-এর ভারে বড় বেশি বিচলিত। তার টানটাই তীব্র। মায়াবী পৃথিবীর যাদু জীবনানন্দ-কে খেলায়। সেই খেলাঘরে তিনি কখনও নিঃসঙ্গ, কখনও আসঙ্গলোলুপ। এই একাকী জীবনের বেদনা সত্ত্বেও কবি একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। জোর করে যেন প্রেম আদায় করতে চান। কে যেন কবিকে নিসর্গের অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে চায়। জীবনদেবতা অথবা কোনো মানসসুন্দরীর কোনো ধারণাই আমরা পাই না এখানে। কে কবিকে এই অন্তঃপুরের মমতায় পৌঁছে দেয়? 'নিজের প্রাণের সাথে' অর্থাৎ বিভোর কবি এখানেও একা—একাকী। বেদনার আর এক রূপ দেখি 'মৃত মাংস' কবিতায়। এই কবিতায় কবিচিত্ত কারুণ্যে আচ্ছন্ন। যে পাখির ডানা ভেঙে পড়ে গেল সে পাখির বেদনা কবিকে বিচলিত করে এবং এক গভীর প্রজ্ঞায় কবিচিত্ত আলোড়িত হয়। ডানা ভাঙ্গা পাখি রঙ, খেলা, ঈর্ষা, হিংসা, সাধ, স্বপ্ন-এর জগৎ থেকে নির্বাসিত।

জানে না সে, আহা
সে যে আর পাখি নয়—রঙ নয়—খেলা নয়—তাহা
জানে না সে,—ঈর্ষা নয়—হিংসা নয়—বেদনা নিয়েছে তারে কেড়ে!
সাধ নয়—স্বপ্ন নয়—একবার দুই ডানা ঝেড়ে
বেদনারে মুছে ফেলে দিতে চায়:

বেদনায় আক্রান্ত এই পাখি কি মানুষেরই প্রতীক? এই বেদনার রেশ থেকে সে মুক্তি চায়। বেদনারই শিকার এ হৃদয়—এ পাখি। জালবদ্ধ পাখির যন্ত্রণাকাতর রূপটিকে জীবনানন্দ অনুভব করেছেন। স্মৃতিতাড়িত মানুষও স্মৃতির জালে বন্দী। কে এই স্মৃতিপাশ থেকে মুক্তি না চায়? কিন্তু

রূপালি বৃষ্টির গান, রৌদ্রের আস্বাদ
মুছে যায় শুধু তার,—মুছে যায় বেদনারে মুছিবারে সাধ।

মৃত্যুর মুখোমুখি মানুষও বেদনায় আচ্ছন্ন হয়। আয়ু ফুরিয়ে যায় কিন্তু রূপ, রঙ, খেলা, স্বাদ, স্বপ্নকে মানুষ ভুলতে পারে না। পাখি যেমন জানে না তার আকাশের ঘরে আর যাওয়া হবে না তেমনি মানুষও জানে না মৃত্যু এসে তার ইচ্ছাকে নষ্ট করে দেবে। কিন্তু বেদনাকে সে মুছে ফেলতে পারে না। আসলে বেদনাই সৃষ্টি করে। বেদনাই স্মৃতির পথে আনাগোনা করে। আমৃত্যু দুঃখ বহন মানুষের বিধিলিপি। এই বেদনা-পাথার অসীম। এ উত্তীর্ণ হওয়া সাধ্যাতীত। বলা বাহুল্য এ বেদনা রবীন্দ্রনাথের বেদনা নয়। এমন কি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায়ও বেদনার এই অভিজ্ঞতার স্পর্শ নেই। রবীন্দ্রনাথের বেদনা উপায়, উপেয় অমৃত। যতীন্দ্রনাথের বেদনায় কেবল যন্ত্রণা, শোক। জীবনানন্দের বেদনা বাস্তবের স্বীকৃতি এবং অস্তিত্বের সংকট।

জীবনানন্দের কবিতায় স্পষ্টত ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্রোহ নেই। কিন্তু সমকালীন জীবনের যে অভিজ্ঞতা তাঁকে নূতন এক বোধে উত্তীর্ণ করল তার স্পর্শ আছে 'হঠাৎ মৃত' কবিতায়। এ কবিতায় রোমান্টিক পরিবেশ বিস্তৃত। রোমান্টিক কবিচিত্ত প্রকৃতির আত্মাকে আবিষ্কার করেছে। অজস্র বুনো হাঁস উড়ে চলে। এরা অঙ্কুরের পাখা মেলে না। মৃত্যু এসে এদের নীচে ফেলে দেয়—'অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর'! তিন-বার 'অ'র প্রয়োগ অচলতার গাঢ়তাকে আরও বেশি স্পষ্ট করে। ইন্দ্রিয়চেতনাকে এই অচলতা গ্রাস করে। তাকে স্পর্শ করি, ঘ্রাণ নিই, তাকে দেখি, তাকে অনুভব করি। পরিণামে এক মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হই। চারদিকে কবি মৃত্যুর গর্জন শুনছেন। রূপসীর প্রেম, কবির কল্পনা সবই মৃত্যুর পটভূমিকায় ম্লান, নিরুত্তাপ। আমাদের চাওয়া পাওয়ায় আনন্দে ভরে যায় না, প্রেম নেই, বিবেক নেই। এই সব হঠাৎ মৃত্যু কবির হৃদয়ে ক্ষোভ জাগায়। তার পর জীবনানন্দের ভাষায় শুনি

রূপ-প্রেম-খ্যাতি-সুপক্ক রৌদ্রের ভিতর
দাঁতের এনামেল ঝিকমিক ক'রে ওঠে
পবিত্র সমুদ্রের মতো—
চিরন্তন।

বুনো হাঁসেরা উড়ে চলে যায়। তাদের মধ্য থেকে কাউকে ফেলে দেয়। সৌর জগতের, কালের আবর্তন অবিরাম চলছে। কিন্তু এখানে যাকে ফেলে দেয় সে অচল অভ্যাসের মধ্যে জড়। সেখানে শুয়োরের মাংসের ভোজ। প্রচলিত কাব্যভাষা ছেড়ে দিয়ে বেদনা প্রতিবাদের শব্দ আবিষ্কার করেছে। এই চিরন্তনের চিত্র আছে জীবনানন্দে, কিন্তু সে কেবল কথার কথাই। এই বেদনা জীবনানন্দের কবিতায় শাণিত হয়ে ঝলসানো শবের নিষ্ঠুরতাকেই স্পষ্ট করে। সূর্য জীবনের প্রতীক। সে প্রতীকও বেদনার ভাষায় এই রূপ পায়

বৃন্তের মত সূর্য—পশ্চিমের—
মৃত প্রলম্বিত—হাঙরের মতো—
মেঘের ওপার থেকে
প্রতিভার দীর্ঘ বাহু বাড়ায়ে দিয়েছে মেঠো হাঁসের ডানায়, শস্যহীন ক্ষেতে,
গফুরের শীর্ণ গোলাঘরে, শ্মশানে কবরে। আমাদের সবের হৃদয়ে।
এই প্রত্যয়ের থেকে গভীর অগ্নির জন্ম হয়।

রোমান্টিক কবির এই রকম বাস্তব সচেতনতা দুর্লভ বস্তু। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও এই বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন। কিন্তু অস্তায়মান সূর্যের এই সর্বনাশা রূপ তাঁর কাছ থেকে আমরা কল্পনাই করতে পারি না। শীর্ণ গোলাঘর। 'শ্মশানে কবরে'র সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সহাবস্থান জীবনানন্দের কবিতায় মোটেই অস্বাভাবিক নয় বরং সেটিই তাঁর কবিতার চারিত্র্য।

প্রায় সকলেই লক্ষ করেছেন জীবনানন্দের কবিতায় অবক্ষয়ের চিত্র। তাঁর কবিতায় মৃত্যু-প্রসঙ্গ বারে বারে আসে 'মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে' (পাখিরা), 'মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন' (সহজ), 'মৃত সে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিলো যারে' (কার্তিক মাঠের চাঁদ), 'উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়, /মানুষেরো আয়ু

শেষ হয়' (স্বপ্নের হাতে), 'হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা আছে' (অন্ধকার), 'এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব / ভাসিতেছে চিরদিন' (শব), 'চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম / চিতা জ্বলে' (শঙ্খমালা), 'বৈতরণী বৈতরণী—শান্তি দেয়-শান্তি-শান্তি—ঘুম-ঘুম-ঘুম / অবিরত তারি দিকে ছুটিতেছি আমি ক্লান্ত শকুনের মতো।' (বৈতরণী), 'তাহারা দুপুরে ব'সে শহরের গ্রিলে / মৃত্যু অনুভব করে আরো গাঢ়-নীল' (মৃত্যু) 'স্মৃতিই মৃত্যুর মতো' (আমিষাশী তরবারী), 'ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়, / বিহ্বলতা বলে মনে হয়' (পৃথিবীলোক)। জীবনানন্দের এই মৃত্যুভাবনার চরম রূপ 'আট বছর আগের এক দিন' কবিতায় বিস্তৃত। কেউ কেউ জীবনানন্দের এই মৃত্যুচেতনার পাশাপাশি লক্ষ করেছেন জীবনের প্রতি তাঁর অপরিসীম প্রীতি। এরকমই আমরা অজস্র শব্দ উপমা চয়ন করতে পারি যেগুলো অন্ধকারের, আতঙ্কের, ভয়াবহতার। আর তারই সঙ্গে সমান উৎসাহে আলোর, আশার শব্দ-উপমার আহরণ সম্ভব। পূর্ণেন্দু পত্রী রূপসী বাংলার দুই কবি গ্রন্থে এসব ছবির পসরা মেলে দিয়েছেন। সেখানে খুশী এবং আনন্দের মেশামেশি। 'হৃদয় গন্ধের মত—হৃদয় ধূপের মত জ্বলে ; ধোঁয়ার চামর তুলে তোমারে সে করিছে ব্যজন' (প্রেম), 'নক্ষত্রের বেশী তুমি,—নক্ষত্রের আকাশের মত !' (প্রেম), 'আলোর চুমায় এই পৃথিবীর হৃদয়ের জ্বর / কমে যায় : তাই নীল আকাশের স্বাদ—সচ্ছলতা / পূর্ণ করে দিয়ে যায় পৃথিবীর ক্ষুধিত গহ্বর' ; (অনেক আকাশ), 'চাঁদ জেগে রয় / তারা ভরা আকাশের তলে, / জীবন সবুজ হয়ে ফলে / শিশিরের শব্দে গান গায় / অন্ধকার,—আবেগ জানায় রাতের বাতাস !' (কয়েকটি লাইন)। 'জীবন' কবিতায় মৃত্যুকে নানারকম ভাবে কবি চিনেছেন, জেনেছেন, ভেবেছেন। কোনো পরিসংখ্যান-কৌতূহলী সমালোচক জীবনানন্দের কবিতাকে এরকম দুধাকে সাজিয়ে দেখতে পারেন কোন্ দিকে জীবনানন্দের ঝোঁক বেশী। আলোর অথবা অন্ধকারের ? জীবন অথবা মৃত্যুর ? প্রাচুর্যের অথবা অবক্ষয়ের ? এবং সে থেকে এরকম সিদ্ধান্তেও কেউ কেউ এসেছেন যে জীবনানন্দের কবিতা অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে জীবনে, নিঃসঙ্গতা থেকে এক গভীর বিশ্বাসের জগতে উত্তরণের কাব্য। আবার কেউ কেউ বিপরীত সিদ্ধান্তেও এসেছেন। আমরা কি এক্ষেত্রে চারু পাঠকের বোধের উপর নির্ভর করব। যে যেমন অর্থ টেনে নেবেন সেরকম ভাবেই জীবনানন্দ সার্থক। বলা বাহুল্য এ কবিতা বিচারের অন্যতম মাপকাঠি।

এই রকম ভাবে আরো খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যায়। জীবনানন্দের কবিতায় প্রতিমানের তীব্র আকর্ষণের কথা সকলেই বলেছেন। কিছু চিত্র তো প্রবাদপ্রতিম। নেশা ধরিয়ে দেয় এই রং-রূপ-গন্ধ। একটি তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ জীবনানন্দের কবিতায় বার বার এসেছে। বিষয় আলোচনার দিক থেকে সেইটি গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ করলে দেখতে পাব তাঁর বহু কবিতায় ফসলের, ফসল কাটার প্রসঙ্গ। কতকগুলি পংক্তি এখানে তুলে দিই ; 'একদিন শুনেছে যে জল আর ফসলের গান', 'ভরা ফসলের মত পড়ে ছিঁড়ে', 'জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল', 'শস্যের মত মোর এ শরীর ছিঁড়ে', 'আড়ষ্ট পড়িবে / ফসলের গন্ধ বুকে করে / বার বার পড়ি যেন ঝরে', 'ক্ষুধিতের ভাষা / বুকে করে করে / ফলিব কি !—পড়িব কি ঝরে / পৃথিবীর শস্যের ক্ষেতে' /

'দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয় ;

সেই শস্য অগণন মানুষের শব ;
শব থেকে উৎসারিত স্বর্গের বিস্ময়' (সুচেতনা)

'এ-দেহ পেয়েছে যেন তাহার চুম্বন / ফসলের ক্ষেতে ;', 'ফসলের স্তন / আঙুলে নিঙাড়ি', 'এই পৃথিবীর ফসলের ভূমি / আকাশের তারার মতন / ফলিয়া ওঠে না রোজ ; —দেহ ঝরে,—ঝরে যায় মন / তার আগে।' জীবনানন্দ যখন গভীর আশ্লেষে পৃথিবীর অলিগলি বেয়ে হেঁটেছেন তখন কেবলই চেয়েছেন সেই সৌন্দর্যকে ভোগ করতে। কিন্তু তিনি জানেন

সেই সব পাখি আর ফুল :
পৃথিবীর সেই সব মধ্যস্থতা
আমার ও সৌন্দর্যের শরীরের সাথে
মমির মতনও আজ কোনোদিকে নেই আর ; (মনোবীজ)

তখন নেমে আসে আলো-অন্ধকারের বিষণ্ণতা। অনেক ধূসর বই'র জগতে তিনি চলে যান। সেখানে তিনি প্রবেশ করেন। আমাদের মনে হয় এইটিই তাঁর পরিচিত জগৎ। এখানেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। তিনি স্বচ্ছন্দে আলাপচারী হয়ে উঠতে পারেন। বলতে পারেন

চেয়ে দেখি কোনো-এক আননের গভীর উদয় :
সে-আনন পৃথিবীর নয়।
দু-চোখ নিমীল তার কিসের সন্ধানে ?
'সোনা—নারী—তিশি—আর—ধানে'—
বলিল সে : 'কেবল মাটির জন্ম হয়।'
ধানের রসের গন্ধ পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই। (সিন্ধুসারস)

কবিতাটির নাম মনোবীজ। আগের ফসলের ফলে ওঠার সঙ্গে এই সব পংক্তির সাদৃশ্য লক্ষ করাব মত। ফসল ফলে ওঠাব কথা নিবেদন করেও জীবনানন্দ কিন্তু 'ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে' এরকম খুসীতে উচ্ছল হয়ে উঠতে পারেন না। তাঁর প্রতিভা মেধার সঙ্গে যুক্ত। এই মেধাই কবিকে গ্রাস করে। যত তিনি জানেন তত তিনি বিপন্ন বোধ করেন। সোনা, নারী, তিশি আর ধানকে একই পংক্তিতে ন্যস্ত করার ফলে ফসলের তাৎপর্য আমরা পেয়ে যাই। কেবল মাটির জন্ম হয়—অবশ্যই। এ মাটিতেই সোনা, নারী, তিশি আর ধান। ফসলের ঝরে যাওয়ার দিকটাও জীবনানন্দ উপেক্ষা করতে পারেন নি। মাটির টানেও যেমন তিনি আকৃষ্ট হন তেমনি এ মাটির বন্ধ্যা দিকটিও কবিকে উৎকণ্ঠিত করে। মাটির সঙ্গে ফসলের যে নিবিড় মমতার বন্ধন সে কথা জীবনানন্দ আমাদের জানিয়েছেন

'মাটির শরীরে তার ছিল যে পিপাসা'
'হারায়ে গিয়েছে কবে কঙ্কালে কাঁকরে
এ মাটির পরে !'
'এক ক্ষেত ছাড়ি
অন্য ক্ষেতে চলিব কি ভেসে'

'এ মাটির নিঃসার শিশিরে
রক্তের তাপ ঢেলে আমি
আসিব কি নামি।'

'বোধ' কবিতায় তো তিনি সরল চাষীর জীবনই কাম্য মনে করেছেন।

দেহপিপাসা এবং বীজের আকৃতি সৃষ্টির উজ্জ্বল ইঙ্গিত। মাটির বুকে বীজ যে বেদনায় এবং পরম লালসায় অঙ্কুরিত হ'য়ে ওঠে সে মাটির টান জীবনানন্দের কবিতাকে মাটির গন্ধে স্বাদে ভরপুর করে তোলে। এই হয়ে ওঠার ব্যাপারটি আক্ষরিক অর্থে সত্য। সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে নিয়ে দেহের স্বাদ পেয়েছে প্রেমিক। দেহের নোনা স্বাদে সমুদ্রের ইশারা। জীবনানন্দ বলেন

এ দেহ,—অলস মেয়ে
পুরুষের সোহাগে অবশ।—
চুমে লয় রৌদ্রের রস
হেমন্ত বৈকালে
উড়ো পাখ্ পাখালির পালে
উঠানের ;—পেতে থাকে কান,—
শোনে ঝরা শিশিরের গান
অঘ্রাণের মাঝরাতে ;

বীজ থেকে ফসল ফলে ওঠার ইতিকথাও তো এই রকম। জীবনানন্দ মাটির স্বপ্ন, ফসলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যান। সোহাগ, চুম্বনের স্পর্শে আমরা প্রকৃতির নূতন রূপকে পাই। অর্থাৎ জীবনানন্দের কবিতায় সৃষ্টির প্রসঙ্গ এলেই ফসল ফলে ওঠার ইমেজ ব্যবহৃত হয়। এক জাতীয় কবিতায় ইমেজ-এর প্রেরণা কোথায় আমরা তা বুঝতে পারি। ফসল ফলে ওঠা ও ফসল ঝরে যাওয়া প্রেম ঘনীভূত হওয়া এবং প্রেম নষ্ট হয়ে যাওয়া দুইই এক প্রযত্নে উচ্চারিত হয়। যে কবির বেদনা প্রাচুর্যের সৌন্দর্যের (কান্তারের পথে যেন সৌন্দর্যের ভূতের মতন তাহারে চকিত আমি করিলাম—'মনোবীজ') অপচয়, অবক্ষয়ের সাক্ষী তিনি যে এক বিষণ্ণতায় নিমগ্ন হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

অমলেন্দু বসু বলেছেন জীবনানন্দের কবিতায় টেনশন আছে। এই টেনশন আছে বলেই জীবনানন্দ স্থির থাকতে পারেন নি। এই টেনশনটা কিসের ? অবশ্যই প্রেমে এবং অপ্রেমে, জীবন এবং মৃত্যুতে, হেমন্ত ও বসন্তে, ফসল ফলে ওঠা ও ফসল ঝরে যাওয়ার দ্বন্দ্বে। তাঁর বেশ কিছু কবিতার মধ্যেই এই টেনশনের বিস্তার। যে টেনশনে তিনি ভুগেছেন সে টেনশন বর্তমানের সঙ্গে অতীতের এবং ভবিষ্যতেরও। আমরাও এই টেনশনে ভুগি। মাঝে মাঝে কবি স্বস্তিবাচন করেছেন কিন্তু তা ক্যান্সার রোগীর কাছে সাময়িক সান্ত্বনা দান মাত্র মনে হয়। মৃত্যু অবধারিত, মৃত্যু বাস্তব।

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

উপরের দুই পংক্তির 'তবুও' শব্দটির নিদারুণ ব্যবহার লক্ষ করতে বলি। এই মানুষের নিয়তি। 'তবুও' স্পষ্টত টেনশনের দিকেই ইঙ্গিত করে। মানুষের নিয়তিই তাকে

ঋণী করে রাখে পৃথিবীর কাছে। পরস্পর বিরোধী শব্দ জীবনানন্দের কবিতায় কেমন অনায়াসে স্থান পেয়ে যায়, দেখুন

আমাদের মত ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে (সুচেতনা)
জেগে ওঠে উনিশশো, তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, অনন্তের অফুরন্ত রৌদ্রের তিমির।
(সূর্যপ্রতিম)

মানবজন্মের ঘরে যখন এসেছি
না এলেই ভালো হত অনুভব করে,
কত কাছে—তবু কত দূরে (সবিতা)

মরণের পরপারে বড়ো অন্ধকার
এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো (আমাকে তুমি)

তিনি নিজেই অনেক সময় একটি স্বীকারোক্তি বড় বেদনায় উচ্চারণ করেন আবার তাকেই বিরুদ্ধ ভাবনার দোলায় চঞ্চল করে তোলেন। নিজেকেই নিজে প্রতিবাদ করেন

সময়ও অপার—তাকে প্রেম আশা চেতনার কণা
ধরে আছে বলে সে-ও সনাতন ; কিন্তু এই ব্যর্থ ধারণা
সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাটা বেছে
প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে সরে গেছে
যেই অস্পষ্ট নির্লিপ্ততে—তাই-ই ঠিক :—ওখানে স্নিগ্ধ হয় সব।
অপ্রেমে বা প্রেমে নয়—নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব।
(অঘ্রাণ প্রান্তরে)

ধনুকের ছিলায় যে প্রচণ্ড টান তিনি সঞ্চার করেছিলেন তাকে ধীরে ধীরে গভীর প্রজ্ঞায় শিথিল করে দিয়ে পরম আশ্রয় তিনি খুঁজে পেলেন। টেনশনের মুক্তি কখনও কখনও ঘটেছে। এসব কবিতায় তার পরিচয়। বনলতা সেন-এ তার অভিব্যক্তি। কিন্তু তাঁর কবিতায় টেনশন প্রায়ই এরকম কোনো প্রজ্ঞার দ্বারা নির্লিপ্ততে পৌঁছে দেয় না। জীবনানন্দের কবিতায় কল্লোলিনী কলকাতার পাশে হাইড্রেনের জলের ছবি। কত বিপরীত বস্তু, কত পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবনা জীবনানন্দের কবিতায় সমন্বয় পেয়ে যায়। নিসর্গ মানুষ তাঁর সামনে। রহস্যঘেরা মায়াবী পৃথিবী। তিনি এসবের মধ্যে অন্তঃশীলা ঐক্যের সন্ধান করেন। ঐক্য খুঁজে পান না। সেজন্যে বেদনা। সেজন্যে টেনশন। টেনশন আরও জটিল রূপ নেয় যখন কবি আমাদের সুখের, স্বাচ্ছন্দ্যের, তৃপ্তির মুখ দেখিয়ে সরে যান। তিনি যখন বলেন

কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালবাসে (হায় চিল)

এবং পরের কবিতায় বলেন

কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর (বুনো হাঁস)

হৃদয়ের এই কারুণ্য এবং চাওয়ার মেদুর আর্তি আমাদের বিহ্বল করে। মানুষ কল্পনার

হাঁসের পাখায় নির্ভর পায় কিন্তু জীবনানন্দ জানেন এরকম ভাবনার স্বাধীনতা মানুষ হারিয়েছে।

জীবনানন্দ কান্তারে কান্তারে হেঁটেছেন। সে হাঁটায় এক ধরনের সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন। শব্দহীন জ্যোৎস্না আমাকে সেই কান্তারের দিকে নিয়ে যায়। সে কান্তার হৃদয়-কান্তার। বেদনার পথে এই শব্দহীন জ্যোৎস্না। করুণ ও বিধুর। টেনশন সেজন্যেই। ক্লান্ত এবং ক্লান্তিহীন সে পরিক্রমা। আমরা জানি রোমান্টিক কবির চিত্ত ভ্রমণপিপাসু। সে ভ্রমণ অবশ্যই ট্যুরিস্টের নয়। বেদনা থেকেই এর জন্ম। বেদনাই 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে'র তৃষ্ণায় অস্থিরতা আনে। আমরা কবির কবিতায় পেয়ে যাই অবিরাম হাঁটার কথা, পাখির কথা, নাবিকের প্রসঙ্গ, জাহাজের মাস্তুলের চিত্র, নদীর ছলছল শব্দ, সাগরের ঢেউ যে ঢেউয়ে নোনা আর তিতা স্বাদ। এ পথপরিক্রমার ব্যাপ্তি দূর বহুদূর কালে বিসর্পিত। বেবিলন, মিশর, এশিরিয়া, কুরুবর্ষ, মালাবার।

উপনীত জাহাজের মাস্তুলের সুদীর্ঘ শরীর (মনোবীজ)
পৃথিবীর অলিগলি বেয়ে আমি কত দিন চলিলাম (ঐ)
সব হালভাঙা জাহাজের মতো সমন্বয় (ঐ)
সাগরের অনেক রৌদ্র আছে বলে ;—পরিব্যাপ্ত বন্দরের মতো মনে হয় যেন এই পৃথিবীকে (ঐ)
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে অনেক কবিতা লিখে চলে গেলো যুবকের দল ; (ইহাদেরি কানে)
যে-ঘোড়ায় চড়ে আমরা অতীত-ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাবো ?
(আজকের এক মুহূর্ত)

বন্দরের ওপারে সূর্যকে দেখেছি (শহর)
সমস্ত বঙ্গোপসাগরে উচ্ছ্বাস থেমে যায় যেন :
মাইলের পর মাইল মৃত্তিকা নীরব হয়ে থাকে ! (শ্রাবণ রাত)
দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে
শীতার্ত এ-পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিল কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে। (সিন্ধু সারস)
আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায় (মৃত্যুর আগে)
সাগরের অই পারে—আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এইসব পাখি ছিল (পাখিরা)
নক্ষত্রের আলো জেলে পরিষ্কার আকাশের 'পর
কখন এসেছে রাত্রি !—পশ্চিমের সাগরের জলে
তারপর শব্দ ; উত্তর সমুদ্র তার,—দক্ষিণ সাগর
তাহার পায়ের শব্দে—তাহার পায়ের কোলাহলে
ভ'রে ওঠে ; (জীবন)

নক্ষত্র, নীল সমুদ্র, পশ্চিমের সাগর, উত্তর সমুদ্র, দক্ষিণ সাগর ইত্যাদি শব্দমালা সুদূরের

ইঙ্গিত দেয়। যে বেদনায় আক্রান্ত জীবনানন্দ সেই বেদনাই তাঁকে দূরাভিসারে প্ররোচিত করে। উপরের পংক্তিগুলিতে মাঝে মাঝে আশ্বাসের বাণী আছে। কিন্তু ইতস্ততঃ সংগৃহীত এই পংক্তিগুলি যেসব কবিতা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে সে কবিতায় নক্ষত্রের আলো নিভে যায়, সেখানে ভাঙা মাস্তুলের অসহায়তা। ওপারে সব আছে এরকম লাইন পেয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা অবশ্যই স্মরণ করতে পারি। কিন্তু জীবনানন্দে সে আশ্বাস নেই। তিনি ওপারের আলোর দূতীর ইঙ্গিত পান কিন্তু সে দূতী এগিয়ে আসে না। এলেও আমরা দেখি সাতটি তারার তিমির, ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি। টেনশন এইভাবে জীবনানন্দের কবিতায় তৈরী হয়।

জীবনানন্দের কবিতায় বিরাম চিহ্নের ব্যবহার অত্যন্ত বেশি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর 'কবি জীবনানন্দ দাশ' বইতে যে-সব পংক্তি উদ্ধার করেছেন সেগুলির বিন্যাস কখনও কখনও ছাপা বইয়ের সঙ্গে মেলে না। জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটির চিহ্নও কম নয়। সে যাই হোক এই বিরাম চিহ্নের ব্যবহারেও কবির খুঁতখুঁতে স্বভাবটি ধরা পড়ে। নাকি তিনি নিজেই নিশ্চিত হতে পারছেন না বিরাম চিহ্নের ব্যবহার বিষয়ে। একটি বিরাম চিহ্ন ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে কৌতূহল বোধ করি। লক্ষ করবেন জীবনানন্দের কবিতায় প্রশ্নাত্মক বাক্যের ব্যবহার বেশি। প্রশ্ন যেখানে সেখানে সংশয়। সংশয় থেকে অস্থিরতা। আর অস্থিরতা মানেই টেনশন।

অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি? (বোধ)
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে?—করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ? (ঐ)
ঘুমাতে চাও কি তুমি? (কয়েকটি লাইন)
যাতনা পাবে না কেউ আরো? (ঐ)
পৃথিবী পাবে কি গান তোমার বইয়ের পাতা খুলে? (ঐ)
আকাশ কহিছে কোন্ কথা
নক্ষত্রের কানে?
আনন্দের? দুর্দশার? (ঐ)
সমুদ্রের কানে
কোন্ কথা কই আমি এই পারে—সে কিছু জানে? (ঐ)
আহ্লাদ কি পায় নাই তারা কোনোখানে? (ঐ)
অজস্র গভীর রং পালকের 'পর
তবে কেন? কেন এই সোনালি চোখ খুঁজেছিল জ্যোৎস্নার সাগর? (পাখি)
কাহারে সে চাহিয়াছে? কতদূর চেয়েছে উড়িতে? (ঐ)
আমার বুকের 'পরে এই এক পাখী :

পাখী ? না ফড়িং কীট ? পাখী ? না জোনাকি ? (ঐ)
কী কথা তাহার সাথে ? (আকাশলীনা)
নীড়কে কি চিনেছিলো তনুবাত নীলিমার নিচে ?
না হলে উচ্ছল সিন্ধু মিছে ? (বিভিন্ন কোরাস)
আবেগ কি ক্রমেই আরেক তিল বিশেষিত হয় ? (ভাষিত)
হৃদয়ের জন-পরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে ? (সৃষ্টির তীরে)
আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে ? (ভাষিত)

নিদারুণ যন্ত্রণায় জীবনানন্দ নষ্ট পৃথিবীর দিকে তাকান। আশা-আকাঙ্ক্ষার, কল্পনা-স্বপ্ন ইত্যাদির বিনষ্টি কবিকে বেদনায় জর্জরিত করে নিশ্চয়ই। হতাশায় তিনি ভেঙে পড়েন। কেবল প্রশ্ন প্রশ্ন। কোন্ নক্ষত্রের পানে মানুষের আশ্বাস ? কোন্ পশ্চিমের সাগরে অনন্ত সুখ ? পৃথিবী ছাড়িয়ে কোন্ অমর্ত্যলোকে সে অমরাবতী ? এসব প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে ভালোবাসাকে জীবনানন্দ স্পর্শ করতে চান। তিনি আমাদের প্রশ্নের মুখোমুখী করে দেন, নিজে প্রশ্নের কাঁটার মুকুট পরেন। বেদনাই এই অস্থিরতার জন্ম দেয়। এক পরম জিজ্ঞাসা নিয়ে জীবনানন্দ সত্যের সান্নিধ্যে আমাদের নিয়ে আসেন। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য বিরাম চিহ্নগুলির ব্যবহারও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। জীবনানন্দের কবিতায় ড্যাশ চিহ্নের ব্যবহারও অকিঞ্চিৎকর নয়। ছন্দের দিক থেকে এই ড্যাশ চিহ্নের মূল্য খুবই বেশি। আমরা ছন্দের পারিভাষিক নিরীক্ষায় না গিয়েও বলতে পারি এই ড্যাশ চিহ্ন জীবনানন্দের কবিতায় বিলম্বিত প্রবাহের সঞ্চার করেছে।

খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান গায়—গান গায়
(আমাকে তুমি)

আগুনের—ঘিয়ের ঘ্রাণ (আমাকে তুমি)
হুড়াহুড়ি জ্যোৎস্নায়—ছায়ায়,
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন
(বনলতা সেন)

আমি শুয়ে থাকবো—ধীরে—পউষের রাতে (অন্ধকার)
নদীর তরঙ্গে—ক্রমে—তুষারের স্তূপে তার ঢেউ (আবহমান)

'হাজার বছর শুধু খেলা করে' এই কবিতাটির ছটি পংক্তি। পাঁচটি ড্যাশ চিহ্নের ব্যবহার। 'তোমাকে' কবিতার প্রথম স্তবকের চার পংক্তিতে পাঁচটি ড্যাশ চিহ্নের ব্যবহার। অনেক সময়েই এই ড্যাশগুলি পাঠকের কল্পনাকে উত্তেজিত করবার জন্যে ব্যবহৃত। আবার কখনও একটি বিস্তারের প্রত্যাশায় এই ড্যাশচিহ্নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যে কারণেই হোক এই-ড্যাশচিহ্ন কবিতার গতিকে যেভাবে মন্থর করে দেয় সে মন্থরতা কবিচিত্তের এক প্রগাঢ় বেদনাজাত বলে মনে হয়। আবার তাঁর কবিতায় যে চিহ্নটি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রযুক্ত সেটি হল সেমিকোলন। 'সুচেতনা' কবিতায় তেত্রিশ পংক্তিতে তেরোটি সেমিকোলন। দাঁড়ি আছে সাতটি। 'শব' কবিতায় ষোল পংক্তিতে আটটি সেমিকোলন। কমার ব্যবহারও কম নয়। কিন্তু এমন কিছু পংক্তি আছে যেখানে কমা বসালে ক্ষতি ছিল না। জীবনানন্দ সেখানে বসিয়েছেন সেমিকোলন।

কমা'র থামার চাইতে একটু বেশী থামতে বলছেন জীবনানন্দ। বলা বাহুল্য বেদনার ভাষার লয় ধীর। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় অম্বুজ বসু (একটি নক্ষত্র আসে) লক্ষ করেছেন আচমকা মিলের (অন্ত্যানুপ্রাস) বিন্যাস। অমিলের পংক্তি পরম্পরা কবিতার বৃত্তে এসে যখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন দেখতে পাই মিল দিয়ে তিনি কবিতাটির চলাকে থামিয়ে দিলেন। যেমন 'উত্তর প্রবেশ' কবিতাটি অমিল মুক্তক ছন্দে লেখা। কিন্তু জীবনানন্দ সমাপ্তিতে এসে দুটি চরণকে মিলের বন্ধনে বাঁধলেন। অথবা 'জনান্তিকে' কবিতার শেষ পর্বে এসে 'অন্ত্যানুপ্রাসের আকস্মিক সমারোহ'। এখানে এলিয়টীয় পংক্তিবিন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়। এবং এলিয়টের কবিতা সম্বন্ধে যে বলা হয় fixities and flow অথবা flow and fixities জীবনানন্দের কবিতায় তার লক্ষণ মাঝে মধ্যে দেখা যায়। অবশ্যই এই শৈলী সময়চেতনার সঙ্গে যুক্ত। সে বিষয়ে পরে বলছি।

যতদূর মনে পড়ছে ফাদার আঁতোয়া রাজা অয়দিপাউসের ট্র্যাজেডির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে মানুষের ট্র্যাজেডি সেখানে যেখানে মানুষ বিজিজ্ঞাসু। আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। যদি কৌতূহল না থাকত তাহলে এই সৃষ্টিপ্রবাহে আমরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করে দিতাম। কিন্তু যত জানছি তত দুঃখ বাড়ছে। জ্ঞান আমাদের বিপন্ন বিস্ময়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জীবনানন্দের কবিতায় বিপন্ন বিস্ময়, বিদীর্ণ বিস্ময়, গভীর বিস্ময় এসব বাক্যের টুকরো ছড়িয়ে আছে। প্রাত্যহিকতার মধ্যে আমাদের অভিজ্ঞতা এরকম বিস্ময়ের মুখোমুখি করে দেয়। রাজা অয়দিপাউসকে জ্যোতিষী (পুরোহিত) রাজ্যের মারী, অনাচার সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে যত বারণ করছেন অয়দিপাউস তত অস্থির হয়ে উঠছেন জানবার জন্যে কেন তাঁর রাজ্যে এই মারী, অনাচার। কার পাপে এই অবস্থা রাজ্যের? শেষ পর্যন্ত রাজা জানতে পারলেন তিনি মা-কে বিবাহ করেছেন। কৌতূহলের কি ভয়াবহ পরিণাম? অথচ না জেনেও অয়দিপাউসের পরিত্রাণ নেই। অস্তিবাদী দার্শনিকরা বলেছেন ব্যক্তি প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে। তিনি আছেন এই জ্ঞান তাঁর হয়। প্রতিদিনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ তার এই অস্তিত্বের সম্বন্ধে সচেতন হয়। বেঁচে থাকার জন্যে মানুষের সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব। Man is nothing else but what he makes of himself. সার্ত্রের দর্শনে নিয়তি, প্রাক্তন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপের ফলে মানুষের পরিবর্তন হয়—এমন কথা নেই। এই মানুষ স্বাধীন এবং সে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করতে চায় তার কর্মধারাকে। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে এই স্বাধীন নির্বাচন সম্ভব নয়। ফলে সার্ত্রের বুর্জোয়া সমাজ সম্বন্ধে ঘৃণা এবং বিবমিষা। বুর্জোয়া মূল্যবোধে আমরা শেষ পর্যন্ত অলীক বিশ্বাসে পতিত হই। নিজেকে ধ্বংস করি। পৌঁছাই নৈরাজ্যে Absurd-এ। বলা বাহুল্য জীবনানন্দের কবিতায় অস্তিবাদী দর্শনের পরিচয় দুর্লভ নয়। Absurd তত্ত্বও অসুলভ নয় তাঁর চিন্তাধারায়। তিনি যে এই দর্শনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা তো তাঁর কবিতাবিষয়ক প্রস্তাবে উল্লেখ আছে। তাহলে আপনাকে এই জানার ইচ্ছা কোনোদিনই ফুরাবে না। ফুরাবে না বলেই এই দুঃখ। এই বুর্জোয়া সমাজের মূল্যবোধে আমার জীবনের বিনাশ। অবিনাশী কিছুর সন্ধানই মানুষের জীবন।

হায় স্বর্গভ্রষ্ট মানুষের এই পরিণাম। সার্ত্র তো স্বর্গেও বন্ধন-কে দেখেছেন। ভালোবাসার মৃত্যু দেখেছেন। জীবনানন্দও এই ভালোবাসাকে চেয়েছিলেন। নারী তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। পাঁকেপদ্মে জীবনানন্দ খুঁজেছেন তাকে। কিন্তু সে নারী আপ্রাপনীয়, অধরা। বেদনার জন্ম এইখানে। জীবনানন্দের বাসনায় প্রেম স্পর্শ করে না এমন হতে পারে না। হয়ও নি। এই যেমন তাঁর ধূসর পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রেম' কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথের 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ অদলবদল করে কেরাণীর প্রেমকে যখন নিখিল বিশ্বের প্রেমস্বরূপের পটভূমিকায় স্থাপিত করলেন তখন প্রেমের গ্লানি, যন্ত্রণা আর তাতে নেই। প্রেম সেখানে উজ্জ্বল এবং শুভ্র। জীবনানন্দের রচনায় সে ঔজ্জ্বল্য এবং শুভ্রতার সাক্ষাৎ মেলে অবশ্যই। জীবনানন্দের কাছেও প্রেম 'প্রার্থনার গানের মতন', 'গানের ছন্দের মত'। এ-প্রেমে সুদূর অভিসারের ইঙ্গিতও আছে। আলো অন্ধকারে জীবন দুলে উঠে এই প্রেমের স্পর্শে। হৃদয় ধূপের মত জ্বলে আর সেই ধূপের ধোঁয়া প্রেমের বন্দনা করে। জীবনানন্দ বলেন

পাখির মায়ের মত প্রেম এসে আমাদের বুক !
সুস্থ করে দিয়ে গেছে আমাদের রক্তের অসুখ !
পাখির শিশুর মত যখন প্রেমেরে ডেকে ডেকে
রাতের গুহার বুকে ভালোবেসে লুকায়েছে মুখ,—
ভোরের আলোর মত চোখের তারায় তারে দেখি !—

শুশ্রূষাকাতর কবিচিত্তের প্রেমবাসনা পাখির এবং পাখি-মা'র নরম লাবণ্যে এবং আহ্বানের সরল কামনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের প্রসঙ্গে দময়ন্তী, মহাশ্বেতা, সুভদ্রা উদ্ভাসিত হয়। সেই পৌরাণিক প্রেমবাসনায় কবিচিত্ত অনন্ত সুখের আস্বাদ পায়। প্রেমিকাকে মহারানী বলতে তিনি গৌরব অনুভব করেন। জীবনানন্দ মধ্যবিত্ত জীবনের অসুখের কথা বলেন। পাখির উপমায় যেন তিনি মানবচিত্তকে খানিকটা উপেক্ষাই করলেন। জীবনানন্দ জানেন পাখি মুক্ত। মানুষ বন্দী। তিনি জানেন মধ্যবিত্ত জীবনের রক্তের মধ্যে অসুখের চলাফেরা। প্রেম এই অসুখকে সুস্থ করে দেয়। মধ্যবিত্ত জীবনের এই বাসনার ঘনিষ্ঠ চিত্র জীবনানন্দের প্রেম-কবিতায় বার বার দেখা দেয়। এই প্রেম 'সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্র থেকে / প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি' ;--। মজা হচ্ছে এই জানার ফলেই কবির বেদনা। এবং সেই বেদনার ফলে তাপ। সেই তাপে জ্বলতে পারেন বলেই তাঁর কবিতা আমাদের উত্তপ্ত করে

অসুস্থ ডানার কোলাহলে,
ঝড়ের হাওয়ার শেষে ক্ষীণ বাতাসের মত বয়ে,
আগুন জ্বলিয়া গেলে অঙ্গারের মত তবু জ্বলে,
আমাদের এ জীবন···
তার ছিঁড়ে গেছে,—তবু তাহারে বীণার মতন করে
বাজাই,—যে-প্রেম চলিয়া গেছে তারি হাত ধরে !

শেষ চরণের বিস্ময়বোধক চিহ্নটি লক্ষ করতে বলি। এই কবিতা তো প্রেমের স্মৃতি-

রোমন্থন। তার-ছেঁড়া বীণা হাতে কবি। শূন্যতার কি অসহায় রূপ! এই শূন্যতার বুকেই জীবনানন্দ বীণার কড়ি-মধ্যম বাজিয়ে দেন। যে চলে যায় তার হাত ধরা যায় না। স্মৃতিকে স্পর্শ করা যায় মাত্র। জীবনে এই স্মৃতি ভার—কবিতায় বেদনার রসে তা পূর্ণ। কখনও কখনও জীবনানন্দের প্রেমবাসনা পল্লীসংস্কারের পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠতে থাকে

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি ;

এই বাসনা প্রেমিককে আকাশ-বিহারী করে। হংসের ভাবনায় কবি ডানার চলমানতায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। জলসিঁড়ি নদী, ধানক্ষেত, ছিপছিপে শর, একটি নিরালা নীড়, ফাল্গুনের রাত, ঝাউয়ের শাখা পল্লীবাংলার মায়ামমতা মাখানো চিত্র। এরপর কবি গৃহবাসনা পরিত্যাগ করেন

তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখনায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীশ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।

এই ছবি কি গৃহবাসনা পরিত্যাগের? এখানেও মর্ত্যমায়া কবি ত্যাগ করতে পারেন না। খই ক্ষেত, শিরীশ বন সোনার ডিম প্রেম-কে আকাশ পৃথিবীর স্পর্শে বাস্তব-কল্পনার মায়ায় দুলিয়ে দেন। কিন্তু কবির প্রতিভা (মনন + কল্পনা) এই উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয় আমাদের যে এই প্রেম গুলিবিদ্ধ। মানুষের কামনা 'আমি যদি হতাম'। এই 'যদি' লক্ষণীয়। কল্পনা আর বাস্তবতার মাঝখানে ঐ সংশয়াত্মক 'যদি' এসে শিকড় মেলেছে। হংসের পাখায় পিস্টনের অর্থাৎ যন্ত্রের টানে প্রেমকে বিশুষ্ক করে তোলে। এই প্রেমে মৃত্যু, স্তব্ধতা এবং শান্তি। যন্ত্র মানুষকে অহরহ টুকরো টুকরো মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। প্রেমের এই পরিণাম কবিকে টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার থেকে এক অখণ্ড মৃত্যুচিন্তায় উত্তীর্ণ করে দেয়। জীবনানন্দের কবিতায় প্রেমভাবনার স্বল্পতার কথা কেউ কেউ উত্থাপন করেছেন। শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনে নেই এমন কিছু কবিতা আমাদের নজরে অনেক সময় পড়ে নি বলেই কি প্রেমচেতনার স্বল্পতার দিকটি উল্লিখিত হয়েছে। নিঃসঙ্গ কবির প্রেমের জন্যে হাহাকার বেশ কয়েকটি কবিতায় বিস্তৃত হয়েছে একথা স্মরণে রাখা কর্তব্য। জীবনানন্দ 'সহজ' কবিতায় বলেছেন

পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান!
কোনদিন শুনিবে না তুমি তাহা,--জানি আমি—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে!

আগে একবার 'বন্দি'র যন্ত্রণার উল্লেখ করেছি। এবারে 'তবুও'র মর্মান্তিকতা লক্ষ করতে বলি। নারীর প্রেমই যে নিঃসঙ্গ হৃদয়ে গান হয়ে তরঙ্গ তোলে একথা জীবনানন্দ বোঝেন। আর সেই শরীর না পাওয়ার বেদনায় তার অনুভব কবিতা রূপে প্রস্ফুটিত হয়। জীবনানন্দ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর উক্তি তিনি নির্জনতার কবি—অনেকের মনঃপূত হয় নি। কিন্তু বসুর উক্তিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করলে বুঝতে পারি জীবনানন্দের কবিপ্রাণ নির্জনতাকেই খুঁজেছিল।

নিঃসঙ্গ বুকের গানে
নিশীথের বাতাসের মত
একদিন এসেছিলে,
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত !

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রেমের স্মৃতি-রোমন্থন জীবনানন্দের কবিতার অন্যতম বিষয়। এ রোমন্থন মাথুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের। বাংলা কবিতায় অন্তঃশীলা স্রোত জীবনানন্দের কবিতায় দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু মাথুরের পর ভাবসাম্মিলনের কোনো আশ্বাস এ কবিতায় নেই। কেবল তাই নয় তিনি বলেন, 'তোমারে নিয়েছে কেটে কখন সময় !' অথবা 'আমার নিকট থেকে তোমারে নিয়েছে কেটে যদিও সময়।' এখানে জীবনানন্দ ঐতিহ্যকে অতিক্রম করলেন। বাংলা কবিতায় নূতন সম্ভাবনা জাগিয়ে তুললেন। স্মৃতি-কে সময়ের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। স্মৃতির প্রবাহে চরাচর ব্যাপ্ত হয়ে গেল। নিজের কাছেই তিনি বোঝাপড়া করতে চাইছেন

কেন আমি গান গাই ?
কেন এই ভাষা
বলি আমি !—এমন পিপাসা
বার-বার কেন জাগে !
পড়ে আছে যতটা সময়
এমনি তো হয়।

সময়ের প্রবাহ-কে মেনে নিয়েও কিন্তু জীবনানন্দকে একথা বলতেই হয় একদিন যে আনন্দ-উল্লাস জেগে উঠেছিল তা আর ফিরে আসে না। সেখানে ফিরে যাবার অর্থাৎ জীবনের গতি-কে উল্টো পথে ফিরিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও কবি মনীষা জানে সেখানে আর ফিরে যাওয়া যায় না। এক গভীর ব্যর্থতাবোধ থেকে এসব কবিতার জন্ম। সে ব্যর্থতা এ জীবনের, কবির চৈতন্যের জাগরণে।

সকল যেতেছে চলে, সব যায় নিভে—মুছে—ভেসে—
যে-সুর থেমেছে তার স্মৃতি তবু বুকে জেগে রয় !
যে-নদী হারায়ে যায় অন্ধকারে—রাতে—নিরুদ্দেশে,
তাহার চঞ্চল জল স্তব্ধ হয়ে কাঁপায় হৃদয়।

আকাশের তারার মত প্রণয়িনীর আমন্ত্রণ। সে আমন্ত্রণ কেমন? 'ঘুমন্ত বাঘের বুকে বিষের বাণের মত বিষম সে ক্ষত'। বেদনার এই আর এক চিত্র। এই বেদনাই কবির জীবনকে একদিন 'পাখির ডিমের মত' ফুটিয়ে তুলবে। জীবনানন্দ কল্লোলগোষ্ঠীর অস্থিরতা লক্ষ করেছিলেন। কল্লোলের উত্তাপের স্পর্শ তিনিও পেয়েছিলেন। 'ঝরা

পালকে'র কিছু কবিতায় তার পরিচয় আছে। কিন্তু তিনি কল্লোলের কোলাহল থেকে সরে এসেছিলেন। স্বভাবে, ভাবনায় তিনি কল্লোলের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করতে পারেন নি। কিন্তু দেহ সম্পর্কে তিনি ভিক্টোরীয় ভদ্রতায় শম্বুকবৃত্তিও গ্রহণ করেন নি। ১৩৩৩ একটি দীর্ঘনিশ্বাসের কবিতা। কবির প্রিয়ার উদ্দেশে রচিত কবিতা। প্রেমের In Memorium এই কবিতা। একদিন প্রিয়ার রক্তের ভালোবাসা কবিকে শান্তি দিয়েছিল। এ কবিতায়ও বেদনার বিস্তার। সেই বেদনায় প্রেমিকের ভালোবাসার পদ্ম ফুটেছিল। কিন্তু এখন তিনি নিঃসঙ্গ। অস্তিত্বের এই বেদনাই কবিতাটির বক্তব্য। প্রেম সান্ত্বনা নয়, বিষণ্ণতার প্রতীক। কেননা

এই পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ ; —কেহ ঝরে, —ঝরে যায় মন
তার আগে।

কবিতাতে এই চারটি ধুয়াপদ। জীবনানন্দের কবিতায় ধুয়াপদের ব্যবহার আছে। এবং একই কবিতায় এই ধুয়াপদ বার বার ঘুরে ঘুরে আসে। তাতে একটা ক্লান্তির পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। এই ক্লান্তি জীবনবহনের ক্লান্তি, এবং আমার মনে হয় বর্তমান কালের দুঃসহতার বেদনার ভাষাকে খুঁজে পেয়েছেন এই ধুয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে। ১৩৩৩ এর ব্যতিক্রম নয়। ১৩৩৩ কবিতাটিতে জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতির সব কটি লক্ষণই অতিস্ফুট। 'পিপাসার গান'ও প্রেমের কবিতা। বক্তব্য স্পষ্ট। দেহের পিপাসার কথাই কবি বলেছেন। দেহপিপাসা ঊনিশ-বিশ শতকের কবিতায়ও ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভোগের প্রসঙ্গ অবশ্যই আছে কিন্তু তাঁর কবিতার অন্যতম ধুয়া হল 'নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে'। কল্লোলগোষ্ঠীর কবিবৃন্দের কবিতায় দেহবাসনা উচ্চকিত। কখনও কখনও সদ্যোজাত শিশুর চীৎকারের মতো তা লক্ষ্যভ্রষ্ট। অনেকসময় কবির উচ্চারণ ফ্যাশনলোলুপ। এবং এমন কি ফ্যাডের (fad) চোরাবালিতে আত্মসমর্পণ। জীবনানন্দের কবিতায় দেহপিপাসার টান তীব্র। সে তীব্রতা প্রেমিক-প্রেমিকার কামকলার বর্ণনায় প্রদীপ্ত। প্রতিচরণে কামনার উত্তাপ।

নারীর অধরে
চুলে—চোখে—জুঁয়ের নিশ্বাসে
ঝুমকোলতার মত তার দেহ-ফাঁসে
ভরা ফসলের মত পড়ে ছিঁড়ে
এই দেহ,—ব্যথা পায় ফিরে।···

অথবা

সেই ঠোঁট চুল,
সেই চোখ,—সেই হাত,—আর সে-আঙুল
রক্ত আর মাংসের স্পর্শসুখভরা,—
যেই দেহ একদিন পৃথিবীর ঘ্রাণের পসরা
পেয়েছিল,—আর তার ধানীসুরা করেছিল পান,···

অবশ্যই এই বর্ণনা মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসুর দেহারতির কথা স্মরণ করিয়ে

দেয়। কিন্তু কবিতাটি আরো কিছু বেশি বলে। প্রেমের প্রৌঢ় অভিজ্ঞতায় অতৃপ্তির জ্বালা। এই জ্বালায় ভোগবাসনার জন্ম। আর ভোগবাসনাই পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষা জাগায়। জীবনানন্দের কবিতায় বারংবার পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষার কথা উচ্চারিত। শাস্ত্রীয় অর্থে নয়—মানুষের অচরিতার্থ জীবনবাসনা অর্থে। সেই কারণে কবিতাটির উন্মেষ লগ্নে কবির মৃদু প্রশ্ন 'আরবার আসিব কি নামি।' প্রশ্নটি মৃদু বটে কিন্তু কবিতাটির শরীর তৈরী হয়েছে তাকে ঘিরেই। এই কবিতায়ও কবির রোমন্থনকাতরতা ব্যাপ্ত। কিন্তু কবির মনীষা তাঁকে জানিয়ে দেয় প্রেমের অনিঃশেষ স্বাদ এ জীবনে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ সত্য আবিষ্কারে কবির বিষণ্ণতা। মোহিতলালের কবিতায় অতৃপ্তি-জনিত সুখের তীব্রতা পরিস্ফুট। বৈষ্ণব কবিদের ভাষায় তপ্ত ইক্ষু চর্বণ। জীবনানন্দ ক্ষুধাকেও মৃদু কোমল করে এক দূরাগত বিষণ্ণতায় ভরে দেন। 'শঙ্খমালা' কবিতা রূপকথা আশ্রয়ী। শঙ্খমালার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শঙ্খিনীমালার। মিথুনবাসনা কবিতাটির দেহে, মিলনের আকৃতি কবিতার শব্দের বা প্রতিমার আভাস। কবির অন্বিষ্ট শঙ্খমালাকে এক মায়াবী আলোয় খুঁজেছেন কবি। উনামুনো প্রেমকে ছুঁয়ে যে সর্বব্যাপী প্রেমে উত্তীর্ণ হন জীবনানন্দের কবিতা তা নয়। এখানে নারীর শরীরের উষ্ণতাপিপাসু এক প্রেমিকের অগস্ত্যযাত্রা। আমাদের তা বিহ্বল করে। কবির অসহায় আর্তনাদ

এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

জীবনানন্দের কবিতায় সৃষ্টির ধারাবাহিকতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ দেখা যায়। এবং তা যে বীজ থেকে ফসলে পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেয় সেকথা আগে বলেছি। 'আকাশে রূপালি শস্য' (নক্ষত্র = খই = ধান) অথবা 'সোনার সিঁড়ির মতো ধানেধানে' —সে কথাই বলে। নারীর সঙ্গে শস্য একই প্রযত্নে উচ্চারিত হয় বলে পৃথিবীর মায়ামোহ এত বাস্তবিক। জীবনানন্দের রোমান্টিকতা বাস্তব থেকে পলায়ন নয় বাস্তবেরই ঘ্রাণ, স্বাদ স্পর্শে তা ভরা। এ কবিতার আর দুটি চরণ 'স্তন তার / করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার ?' বাস্তবকে দেখার এক আশ্চর্য দৃষ্টি আমরা লক্ষ করি এইখানে। কে জানে জীবনানন্দের কল্পনা উর্বরাশক্তির আধার কোনো স্ত্রীদেবতাকে স্মরণ করেছিলো কিনা ? অথবা রবীন্দ্রনাথের উর্বশীরই সংহত, জমাট রূপ এই কবিতা ? রূপকথার কথা বলছিলাম। 'পরস্পর' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে বলি। এখানে যে রূপকথার এক মেয়ের সাক্ষাৎ পেয়ে যাই তাঁর রূপ কি রকম ? 'পালঙ্কের 'পরে শুধু একখানা দেহ' 'মসৃণ হাড়ের মত শাদা হাত দুটি', 'আসিবে না গতি যেন কোনোদিন তাহার দু'পায়ে', 'পাষাণের মত হাত পাষাণের হাতে'। এ মেয়ে বসন্তসেনা নয়। কিন্তু বসন্তসেনার রহস্য তার দেহে। সে মেয়ে 'জমানো ফেনার মত দেখা গেল তারে / নদীর কিনারে !', 'শাদা হাতে ধব্‌ধবে স্তন / রেখেছে সে ঢেকে !' কবির অভিজ্ঞতায় আর একবার স্বপ্নের সেই রূপকথা ভেসে ওঠে। যে মেয়ে সেখানে কবিকে দেখা দিয়েছিল—'সেই জল-মেয়েদের স্তন / ঠাণ্ডা,—শাদা,—বরফের কুঁচির মতন !' অথবা 'মুখ বুক ভিজে, ফেনার শেমিজে / শরীর পিছল !' দ্বিতীয় রূপকথায় বহুবচন মেয়েরা। এসব স্মৃতি-কে উত্তেজিত করে। বেদনার রসে সে নারী চিত্রিত হয়। আর এক রূপকথার কথা

কবির মনে পড়ে যায়। 'রাজ-যুবরাজ-জেতা-যোদ্ধা' যে নারীর জন্যে আত্মাহুতি দিয়েছিল সে রূপসীর ছবি এখানে। এ নারীর 'শরীরে ননীর ছিরি,—ছুঁয়ে দেখো—চোখা ছুরি,—ধারালো হাতির দাঁত !'

হাড়েরই কাঠামো শুধু,—তার মাঝে কোনোদিন হৃদয় মমতা
ছিল কই !

এ-যেন সৌন্দর্যজগতের বিস্ময়। বিষামৃতের আধার এই জগৎ। ইতিহাসের আগে ও পরের স্তরের নারীস্তোত্র। প্রেমবর্জিত এই জগৎ। চলে আসেন সাম্প্রতিক কালে। যেখানে মায়া মমতার সাক্ষাৎ পান। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কবির মনে হয় 'সব বাসি,—সব বাসি,—একেবারে মেকি।' এই সব ধারণা থেকেই কবি বোধের জগতে যান, মৃত্যু পরমরমণীয় হয়ে ওঠে। জীবনের প্রতি ভালোবাসাই কবিকে জীবনবিমুখ করে তোলে। প্রেমও সেখানে বাসি, মেকি বলে মনে হয়। কারও কারও মনে হবে এ এক ধরনের সিনিসিজম। হয়ত তারই ফলে জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা। হয়ত সেই কারণেই 'বোধ'-এর জন্ম। কিন্তু আট বছর আগের একদিন মৃত্যুচেতনার না জীবনপিপাসার কবিতা—আজও তার যথার্থ সমাধান হয়েছে কিনা সন্দেহের বিষয়।

জীবনানন্দ কখনও ক্লান্ত সুরে, কখনও এক নিশ্চিত বিশ্বাসে, কখনও বা এক ব্যাপ্ত বোধে বিশেষ একটি কালকে, বিশেষ একটি ইন্দ্রধনুর প্রকাশকে অথবা প্রেমের মধুর লগ্নকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন—তার ঘ্রাণ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এসবই অতীত-কালের। তিনি অতীতের সেই বিশেষ মুহূর্তটির প্রতি দীর্ঘনিশ্বাসে হাত বাড়িয়েছেন এবং বর্তমানের সীমাবদ্ধতা যত তাঁকে আতুর করেছে তত তিনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিজেকে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কোনদিন, একদিন, সেদিন এবং রাত দিন, আজ, মহাকাল, খণ্ডকাল এজন্যে জীবনানন্দের কবিতায় ভিড় করে। কিছু উদাহরণ সংকলন করি

পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয় (কার্তিক মাঠের চাঁদ)
একদিন হয়েছে যা (ঐ)
আজো তুমি তার স্বাদ লয়ে
আর একবার তবু দাঁড়ায়েছ এসে (ঐ)
এ পৃথিবী আজ জানে তা কি (ঐ)
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে (সহজ)
আজ রাত্রে এসেছিলে
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত (ঐ)
একদিন শুনেছ যে-সুর—ফুরায়েছে (কয়েকটি লাইন)
আজিকার,—শেষ মুহূর্তের
আমি এক ; (ঐ)
সেই দিন তুমি যাবে চ'লে
পৃথিবী গাবে কি গান (ঐ)
একদিন সেই ব্যথা ছিল সত্য তারে ? (ঐ)
সেদিনের পুরানো আঘাত (ঐ)

ব্যথা যারা সয়ে গেছে রাত্রি-দিন (কয়েকটি লাইন)
কোন্ রাত্রি-আঁধারের পার আজ সে খুঁজিছে (ঐ)
আহ্লাদ কি পায় নাই তারা কোনোকালে (ঐ)
কোন্ রাত—কোন্ অন্ধকার
একবার এসেছিল,—আসিবে না আর (ঐ)
গান গায় যেখানে সাগর তার জলের উল্লাসে (ঐ)
সে রাতেও হিম হয়ে আসে
বাঁশ পাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা (পেঁচা)

যেখানে, সেখানে, কোন্ রাত, আজ এসব দিক-ও কাল নির্দেশক শব্দগুলি জীবনানন্দের কবিতায় বিরোধের সূচনা করে। দূরকালের ইন্দ্রধনু আর একালের বিপর্যয়কে একই সূত্রে বাঁধবার ব্যর্থ প্রয়াস এসব চরণে স্পষ্ট।

এখন বোধ করি বলা যায় জীবনানন্দকে কেউ কেউ কবি বলতে কি বুঝেছিলেন ? কবি জীবনানন্দের চেতনা কেবল কল্পনাবিলাসী নয় তিনি মনীষীও বটে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই কারণে তাঁর আলোচনায় জীবনানন্দের মনীষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। জীবনানন্দের প্রেমের উপলব্ধি উনামুনোর ভাষায় বলা যায় 'If I am moved to pity and love the luckless star, which will one day vanish from the sky, it is because love, compassion, makes me feel that it possesses a conciousness, more or less obscene, which causes it to suffer because it is no more than a star doomed to cease being itself one day. For all conciousness is an awareness of death and suffering.' রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেম সৌন্দর্যবোধ মঙ্গলচিন্তা অনায়াসে মিলে যায়। জীবনানন্দের কবিতায় দীর্ঘ বর্শা হাতে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে রূপসীরা কি খুঁজছে ? কাকে বিদ্ধ করতে চাইছে ?

মৃত্যুকে দলিত করার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?

এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে ? বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যায়ে এসে এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি করান আমাদের। এই অনিশ্চয়তা একালের কবিতার জন্মভূমি। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দের গোটা ছকটাই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। জীবনানন্দের কি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।

সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে,
গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন। (সিন্ধু সারস)

রোমান্টিক কবিতায় আলডুস হাক্সলি বলেছেন (বিশেষ করে ওয়র্ডসওয়র্থ) প্রকৃতির একটি রূপই পরিস্ফুট হয়েছিল। নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর দিকটি উপেক্ষিত হয়েছিল। জীবনানন্দের কবিতায় (আরো কারো কারো কবিতায়) প্রকৃতি তার স্বভাব নিয়ে উপস্থিত। এই সিন্ধুসারসই কবির মনে জাগায়

অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো না কি ? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে—হারিয়েই আনন্দের গতি ;
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান ?

বর্তমানের একটা মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা কবি উচ্চারণ করলেন। প্রবন্ধের সুরুতে যে কথা বলেছিলাম সে বেদনারও মানে এখানে স্পষ্ট। আসলে পঙ্গু জীবনের যে ছবি জীবনানন্দ যুদ্ধের প্রাক্কালে ও যুদ্ধপরবর্তী কালে দেখেছেন তা তাঁর হৃদয়কে দীর্ণ করেছে। সাতটি তারার তিমিরে তার প্রচুর চিত্র তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন কবিতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর এসব থেকে জীবনানন্দ ইতিহাস ও কালচেতনার গভীরে নিমগ্ন হন। অবশ্যই এ চিন্তায় টি. এস. এলিয়টের চিন্তার প্রভাব আছে। টি. এস. এলিয়টের চিন্তা আবার হেরাক্লিটাসের ভাবনার দ্বারা শোধিত।

The begining and the end are common.
Fire lives in the death of earth, air lives in the death of fire, Water lives in the death of air, and earth lives in the death of water.

এই বোধেই এলিয়ট বলেন In my end is my beginning. জীবনানন্দের কবিতায় এরকম আশ্বাস পাই কি ? সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অমলেন্দু বসু, জীবনানন্দের মৃত্যু চিন্তাব থেকে উত্তরণ দেখেছেন। বিশেষ করে বসু 'মহাত্মা গান্ধী' কবিতাটির উল্লেখ করে বলেছেন জীবনানন্দ এক মহতী মূল্যবোধে আস্থাবান। একদিক থেকে এ মন্তব্য যথার্থ। কিন্তু মহাত্মার একলা চলা জীবনের বর্ণনা এ কবিতায় যেভাবে দেওয়া হয়েছে সেখানে আশ্বাসের কথা কি খুব জোরালো ?

হয়তো বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয় :
হয়তো বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে ;
একজন স্থবির মানুষ দেখ অগ্রসর হয়ে যায়
পথ থেকে পথান্তরে—সময়ের কিনারায় থেকে সময়ের
দূরতর অন্তঃস্থলে : —সত্য আছে, আলো আছে ; তবুও সত্যের আবিষ্কারে।

'হয়তো বা' উচ্চারণে সংশয় দূর না হওয়ারই ঘোষণা। 'সময়ের কিনারায় থেকে সময়ের দূরতর অন্তঃস্থলে' সত্য, আলো আবিষ্কারের প্রয়াসকে তিনি অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু এই কবিতাতেই আছে 'মানুষের প্রাণে কোনো উজ্জ্বলতা নেই' 'শক্তি আছে শান্তি নেই', 'প্রতিভা রয়েছে, তার ব্যবহার নেই'—মহাত্মা গান্ধীর সহিষ্ণুতার জয় ঘোষিত হলেও বর্তমানের চেহারা হল 'প্রার্থনা করার মতো বিশ্বাসের গভীরতা কোনো দিকে নেই'। আসলে মানুষ সময়ের নিকট থেকে সময়ের দূরতর অন্তঃস্থলে যাচ্ছে। এই যাওয়াটাই হয়ত এক অর্থে সত্য। জীবনানন্দের কবিতায় সময়ের (ইতিহাসচেতনা) দিকে তাকানো যাক। সাতটি তারার তিমিরে এই পংক্তিগুলি লক্ষণীয়

তবুও মিথ্যা নয় : সময়ের বালি পাতালের কালি ঠেলে
সময় সুখ্যাতগুণে অন্ধ হ'য়ে, পরে আলোকিত হয়ে গেলে (বিভিন্ন কোরাস)
সময়ের নিরুৎসুক জিনিষের মতো (ভাষিত)

এতদিন পরে সেই সব ফিরে পেতে
সময়ের কাছে যদি করি সুপারিশ
তাহলে সে স্মৃতি দেবে সহিষ্ণু আলোর
দু-একটি হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে (স্বভাব)
কোথাও নদীর পারে সময়ের বুকে
দাঁড়ায়ে রয়েছে আজো সাবেককালের এক স্তিমিত প্রাসাদ
আজ এই সময়ের পারে এসে পুনরায় দেখে
আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে (উন্মেষ)

মহাপৃথিবী থেকে কয়েক পংক্তি

সময় কীটের মত কুরে যায় আমাদের দেশ
এইখানে সময়কে যতদূর দেখা যায় চোখে
নির্জন ক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখি দাঁড়ায়েছে অভিভূত চাষা ; (আবহমান)
অভিভূত হ'য়ে আছে—চেয়ে দ্যাখো—বেদনায় নিজের নিয়ম। (ঐ)
চাপা প'ড়ে
গেছো যে হারিয়ে
পৃথিবীর ভিড়ে তুমি—বলে সে খিন্ন হাত ছেড়ে দিলো ধীরে :
শান্ত মুখে—সময়ের মুখপাত্রীর মতো সেই অপূর্ব শরীরে
নদী নেই—হৃদয়ের কামনা ব্যথা শেষ হ'য়ে গেছে কবে তার ; (জর্নাল : ১৩৪৬)

সাতটি তারার তিমিরে একটি কবিতার নাম 'রিস্টওয়াচ' এবং আর একটি কবিতার নাম 'সময়ের কাছে'। সময় এবং ইতিহাসচেতনা আলাদা বস্তু কিছু নয়। জীবনানন্দের কল্পনা যত গভীর তত বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। অর্থাৎ কবির অভিজ্ঞতা যত প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করেছে তত তিনি যেন আমাদের রক্তের ভিতরে যে অসুখ খেলা করে তার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। এলিয়টের ধর্মান্তরিত রূপ বড় বেশি ধরা পড়ে 'ফোর কোয়ার্টেটসে'। সেখানেও কবিতা আছে কিন্তু প্রজ্ঞা এসে কবির হাত চেপে ধরে। জীবনানন্দের 'সময়ের কাছে' কবিতা আসলে সেরকম একটা বোধ। সময় কেন সমাপ্তিহীন এই প্রশ্ন তাঁর মনে জেগেছে। আর এর উত্তর দিতে গিয়ে নিজেকে বলেছেন উচ্ছিষ্ট, জঞ্জাল। কিন্তু পরক্ষণেই সময়ের প্রবাহ তাঁকে এক উজ্জ্বলতার মুখোমুখি করে দেয়। তখন মনে হয় মানুষ 'বড়ো শাদা পাখি' তার বুকে 'উজ্জ্বল প্রাণশিখা' তার 'সাহস সাধ স্বপ্ন' আছে। পৃথিবী উচ্ছিষ্ট আর জঞ্জাল সরাতে সরাতে 'প্রৌঢ়তার' দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কবি তার বন্দনা করছেন 'যুগে যুগে তার জয়'। আবার সন্দেহের দোলায় কবি দুলেছেন 'স্বপ্নের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানসিকতার ভোর' কোথাও আছে কি ? জীবনানন্দের কালচেতনা আর ইতিহাসচেতনা কেমনভাবে এক হয়ে যায় এই পংক্তিগুলিতে তার স্বাক্ষর

নচিকেতা জরাথুস্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হামা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ?
অন্ধকারে ইতিহাস পুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই ;

অতএব 'অনন্ত দ্বন্দ্ব'ই কবির বোধে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের পার্থক্য লক্ষ করেছি। কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথে জীবনানন্দ কী রকম আশ্রয় পান তার কথাও স্মরণে রাখা কর্তব্য

'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ণ হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দের এই সময় ও ইতিহাসভাবনায় এলিয়টের এমন কি আইনস্টাইনের স্পেস টাইম তত্ত্বের সাদৃশ্য দেখেছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য বিষয়টির আলোচনায় জীবনানন্দের বিখ্যাত কবিতাবলীর পংক্তি উদ্ধার করেছেন। অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে সময় অথবা ইতিহাসের উল্লেখ না থাকলেও জীবনানন্দের কবিভাবনা যে মৃত্যু, প্রেম প্রকৃতির ভাবনায় কাল চেতনার দ্বারা প্রভাবিত তাই বলতে চেয়েছেন। বস্তুত সঞ্জয় জীবনানন্দের কবিতার শরীরে কখন যে প্রেম প্রকৃতিতে স্থিত হয় আবার সেই ভাবনা মৃত্যুর তুহিনশীতলতায় নিমজ্জিত হয় তার রহস্যময়তা-কে ধরতে চেয়েছেন। আবার এ সমস্ত কিছুই কালের অবিশ্রাম গতিময়তায় রঙ বদলায় তাও জীবনানন্দের কবিতার বৈশিষ্ট্য। এই সময়চেতনার দার্শনিক ব্যাখ্যায় যাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমি কেবল লক্ষ করি এই সময়চেতনা জীবনানন্দের কবিভাবনায় এমনভাবে জুড়ে বসল যার ফলে কবিতার বিষয়ে নূতন মাত্রা যুক্ত হল। জীবনানন্দের কবিতায় অতীতচারিতা সময়ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হল বলেই এ-কেবল রোমান্টিক ভাবনাদীপ্ত নয়। অতীত—বর্তমান—ভবিষ্যৎ একই সূত্রে গ্রথিত হয়। কোনো কবি জগৎ ও জীবনকে রঙ্গমঞ্চরূপে কল্পনা করেছেন, কেউ মনে করেছেন ঐশী লীলা রূপে কেউ বা প্রকৃতি-পুরুষের দ্বৈত লীলা রূপে। জীবনানন্দ সেখানে দেখলেন সব কিছুই সময়ের দান। অতীত-বর্তমান মিলে মিশে একাকার জীবনানন্দের কবিতায়। সময়ের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে কবির আকুল প্রয়াস। এই আকুলতা বেদনা থেকেই জন্ম নেয়। কেননা সময় কিছু ধরে রাখে না। নক্ষত্রের দীপ জ্বেলে এই সময় আমাদের মুগ্ধ করে কিন্তু পরক্ষণেই সে নক্ষত্রের ধ্বংসের সংবাদও পেয়ে যাই আমরা। এই সময় ভাবনাই জীবনানন্দের কবিতায় একটা ব্যাপ্ত বোধের জন্ম দেয়। যেমন

যত স্রোত বয়ে যায়
সময়ের
সময়ের মতন নদীর
জলসিঁড়ি, নীপার, ওডার, রাইন, রেবা, কাবেরীর
তুমি তত বয়ে যাও,
আমি তত বয়ে চলি,
তবুও কেহই কারু নয়। (দীপ্তি)

সময় নিজের নিয়মে চলে। জগৎ ও জীবনের প্রতি নির্বিকার। মানুষ সময়স্রোতের উপর সাঁকো গড়ে দিতে চায়। কিন্তু তা ভেঙ্গে যায়। প্রকৃতি ও মানুষ একই ধারায় বয়ে চলেছে। এখানে লক্ষ করতে বলি জীবনানন্দ বিভিন্ন নদী নামগুলি একই পংক্তিতে সাজিয়ে দিলেন। এ বিন্যাস তাঁর পক্ষেই সম্ভব। জীবনানন্দ অনায়াসে ওডার নদীর

সঙ্গে রেবা-কাবেরীর মিলন ঘটাতে পারেন। অবাক হয়ে যাই জলসিঁড়ি নদীও নীপার ওডারের সঙ্গে একই সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। স্পেসজ্ঞানকে এভাবে জীবনানন্দ ভেঙ্গে দিয়ে নূতন ভাবনায় উত্তীর্ণ করে দেন। যেমন অতীতই বর্তমান হয়ে ওঠে তেমনি দূর ও নিকটের ব্যবধান ঘুচে যায়। এই কবিতাতেই আছে

রক্তের সমুদ্র চারিদিকে
কলকাতা থেকে দূর
গ্রীসের অলিভ-বন

অন্ধকার

এখানেও কলকাতা-গ্রীস অনায়াসে একাকার হয়ে যায়। একেই বলেছি জীবনানন্দের কবিতায় ব্যাপ্ত বোধ। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ঘন ঘন ইতিহাসের দৃশ্যের উপস্থিতি দেখি। অতীতের গৌরবময় স্থান নাম তাঁর কবিতায় যত্রতত্র। মহান পুরুষের কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি উল্লাস বোধ করেন। জীবনানন্দের ইতিহাসবোধেও ধর্মাশোক, কুরুবর্ষ, লাওৎ-সে, সুজাতা, সঙ্ঘমিত্রা, ঈশা-র কথা আছে। কিন্তু কোনো দৃশ্য কোনো ঘটনা কোনো ব্যক্তিই কোনো জাতীয় অথবা ধর্মীয় অভিমান থেকে জাগে না জীবনানন্দের কবিতায়। সময়ের স্রোতে এসব ব্যক্তি, ঘটনা, দৃশ্যের উদয়-বিলয় জীবনানন্দের অভিষ্ট। এবং আলো অন্ধকারের এই স্রোতে জীবনানন্দ জগৎ ও জীবনকে পান বেদনাক্রান্ত বোধে। এই সৃষ্টি প্রবাহে বর্তমানে যে ভাবনায় জীবনানন্দ খুসী হন এবং জেগে উঠতে চান তা হল সৃষ্টিরই ঐশ্বর্য, তিনি সুন্দরকে জানেন। কিন্তু তিনি সবকিছুর মধ্যেই সময়ের ভার অনুভব করেন। আমরা চাইলেও সেই সময়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি না। এই বন্ধনের বেদনাই জীবনানন্দের কবিতার কবিত্ব।